উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা—৩

৬৪তম বর্ষ, [illegible]

বার্ষিক মূল্য ৫৲

প্রতি সংখ্যা ·৫০

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ

জন্ম : ২৭শে ফাল্গুন, ১২৮৬ মহাসমাধি : ২৭শে পৌষ, ১৩৬৮

[মহাসমাধি সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী এই সংখ্যার শেষের দিকে অতিরিক্ত পত্রাংশে দ্রষ্টব্য]

'নরঋষি আজি ধরাধামে এলো'

কথা ও সুর—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সুরট-মল্লার—তেওরা

বিবেকানন্দ এলো রে এবার ।
ঐ শোন তাঁর বিজয়-হুংকার ॥
নরঋষি আজি ধরাধামে এলো
ছাড়িয়া সপ্ত-ঋষি-মণ্ডল
বরাভয় কর কমলযুগল
মুছাবে সকল কালিমা ধরার ॥
ক্ষাত্র বীর্য ব্রহ্মজ্ঞান
ধরিল নররূপ নয়নাভিরাম ।
ভারত-আত্মা মূর্তিমান্
শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাণ
ঘোষিল ধরাতে বারতা মহান্
'মানুষই দেবতা'—নব সমাচার ॥

রে রেম ম | ম — | গ ম | রে রেপ ম | রে গরে | সানি সা I
বি বে॰ কা | ন ॰ | ন্দ ॰ | এ লো॰ রে | এ ॰॰ | বা॰ র

প র্রে র্সা | নি ধ | নিধ প | ম মধ প | মগ রেগ | সা সা II
ঐ ॰ শো | ন ॰ | তাঁ॰ র | বি জ॰ য় | হু॰ ॰ং | কা র

ধ ম প | নি প | নি র্সা | প র্সা র্সা | র্সা — | নি র্রের্সা I
ন র ঋ | ষি ॰ | আ জি | ধ রা ধা | মে ॰ | এ লো

প র্সা নি | র্সা নি | র্সা — | রে́ সারে́ র্সা | নি ধ | প প I
ছা ড়ি য়া | স ০ | প্ত ০ | ঋ ষিং ০ | ম ০ | গু ল

সা রে রে | ম রে | ম প | ম প প | নিপ নি | সা — I
ব রা ভ | য় ০ | ক র | ক ম ল | যুং গ | ল ০

প রে র্সা | নি ধ | নিধ প | ম মধ প | মগ রেগ | রে সা II
মু ছা বে | স ক | লং ০ | কা লিং মা | ধং ০০ | রা র

মসা — সা | রে — | গ — | মগ ম ধ | প — | — প I
ক্ষা ০ ত্র | বী ০ | র্য ০ | ব্রং ০ হ্ম | জ্ঞা ০ | ০ ন

রে গ গ | ম মধ | প প | ম গ ম | রে — | সা সা I
ধ রি ল | ন রং | রূ প | ন য় না | ভি ০ | রা ম

ধ ম প | নি প | নি সা | প র্সা নি | রে́র্সা — | — র্সা I
ভা র ত | আ ০ | ত্মা ০ | মূ ০ র্তি | মা ০ | ০ ন

প র্সা নি | র্সা নি | র্সা — | রে́সা রে́র্সা নি | ধ নি | প প I
শ্রী রা ম | কৃ ০ | ষ্ণে ০ | নি বে দি | ত ০ | প্রা ণ

পর্সা রে́ রে́ | রে র্ম | রে́ — | র্সা নি নি | রে́সা — | — র্সা I
ভা র ত | আ ০ | ত্মা ০ | মূ ০ র্তি | মা ০ | ০ ন

প র্সা নি | র্সা নি | র্সা — | রে́র্সা রে́র্সা নি | ধ নি | প প I
শ্রী রা ম | কৃ ০ | ষ্ণে ০ | নি বে দি | ত ০ | প্রা ণ

সা রে রে | ম ম | প — | ম প প | নি — | র্সা —
ঘো ষি ল | ধ রা | তে ০ | বা র তা | ম ০ | হা ন

প রে́ র্সা | নি ধ | নি ধপ | ম ধ প | মগ রেগ | রে সা II
মা নু ষই | দে ব | তা ০০ | ন ব স | মাং ০০ | চা র

কথাপ্রসঙ্গে

নবযুগের উদ্বোধন

এই সংখ্যা হইতে 'উদ্বোধনে'র ৬৪তম বর্ষ আরম্ভ হইল। শ্রীভগবানের আশীর্বাদই আমাদের প্রধান শক্তি, প্রধান সম্বল। পাঠক-পাঠিকাদের শুভেচ্ছা ও লেখক-লেখিকাদের সহযোগিতা ও অন্যান্য বন্ধুদের সহায়তা স্মরণ করিয়া আমরা যে গতানুগতিকভাবে এক নববর্ষে প্রবেশ করিতেছি তাহা নয়, নূতন এক যুগের দিকে অগ্রসর হইতেছি।

স্বামীজী যে নবযুগের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ত্যাগতপস্যাপূত মানব-মনের একটি উর্ধ্বমুখী সাধনাকে লক্ষ্য করিয়াই। তিনি বলিয়াছেন: যে দিন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে, সেদিন হইতে সত্যযুগ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি—বিশ্বাস করি, স্বামীজীকে কেন্দ্র করিয়া যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কেন্দ্র করিয়া তেমনি সেই ভাব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা সেই নবযুগের দিকেই অগ্রসর হইতেছি।

আধ্যাত্মিক বিশ্বমানবতার এক নব দিগন্তই প্রতিভাত হইয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের অভ্রান্ত দৃষ্টিতে। এ যুগের মানুষকে তিনি আহ্বান করিয়া গিয়াছেন এক নবতর জাগ্রত মানবতার আহ্বানে; সুপ্ত ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন প্রভাতী সঙ্গীতে! তিনি দেখিয়াছিলেন—ভারতের বিরাট জনতার যুগযুগব্যাপী নিদ্রা ভাঙিতেছে, তিনি দেখিয়াছিলেন, 'সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া'। নিদ্রা ভাঙিতেছে, তবে ধীরে ধীরে।

অনেকে মনে করেন নবযুগ আসিয়া গিয়াছে, আবার কেহ কেহ মনে করেন, নবযুগ আসিতেছে। আলোক-অন্ধকার-মিশ্রিত পথ দিয়াই আমরা চলিয়াছি। সংশয়-বিশ্বাস-মিশ্রিত মন লইয়াই আমাদের পথ চলিতে হইবে, তবে অন্তরের অন্তরে বিশ্বাসের ক্ষীণ দীপশিখাটুকু যেন জ্বলিতে থাকে; ঊষার অরুণরাগে পূর্বদিগন্ত রক্তিম হইয়া উঠিতেছে! সূর্যোদয়ের আর দেরি নাই। দুর্যোগের রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে! সুদীর্ঘ রজনী সত্যই প্রভাতপ্রায়া।

হতাশ হইলে চলিবে না, থামিলে চলিবে না। চলিতে চলিতেই পথ ফুরাইয়া যায়! যে ঘুমায় সে তো অকর্মণ্য, মৃত! যে জাগ্রত, সেই জীবিত, সে কর্মনিষ্ঠ, সে চলিতেছে—আশা-আকাঙ্ক্ষা আত্মবিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতেছে।

জাগ্রত জাতিও চলিতে থাকে আত্মবিশ্বাস আত্মনির্ভরতা—আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া। নিজস্ব ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার ভবিষ্যৎ রচিত হয়, তাহাই জাতীয় জীবন; নতুবা শুধুমাত্র পরের অনুকরণ বা অনুসরণ করিয়া যে জীবন, তাহা পরাধীনতারই নূতন সংস্করণ। আন্তর্জাতিকতার মিথ্যা মোহে যাহারা বলে, 'জাতীয়তা একটা সেকেলে কথা, বর্তমানে অচল'—তাহাদের প্রশ্ন করি, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ আছে কি, যে দেশ নিজস্ব জাতীয়তার দৃঢ় ভূমি ছাড়িয়া দিয়া আন্তর্জাতিকতার আকাশে অবিরত উড্ডীয়মান?

ভারত যে বর্তমানে জাগিতেছে—এ কথা প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ের মতো সত্য! কেন জাগিতেছে, তাহার উত্তর আমরা শুনিয়াছি স্বামীজীর মুখে: জগতের কাছে ভারতের নিজস্ব কিছু দিবার আছে—তাহার একটি জাতীয় আদর্শ আছে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, বিধিনির্দিষ্ট একটি দায়িত্ব আছে। সে নিজে আধ্যাত্মিকভাবে জাগ্রত হইয়া জগৎকেও সেই ভাবে জাগ্রত করিবে!

'নরঋষি' নরেন্দ্রনাথ

শুধু 'স্বামীজী' বলিতে আবালবৃদ্ধবনিতা 'স্বামী বিবেকানন্দ'কেই বুঝিয়া থাকে। সকলে হয়তো তাঁহার পুরা নামটিও জানে না বা শোনে নাই। কেহ হয়তো কোন ছবি দেখিয়াছে—ধ্যানমূর্তি অথবা উষ্ণীষশীর্ষ অথবা দণ্ডহস্তে পরিব্রাজক। নানারূপে স্বামীজী তাহাদের হৃদয় হরণ করিয়াছেন, তাহাদের চক্ষে স্বামীজীর নানা মূর্তি ভাসিতেছে। দরিদ্র চাষার কুটিরে, ধনীর মর্মর প্রাসাদে, ভুনাওয়ালার দোকানের দেওয়ালে সমান সমাদরে স্বামীজীর ছবি শোভা পাইতেছে। কেহ বা স্বামীজীর দু-একখানি বই পড়িয়াছে, কেহ বা দু-চারিটি অগ্নিগর্ভ বাণী শুনিয়াছে, অল্প কয়েকজনই তাঁহার সমগ্র জীবন-কথা সঠিকভাবে পড়িয়া উঠিবার সুযোগ বা সুবিধা পাইয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়। কাহারও মতে স্বামীজী একজন প্রথম শ্রেণীর ধর্মাচার্য ও আধুনিক যুগে নব-বেদান্তের প্রচারক। কেহ বা দেখেন—স্বামীজী ভারতাত্মার মূর্ত বিগ্রহ, স্বদেশ-মন্ত্রের উদ্‌গাতা, একটা অবনত জাতিকে উঠাইবার চেষ্টায় প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। আবার কেহ দেখেন—স্বামীজী স্বদেশে বিদেশে মানুষের সেবায়, আত্মবিস্মৃত মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগাইবার সাধনায় সকলকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন!

স্বামীজীর শতবার্ষিকীর পূর্ব মুহূর্তে অনেকেরই মনে আজ স্বামীজী-সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে, তাই আজ আমাদের প্রথম কর্তব্য তাঁহার স্বরূপ-সম্বন্ধে একাগ্র অনুসন্ধান। তবেই আমরা বুঝিব বিভিন্ন দিকে বিকশিত তাঁহার জীবনের প্রকৃত মর্ম, তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার যথাযথ অর্থ।

স্বামীজীর স্বরূপ—শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা কে বেশী জানিত, বা জানিতে পারে? তিনি কি বলেন নাই, 'ও সেই প্রাচীন নরঋষি—দেবলোকেরও ঊর্ধ্বে—অখণ্ডের ঘরে ধ্যানমগ্ন ঋষি'! বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি অতি ব্যাপক, জড়বাদী সভ্যতার একান্ত ভোগপরায়ণ আদর্শ মানুষকে ক্রমশঃ স্বার্থপর ও সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, পশুতে পরিণত করিতেছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মুখে উচ্চ উচ্চ আদর্শের বুলি—আর মনে কাম-কাঞ্চনের অতৃপ্ত তৃষ্ণা। ইহাই এ-যুগের সাধারণ মানুষের যথার্থ পরিচয়।

মানুষের এই ক্রমাবনতি রোধ করিতে, মানুষকে তাঁহার নিজস্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়োজন কঠোর ত্যাগ ও তপস্যা! কে তাহা করিবে?—যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের কল্যাণে কঠোর তপস্যা করিয়া বারংবার দেহপাত করিয়াছেন নর ও নারায়ণ—শ্রীভগবানেরই অবতার দুই প্রাচীন ঋষি! তাঁহাদের অন্য কোন কামনা নাই, অন্য কোন বাসনা নাই; শুধু এক লক্ষ্য—মানুষ যেন যথার্থ মানুষ হয়! নরলোকে আবির্ভূত হইয়া তাই বুঝি তাঁহাদের নাম-দুটিও নরলোকের মতো—মানুষের ধরিবার বুঝিবার মতো; নরঋষি নারায়ণ-নামের মহিমাও বর্জন করিয়াছেন! 'নারায়ণ' তাঁহার নামের মহিমা সত্ত্বেও নরের মধ্যেই তাঁহার অধিষ্ঠান (অয়ন) ঘোষণা করিয়াছেন!

নর-নারায়ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মানব-উন্নয়নের লীলা করিয়া চলিয়াছেন! একবার তাঁহাদের দেখিয়াছি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপ্রাঙ্গণে! জীবন-সংগ্রামে অবসন্ন, মায়ামোহে মুগ্ধ মানুষের নিখুঁত প্রতীক বিষণ্ণ অর্জুন, আর শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য-দেহধারী সদাচৈতন্যময় ভগবান; নারায়ণ নর-কে উৎসাহিত করিতেছেন, উত্তেজিত

করিতেছেন—সত্ত্বরজোগুণ সহায়ে তমোগুণকে জয় করিয়া স্বরূপ উপলব্ধি করিতে। আবার দেখিলাম—শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ধীরে ধীরে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত করিতেছেন।

কি প্রয়োজন ছিল? যদিও স্বয়ম্ভু এই এই সৃষ্টিকে বহির্মুখী করিয়াছেন, তথাপি মাঝে মাঝে তাহাকে অন্তর্মুখী করাও তাঁহারই লীলার অন্তর্গত। মানুষ যখন তাহার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া যায়, যখন তাহার নিজস্ব ভূমা-ভাব ভুলিয়া অল্পেই সুখী হয়, তখন আর ভগবান স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি নামিয়া আসেন—নরলোকে মানুষের মাঝে মানুষ সাজিয়া মানুষকে মনে করাইয়া দিয়া যান তাহার স্বরূপের কথা।

কিন্তু তাঁহার সেই উচ্চগ্রামের সুর মানুষের অনভ্যস্ত কর্ণে ঠিকভাবে ধরা পড়ে না, সাধারণ মানুষ ঠিক বুঝিতে পারে না—তাঁহার কথার মর্ম। তাই তাঁহাকে সঙ্গে আনিতে হয় কয়েকজন অসাধারণ মানুষ, যাহারা তাঁহার জীবন ও বাণীর মর্মকথা সাধারণ মানুষের স্তরে পৌঁছাইয়া দিবে, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ আনিয়াছিলেন ধ্যানলোক হইতে নরঋষি নরেন্দ্রনাথকে?

কি সুন্দর নাম! নরলোকে আগত নরঋষির নাম নরেন্দ্রনাথ!—একটি জ্বলন্ত জীবন্ত মানুষ! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'খাপখোলা তলোয়ার!' —বলিয়াছেন, 'এত বড় আধার আর কখনও আসে নাই!' জহুরী হীরে চেনে, শ্রীরামকৃষ্ণই চিনিয়াছিলেন নরেন্দ্রনাথকে!

নরেন্দ্রনাথ 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'—এত বড় নাম তাঁহাকে ব্যথিত করিত, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশংসাও তাঁহাকে কুণ্ঠিত করিত। তথাপি আমরা দেখিয়াছি—এই নাম তাঁহাকে কি ভাবে মানাইত, এ নাম শুধু তাঁহারই যোগ্য। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হৃদয় ও মস্তিষ্ক, তাহার পূর্ণ বিকাশ 'নরেন্দ্রনাথ'ই এ যুগের মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি! এ যুগের মানুষের মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, সকল সন্দেহ-সংশয়—ও তাহার সমাধান এবং সামঞ্জস্য আমরা তাঁহারই মধ্যে পাই। সাধারণ মানুষের এত বড় জয়গান কখন কাহারও কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই! "সবার উপরে 'মানুষ' সত্য তাহার উপরে নাই" এই কবিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা মনোমত ব্যাখ্যা করি, অনেকেই জানি না—এ 'মানুষ' সাধারণ মানুষ নয়; সহজিয়া সাধনার এ 'সহজ মানুষ'—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ! তাঁহারা বরেণ্য, নমস্য; তাঁহারা সুখদুঃখের অতীত, তাঁহারা আমাদের এ আলোচনার ঊর্ধ্বে!

কিন্তু স্বামীজী যে-মানুষের জয় গাহিয়াছেন—সে মানুষ মাঠে চাষ করিতেছে, দোকানে চানা ভাজিতেছে, রেলে-স্টীমারে নৌকায় মাল তুলিতেছে, ট্রামে-বাসে ঝুলিয়া মৃত্যুর সঙ্গে যুঝিয়া জীবন-সংগ্রাম করিতেছে, এই এ-যুগের মানুষের কাছেই স্বামীজী এ-যুগের ভগবানের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বিভ্রান্ত মানুষকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন: তুমি ভাল; আরও ভাল হও। যাহা কিছু কর, মানুষের মতো কর; মনুষ্যত্বকে অবনমিত করিও না! সিংহশিশু, স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে মেষশিশু ভাবিও না! ওঠ, জাগো, মোহনিদ্রা হইতে জাগো—ভুলের খেলা অনেক হইয়াছে; স্বপ্ন দিয়া স্বপ্ন ভাঙো; স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হও; যতক্ষণ না সেই লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ—ততক্ষণ থামিও না!

ভারতের উপনিষদের এই মহাবাণী কণ্ঠে লইয়াই স্বামীজী বাহির হইয়াছিলেন বিশ্ব-বিজয়ে! এ দিগ্‌বিজয় তাঁহার নিজের মহিমার

জন্য নয়। তিনি জানিতেন—পাশ্চাত্য-ভাবের উপর এই ভারত-ভাবের বিজয় দ্বারাই সূচিত হইবে জড়ের উপর চৈতন্যের প্রভাব, শুরু হইবে মানবেতিহাসে এক নূতন আধ্যাত্মিক যুগ!

কি সেই যুগের স্বরূপ ও প্রকৃতি? মানুষকে পাপী তাপী বলিয়া, পরলোকে শাস্তির ভয় দেখাইয়া তাহাকে দিয়া প্রায়শ্চিত্ত-রূপ ধর্ম আর করানো চলিবে না! দু-চার জন অজ্ঞ অন্ধবিশ্বাসী চিরকাল থাকিবে—যাহারা অনন্তকাল ধরিয়া প্রথম মানব-মানবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; কিন্তু যাহারা যথার্থ বিশ্বাসী তাহারা বুঝিবে, দেবতা স্বর্গে বা আকাশে নাই, —মানবের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে দেবত্ব; সাধনা দ্বারা, ত্যাগ- ও তপস্যা দ্বারা দেবত্ব ফুটিয়া ওঠে; যুগে যুগে সেই জাগ্রত দেবতা মানুষকে আশার বাণী, অমৃতত্বের বাণী শুনাইয়াছেন। মানুষ শুনিয়াছে, কখন বুঝিয়া আবার ভুলিয়াছে, কখন বা ভুল বুঝিয়াছে। ইহাই ধর্মজগতের পুনরাবর্তনশীল ইতিহাস।

আজ তাই অতি সরল সবল স্বচ্ছ ভাষায় মানবাত্মার দেবত্ব আবার বিঘোষিত হইয়াছে! ইহা চিরন্তন সত্য, পুরাতনা বাণী—শুধু নূতন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, নূতন ভঙ্গিতে প্রচারিত হইতেছে। এবার যেন আবার না ভুল করি, আবার যেন না ভুল বুঝি!

মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বেরই (potential divinity) তাত্ত্বিক রূপ (Theoretical form) নরনারায়ণ-বাদ—মানুষের মধ্যেই ভগবান রহিয়াছেন। এই ভাবেরই ব্যাবহারিক রূপ (Practical shape) শিববোধে জীব-সেবায়; এখানে শুধু মানুষে নয়—জীবমাত্রে শিবদর্শন। উভয়ই সেই অদ্বৈত বেদান্তের জীবব্রহ্মবাদের সার্থক ও যুগোপযোগী রূপায়ণ। ত্যাগ-তপস্যা দ্বারা মানুষ প্রথম অনুভব করিবে—তাহারই মধ্যে রহিয়াছে অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভাব। সেই অনুভূতিলব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হইবে সমাজের সর্বস্তরে। এই ভাবেই পাশবদ্ধ জীব রূপান্তরিত হইবে পাশমুক্ত শিবে, এবং মানুষ চিনিবে নিজের স্বরূপ।

‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার’

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আশ্চর্য সে নাম,
জন্ম-শতবর্ষে বিশ্ব করিছে প্রণাম।
গৈরিক বসন অঙ্গে মুণ্ডিত মস্তক,
করে দণ্ড, নগ্নপদ কে পরিব্রাজক!
কখন কৈশোর-শেষে আসিল যৌবন
গৃহ-সুখ-সাধ কত বিলাস-ব্যসন
ভুলালো না মন।

শুধু সাধু-ভক্ত-দ্বারে
ফিরেছ ঈশ্বরে খুঁজি—কে দেখেছে তাঁরে,
অচিন্ত্য সে পুরুষেরে?
‘তোমারি সমান’—
গুরু কন, ‘জানি তাঁরে, দিব সে সন্ধান।
হের জীব শিব-রূপে দেহের মন্দিরে,
হের বিশ্বে সব ধর্ম মেশা এক নীড়ে।’
নিমেষে আঁখির আগে মিলিল ঈশ্বর!
‘বহু রূপে’ রয়েছেন ব্যাপি চরাচর।

চলার পথে

'যাত্রী'

যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। পঞ্জিকায় দিন-নির্ণয়ও হইয়া গিয়াছে। ধূলা-মাটি-ভরা এই পৃথিবী হইতে ঐ ভাগবত পুরুষ এখন মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত। এই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তিনি কতই না প্রেরণা দিয়াছেন, কতই না বুঝাইয়াছেন। মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ—এ-কথা তাঁহার মুখনিঃসৃত হইয়াই শুদ্ধ হইয়া যায় নাই; তাঁহার পূত সংস্পর্শে আগত সাধকদের সকলকেই ঐ আদর্শ যাহাতে স্ব স্ব জীবনে কার্যে পরিণত করা যায়, তাহার জন্য মানসিক প্রস্তুতিটিও তাহাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দিয়া বিদায়ের জন্য এখন তিনি সদাই প্রস্তুত। এমন সময়ে ঐ মহামানবের লীলা-জীবন শেষ হইবার তিন-চারিদিন পূর্বে তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া সমাধিমগ্ন হইলেন। দেব-মানবের সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্যের তখন মনে হইল এক অতি সূক্ষ্ম অথচ ভাস্বর তথা সাত্বিক শক্তি—বিদ্যুদাধার-স্পর্শে দেহে প্রবাহ সঞ্চারিত হওয়ার মতো শক্তি—তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেছে। শিষ্যের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল; তিনি কিছুক্ষণ ভাবে বিভোর হইয়া রহিলেন। কিন্তু আবার বাহ্য সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে জলধারা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হ'লে পরে ফিরে যাবি।

ঐ গূঢ় ভগবৎ-শক্তির ধারক ও বাহক-রূপেই এখন হইতে নরেন্দ্রনাথকে স্বামী বিবেকানন্দে বিকশিত হইতে দেখিলাম। এখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তির বিগ্রহরূপে বিবেকানন্দের নবকলেবর লাভ। নরেন্দ্রনাথও বুঝিলেন, যে অবতার-শক্তি এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে ছিল, তাহাই এখন তাঁহার শরীর আশ্রয় করিয়াছে। ঐ শক্তি প্রভাবে নিজস্ব মুক্তির চিন্তা করা আর চলিবে না—দেশ-দেশান্তরের বহু অন্ধকার মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইবার কার্যে উহাকে ব্যবহার করিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন, নিজে নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকিলেই চলিবে না—'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়' তাহা এখন মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া বনের বেদান্তকে মানবের গৃহকোণে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

দুঃখদৈন্যে-ভরা, আত্ম-চিন্তাহীন মানবকুলের অবস্থা তখন কিরূপ, তাহা কবিতার ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—

> 'সমস্ত পৃথিবী এক শরবিদ্ধ পাখির মতন
> যন্ত্রণায় দিশেহারা সকরুণ তার সে কাহিনী।'

স্বামীজী তাই ধর্মকে কেবল বিচার-বিশ্লেষণের দার্শনিক তত্ত্বে না দাঁড় করাইয়া উহা যাহাতে প্রত্যেক মানব নিজ নিজ জীবনে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার কাজে লাগাইতে পারে, তাহারই

শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দের জীবন সর্ববিধ অজ্ঞান ও মায়ার বিরুদ্ধে অভিযান এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত আলোকবার্তাকে অভিনন্দন।

এই সময় হইতেই বিবেকানন্দ-জীবনে এক চির-নবীনত্বের আবির্ভাব। এই চির-নবীনত্বের—এই চিরযৌবনের একটি মরণজয়ী দিক আছে। এবং এই দিকটির সম্প্রাসরণ করিতে গিয়া জনৈক লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া বলিতে পারি: যে যৌবন সুখের খাঁচাতে বন্দী থাকিয়াই তৃপ্ত, ভোগ-বাসনায় দৃপ্ত, সেই যৌবন নূতনের যৌবন, তাহার মৃত্যু আছে, আয়ুষ্কালও তাহার নিতান্তই সীমিত। মরণ-বনের অন্ধকারের গহন কাঁটাপথে নির্ভীক 'শিকারি' যে-যৌবন, তাহা যুগে যুগে দেশে দেশে আবির্ভূত হয়—এই নির্ভীক যৌবনের আয়ুষ্কাল অসীম—মৃত্যুঞ্জয় মহাকালের উপমাস্বরূপেই তাহা চির দেদীপ্যমান থাকে।

এখন হইতে বিবেকানন্দের মধ্যে এই মৃত্যুঞ্জয় যৌবনের গতি ও প্রেরণা মূর্ত হইয়া উঠিল। এখন হইতে তাই তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্বে পৌঁছানোর আনন্দ-সাধনা লইয়াই মানবসমাজকে প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। এখন হইতে তাই তিনি আর দুর্বোধ্য রহস্যের পথে পা না বাড়াইয়া, তাঁহার চতুর্দিকে যে নররূপী নারায়ণ রহিয়াছেন, তাঁহাদেরই পূর্ণ অভিব্যক্তির পথে পথিকৃৎ হইয়া দাঁড়াইলেন। ফলে পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনের যে মর্মন্তুদ হাহাকার, তাহার সমস্যা সমাধানের জন্য উদারচেতা প্রেমিক বিবেকানন্দকে ভ্রমণ করিতে দেখি। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়: যুগমানবের চিন্তার তীব্রতা এখন হইতে বিবেকানন্দকে তাঁহার ধ্যানময় জীবনের মহাচেতনার স্বরলোক হইতে নামাইয়া আনিয়া এই মাটির পৃথিবীতে মানবের দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। এক কথায় তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে পরিহার করিয়া এখন হইতে বিশ্বমানবকে ডাক দিয়াছেন মুক্তজীবনের অবার গতিপথে, আনন্দের অসীম অজস্রতায়। এই আহ্বান কেবলমাত্র ব্যক্তি বা সমাজকে নয়, সমগ্র দেশকে মুক্ত-জীবনের আনন্দময় পথে আগাইয়া দিয়াছে,—এ-কথা গভীরতর ইতিহাসের পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। বিবেকানন্দোত্তর ভারতে তাই দেখি শিল্পে-কলায়, সঙ্গীতে-সাহিত্যে, জীবনের দিকে দিকে এত জাগরণের প্রেরণা, স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সাধনায় এত মরণপণ চেষ্টা। আমরা ক্রমশঃ এই শ্রীরামকৃষ্ণধৃতপ্রাণ আধ্যাত্মিক কেশরীর জীবনালেখ্য দেখিতে চেষ্টা করিব। বুঝিতে চেষ্টা করিব—কি ভাবে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে বেদান্ত-সিদ্ধান্ত নব জন্মলাভ করিয়া বেলুড়ের মাটিতে তাহার প্রসার সম্ভবপর করিল। এই দুই ঘটনার মধ্যে বেদান্ত-কেশরীর পৃথিবী পরিক্রমা তাৎপর্যপূর্ণ!

চল পথিক, এই ভাস্বর-দ্যুতি মহাপ্রাণের জীবনেতিহাস সংগ্রহে চল, এই প্রসঙ্গে এই মহাশক্তির শতবার্ষিকীতে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আগাইয়া চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

জগতের কাছে ভারতের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

['India's Message to the World' নামে একটি বই লেখার উদ্দেশ্যে স্বামীজী ৪২টি চিন্তাসূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বইটির ভূমিকাসহ সামান্য কয়েকটি চিন্তাসূত্রই বিস্তারিত-ভাবে লেখা হইয়াছিল। দেহাবসানের পর এই অসমাপ্ত ইংরেজী রচনাটি তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। এখানে খসড়া রচনাটির অনুবাদ* প্রদত্ত হইল।]

সূচী

১. পাশ্চাত্যবাসীদের উদ্দেশ্যে আমার বাণী বীরত্বপূর্ণ। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আমার বাণী বলিষ্ঠতর।

২. ঐশ্বর্যময় পাশ্চাত্যে চার বৎসর বাস করার ফলে ভারতবর্ষকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। অন্ধকার দিকগুলি গাঢ়তর এবং আলোকিত দিকগুলি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

৩. পর্যবেক্ষণের ফল—ভারতবাসীর অধঃপতন হইয়াছে, এ-কথা সত্য নহে।

৪. প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির একীকরণ; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এই সমস্যা অন্যত্র এত বিশালরূপে দেখা দেয় নাই।

৫. ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

৬. অন্যান্য দেশে ইহা দৈহিক বলের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে অপরাপর সংস্কৃতির উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে ক্ষণস্থায়ী বিপুলপ্রাণশক্তিসম্পন্ন জাতীয় জীবন দেখা দিয়াছে, তারপর উহার ধ্বংস হইয়াছে।

৭. অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্যা যত বিরাট, উহা সমাধানের চেষ্টাও তত শান্ত উপায়ে দেখা দিয়াছে। প্রাচীনতম কাল হইতে ভিন্ন আচারপদ্ধতি, বিশেষভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মসম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

৮. যে দেশে ঐক্যস্থাপনের জন্য বলপ্রয়োগই যথেষ্ট হইয়াছে, সে দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচিত্র উন্নতির পন্থাগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া প্রধান গোষ্ঠীটিই উন্নত হইয়াছে। একটি বিশেষ শ্রেণী অধিকাংশ জনসাধারণকে স্বীয় মঙ্গল-সাধনের জন্য ব্যবহার করিয়াছে; ফলে উন্নতির বেশীর ভাগ সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে, যখন সেই প্রাধান্যপ্রয়াসী গোষ্ঠীটির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তখন গ্রীস রোম বা নর্মানদের ন্যায় আপাত-অভেদ্য জাতিসৌধগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৯. একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচনা অনুসারে এ-কথাও বলা যায়, ইহার দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবে।

১০. এমন একটি মহান্ পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।

---

* অনুবাদক : শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ। [দ্রষ্টব্য : Complete Works IV—Pp. 254—262]

১১. দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে কিন্তু এক্ষণে বাস্তবক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন নিজেদে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

১২. একটি জাতীয় পটভূমি পাওয়া গেল—আর্যজাতি।

১৩. মধ্য-এশিয়া হইতে বাল্টিক উপসাগর অবধি এলাকায় কোন পৃথক্ ও বিশি আর্যজাতি ছিল কিনা, তাহা অনুমানের বিষয়।

১৪. তথাকথিত জাতি-রূপ (type)। বিভিন্ন জাতি সর্বদাই মিশ্রিত ছিল।

১৫. সোনালী চুল ও কালো চুল।

১৬. তথাকথিত ঐতিহাসিক কল্পনা হইতে সহজবুদ্ধির বাস্তব জগতে অবতরণ প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতে মধ্যবর্তী দেশে।

১৭. ইহার ফলে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা দেয়।

১৮. 'সংস্কৃত' যেমন ভাষা-সমস্যার সমাধান, 'আর্য' তেমনি জাতিগত সমস্যার সমাধান বিভিন্ন পর্যায়ের প্রগতি ও সংস্কৃতির এবং সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধা 'ব্রাহ্মণত্ব'।

১৯. ভারতবর্ষের মহান্ আদর্শ—'ব্রাহ্মণত্ব'।

২০. স্বার্থহীন, সম্পদ্‌হীন, একমাত্র নৈতিক নিয়ম ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার অনুশাসনের ঊর্ধ্বে।

২১. জন্মগত ব্রাহ্মণত্ব—অতীতে ও বর্তমানে বহু জাতি ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিয়াছে, উহার অধিকারী হইয়াছে।

২২. যাঁহারা মহৎ কর্মের অধিকারী, তাঁহারা কোন দাবি করেন না, একমাত্র অলস অকর্মণ্য মূর্খদের পক্ষেই উহা সম্ভব।

২৩. ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র আদর্শের অবনতি। পুরাণে আছে, কলিযুগে কেবল অব্রাহ্মণেরাই থাকিবে। সে কথা সত্য, দিনে দিনে সত্যতর হইয়া উঠিতেছে। কিছু পরিমাণ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন—একমাত্র ভারতবর্ষেই আছেন।

২৪. ব্রাহ্মণত্ব লাভের পূর্বে আমাদিগকে ক্ষাত্র আদর্শের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কেহ হয়তো পূর্বে এই আদর্শে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে উহার পরিচয় দিতে হইবে।

২৫. কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন।

২৬. একই জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীরা একটি বংশগত নামে এক ধরনের দেবতার উপাসনা করে—যেমন ব্যাবিলোনীয়দের 'বাল'-দেবতা উপাসনা এবং হিব্রুদের 'মোলোক'-দেবতা উপাসনা।

২৭. ব্যাবিলোনীয়দের সব 'বাল'-দেবতাকে 'বাল-মেরো ডাচে' পরিণত করা এবং ইহুদীদের সব 'মোলোক'কে 'মোলোক যিয়োবাহ' বা 'ইয়াহ'তে পরিণত করার চেষ্টা।

২৮. ব্যাবিলোনীয়েরা পারসিকদের দ্বারা ধ্বংস হয়। হিব্রুগণ ব্যাবিলোনীয়দের

পৌরাণিক কাহিনী গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রয়োজনমত গড়িয়া লয় এবং একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম গড়িতে সমর্থ হয়।

২৯. স্বৈর রাজতন্ত্রের মতো একেশ্বরবাদ দ্রুত আদেশানুযায়ী কার্য সমাধা করে, কিন্তু ইহার আর কোন বিকাশ সম্ভব হয় না। একেশ্বরবাদের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি—ইহার নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন। যে সকল জাতি এই মতবাদের প্রভাবাধীন হয়, তাহারা অল্পকালের জন্য সহসা উন্নতি লাভ করিয়া অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়।

৩০. ভারতবর্ষে সেই সমস্যা দেখা দিয়াছিল, সমাধান মিলিল—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' সর্বপ্রকার সাফল্যের পশ্চাতে ইহাই মূলমন্ত্রস্বরূপ, সমগ্র সৌধের ইহাই রক্ষণশিলা।

৩১. ফলস্বরূপ—বৈদান্তিকের সেই আশ্চর্য উদার সহনশীলতা।

৩২. সুতরাং বিরাট সমস্যা হইল বিভিন্ন উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট না করিয়া উহাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতিসাধন।

৩৩. স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত কোন প্রকার ধর্মের পক্ষে ঐরূপ করা অসম্ভব।

৩৪. এইখানেই অদ্বৈতবাদের মহিমা। অদ্বৈতবাদ কোন ব্যক্তির নয়, আদর্শের প্রচারক; অথচ পার্থিব ও অপার্থিব শক্তির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ করিয়া দেয়।

৩৫. চিরকাল এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—এই অর্থে আমরা সর্বদা অগ্রসর হইতেছি। মুসলমান আমলের মহাপুরুষবৃন্দ।

৩৬. প্রাচীনকালে এই আদর্শ পূর্ণসচেতন ও শক্তিশালী ছিল, আধুনিককালে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; এই অর্থে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে।

৩৭. ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটিবে: যদি কিছুকালের জন্য একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত শ্রমের দ্বারা আশ্চর্য ফল লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বহুকাল ধরিয়া যে সকল জাতি রক্ত ও আদর্শের মধ্য দিয়া মিলিত হইতেছে, তাহাদের সমবায়ে যে ভবিষ্যৎ মহাশক্তি গড়িয়া উঠিবে—তাহা আমি মানস নেত্রে দেখিতে পাইতেছি।

ভারতের ভবিষ্যৎ—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে তরুণতম ও সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত একটি জাতি, যাহা প্রাচীনতমও বটে।

৩৮. আমাদের কোন্ পন্থায় কাজ করিতে হইবে? স্মৃতি-অনুসারে নির্ধারিত কয়েকটি সামাজিক বিধিনিষেধের গণ্ডি। কিন্তু উহাদের একটিও শ্রুতি হইতে আসে নাই। সময়ের সঙ্গে স্মৃতির পরিবর্তন হইবে। ইহাই নিয়মরূপে স্বীকৃত।

৩৯. বেদান্তের আদর্শ কেবল ভারতবর্ষে নয়, বাহিরেও প্রচার করিতে হইবে। লেখার মধ্য দিয়া নয়, ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রত্যেক জাতির মানসগঠনে আমাদের চিন্তাধারা সঞ্চার করিতে হইবে।

৪০. কলিকালে দানই একমাত্র কর্ম। কর্মের দ্বারা শুদ্ধ না হইলে কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না।

৪১. পরা ও অপরা দুই ধরনের বিদ্যাই দান করিতে হইবে।

৪২. জাতির আহ্বান—ত্যাগ এবং ত্যাগীর দল।

ভূমিকা

প্রতীচ্যের অধিবাসীদের উদ্দেশে আমার বাণী তেজোদীপ্ত। হে প্রিয় স্বদেশবাসিগণ! তোমাদের প্রতি আমার বাণী বলিষ্ঠতর। প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণী আমার সাধ্যানুযায়ী আমি প্রতীচ্য জাতিসমূহের নিকট প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উহা ভাল হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের বলদৃপ্ত কণ্ঠোত্থিত মৃদু অথচ নিশ্চিত বাণী স্পন্দিত হইতেছে, দিনে দিনে সেই ধ্বনি স্পষ্টতর হইতেছে—উহা বর্তমান ভারতের নিকট ভবিষ্যৎ ভারতের বাণী।

নানা জাতির মধ্যে অনেক আশ্চর্য প্রথা ও বিধি, অনেক অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই যে, আচার-ব্যবহারের—সংস্কৃতি ও শক্তির আপাত-বৈচিত্র্যের অন্তরালে একই মনুষ্যহৃদয় একই ধরনের আনন্দ-বেদনা, সবলতা ও দুর্বলতা লইয়া স্পন্দিত হইতেছে।

ভাল মন্দ সর্বত্রই আছে। উহার সামঞ্জস্যও আশ্চর্যভাবে বিদ্যমান। কিন্তু সকলের ঊর্ধ্বেই সেই গৌরবদীপ্ত মানবাত্মা—যাহার নিজস্ব ভাষাটি বলিতে জানিলে সে কখনও ভুল বুঝে না। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই জাতীয় নরনারী আছে, যাহাদের জীবন মানবজাতির পক্ষে আদর্শস্বরূপ। যাঁহারা সম্রাট্ অশোকের সেই বাণীর প্রমাণস্বরূপ—'প্রত্যেক দেশেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা বাস করেন।'

পবিত্র ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ হৃদয়ে যে প্রতীচ্যবাসিগণ—আমাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য; এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর, হে আমার বন্ধুবর্গ—তোমাদেরই সেবায় ব্যয়িত হইবে।

আমার দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সম্বল—সে সবই তো আমি এই দেশের কাছে পাইয়াছি, এবং যদি আমি কোন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়া থাকি, সে গৌরব আমার নয়, তোমাদের। আমার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা—সবই আমার ব্যক্তিগত, সে সবই এ দেশবাসীকে যে মহতী ভাবধারা আজন্ম ধারণ করিয়া রাখে, তাহা দ্বারা সমৃদ্ধ হইবার শক্তির অভাববশতঃ।

আর কী দেশ! বিদেশী অথবা স্বদেশী, যে-কেহ এই পবিত্রভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইবে—যদি তাঁহার মন পশুস্তরে অধঃপতিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইতিহাসের বিস্মৃত অতীত হইতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম যে সন্তানেরা পশু-সত্তাকে দিব্য সত্তায় উন্নীত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন্ত চিন্তারাশি দ্বারা নিজেদের পরিবৃত অনুভব করিবেন। সমগ্র আবহাওয়াটি আধ্যাত্মিকতা দ্বারা স্পন্দিত।

দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা সংরক্ষণ করিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মস্বরূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সে সব কিছুরই পুণ্যভূমি। এই দেশ—যেখানে আনন্দের পাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বেদনার পাত্রটি পূর্ণতর হইলে অবশেষে এইখানেই মানুষ সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিল—এ সমস্তই

অসার ; এখানেই যৌবনের প্রথম সূচনায়, বিলাসের ক্রোড়ে, গৌরবের সমুচ্চ শিখরে, ক্ষমতার অজস্র প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ মায়ার শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।

এইখানে এই মানবতাসমুদ্রে সুখদুঃখ, সরলতা ও দুর্বলতা, ধন-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রু, জন্মমৃত্যুর তীব্র স্রোতসংঘাতে, অনন্ত শান্তি ও স্তব্ধতার বিগলিত ছন্দের আবর্তনে উত্থিত হয় বৈরাগ্যের সিংহাসন। এই দেশেই জন্মমৃত্যুর মহাসমস্যাসকল—জীবন-তৃষ্ণা, এ জীবনের জন্য ব্যর্থ উন্মাদ প্রচেষ্টার ফলে সঞ্চিত দুঃখরাশি- সর্বপ্রথম আয়ত্তে আনিয়া সমাধান করা হয়, এমন সমাধান অতীতে কখনও হয় নাই বা ভবিষ্যতে কখনও হইবে না ; এইখানেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় যে, এই জীবনটাই অনিত্য—যাহা পরমসত্য, তাহারই ছায়ামাত্র। এই একটি দেশ, যেখানে ধর্ম বাস্তব সত্য, এইখানেই নরনারী সাহসের সঙ্গে অধ্যাত্মলক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য ঝাঁপ দেয়, ঠিক যেমন অন্যান্য দেশে দরিদ্র ভ্রাতাদের বঞ্চিত করিয়া নরনারী জীবনের সুখসামগ্রীর জন্য উন্মাদের মতো ঝাঁপ দেয়। এইখানেই মানবহৃদয়—পশুপক্ষী, তরুলতা, মহত্তম দেবগণ হইতে ধূলিকণা অবধি, উচ্চতম হইতে নিম্নতম সত্তা পর্যন্ত সবকিছুকে ধারণ করিয়া আরও বিশাল—অনন্তপ্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেই মানবাত্মা সমগ্র বিশ্বকে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে অনুধাবন করিয়াছে, তাহার প্রতিটি স্পন্দন আপন নাড়ীর স্পন্দন বলিয়া মনে করিয়াছে।

আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া, পূর্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তব রূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির গোলক এক হাত হইতে আর এক হাতে গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে ; জাতীয় জীবনস্রোত কখন মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখন প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে দণ্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণতেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রানীর মতো পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন ; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোন শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, সত্যই মহিমময় ভবিষ্যৎ, প্রাচীন উপনিষদের যুগ হইতে আমরা পৃথিবীর সমক্ষে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাণী প্রচার করিয়াছি : 'ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' —সন্তান বা ধনের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইতে পারে। জাতির পর জাতি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং বাসনার জগতে থাকিয়া জগৎ-রহস্য সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহারা সকলেই ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাচীন জাতিসমূহ ক্ষমতা ও অর্থগৃধ্নুতার ফলে জাত অসাধুতা ও দুর্দশার চাপে বিলুপ্ত হইয়াছে,—নূতন

জাতিসমূহ পতনোন্মুখ। শান্তি অথবা যুদ্ধ, সহনশীলতা অথবা অসহিষ্ণুতা, সততা অথবা খলতা, বুদ্ধিবল অথবা বাহুবল, আধ্যাত্মিকতা অথবা ঐহিকতা—এগুলির মধ্যে কোনটির জয় হইবে—সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও বাকী।

বহুযুগ পূর্বে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিয়াছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া সেই সমাধান অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছি, শেষ অবধি ইহাই ধরিয়া রাখিতে চাই। আমাদের সমাধান—ত্যাগ, অপার্থিবতা।

সমগ্র মানব জাতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর—ইহাই ভারতীয় জীবন-সাধনার মূলমন্ত্র, ভারতের চিরন্তন সঙ্গীতের মূল সুর, ভারতীয় সত্তার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ভারতীয়তার ভিত্তি, ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান প্রেরণা ও বাণী। তাতার, তুর্কী, মোগল, ইংরেজ—কাহারও শাসন-কালেই ভারতের জীবনসাধনা এই আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।

ভারতের ইতিহাসে কেহ এমন একটি যুগ দেখাইয়া দিন দেখি, যে যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করিতে পারেন, এমন মহাপুরুষের অভাব ছিল। কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক—সে কাজ রণবাদ্য বা সৈন্যবাহিনীর রণযাত্রার দ্বারা হইতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের ন্যায় সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, অথচ পৃথিবীর সুন্দরতম কুসুমগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিজস্ব শান্ত প্রকৃতির দরুন এ প্রভাব বিদেশে ছড়াইয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রযোজন হইয়াছে, যদিও স্বদেশের গণ্ডিতে ইহা সর্বদাই সক্রিয় ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, ইহার ফলে যখনই তাতার, পারসিক, গ্রীক বা আরব জাতি এদেশের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগসাধন করিয়াছে, তখনই এদেশ হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বন্যাস্রোতের মত সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে। সেই এক ধরনেরই ঘটনা আবার আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। ইংরেজের জলপথ ও স্থলপথ এবং ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসিবৃন্দের অসাধারণ বিকাশের ফলে পুনরায় সমগ্র জগতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ সাধিত হইয়াছে, এবং সেই একই ব্যাপারের সূচনা দেখা দিয়াছে। আমার কথা লক্ষ্য করুন, এ কেবল সামান্য সূচনা মাত্র, বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহ আসিতেছে। বর্তমানে ভারতের বাহিরে যে কাজ হইতেছে, তাহার ফলাফল কি, তাহা আমি সঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু নিশ্চিত জানি, লক্ষ লক্ষ লোক—আমি ইচ্ছা করিয়াই বলিতেছি, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যেক সভ্য দেশে সেই বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, যে বাণী আধুনিক যুগের অর্থোপাসনা যে ঘৃণ্য বস্তুবাদের নরকাভিমুখে তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বেদান্তের উচ্চতম ভাবধারাই তাঁহাদের সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অধ্যাত্ম-রূপান্তর সাধন করিতে পারিবে। গ্রন্থের শেষ ভাগে আমাকে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করিতে হইবে। এখন আমি অন্য একটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইতেছি—দেশের অভ্যন্তরে কার্যক্রম।

এই সমস্যার দুইটি দিক—কেবলমাত্র অধ্যাত্ম-রূপান্তর সাধন নয়, যে বিভিন্ন উপাদানে এ জাতি গঠিত, তাহাদের সমীকরণ। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক আত্মীয়তাসূত্রে বিধৃত করা প্রত্যেক জাতির সাধারণ কর্তব্য। [রচনাটি অসমাপ্ত]

স্বামীজীর স্মৃতি*

মাদাম কালভে

কেব্রিয়ার (Cabriers) প্রাসাদে সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, কোন সঙ্গীত-শিক্ষার্থী বা অতিথি উপস্থিত না থাকিলে এইরূপ বাধাহীন সুদীর্ঘ সন্ধ্যাকালে গ্রন্থ-পাঠের বিশেষ সুবিধা। আমি বিবিধ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করিয়াছি। অন্য বিষয় অপেক্ষা আমার প্রিয়—অতীন্দ্রিয়বাদ, থিওসফি ও যাহা কিছু ধর্ম-জীবনকে পরিতুষ্ট করে। আমি আশৈশব ধর্মভাবাপন্ন; আমার জীবনে যে দু-একজন মহাপুরুষের সঙ্গ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ও অন্যান্য মহাত্মার জীবন ও বাণী আমার ধর্মজীবন সমৃদ্ধ করিয়াছে। গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই আমি পাইয়াছি—শক্তি ও সামর্থ্য, যাহার বলে সুখদুঃখমিশ্রিত আয়াস-সাধ্য সাংসারিক জীবন-নদী পাড়ি দিতে পারিয়াছি এবং শেষজীবনে নিশ্চিত শান্তি ও নির্ভয়ভাব লাভ করিয়াছি।

আমার পরম সৌভাগ্য ও আনন্দ যে, আমি এমন একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলাম, যিনি সত্যই ঈশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান্ ও উদার সন্ন্যাসী, দার্শনিক এবং দরদী বন্ধু। আমার ধর্মজীবনে তাঁহার অসীম প্রভাব, তিনি আমার নিকট এক অভিনব ভাবরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, আমার আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শ ব্যাপক ও সুগভীর করিয়াছেন এবং আমাকে উদার সত্য অবধারণ করিবার শিক্ষা দিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই অসাধারণ পুরুষ একজন হিন্দু বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। তিনি 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে সুপরিচিত। তাঁহার আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর জন্য তিনি সমগ্র আমেরিকায় সমাদৃত। একদা যখন তিনি চিকাগোতে বক্তৃতা দিতেছিলেন, আমিও তখন সেখানে। সেই সময় আমার শরীর ও মন খুবই অবসন্ন হইয়া পড়ায় স্বামীজীর নিকট যাইতে মনস্থ করি, কারণ আমার কয়েকজন বন্ধু তাঁহার আশ্রয় লইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার আবাসস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার পাঠ-কক্ষে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি কথা বলিবার পূর্বে আমি যেন কোন কথা না বলি, ইহা আমাকে পূর্বেই জানানো হইয়াছিল। তদনুসারে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে কিয়ৎক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনোমুগ্ধকারী ধ্যানাসনে তিনি বসিয়া ছিলেন। জাফরান রঙের তাঁহার বসন ভাঁজে ভাঁজে মাটিতে পড়িয়াছিল। তাঁহার মস্তকে একটি উষ্ণীষ; মস্তক সম্মুখে কিঞ্চিৎ অবনত ও দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ। ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর উপরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই তিনি বলিলেন, 'বাছা, তোমাকে ঘিরিয়া কি বিক্ষুব্ধ পরিবেশ! স্থির হও। শান্ত হওয়া তোমার একান্ত প্রয়োজন।' অতঃপর তিনি অচঞ্চল শান্তস্বরে আমার গোপনীয় সমস্যা ও দুশ্চিন্তাসমূহ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তখনও আমার নাম পর্যন্ত জানেন না।

* প্রসিদ্ধ গায়িকা Madame Calve-এর 'আত্মজীবনী'র একটি অধ্যায়:—অনুবাদ: ব্রহ্মচারী বরুণ

তিনি এমন সব বিষয় প্রকাশ করিলেন, যাহা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও জানিতেন না বলিয়া মনে হয়। বোধ হইল ইহা বিস্ময়কর ও অলৌকিক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি করিয়া এ-সকল কথা জানিলেন? কে আপনাকে আমার সম্বন্ধে বলিয়াছে?'

তিনি স্নিগ্ধ সস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। বোধ হইল, আমি শিশুর মতো বিচারবুদ্ধিহীন একটি প্রশ্ন করিয়াছি।

তিনি নম্রভাবে বলিলেন, 'কেহই তোমার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলে নাই। কাহারও বলার প্রয়োজন আছে কি? তোমার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত পুস্তকের পাতার মতো দেখিতে পাইলাম।'

অবশেষে তাঁহার নিকট হইতে সেদিনকার মতো বিদায় লইতে উদ্যত হইলাম। আমি গাত্রোত্থান করিলে তিনি বলিলেন, '......বিষয় তোমাকে ভুলিতেই হইবে। পূর্বেকার মতো প্রফুল্ল ও হাসিখুশী-ভাবে থাকিতে সচেষ্ট হও। স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি দৃষ্টি দাও। নির্জনে তোমার দুঃখের বিষয় চিন্তা করিও না। অবরুদ্ধ আবেগ-অনুভূতিকে কোন প্রকার বহির্বিষয়ে পরিচালিত কর। তোমার ধর্মজীবনে ইহা প্রয়োজনীয়। তোমার শিল্পকলার জন্যও ইহা আবশ্যক।'

তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও উপদেশ দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। মনে হইল, তিনি আমার মস্তিষ্কের যাবতীয় বিক্ষুব্ধ চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া সেই-স্থানে দিয়াছেন তাঁহার সরল ও শীতল চিন্তাসুধা। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির নিকট আমি কৃতজ্ঞ, কারণ ঐ শক্তিপ্রভাবে আমি পুনরায় প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল হইলাম। প্রচলিত সম্মোহনবিদ্যা বা বিমোহনকারী কোন শক্তি তিনি ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তাঁহার পবিত্র ও অদম্য সঙ্কল্প আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের বীজ বপন করিয়াছিল। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর বুঝিয়াছিলাম, তিনি অপরের বিশৃঙ্খল চিন্তারাশিকে শুদ্ধ করিয়া প্রশান্তিতে মন ভরিয়া দিতেন, যাহাতে সেই ব্যক্তি অখণ্ড মন দিয়া তাঁহার উপদেশ ধারণা করিতে পারে।

কখনও প্রশ্নোত্তরে, কখনও তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য তিনি কাব্যের উপমা অথবা রূপক কাহিনী অবলম্বনে উপদেশ দিতেন। একদিন আমরা আত্মার অমরত্ব ও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে-ছিলাম। তাঁহার উপদেশাবলীর প্রধান একটি বিষয় পুনর্জন্মবাদ তিনি ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি বলিলাম, 'আমি এ-বিষয় ভাবিতেও পারি না। আমার আমিত্ব যত তুচ্ছই হউক, আমি উহাতে অনুরক্ত থাকিতে চাই। সনাতন একত্বে আমি লীন হইতে চাই না। এইরূপ কল্পনাও আমার নিকট ভীতিপ্রদ।'

প্রত্যুত্তরে স্বামীজী বলিলেন: বিশাল সমুদ্রে একদিন এক বিন্দু জল পড়িল। জল-বিন্দুটি তোমার মতোই কাঁদিতে লাগিল ও অভিযোগ করিতে লাগিল। মহাসমুদ্র জল-বিন্দুর প্রতি হাসিয়া বলিল, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন, বুঝি না। আমার সহিত মিশিয়া তুমি তোমার ভাই-ভগিনী অন্যান্য জলবিন্দুর সহিত মিলিত হইয়াছ। এই সকল জলবিন্দুর সমষ্টিই আমি। এখন তুমি নিজেই মহাসমুদ্র হইয়াছ। আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও তো সূর্যরশ্মির সাহায্যে ঐ মেঘলোকে যাইতে পারো। পুনরায় সেখান হইতে তৃষিত ধরিত্রীর বুকে

আশীর্বাদ ও কল্যাণস্বরূপ জলবিন্দুর আকারে নামিয়া আসিতে পারো।'

স্বামীজী এবং তাঁহার জনকয়েক বন্ধু ও ভক্তদের সহিত আমি তুরস্ক, মিশর ও গ্রীসের মধ্য দিয়া এক অবিস্মরণীয় ভ্রমণে গিয়াছিলাম। আমাদের দলে ছিলেন স্বামীজী, চিকাগোর মিস্ ম্যাকলাউড, ফাদার হিয়াসান্থ লয়সন ও তাঁহার আমেরিকান স্ত্রী। স্বামীজীর বিশেষ অনুরাগিণী মিস্ ম্যাকলাউড ছিলেন খুবই উৎসাহী ও মধুরস্বভাবা। আমি ছিলাম এই দলের 'গায়ক-পক্ষী'।

অবিস্মরণীয় এই তীর্থভ্রমণ! বিজ্ঞান দর্শন ও ইতিহাসের কোন কিছুই স্বামীজীর অজানা ছিল না। আমার আশেপাশে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই আলোচনাগুলি আমি একাগ্রমনে শুনিতাম, কিন্তু তর্কবিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতাম না। তবে আমার রীতি-অনুযায়ী প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সুবিধামত গান পরিবেশন করিতাম। ফাদার লয়সন ছিলেন একজন বিদ্বান্ ও খ্যাতনামা ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্। স্বামীজী তাঁহার সহিত নানাবিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। দেখিয়া বিস্মিত হইতাম যে, স্বামীজী হয়তো কোন প্রাচীন প্রমাণপত্রের মূল উদ্ধৃতি করিতেছেন, অথবা কোন চার্চের ধর্মসভার সঠিক তারিখ উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু ফাদার লয়সন নিজে উহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারিতেছেন না।

একদিন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কোথা হইতে এই সকল তথ্যাদি সংগ্রহ করিলেন?'

স্বামীজী বলিলেন, 'উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী হইতেই চয়ন করিয়াছি। বিগত দশ হাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশের সন্ন্যাসিবৃন্দ গুরুশিষ্য-পরম্পরা গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই নিজের জ্ঞানরাশি, অভিজ্ঞতা, গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদির উল্লেখসহ স্বীয় জীবনের ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রদায়ের বিজ্ঞতম ব্যক্তি ঐ ইতিবৃত্ত পাঠ করেন ও প্রয়োজনানুসারে সম্পাদনা করেন। পুনরাবৃত্ত বিষয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জন করিয়া কোন ব্যক্তির জীবনগ্রন্থের হয়তো একটিমাত্র পঙ্‌ক্তি বা একটি পৃষ্ঠামাত্র গৃহীত হয়। কদাচিৎ সমগ্র গ্রন্থখানি সংরক্ষিত হয়। এগুলি পরে উপনিষদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে আমাদের বিস্ময়কর একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতে ইহা অতুলনীয়। আমার জ্ঞানরাশির সব কিছু ঐ ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত।'

গ্রীসদেশে আমরা ইউলিসিস দেখিতে গিয়াছিলাম। স্বামীজী ইহার রহস্যকাহিনী আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিলেন। আমাদিগকে মন্দির ও বেদীগুলি দেখাইয়া বিভিন্ন স্থানে শোভাযাত্রাদি যেরূপ হইত, তাহার বর্ণনা করিলেন। স্বামীজী সেখানকার প্রাচীন গাথা সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন এবং পুরোহিতগণের আচার-অনুষ্ঠান ব্যাখ্যা করিলেন।

ইহার পর মিশরে থাকাকালে এক অবিস্মরণীয় রাত্রিতে স্বামীজী নীরব স্ফিন্‌ক্সের ছায়ায় দাঁড়াইয়া রহস্যপূর্ণ চাঞ্চল্যকর বর্ণনার সাহায্যে আমাদিগকে সুদূর অতীতে লইয়া গেলেন।

অতি সাধারণ পরিবেশের মধ্যেও স্বামীজীর সান্নিধ্য ছিল খুবই আকর্ষণীয়। কথার যাদুতে তিনি শ্রোতাদের বিমোহিত করিতেন।

রেলওয়ে স্টেশনের বিশ্রামাগারে বসিয়া তাঁহার আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনিতে শুনিতে আমাদের সময় ভুল হইয়া যাইত, ফলে অনেকবারই আমরা গাড়ী ধরিতে পারি নাই। আমাদের মধ্যে মিস্ ম্যাকলাউড ছিলেন খুব হুঁশিয়ার, তাঁহারও কখন কখন সময়ের খেয়াল থাকিত না। ইহার ফলে গন্তব্যস্থল হইতে বহুদূরে কোন অসুবিধাজনক স্থানে অসময়ে পড়িয়া থাকিতে হইত।

একদিন কাইরো শহরে আমরা পথ হারাইয়া ফেলিলাম। বোধ হয় আমরা সকলেই আলোচনায় খুব মশগুল হইয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক আমরা একটি অপরিচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় গলির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম, কতকগুলি অর্ধনগ্না নারী জানালায় ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে ও কয়েকজন দরজার সম্মুখে হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ির আড়ালে বেঞ্চের উপর উপবিষ্টা কয়েকটি নারী খুব হল্লা করিতেছিল। তাহারা উচ্চস্বরে হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে স্বামীজীর খেয়াল হইল, তিনি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। দলের জনৈক মহিলা সেস্থান ত্যাগ করিয়া আমাদের অন্যত্র লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইলেন। স্বামীজী কিন্তু নীরবে দল পরিত্যাগ করিয়া বেঞ্চে উপবিষ্টা সেই নারীদের সম্মুখীন হইলেন।

'আহা বাছারা' স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, 'গরীব বেচারারা! দৈহিক সৌন্দর্যের মধ্যেই এদের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রকটিত হইয়াছে। দেখ, এখন ইহাদের কি দুরবস্থা!' পাপকর্মে লিপ্ত নারীগণের সম্মুখে খৃষ্টের মতোই স্বামীজীর অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকগুলি হতবাক্ হইয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন স্বামীজীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিল এবং ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করিয়া বলিল, 'Hombre de dios, hombre de dios!' (দেবদূত, দেবদূত)। অপর একজন ভয়ে ও নম্রতায় সহসা দুই হাত দিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করিল, যেন স্বামীজীর পবিত্র দৃষ্টি হইতে তাহার সঙ্কুচিত আত্মাকে আবৃত করিতে চাহিতেছিল।

এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণকালেই আমি স্বামীজীকে শেষবারের মতো দেখি। কয়েক-দিন পরে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মর্ত্যলীলা সমাপ্ত-প্রায় বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজ ধর্মসংস্থার লোকজনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন। তাঁহাদের মধ্যেই তিনি যৌবনকাল অতিবাহিত করেন এবং সেই সঙ্ঘের তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়।

এক বৎসর পরে আমরা শুনিলাম, জীবন-দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া স্বামীজী দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই অমূল্য গ্রন্থে একটি ছত্রও বর্জন করা হয় নাই। তিনি 'সমাধি'যোগে দেহত্যাগ করেন। সংস্কৃতভাষায় 'সমাধি' শব্দের অর্থ ইচ্ছামৃত্যু। কোন দুর্ঘটনা বা ব্যাধিতে আক্রান্ত না হইয়া দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হিন্দুযোগী তাঁহার শিষ্যদিগকে পূর্বেই দেহ-ত্যাগের দিন নির্দেশপূর্বক তাঁহার মর্ত্যজীবনের পরিসমাপ্তি করেন।

* *

১৯১০ খৃঃ ঈপ্সিত দেশপর্যটনের বাসনা মিটাইবার জন্য আমি অস্ট্রেলিয়ায় সঙ্গীত-

পরিবেশনের একটি চুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলাম। পৃথিবী পরিক্রমণের সুদীর্ঘ যাত্রায় ঐ বৎসরের মার্চ মাসে বাহির হইলাম। অস্ট্রেলিয়ায় পার্থ, মেলবোর্ন, এডিলেড, সিডনি, ব্রিসবেন, ওয়েলিংটন, ক্রাইস্টচার্চ প্রভৃতি শহর ঘুরিয়া সিঙ্গাপুর হইয়া কলম্বোয় পৌঁছিলাম। শেষোক্ত দুইটি শহরেও সঙ্গীত-পরিবেশন করিয়াছিলাম। অতঃপর মাদ্রাজ, কলিকাতা, দার্জিলিং, দিল্লী, আগ্রা, বোম্বের মধ্য দিয়া দীর্ঘ পরিভ্রমণ করি। প্রত্যেক শহরেই সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত ছিলেন কিছুসংখ্যক ইংরেজ নরনারী এবং দেশীয় মহারাজাগণ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ। ভারতবর্ষে এই যাত্রাতেই স্বামীজী যে-মঠে তাহার শেষ-দিনগুলি যাপন করিয়াছিলেন, সেখানে যাইব স্থির করিয়াছিলাম। স্বামীজীর জননী আমাকে সেস্থানে লইয়া যান। তথায় তাঁহার সমাধি-ভূমির উপর নির্মিত স্মৃতিমন্দির দর্শন করিলাম। স্বামীজীর অন্যতম আমেরিকার বন্ধু মিসেস লেগেট ঐ স্মৃতিমন্দির স্থাপনের জন্য সাহায্য করেন। স্মৃতিমন্দিরে স্বামীজীর নাম কোথাও দেখিতে না পাইয়া স্বামীজীর একজন সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার প্রশ্নে তিনি অবাক্‌বিস্ময়ে ও সৌম্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, 'স্বামীজী চির অমর হইয়া রহিয়াছেন।' আজ পর্যন্ত আমি তাঁহার সেই দৃষ্টি ভুলিতে পারি নাই।

বৈদান্তিকগণ মনে করেন, তাঁহারা ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলীর মৌলিকত্ব ও সহজ-বোধ্যতা সংরক্ষণ করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণের কোন মন্দির নাই। তাঁহারা সহজ সুরে ভজনাদি করেন। ধর্মানুরাগ উদ্দীপনের জন্য তাঁহারা ভজনালয়ে কোন প্রতীক মূর্তি বা ছবি রাখেন না; ভজনালয়ের এক প্রান্তে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি বুদ্ধমূর্তি যেন তাঁহাদের এই ভাব ব্যক্ত করে, 'তথাগতের নিকট হইতেই আমরা সাধন-ভজন শিখিয়াছি।' তাঁহাদের সকল সাধন-ভজনের লক্ষ্য অজ্ঞেয় ঈশ্বর। তাঁহাদের প্রাণঢালা প্রার্থনার মধ্যে শুনা যায়, 'হে মহান্ অজ্ঞেয় পুরুষ, তুমি নামরূপবিহীন; তোমাকে নামরূপ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিবার স্পর্ধা কাহারও নাই।'

শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এক ধরনের প্রার্থনা স্বামীজী আমাকে শিখাইয়াছিলেন; তিনি বলিতেন, 'ঐশ্বরিক শক্তি আকাশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকায় নিঃশ্বাসের সহিত সেই শক্তি শরীরের মধ্যে ধারণ করা যায়।'

স্বামীজীর সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ অনাড়ম্বর ও হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথেয়তায় আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বৃক্ষের শীতল ছায়াতলে ঘাসের উপর টেবিল পাতিয়া আমাদিগকে ফলমূল পরিবেশন করিয়াছিলেন ও পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়াছিলেন। প্রাঙ্গণের প্রান্তে বিশাল গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল। গায়কগণ অপরিচিত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে যে অপার্থিব করুণরসের কীর্তন গাহিলেন, তাহা আমার মর্মস্থল স্পর্শ করিল। একজন কবি স্বামীজীর স্মরণে বিষাদ-ভাবপূর্ণ একটি কবিতা সদ্য সদ্য রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শান্তিপূর্ণ ধ্যানমধুর প্রশান্তিতে অপরাহ্ণ অতিবাহিত হইল।

যে কয়েকঘণ্টা আমি সেই অমায়িক দার্শনিকগণের সঙ্গ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মৃতিপটে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পবিত্র সুন্দর ও সুদূরের এই মানুষগুলিকে জ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ স্বর্গরাজ্যের অধিবাসী বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান-সংগ্রহ

ডক্টর কালিদাস নাগ

স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী-উৎসব আগত-প্রায়; তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত এদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে শতাব্দী-কমিটিও গড়া হয়েছে, তাঁদের অনেকে উৎসুক হয়েছেন 'মানুষ বিবেকানন্দ'কে জানতে। তাঁর রচনাবলী নানা ভাষায় অনূদিত হ'লে সেই ঔৎসুক্য আরও বাড়বে, তাই 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের আহ্বানে দু-একটি প্রসঙ্গ তুলব।

১৩৫৫-৫৬ খৃঃ উদ্বোধন থেকে প্রকাশিত দুই খণ্ড স্বামীজীর জীবন ও চিন্তাধারা অনুসরণ করতে তাঁর 'পত্রাবলী'র সাহায্য অনিবার্য। তাই গত বছর (অগস্ট, ১৯৬০) পূজার আগে Letters of Swami Vivekananda—প্রায় ৫০০ পাতার ইংরেজী সংস্করণটি ছাপেন 'অদ্বৈত আশ্রম'। তার ভূমিকায় দেখি:

'স্বামী বিবেকানন্দের এত চিঠি পাওয়া গেছে যে, দুই খণ্ড ভরে যায়। সেজন্য মাত্র ২২৯ খানি শ্রেষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ চিঠি' তাঁরা ছেপেছেন, ও 'রচনাবলী' (Complete Works)-র সঙ্গে মিলিয়ে বাকী সব চিঠি পড়তে বলেছেন। ইতিমধ্যে স্বামীজীর মার্কিন-ভক্ত শ্রীমতী মেরী বার্ক (Burke) গভীর পরিশ্রমে মার্কিন পত্রিকা প্রভৃতি ঘেঁটে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিরাট বই লিখেছেন ও খেদ করেছেন যে, অনেক কাজ এখনও বাকী আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রায় ১২টি 'বেদান্ত কেন্দ্রে' আমাদের ভারতীয় সাধু ও বিদেশী সহকর্মী আছেন। লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি বেদান্ত কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও অবিলম্বে পত্রালাপ শুরু করা দরকার।

উদ্বোধন থেকে প্রথমে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী নিঃশেষিত হ'লে স্বামী আত্মবোধানন্দ দুই খণ্ডে তার পুনঃপ্রকাশ করেন ও ১৩৫৫-৫৬ অর্থাৎ প্রায় ১২ বছর আগে লিখে গেছেন: "এই চিঠিগুলিতে আমরা স্বামীজীকে ১৮৮৮ খৃঃ হইতে তাঁর মহাসমাধির (৪ঠা জুলাই, ১৯০২) পূর্ব পর্যন্ত নানাবিধ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত লেখকের পক্ষে ইহার মূল্য কম নহে। এতদ্ব্যতীত তিনি কিরূপ সাধনা এবং মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সাফল্যের চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারও আভাস এইগুলির মধ্যে আমরা পাই।... স্বামীজীর প্রথম এবং শেষ কথা 'মানুষ চাই।' আমরা দেশবাসীকে তাঁহার এই ঐকান্তিক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করিতেছি।"

প্রকাশকের এই উদার আহ্বান সমর্থন ক'রে আমি অনুরোধ জানাই যে 'বিবেকানন্দ-পত্রাবলী'র শতবার্ষিক সংস্করণ[১] (পাদটীকা ও সূচীপত্র-সহ) ছাপা হোক। সেই পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংস্করণকেই ভিত্তি ক'রে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজী সংস্করণ থেকে বিদেশী ভাষায় Dynamic monk (শক্তিমান্ সন্ন্যাসী) বিবেকানন্দের মাত্র ৩৯ বছর জীবনের Power House (শক্তিকেন্দ্র) দেখান হোক। তাঁর জীবনের প্রথম ২৫ বছর ও শেষ ৫ বছরের খবর সংগ্রহ এখনও বাকী আছে।

---

১ শতবার্ষিক সংস্করণ 'স্বামীজীর বাণী ও রচনায়' মোট ৫৫৩খানি পত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।—উঃ সঃ

ফেব্রুআরি ১৮৮৮; নরেন দত্ত প্রথম চিঠিতে (স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুর থেকে) লিখছেন : মাস্টার মশাই! আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্প লোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে! আপনার নরেন্দ্রনাথ

১৮৮৩ খৃঃ কুড়ি বছরের যুবক নরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্র শীল উভয়ে General Assembly কলেজে পড়িতেন। এই দুই মহাপুরুষ সে-কালের ছাত্রসমাজ ও শিক্ষার আদর্শ নিয়ে কত বড় কাজ ক'রে গেছেন বুঝতে হ'লে প্রাক্-কংগ্রেস যুগের পত্রিকা ও পত্রাবলী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে হবে; তবেই বুঝতে পারা যাবে ১৮৯৩ (Chicago Parliament of Religions) চিকাগোতে ধর্মসম্মেলনে ভারতের স্থান। তখন স্বামী বিবেকানন্দ ৩০ বছরের দীপ্ত প্রভাকর। মাত্র কয়েক জন নরনারীর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পেয়ে গোঁড়া খৃষ্টানদের আক্রমণ সহ্য ক'রে, স্বামী বিবেকানন্দ ইওরোপ আমেরিকা ও এশিয়ায় বেদান্তকেশরী-রূপে কি বিরাট অধ্যাত্ম-যজ্ঞের উদ্বোধন ক'রে গেছেন, এটি সবাইকে বোঝাতে হবে।

১৮৮৮ খৃঃ প্রথম বাংলা চিঠিখানির আগে-কার চিঠিপত্র স্বামীজীর পারিবারিক ও অর্থ-নৈতিক বিবরণী দিতে হ'লে (ডক্টর বিনয় সরকারের ভাষায়) 'খোঁজ-পরিষদ' গড়ে তুলতে হবে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, তাঁদের তিন পুত্র নরেন্দ্র, মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র এবং দুই কন্যা প্রায় সবাই 'পত্রাবলী'র মধ্যে উল্লিখিত আছেন। ১৯০০ খৃঃ শেষে আমেরিকা প্রবাস থেকে স্বামীজী লিখেছেন, 'আমি ২০ বছর গুরু রামকৃষ্ণের সেবা ক'রে আসছি।' তাহলে ১৮৮১-১৯০১ অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের ১৮।১৯ বছর বয়স থেকে পরবর্তী ১৯।২০ বছর ধরতে হবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কাশীপুর, বরাহনগর, আলমবাজার পার হয়ে বেলুড় মঠে শেষ। হুগলী জেলার আঁটপুর থেকে লেখা (১৮৮৮ খৃঃ) তাঁর প্রথম বাংলা চিঠি! তার চার বছর আগে পিতৃ-বিয়োগ এবং আর্থিক সঙ্কট ও আত্মীয়জনের সঙ্গে মামলা—এ সব বিষয়েও সন্ধানের অবকাশ রয়েছে। 'মানুষ বিবেকানন্দ' শুধু তত্ত্ব-কথা নয়, রক্তমাংসের মানুষ, সে-কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি (১৮১৭-১৯০৬) দেবেন্দ্রনাথও নরেনের চোখ দেখে 'Yogi's eyes' (যোগীর চক্ষু) বলেছিলেন।

এই অসাধারণ মানুষটির সাধারণ জীবন বাংলা দেশ থেকে না বেরুলে সত্য ও সুবিচার দুই ক্ষেত্রেই আমরা অপরাধী থেকে যাব। নরেন্দ্রের দু-বছরের বড় প্রাণাচার্য নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) এবং এক বছরের ছোট আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল, এঁদের শতাব্দী উপলক্ষে সন্ধান ক'রে দেখি, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগরের Metropolitan কলেজে সিমুলিয়ার দুটি যুবক নরেন্দ্র ও নীলরতন F.A. ক্লাসে পড়ছেন। পরে দেখি দু-জনেই সরোজিনী নাইডুর পিতা ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত গ্রে-স্ট্রীট University School-এ গিয়ে একত্র মাস্টারি করছেন। সেকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও দু-জনেরই উপর পড়েছে; কারণ মনীষী কেশব সেন ১৮৭০-৭১ বিলাত ভ্রমণ ক'রে এসেই এক পয়সার কাগজ 'সুলভ সমাচার' (এখন প্রায় দুষ্প্রাপ্য) প্রকাশ করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে আবিষ্কার করেছেন। সহকর্মী প্রতাপ মজুমদার ও ভাই গিরীশচন্দ্র সেন

(কোরান-অনুবাদক)-দের দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-কাহিনী কেশবই লেখানো শুরু করেছিলেন। ১৮৮৪ খৃঃ কেশবের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এই আত্মিক সম্বন্ধ অটুট ছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির (১৮৭৮ স্থাপিত)-ভবনে নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তা শুনেছেন। সাধারণ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কি গভীর প্রীতি ছিল, Men I have seen (1910) পড়লেই তা বোঝা যায়। বালকের মতো শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলেন, সিংহবাহিনীর সিংহ দেখব। শিবনাথের বন্ধু রামব্রহ্ম সান্যাল তখন আলিপুর (Zoo) চিড়িয়াখানার অধিকর্তা; তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হবে। তাই শিবনাথ পরামর্শ দিলেন, তিনি সুকিয়া স্ট্রীট-মোড় অবধি এনে নরেন্দ্রের উপর ভার দেবেন শ্রীরামকৃষ্ণকে আলিপুরের সিংহ দেখিয়ে আনবার।

নরেন্দ্রের দু-বছরের বড় রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খৃঃ প্রথম বিলাত প্রবাস থেকে ফিরেছেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আদেশ করলেন একটি বিবাহ-মঙ্গল গীত রচনা করতে, কারণ রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলা দেবীর সঙ্গে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তাঁদের পুত্র সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে লীলাদেবীর ডায়েরী থেকে আমি পেয়েছি: সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে জমকালো বিবাহসভা, আচার্য—শিবনাথ শাস্ত্রী। সেখানে নগেন চট্টোপাধ্যায় (রামমোহন-জীবনীকার), কীর্তনীয়া ডাঃ সুন্দরীমোহন দাশ। শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের বন্ধু), কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ সঙ্গীত করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' এবং 'জগতের পুরোহিত তুমি', ও 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়াছিলেন।

১৮৯২-৯৩ খৃঃ আমেরিকা যাত্রার প্রস্তুতি ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ইংরেজীতে বহু পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু ১৮৯২-১৯০২ বিবেকানন্দ-জীবনের এই শেষ দশকের বিদেশী পত্রিকা থেকে আমরা যত পেয়েছি, ভারত থেকে (সন্ধানের অভাবে) এখনও তেমন কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। পুনার পণ্ডিতা রমাবাই এক বাঙালীকে বিবাহ করেন, বিধবা হয়ে পরে খৃষ্টান হন; মার্কিন গোঁড়া খৃষ্টান নর-নারীগণ 'রমাবাই কেন্দ্র' গঠন ক'রে স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছিল, শ্রীমতী বার্ক (Burke) সে-সব ছেপে দিয়েছেন। তার প্রতিধ্বনি পাই সেকালে শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী) ও বিবেকানন্দের পত্রালাপে। রবীন্দ্রনাথও (বিবেকানন্দের পক্ষে ও রমাবাইএর বিপক্ষে) সেকালের পত্রিকায় লিখেছিলেন।

১৯০২ খৃঃ স্বামীজীর আকস্মিক তিরোধানে ব্যথিত ছাত্রমণ্ডলী যখন শোকসভা করে, তখন তারা রবীন্দ্রনাথকে (১৯০২ জুলাই) সভাপতিরূপে পেয়ে বিবেকানন্দকে অর্ঘ্যদান করেন। হয়তো মৌখিক বলেই রবীন্দ্র-নাথের ভাষণ ছাপা অথবা লেখা নেই; কিন্তু কলিকাতার পত্রিকা খুঁজলে তার সারমর্ম আমরা এখনও পেতে পারি। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সুসাহিত্যিক সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে নিজেই এই পর্ব শুনিয়েছিলেন।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে কলিকাতা ও মহীশূরে অনেক কথা স্বামীজী বিষয়ে

শুনেছি; ১৮৯৯-১৯০০ খৃঃ ব্রজেন্দ্রনাথ যখন রোম-অধিবেশনে Vaishnavism and Christianity প্রবন্ধটি International Congress of Orientalists-দের শোনান, 'বেদান্তী' বিবেকানন্দ তখন শেষ বিশ্বভ্রমণে। আমেরিকার বেদান্ত-কেন্দ্রগুলি শেষবার দেখে Paris (History of Religions) Congress-এ স্বামীজীও ফরাসী শিখে ভাষণ দিয়েছেন, কিন্তু ফরাসী পত্রিকাদি থেকে এখনও কিছুই উদ্ধার করা হয়নি। প্যারিসে সস্ত্রীক ডক্টর জগদীশ বসুর সঙ্গে স্বামীজীর আলাপ হয় ও সেই সম্বন্ধ শেষ দিন অবধি বজায় রাখেন 'ভগ্নী নিবেদিতা' (প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের অর্ঘ্যও দ্রষ্টব্য)। ভারতপ্রাণা এই মহীয়সী নারীর পত্রাবলী পূর্ণভাবে ছাপা হ'লে সে-যুগের অনেক নূতন তথ্য আমরা পাব।

'নৈবেদ্য' (১৯০০) থেকে 'শান্তিনিকেতন' ব্যাখ্যান এবং নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি রবীন্দ্র-রচনার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার অনেক মিল আছে,—সেটি দেখাবার অপেক্ষায় রয়েছে; কিন্তু উপন্যাস ও 'গল্পগুচ্ছ' ছাড়া রবীন্দ্র-গদ্য-রচনা লোকে প্রায় ভুলতে বসেছে।

১৯০১-১৯০২—তখন স্ত্রী-বিয়োগ ও পারিবারিক অশান্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গড়ছেন গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়—শান্তিনিকেতন। তার কিছু পূর্বে দক্ষিণেশ্বর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে সাধনকেন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনা করেন, যেখানে আজ বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। সেই সঙ্গে সারদাদেবীর দিব্য-প্রেরণায় নারীসংঘ, নিবেদিতা শিক্ষায়তন ও সারদা মহিলা-মহাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। ভারতের আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কি হবে ও হওয়া উচিত, সে-বিষয়ে গভীর চিন্তা ক'রে গেছেন দু-জনেই—রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ।

কাশীনিবাসী প্রমদাদাস মিত্র ও নরেন্দ্রনাথের পত্রাবলী পাঠে আমরা স্পষ্ট বুঝি, ১৮৮৮ খৃঃ বরাহনগর মঠে বসে স্বামীজী বেদান্ত-ভাষ্যাদি ও অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণ দিয়ে কেন পাঠ শুরু করেন এবং ১৮৯৮ আমেরিকা ইওরোপ থেকে ফিরে বেলুড়ে কেন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার ভিত্তি হবে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি; কিন্তু দেশের চরম দারিদ্র্য দূর করার জন্য কার্যকরী (Technological) শিক্ষারও উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। শিক্ষা যেন ইংরেজের গোলামির প্রস্তুতি না হয়ে যথার্থ 'মানুষ' গড়ার উপায় হয়—দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার ঋত্বিক স্বামী বিবেকানন্দ সে-কথা ব'লে গেছেন। অর্ধশতাব্দী পরে তাঁর পরিকল্পনার তাৎপর্য আমরা বুঝেছি ও জাতীয় পরিকল্পনার (National Planning) মাধ্যমে নূতন কিছু গড়তে চেষ্টা করছি।

১৮৯৩ খৃঃ আমেরিকা যাত্রার পথে তিনি কলম্বো সিঙ্গাপুর ও হংকং প্রভৃতি দেখে জাপানে আসেন; এবং ২৫ বছরের মধ্যে জাপান পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কী আশ্চর্য উন্নতি করেছে, স্বামীজী সে-কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। চীনের সঙ্গে তখন প্রথম যুদ্ধ ক'রে জাপান জয়ী হয়েছে। অথচ সেই গর্বিত জাতি তাদের মুখ্য প্রতিনিধি ওকাকুরা (Count Okakura)-কে পাঠান টোকিও ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দকে সাদরে নিয়ে যেতে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বামীজীর যাওয়া হয়নি। ১৯০১-২ স্বামীজীর জীবনে এই শেষ বছরে তিনি এত অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়েন যে, ১৯০২ ওকাকুরাকে কাশী সারনাথ ও বুদ্ধগয়া দেখিয়ে শয্যা গ্রহণ করেন ও

(৪ জুলাই ১৯০২) মাত্র ৩৯ বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

কিন্তু সব শেষ হবার আগে শোনা যায় স্বামীজী বলেছিলেন যে, সাময়িকভাবে জাপান চীনকে পরাস্ত করলেও চীনই এক বিরাট বিশ্বশক্তি হয়ে উঠবে ও তার সঙ্গে রুশরাও প্রচণ্ড হয়ে উঠবে। সেই ভবিষদ্‌বাণী যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সার্থক হয়ে উঠেছে এবং 'বেদান্তী' বিবেকানন্দ তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে যেন আগামী যুগের 'বিশ্ব-রূপ' দর্শন ক'রে গেছেন!

স্বামীজী জীবনের শেষ কয়টি বছর ইওরোপ-আমেরিকা পরিক্রমা; ১৯০০ ডিসেম্বর বেলুড় মঠে যখন ফেরেন, তখন থেকে মহা-সমাধি (৪ জুলাই ১৯০২) পর্যন্ত তাঁর 'পত্রাবলী' অতি সংক্ষিপ্তভাবে ছাপা হয়েছে। অথচ ঐ শেষ দিনগুলির প্রত্যেকটি চিঠি-পত্র, নোট ও ডায়েরী—যা কিছু রক্ষা পেয়েছে, বিশেষজ্ঞ ও কর্তৃপক্ষদের দেখিয়ে ক্রমশঃ তা ছেপে দিলে তবেই বিবেকানন্দ-শতাব্দী সার্থক হবে। তাঁর 'রচনাবলী'র সংস্কারও হবে এবং 'মহাপুরুষ' ও 'মানুষ বিবেকানন্দ'কে লোকে চিনবে।

বেলুড়ের এবং উদ্বোধন- ও অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশনীর সাধক ও কর্মীদের এ অনুরোধ জানাই, কারণ নূতন সংস্করণ প্রকাশ হবে জানলে বিবেকানন্দ-শতাব্দী উৎসবে ও পূর্ব ও পশ্চিমের স্বামীজীর অনুরাগিগণ হাত মিলিয়ে অনেক অধুনা-অজ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্ব হয়তো আমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

এ বছর নভেম্বর মাসে 'গোলপার্ক' বিবেকানন্দ-হলে Unesco-প্রযোজিত যে-ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে, তার সার্থক পরিণতি হয় যেন (১৯৬৩-৬৪) বিবেকানন্দ-জন্মশতাব্দী উৎসবে। কারণ তিনিই হলেন আধুনিক যুগে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের প্রকৃষ্ট যোগ-সেতু। তাঁর 'জ্ঞান-যোগ' 'কর্মযোগ' 'ভক্তি-যোগ' প্রভৃতির বিদেশী ভাষায় বহু সংস্করণ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় তথা এশিয়া-ইওরোপে দেখেছি।

গত বছর (অগস্ট ১৯৬০) আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে মস্কো গিয়ে ঋষি টলস্টয়ের ভবনে স্বামীজীর 'রাজযোগ' (১৮৯৭ আমেরিকায় মুদ্রিত) গ্রন্থখানি দেখে এসেছি। তাই এ-সব দিকে চোখ রেখে খাঁটি আন্তর্জাতিক ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী-উৎসব যেন আমরা উদ্‌যাপন করতে পারি, এই প্রার্থনা জানালাম।*

---

* এ-প্রবন্ধে পরিবেশিত কয়েকটি ঘটনা স্বামীজীর প্রকাশিত কোন জীবনীগ্রন্থে নাই। এ-গুলির দায়িত্ব ডক্টর নাগ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার অনুরোধ কোন উৎসাহী গবেষক এ-গুলি সম্বন্ধে পুরাতন পত্র-পত্রিকায় সন্ধান করেন। —উঃ সঃ

একটি বাড়ির কথা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

চিকাগোর প্রধান বিমানঘাঁটি ও-হেয়ার এয়ারপোর্ট-এ যিনি আমাকে আনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মিঃ হ্যারি গ্রীয়ার। তাঁহাকে আগে কখনও দেখি নাই, তাই কথা ছিল তাঁহার হাতে একখানি ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা থাকিবে এবং আমি 'ছত্রেণ ছাত্রমদ্রাক্ষম্'—এই ব্যাকরণ-সূত্র অনুসারে তাঁহাকে চিনিয়া লইব। চিনিতে দেরি হইল না, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত একটি প্রমাদ ঘটাইয়া ফেলিলাম। স্থানীয় বেদান্ত-সমিতির পরিচালক পূজনীয় স্বামী বিশ্বানন্দজী পত্রে মিঃ গ্রীয়ারের নামটি এমন ভাবে লিখিয়াছিলেন যে, আমি ইংরেজী 'আর'এর স্থানে পড়িয়াছিলাম 'এন্'। অতএব তাঁহাকে হাসিমুখে অভিনন্দিত করিলাম, গুড মর্নিং মিঃ গ্রীন। যদি নাম বলিতেই হয়, তাহা হইলে ভুল করিয়া বলা বড় সৌজন্যবিরুদ্ধ। কিন্তু আমেরিকান ভক্তেরা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের আদব-কায়দার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সস্নেহে যেমন ক্ষমা করেন, মিঃ গ্রীয়ারও তেমনি উপর্যুপরি সাত-আটবার 'গ্রীন' শুনিয়াও কোন প্রতিবাদ করিলেন না। অবশ্য তাঁহার মোটরে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বোধ করি নবম বার তাঁহাকে সম্বোধন করিবার আগেই ভুল শুধরাইয়া লইয়াছিলাম।

মিঃ গ্রীয়ার ইঞ্জিনিয়র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন, আমাকে গোখরো সাপে কামড়াইয়াছে। (I have been bitten by a Cobra)।[১] অর্থাৎ তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ধান পাইয়াছেন, তখন আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সম্বন্ধে আর কোনও অনিশ্চয়তা নাই।

গল্প বেশ জমিয়া উঠিল। ভগবানের ভক্তেরা এক জাতি। দেশ-কাল ধর্ম-সম্পত্তি-কুল-মান কিছুই তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। গীতা বলিয়াছেন, ভক্তদিগের পারস্পরিক ভগবৎ-প্রসঙ্গ ভক্তি-লাভেরই অন্যতম সাধনা। 'মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥'[২] বেলা তখন প্রায় বারোটা। বেশ গরম। ক্ষুধাও পাইয়াছে। কিন্তু এই আমেরিকান ভক্তটির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ এত ভাল লাগিতেছে যে, কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। কখন যে বিমানঘাঁটি হইতে যাত্রার পর এক ঘণ্টা অতীত হইয়া চিকাগো শহরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছি তাহাও বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ মিঃ গ্রীয়ারের কথায় হুঁশ হইল।

—এইবার আমরা ডিয়ারবর্ন এভিনিউতে ঢুকিতেছি। হেলদের বাড়ি (Hale's residence) দেখিয়া যাইব।

---

১ একটা কোলা ব্যাঙ ঢোঁড়া সাপের পাল্লায় পড়েছিল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। কোলা ব্যাঙটার যন্ত্রণা—সেটা ক্রমাগত ডাকছে। ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা। কিন্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যদি পড়তো তা হ'লে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত। যদি সদ্গুরু হয় তা হ'লে জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১।৪।১৫

২ ভগবদনুরাগী ভগবৎপ্রাণ ভক্তেরা নিজেদের মধ্যে সর্বদাই ভগবৎকথা এবং ভগবদালোচনা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা প্রভূত তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেন। গীতা ১০।৯

ডিয়ারবর্ন এভিনিউ এবং হেলদের বাড়ি! শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। স্বামীজীর পত্রাবলী যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই রাস্তাটির নাম সুপরিচিত। তাঁহার বহু পত্রের মাথায় '৫৪১নং ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, মিঃ জর্জ ডবলিউ হেলের বাড়ি'—এই ঠিকানা দেখা যায়। এই বাড়িটি ছিল স্বামীজীর আমেরিকা অবস্থানকালে একটি প্রধান আড্ডা। আর এই বাড়ির যাঁহারা ছিলেন বাসিন্দা, তাঁহারা যেমন করিয়া স্বামীজীকে পাইয়াছিলেন এবং স্বামীজীও তাঁহাদের নিকট নিজেকে যেমন ভাবে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সত্যই আশ্চর্য। স্বামীজীর ভক্তদের নিকট চিকাগোর হেলদের বাড়ি একটি অবিস্মরণীয় তীর্থ। চিকাগোর অন্য কিছু দেখিবার আগে মিঃ গ্রীয়ার যে আমাকে এই বাড়িটি দেখাইতে চলিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।

গাড়ি থামিল। হেলদের বাড়ি রাস্তার যে-ধারে, তাহার বিপরীত সাইড-ওয়াক্* দিয়া আমরা হাঁটিয়া চলিলাম এবং এক মিনিটের মধ্যেই বাড়িটির সামনা-সামনি দাঁড়াইলাম। বাড়িটি ত্রিতল। সমগ্র বাড়িটিকে এখন একটি 'অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে' পরিণত করা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাড়াটিয়া থাকেন। তবে বাহির হইতে বাড়িটির গঠন ও চেহারা আগেকার মতোই আছে। উহার প্রাচীন স্থাপত্য চিত্তাকর্ষক। আশেপাশের গৃহসমূহ হইতে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া একটি স্নিগ্ধ সরলতা এবং গাম্ভীর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বড় ভাল লাগিল। চোখ যেন জুড়াইয়া গেল।

মনে ৬৮ বৎসর পিছনকার একটি ছবি ভাসিয়া উঠিল। ১৮৯৩ খৃঃ ১০ই সেপ্টেম্বর, বেলা ১০টা/১১টা হইবে। ভারতীয় সন্ন্যাসীর বেশে বিবেকানন্দ এই ডিয়ারবর্ন এভিনিউ দিয়া তাঁহার জিনিসপত্র লইয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। পূর্ব রাত্রে তিনি ট্রেনে বস্টন হইতে চিকাগো পৌঁছিলেন। ধর্মমহা-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের নিকট যে পরিচয়-পত্রটি সঙ্গে ছিল তাহা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। অপরিচিত স্থান। এই রাত্রে কোথায় যাইবেন? স্টেশনটি শহরের জার্মান পল্লীতে। ইংরেজী ভাষাতে নিজের অবস্থা আশেপাশের কাহাকে বুঝাইতেও পারেন না। অগত্যা রাত কাটাইলেন স্টেশন-ইয়ার্ডে একটি খালি মালগাড়ির মধ্যে। কিছু খাওয়া হয় নাই। আজ সকালে স্টেশন হইতে বরাবর হাঁটিয়া আসিতেছেন। চিকাগো শহর বিরাট মিশিগান হ্রদের উপকূলে। হ্রদের তীরে প্রশস্ত রাজপথ। উহার উপর অভিজাত ধনীদের প্রাসাদশ্রেণী। ঐ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে বিবেকানন্দ আসিতেছেন। কত বাড়ির দরজায় আশ্রয় চাহিয়াছেন, অপমানিত হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার ভারতীয় পোষাক এখানকার লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকিয়াছে, তাই পথচারীদের নিকট বিদ্রূপ, টিটকারী, লাঞ্ছনারও শেষ নাই। তবুও বিবেকানন্দ ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া অজানা ভাগ্যের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। চলিতে চলিতে এই রাস্তায় যখন আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা এবং ক্লান্তিতে শরীর একান্ত অবসন্ন, পা যেন আর চলে না। এখানেও এক-একটি বাড়ির সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দরজায় করাঘাত করিতেছেন, যদি একটু আশ্রয় বা খাবার মিলে। প্রতি জায়গায় নিরাশ হইতে

---

* আমেরিকায় 'ফুটপাথ'কে বলে 'সাইড্-ওয়াক্'।

হইতেছে। অবশেষে শরীর-মনের সকল শক্তি যেন ফুরাইয়া গিয়াছে। রাস্তার পাশে বসিয়া পড়িলেন—ঠিক ৫৪১নং বাড়ির বিপরীত দিকে। কতক্ষণ বসিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ নাই, কিন্তু এবার জনৈক মহীয়সী আমেরিকান মহিলার করুণা-বিগলিত দৃষ্টির মধ্য দিয়া ভাগ্যদেবতা যেভাবে প্রসন্ন হইলেন, তাহা স্বামীজীর জীবনকাহিনীর একটি চিহ্নিত ঘটনা।

ঐ মহীয়সীর নাম মিসেস জর্জ হেল। তিনি তাঁহার বাড়ির জানলা দিয়া এই বিদেশী ক্লান্ত বিপন্ন পথিককে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিয়া নারীর শাশ্বত মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিলেন, পথিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পরম সমাদরে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন, বিশ্রামের জায়গা করিয়া দিলেন, পরে নিজে তাঁহাকে ধর্মমহা-সভার অফিসে লইয়া গিয়া প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। পরের দিন ১৮৯৩ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশনেই বিবেকানন্দের নাম দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-লাভের অব্যবহিত পূর্বে গোপালিকা সুজাতার সেবা তাঁহার জীবনীতে যেভাবে অবিস্মরণীয় হইয়া আছে, স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বিজয়ের পূর্বক্ষণে এই করুণাময়ীর আতিথ্য ও সমাদর সেই ভাবেই আমাদের স্মৃতিকে অনুপ্রাণিত করে।

১০ই সেপ্টেম্বরের ঐ প্রথম পরিচয় পরে নিবিড় আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। মিঃ হেলকে স্বামীজী বলিতেন, 'ফাদার পোপ' এবং মিসেস হেলকে 'মাদার চার্চ'। এই উচ্চহৃদয় আমেরিকান দম্পতি স্বামীজীকে ঠিক নিজেদের পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। তাঁহাদের দুই কন্যা মেরী ও হ্যারিয়েট এবং দুই ভাগিনেয়ী ইজাবেল ম্যাককিণ্ডলী ও হ্যারিয়েট ম্যাককিণ্ডলী (যাহারা হেলদের বাড়িতেই থাকিত) স্বামীজীকে দাদা বলিয়া ডাকিত। চার ভগিনীর নির্মল চরিত্র, ধর্মপ্রাণতা এবং উচ্চাদর্শনিষ্ঠা স্বামীজীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে নিজের সহোদর ছোট বোনের মতো মনে করিতেন এবং নানা গল্প, উপদেশ এবং বিশুদ্ধ হাসি-তামাসার মধ্য দিয়া তাহাদের হৃদয় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিতেন। এমন একজন আশ্চর্য দাদা পাইয়া কিশোরীদের আনন্দ ও গর্বের সীমা ছিল না।

ধর্ম-মহাসভার পর প্রায় এক বৎসর স্বামীজীকে আমেরিকার মধ্য পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে নানা স্থানে বক্তৃতা-সফরে ঘুরিতে হইয়াছিল। এই সময়ে চিকাগোর হেলদের গৃহই ছিল তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স। কঠোর কর্মক্লান্তির পর কয়েকদিন এখানে বিশ্রামের জন্য আসিতেন। হেল-দম্পতি এবং চার ভগিনীর প্রীতি ও সেবাযত্নে তিনি অচিরেই সুস্থ হইয়া উঠিতেন। ১৮৯৮ খৃঃ স্বামীজী ভারতবর্ষ হইতে মেরী হেলকে লিখিয়াছিলেন :

'তোমাদের সমগ্র পরিবার আমার প্রতি এত স্নেহসম্পন্ন যে, আমার মনে হয় হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ অনুযায়ী আমি নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে তোমাদের পরিবারভুক্ত ছিলাম।'

লণ্ডন হইতে স্বামীজী ১৮৯৬ খৃঃ ২৮শে নভেম্বর চার বোনকে একসঙ্গে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন :

'আমার মনে হয় পৃথিবীতে যে-ভাবেই হোক, তোমাদের চার জনকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি, আর আমার ধারণা যে তোমরাও আমাকে ঐরূপই ভালবাস। তাই ভারতে ফিরবার প্রাক্‌কালে তোমাদের কয়েকটি কথা না লিখে পারছি না।'

স্বামীজীর অগ্নিময়ী চিন্তাধারার অনেকগুলিই মেরী হেলকে লিখিত তাঁহার বিভিন্ন পত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আলমোড়া হইতে ৯ই জুলাই ১৮৯৭ তারিখে মেরীকে লিখিয়াছিলেন :

'বার বার যেন আমি জন্মগ্রহণ করিয়া অশেষ দুঃখ বরণ করিতে পারি। তবেই তো একমাত্র বাস্তব যে ঈশ্বর রহিয়াছেন, একমাত্র যে ঈশ্বরকে আমি বিশ্বাস করি—সকল জীবের সমষ্টিস্বরূপ যিনি—তাঁহাকে আমি পূজা করিতে পাইব। সর্বোপরি আমার বিশেষ আরাধনার পাত্র হইলেন দুষ্টরূপী আমার ভগবান, আমার দুঃখী-নারায়ণ, সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর দুঃখী-নারায়ণ।'

স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় আসেন, সেই সময়ে তাঁহার ক্যালিফর্নিয়ায় অবস্থানকালে মিঃ জর্জ হেল মারা যান। স্বামীজী মেরীকে ২০শে ফেব্রুআরি, ১৯০০ তারিখে ক্যালিফর্নিয়ার প্যাসাডিনা শহর হইতে লিখিয়াছিলেন, '..এই সংবাদে মর্মাহত হলাম। যদিও আমার সন্ন্যাসীর শিক্ষাদীক্ষা, তবুও হৃদয়টি তো বাঁচিয়াই আছে। জীবনে যত লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি, মিঃ হেল তাঁদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমাদের সকলের দুঃখ স্বাভাবিক। মাদার চার্চ, হ্যারিয়েট এবং অপর সকলেরই শোক বুঝতে পারছি। বিশেষতঃ তোমাদের পরিবারে এই ধরনের আঘাত এই প্রথম।' ক্যালিফর্নিয়া হইতে নিউইয়র্কের পথে স্বামীজী হেল-পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চিকাগোতে নামিয়াছিলেন। যেদিন চলিয়া যাইবেন সেদিন সকালে মেরী স্বামীজীর ঘরে আসিয়া দেখিতে পাইল—স্বামীজীর বিছানা আদৌ ব্যবহার করা হয় নাই। প্রশ্ন করায় বলিলেন, রাত্রে তিনি ঘুমান নাই। তাহার পর কতকটা স্বগতভাবে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন—'ওঃ, মানুষের প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করা কী কঠিন!' স্বামীজী জানিতেন, এই একান্ত দরদী পরিবারের সহিত জীবনে আর দেখা হইবে না।

* * *

স্বামীজীর বহুস্মৃতিজড়িত প্রাচীন বাড়ীটির সামনে দাঁড়াইয়া আছি। একটি অব্যক্ত অনুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, বাড়ীটি যেন জীবন্ত। যে অলোকসামান্য মহাপুরুষ তাঁহার বিদ্যা, জ্ঞান, খ্যাতি ও শক্তি সব কিছু ছাড়িয়া রাখিয়া একান্ত মানবীয় স্তরে 'এখানে' নামিয়া আসিতেন এবং এই গৃহের একটি বালকরূপে নিজেকে প্রকাশ করিতেন, তাঁহার অনির্দিষ্ট স্মিতহাস্য যেন বাড়িটির গায়ে মিশিয়া আছে। আর এই বাড়ির সেই ধর্মনিষ্ঠ দম্পতি এবং চারিটি দেবীপ্রতিম কন্যা যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের নির্মল প্রীতি, সহানুভূতি, উদারতা ও সেবা দিয়া সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে তৃপ্ত করিতেন, তাঁহাদেরও চরিত্র-মাধুরী গৃহটিকে যেন আজিও রঞ্জিত রাখিয়াছে।

বেদান্ত-সাহিত্যের ভূমিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

বৈদিক সাহিত্য বিচার দ্বারা ইহাই নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় যে, স্ব-স্বরূপাববোধই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। মানব পরমেশ্বরের সৃষ্টিপ্রদর্শনীর সর্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় বস্তু, সৃষ্টির ভূষণস্বরূপ। একমাত্র মনুষ্যকেই তিনি বিবেক-বিচারাদি গুণে সমলংকৃত করিয়াছেন, যাহার সদ্ব্যবহার করিয়া মানুষ সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারে এবং অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জন্মমরণ-আবর্তসংকুল এই দুঃখময় সংসার-সাগর হইতে চিরতরে মুক্তও হইতে পারে।

মহর্ষি যাস্ক বলিয়াছেন, 'মত্বা কর্মাণি সীব্যন্তি ইতি মানবঃ'—অর্থাৎ পরিণাম বিচার-পূর্বক যিনি কর্ম করিতে সমর্থ, তিনিই মানব। বিচার ও নিজের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা মানুষ জীবনের কোন-না-কোন সময়ে বুঝিতে পারে যে, পরিণামে দুঃখমাত্রপর্যবসায়ী ঐহিক ভোগমাত্রই তাহার মুখ্য কাম্য বস্তু হইতে পারে না। তখন সে বিষয়ভোগের প্রতি আস্থাহীন হয় ও বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষের মুখে পরমতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে শরণ লইয়া থাকে। একমাত্র বেদান্তই মানুষকে সেই পরম তত্ত্বের সন্ধান দিয়া তাহার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী গুরু শরণাগত শিষ্যকে তাহার যাবতীয় দুঃখনিবৃত্তির জন্য বেদান্ততত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকেন। বেদান্তোক্ত তত্ত্বজ্ঞানই রাগদ্বেষমূল অজ্ঞান নিবৃত্তিকরত মানবকে সর্বাত্মভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন :

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

—ঈশাবাস্যোপনিষদের এই মন্ত্রের ভাষ্যে জগদ্‌গুরু শ্রীআদিশংকরাচার্য লিখিয়াছেন, 'সর্বা হি ঘৃণা আত্মনঃ অন্যদ্ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি।'—আপন হইতে ভিন্ন কাহাকেও দোষদুষ্টরূপে দর্শনকারী পুরুষের চিত্তেই ঘৃণাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্যকারণাত্মক সর্ব দ্বৈতপ্রপঞ্চকে স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মভাবে অবগত হইলে অর্থাৎ সর্ব বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ এই জ্ঞান পরিপক্ক হইলে চিত্তগত রাগদ্বেষ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আচার্য সুরেশ্বর তৎকৃত 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ' গ্রন্থের প্রারম্ভে এইভাবে লিখিতেছেন :

জগতে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকল প্রাণীরই চিত্তে দুঃখ-পরিহারের ইচ্ছা ও তৎপরিহারার্থ প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান। দেহধারণ করিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। জীব স্বকৃত পূর্বসঞ্চিত পাপপুণ্যকর্মফলবশতই বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া থাকে, সুতরাং ঐ কর্ম ও তৎফল বিদ্যমান থাকিতে দেহধারণ অপরিহার্য। কর্মানুষ্ঠান রাগদ্বেষমূলক। অনুকূল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষপ্রযুক্ত হইয়াই সকলে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ নানাবিধ কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। রাগ-দ্বেষের কারণ শোভন ও অশোভন অধ্যাস, অর্থাৎ অনিত্য ব্যভিচারী মিথ্যাভূত বিষয়ে রমণীয়তা- ও অরমণীয়তা-বুদ্ধির আরোপ। (অস্থির বিষয়ে এই বুদ্ধিও স্থির নহে, কারণ একই বিষয় কখন রমণীয় কখন বা অরমণীয়

বলিয়া প্রতীত হয়।) এই অধ্যাস অবিচারিতসিদ্ধ দ্বৈতবস্তুমূলক। দ্বৈতবস্তু যে পর্যন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হইবে, সে পর্যন্ত এইরূপ অধ্যাসও হইবেই। এক অদ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অনববোধ-বশতই শুক্তিকাতে রজতাদির ন্যায় সর্ব দ্বৈতের সত্যবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে। এইরূপ দেখা যায়, এক আত্মার অনববোধ বা অজ্ঞানই পরম্পরাক্রমে সর্ব অনর্থের মূল হেতু। অজ্ঞান প্রভাবেই আত্মার সুখরূপতা ও নিত্যমুক্ততা মানবের প্রতীতি হয় না ও অজ্ঞানবদ্ধ জীব নিজেকে ক্ষুদ্র দীনহীন ও দুঃখী মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব এই অজ্ঞানের আত্যন্তিক উচ্ছেদ-সাধনই দুঃখপরিহারেচ্ছু সকল জীবের একান্ত কাম্য। বিরোধিতাবশতঃ প্রকাশ যেরূপ অন্ধকারের নিবর্তক, তদ্রূপ এই অজ্ঞানেরও বিরোধী ও তন্নিবর্তক একমাত্র আত্মবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান। আত্মা প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অবিষয়। একমাত্র বেদান্তবাক্য হইতেই জীবের ঐ সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সর্বদুঃখনিবৃত্তির জন্য মুমুক্ষুর বেদান্ত-বাক্য হইতেই এই সম্যক্ জ্ঞান সম্পাদন করা একান্ত কর্তব্য।

'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বিদ্বান্‌গণ এরূপ বলিয়া থাকেন: 'বেদ' শব্দ জ্ঞানার্থক। বেদের অন্ত অর্থাৎ জ্ঞানের পূর্ণতা বা পর্যবসান অথবা পরমাবধিকেই 'বেদান্ত' বলে। অর্থাৎ যে-জ্ঞানের পর আর জ্ঞাতব্য কিছু অবশেষ থাকে না, তাহাই বেদান্ত। অল্পজ্ঞানে শান্তি হয় না, সর্বাধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের দৃঢ় অপরোক্ষ-সাক্ষাৎকারই পূর্ণ জ্ঞান। উহাই যথার্থ বেদান্ত।

পুনঃ এরূপ কথিত হয় যে, সমগ্র বেদে এক লক্ষ মন্ত্রের সংগ্রহ আছে। উহার মধ্যে আশী হাজার মন্ত্র কর্মকাণ্ড-বিষয়ক, ষোল হাজার উপাসনাত্মক এবং অবশিষ্ট চারি হাজার আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক। এই শেষ চারি হাজার বেদের অন্তভাগে সন্নিবিষ্ট বলিয়াও এই অংশকে 'বেদান্ত' বলা হয়।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে বেদান্ত সর্বোত্তম। সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান্ আচার্য শ্রীমধুসূদন বলিয়াছেন, 'ইদমেব সর্বশাস্ত্রাণাং মূর্ধন্যম্। শাস্ত্রান্তরং সর্বম্ অস্যৈব শেষভূতমিতীদমেব মুমুক্ষুভিরাদরণীয়ং শ্রীভগবৎপাদোদিতপ্রকারেণ ইতি'—বেদান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্র ইহার অঙ্গীভূত। অতএব ভগবান্ শ্রীশংকরাচার্যপ্রদর্শিত-মার্গে বেদান্তপাঠ ও বিচারাদি করাই মুমুক্ষুগণের একান্ত কর্তব্য।

উপনিষদের অপর নাম 'বেদান্ত'। 'উপ' ও 'নি'-পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'কিপ্' প্রত্যয়-যোগে 'উপনিষৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'উপ' শব্দ দ্বারা সত্বর ও সামীপ্য, 'নি' শব্দ নিশ্চয় বা নিঃশেষ অর্থ বুঝায় এবং 'সদ্' ধাতুর অর্থ বিশরণ, শিথিলীকরণ, গতি বা প্রাপ্তি ও অবসাদন বা বিনাশ। অতএব 'উপনিষৎ' শব্দের অর্থ—জীবব্রহ্মের ঐকাত্ম্য-জ্ঞানসহায়ে যে-বিদ্যা সত্বর সকারণ সংসার-বন্ধন শিথিল করে বা যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায় অথবা যে-বিদ্যার অভ্যাস করিলে উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সংসার-বন্ধনকে বিনাশ করে, সেই বিদ্যাই উপনিষৎ। এইরূপে বেদান্ত- বা উপনিষৎ-শব্দ ব্রহ্মবিদ্যাকে বুঝাইলেও উপনিষদ্‌রূপে কথিত গ্রন্থসমূহ সাহায্যে ঐ বিদ্যা লাভ হয় বলিয়া গৌণভাবে গ্রন্থকেও 'উপনিষদ্ বা বেদান্ত' বলা হয়। হৃদয়গুহাচারী প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম-বিষয়ে এই বিদ্যার উপদেশ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রপন্ন শিষ্যকে

কেবল করুণা-প্রণোদিত হইয়াই প্রদান করিয়া থাকেন।

কিন্তু বেদান্তোক্ত তত্ত্বটি অতি সূক্ষ্ম ও দুরূহ। উহার মর্মার্থ সরলভাবে সকলের বোধগম্য ও প্রতিবাদিগণের বিকৃত মতসমূহ হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীনকাল হইতেই ঐ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—এই তিনটিকে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়। এই তিনটি 'প্রস্থান'ই বেদান্তদর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রে পরমতখণ্ডনপূর্বক উপনিষদ্‌বাক্যসমূহের মর্মার্থ সংক্ষেপে সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা 'ন্যায়প্রস্থান' নামে খ্যাত। গীতাকে 'স্মৃতি-প্রস্থান' ও উপনিষদ্‌সমূহকে 'শ্রুতি-প্রস্থান' বলে।

আত্মার একত্বই উপনিষদ্‌সমূহের মূল বক্তব্য; অধিকারভেদে অপর সমস্ত বিভিন্ন উপদেশ—যাহা উপনিষদে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তাহা ঐ একত্ব-বোধনের সহায়কমাত্র। এইরূপে সর্ব বৈদিক মতসমূহের সমন্বয় স্থাপন-করত উদার অদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমন্বয়াচার্য শ্রীশংকরকৃত প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যসমূহই সর্বোৎকৃষ্ট। এ-বিষয়ে বৈদেশিক পণ্ডিতগণও একমত। সকল উপনিষদ্‌ই একবাক্যে এবং নির্বিরোধে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং জগতের মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিতেছেন। গুরুপরম্পরাগত এই বিদ্যা গুরুমুখে লাভ করিলে সর্ব বিরোধের অবসান হয়। আচার্য শ্রীশংকর প্রধানতঃ শ্রুতিবাক্য-সহায়েই পৌর্বাপর্য নির্ণয়করত শ্রুতি-ব্যাখ্যানপূর্বক স্বমত অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহা তাঁহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুনঃ কর্ম, পূজা, যোগ, উপাসনা প্রভৃতি অধিকারীর রুচি- ও যোগ্যতানুযায়ী এই মতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কিছুই অনাদৃত হয় নাই। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদ সর্বংসহ। শ্রুতিসমুদ্র মন্থনপূর্বক শিবাবতার আচার্য শ্রীশংকর এই অদ্বৈতামৃত জগতের হিতের জন্য সকলকে পরমকরুণাপরবশচিত্তে সাদরে পরিবেশন করিয়াছেন।

আচার্য শ্রীশংকর-প্রচারিত অদ্বৈতবাদই যে ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত এবং ভগবান শ্রীবেদব্যাস-সম্মত ও সর্ব উপনিষদের যথার্থ তাৎপর্য—ইহা নিঃসন্দেহ।

পরস্পর-বিরুদ্ধ মতমতান্তরসমূহদ্বারা বিভ্রান্ত, শান্তিপিপাসু জীবগণকে অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব-রহস্য বুঝাইবার জন্য পরমকারুণিক সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীবেদব্যাস সর্বোপনিষৎ-সিদ্ধান্তের সারভূত 'ব্রহ্মসূত্র'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাই 'বেদান্তদর্শন', 'শারীরক সূত্র', 'উত্তরমীমাংসা-দর্শন' ইত্যাদি নামে সুপ্রসিদ্ধ। মানব-কল্যাণের নিমিত্ত প্রকট শিবাবতার আচার্য শ্রীশংকর স্বীয় সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভব ও লোকোত্তর প্রতিভা-সহায়ে অতি প্রসন্ন ও গম্ভীর বাক্যরচনাদ্বারা উক্ত 'ব্রহ্মসূত্র', 'দশোপনিষৎ' ও 'গীতা'র উপর অপূর্ব অনবদ্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। উহাতে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-সম্মত তাৎপর্য সুনির্ণীত হইয়াছে। আচার্যশিষ্য শ্রীসুরেশ্বর, পদ্মপাদ ও তৎপশ্চাৎ সর্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্মযতি প্রভৃতি তত্ত্ববেত্তা বিদ্বান্‌গণও বেদান্ত-বিষয়ক স্ব স্ব রচনাসমূহদ্বারা বেদান্ত-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে পণ্ডিত-ধুরন্ধর শ্রীবাচস্পতিমিশ্র সূত্রভাষ্যের উপর 'ভামতী'-নামক এক অপূর্ব টীকা রচনা করিয়া সর্বলোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। সূত্রভাষ্যের উপর আরও বহু টীকাদি রচিত হইয়াছে। আচার্যপদানুগ স্বনামধন্য শ্রীমধুসূদন

সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'অদ্বৈতরত্নরক্ষা' প্রভৃতি, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিৎসুখাচার্য 'চিৎসুখী', অলৌকিক প্রতিভাশালী শ্রীহর্ষ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থরচনা দ্বারা প্রতিপক্ষের কুতর্কসমূহ খণ্ডনকরত অদ্বৈততত্ত্বাববোধ অধিকতর সুগম করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তের দুরূহতা অনুমান করিয়া সর্ববিদ্যাপারঙ্গত শ্রীবিদ্যারণ্যস্বামী 'পঞ্চদশী' আদি ও যাজ্ঞিক শ্রীধর্মরাজ 'বেদান্তপরিভাষা'-নামক মনোরম গ্রন্থরচনা দ্বারা সাধারণ সংস্কৃতাভিজ্ঞ পুরুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এইরূপে আরও বহু বিদ্বদ্‌বৃন্দের রচনাভারে সমৃদ্ধ হইয়া অদ্বৈতবেদান্ত-সাহিত্য কালক্রমে এক বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে।

সংস্কৃতানভিজ্ঞ হিন্দিভাষাভাষিগণের জন্য সর্বদর্শনতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীনিশ্চলদাস লোক-কল্যাণেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া 'বিচারসাগর' ও 'বৃত্তিপ্রভাকর' নামক দুইখানি গম্ভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ বেদান্তগ্রন্থ রচনা করিয়া জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ কর্তৃক অনূদিত 'তত্ত্বানুসন্ধান', 'আত্মপুরাণ' আদি গ্রন্থও বহুলোকের অধ্যাত্ম-জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে। পণ্ডিত পীতাম্বরকৃত 'বিচার-চন্দ্রোদয়' প্রভৃতি ও 'পঞ্চদশী' আদি গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদও মুমুক্ষুগণের সমাদর লাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষাতেও শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ), স্বামী গম্ভীরানন্দ ও অন্যান্য সুপণ্ডিত লেখকগণ বহু বেদান্ত-শাস্ত্র বঙ্গভাষাভাষিগণের নিকট সুখবোধ্য করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

সংসারে আবদ্ধ হইয়া জীব কত দুঃখ পায়। এই দুঃখের কারণ সে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের উপর আরোপ করিয়া থাকে। অজ্ঞান-রোগে আক্রান্ত হইয়াই সে সংসারে হাবুডুবু খাইতেছে, কষ্ট পাইতেছে—ইহা সে জানে না বা বুঝিতে পারে না। ভাগ্যবশে সৎসঙ্গ লাভ হইলে তখন জীবের লক্ষ্য বস্তুর উপর দৃষ্টি নিপতিত হয়। সৎসঙ্গের মহিমাবলেই জীব নিজের রোগবিষয়ে সচেতন হয় ও তন্নি-বৃত্তির জন্য ক্রমশঃ সচেষ্ট হয়। তখনই এই বিচার চিত্তে জাগ্রত হয় যে, রাগদ্বেষাদিপূর্ণ বহির্মুখ জীবনে যদি নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতদিনে উহা অবশ্যই লাভ হইত। অতএব বহির্মুখ জীবনে শাশ্বত সুখ-লাভের আশা দুরাশা মাত্র। বিষয়ে দোষ-দৃষ্টিপূর্বক বাহ্যবিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া অন্তর্মুখ হইতে হইবে। বেদান্ত মানুষকে এই অন্ত-র্মুখীনতাই শিক্ষা দেয়। কিন্তু ভোগবাসনা দ্বারা চঞ্চল ও কলুষিত চিত্ত সহসা অন্তর্মুখ হইয়া আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র নিষ্কাম-কর্ম ও উপাসনাদির বিধান করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তগত ভোগবাসনা বিনষ্ট হইলে ও উপাসনা দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য দূর হইয়া একাগ্রতা সাধিত হইলে দৃঢ় আত্মজিজ্ঞাসা উদিত হয়। তখন তাহার জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী আচার্যগণের নিকট উপসন্ন হইয়া সেই পরমতত্ত্ব অবগত হও। ভগবতী শ্রুতি শুধু 'বোধত' বলেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন 'নিবোধত'—অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে অবগত হও। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মননাদি সহায়ে তত্ত্বাবগতির নিমিত্ত শ্রুতি সাদরে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এই বিদ্যা গুরুমুখেই লব্ধব্য। বিদ্বান্‌গণ বলেন: উপনিষদ্ অধ্যয়ন দ্বারা গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যালাভ

উত্তম কল্প, ঋষি-প্রণীত ইতিহাস-পুরাণাদি অধ্যয়ন দ্বারা গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যালাভ মধ্যম কল্প, এবং ভাষা-প্রবন্ধাদি অধ্যয়ন দ্বারা গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যালাভ অধম কল্প। বিভিন্ন অধিকারীর জন্যই এই বিভিন্ন ব্যবস্থা, ইহা বলা বাহুল্য।

বেদান্ত পতিত জীবনকে উন্নত করে। ইহা আমাদিগকে কোন অভিনব অপূর্ব বস্তু প্রদান করে না। যে স্ব-স্বরূপ আমরা অজ্ঞানবশতঃ বিস্মৃত হইয়াছি, বেদান্ত তাহাই আমাদের জানাইয়া দেয় মাত্র। বিবেক-বিচারাদিসহায়ে জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুটিত হইলে জ্ঞানবান্ পুরুষ জগৎকে অন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন। আপাত-প্রতীয়মান রূপরসাদি-বিষয়ে তিনি আর আবদ্ধ হন না। সর্বপ্রতীতির অন্তর্নিহিত সত্য-বস্তুটিকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ- ও স্বাভিন্নরূপে বোধকরত তিনি স্বরূপনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। জ্ঞানী সংসারে থাকিয়াও সদা স্ব-স্বরূপে থাকেন অর্থাৎ স্বরূপকে কখনও বিস্মৃত হন না। সাংসারিক সুখ-দুঃখকে খেলামাত্র জানিয়া তিনি সংসারে বিচরণ করেন, কারণ তিনি জানেন সুখ-দুঃখ স্বরূপে নাই, উহা ভ্রান্তিবশতঃ জীব নিজেতে আরোপ করিয়া থাকে মাত্র। জ্ঞানী সর্বসংসার-দুঃখ-রহিত স্বরূপস্থিতি লাভ-করত পরমানন্দ-সাগরে সদা নিমগ্ন থাকেন। এই অবস্থা-লাভই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব মুমুক্ষুর সদা বেদান্ত-শ্রবণ-বিচারাদি দ্বারা স্বীয় কল্যাণ-সাধনে যত্নবান্ হওয়াই সর্বতোভাবে কর্তব্য।

তামিল শৈবসঙ্গীত 'তেবারম্'

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বিস্তৃত তামিল শৈব-সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম 'তেবারম্'।[১] প্রায় আট হাজার পদ বা স্তবকের সমাহারে গঠিত এই সংকলন-গ্রন্থখানি কেবল যে আকারেই সুবৃহৎ তাহা নয়, ভক্তি-রসেও ইহা শীর্ষস্থানীয়। প্রসিদ্ধ শৈবকবি মানিক্কবাচকর-প্রণীত 'তিরুবাচকম্'-এর কথা ছাড়িয়া দিলে শৈব-সাহিত্যে 'তেবারম্' অদ্বিতীয়। আর যদি নিছক কাব্যরসের দিক হইতে বিচার না করিয়া আমরা তামিল ভক্তজনের ঐতিহ্যবাদী দৃষ্টি লইয়া দেখিতে চাই, তবে শৈব-সাহিত্যে 'তেবারম্'-এর তুলনা নাই। কারণ তামিল-নাডের শৈব তথা হিন্দু জনসাধারণের মনে তেবারম্-এর সহিত একটা দ্বন্দ্ব-মুখর সুদীর্ঘ ইতিহাসের স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে। বৌদ্ধ-জৈনদের কবল হইতে তামিলনাডকে মুক্ত করিবার যে দৃঢ় সংকল্প ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর শৈব তামিলীদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, 'তেবারম্' তাহারই উদ্দীপনাময়ী স্মৃতি বহন করিয়া চলিয়াছে। ইহা ভক্তি-রসের কাব্য হইলেও এই ভক্তি অবিমিশ্র শান্ত বিশুদ্ধ ভক্তি নয়, ইহার সহিত অত্যন্ত অল্প পরিমাণে হইলেও মিশ্রিত হইয়া আছে একটি পরধর্ম-বিরুদ্ধতা। অবশ্য এই মনোভাব সর্বত্র উগ্র হইয়া উঠিলে তেবারম্ ভক্তিকাব্য না হইয়া ইতিহাসের উপাদান হইয়া থাকিত।

---

১ তেবারম্ <তেব আরম্ <দেব আরম্ <দেবহারম্। দেবহার অর্থাৎ দেবতার কণ্ঠে পরাইবার জন্য গীতিমালা।

একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চোল সম্রাট্ প্রথম রাজরাজ চোলের নির্দেশক্রমে শৈব কবি নাম্বিয়াণ্ডার-নাম্বি যে তিন জন ভক্ত-কবির পদাবলী লইয়া 'তেবারম্' সংকলন করেন, তাঁহারা হইতেছেন—সম্বন্ধর্, অপ্পর্ এবং সুন্দরর্। ইঁহাদের প্রথম দুইজন সপ্তম শতাব্দীর সমসাময়িক কবি। সুন্দরর্ আবির্ভূত হন এক শতাব্দীরও পরে। ততদিনে শৈবধর্মের জয়লাভের ফলে তামিলনাডের ধর্ম-সংঘর্ষের উত্তেজনা অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। এবং তৎকালীন শৈব কবিদের রচনা বিরুদ্ধ ধর্মের নিন্দাবাদ হইতে মুক্ত। অপ্পর্-সম্বন্ধর্-এর রচনাবলী সম্পর্কে ঠিক এই কথা বলা যায় না। এই দুইজন শৈবসাধক যেভাবে ধর্মযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের রচনার মধ্যে কিছু পরিমাণ উগ্রতা স্বাভাবিক। তাঁহাদের ভক্তিসঙ্গীত কেবল নিষ্ক্রিয় হৃদয়োচ্ছ্বাস নয়, তাহা ধর্মযুদ্ধের একটি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। এই জাতীয় দু-একটি রূঢ় পদে আসিয়া বিশুদ্ধ-দৃষ্টি-নিরপেক্ষ ভক্ত হয়তো বেদনা বোধ করিবেন।

৬৩জন নায়ন্‌আর্ ভক্তের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীর শৈব কবি চেক্কিলার্ 'পেরিয়পুরাণম্' (মহাপুরাণ) নামে যে উৎকৃষ্ট জীবনী-কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহাই বর্তমানে শৈব কবিদের জীবন-বৃত্তান্তের মুখ্য অবলম্বন। এইরূপ জীবনচরিতগ্রন্থে সাধারণতঃ অলৌকিকতার স্পর্শ থাকে। 'পেরিয়পুরাণম্'-এও রহিয়াছে। ফলে, সম্বন্ধর্-অপ্পর্-সুন্দরর্—আমাদের আলোচ্য এই তিন কবির জীবনেও নানারূপ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। কাব্য জীবনবৃত্তান্ত নয় এবং কাব্যের আলোচনায় কবির জীবনচরিত হয়তো অনাবশ্যক। কিন্তু আলোচ্য শৈব কবিদের জীবনকাহিনী তামিল সাধারণের মনে-প্রাণে এমনিভাবেই জড়াইয়া আছে যে, তাঁহাদের জীবনের দু-একটি মুখ্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া তাঁহাদের রচনার কথা বলিলে বোধ করি অন্যায় করা হইবে।

সম্বন্ধর্ অপেক্ষা অপ্পর্ যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ হইলেও তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে সম্বন্ধর্-ই যে সাধারণতঃ অগ্রাধিকার লাভ করেন, তাহার কারণ বোধ করি—বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের উচ্ছেদ করিয়া তামিলনাডে শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা-কার্যে অপ্পর্ অপেক্ষা সম্বন্ধর্ অধিক কৃতিত্বশালী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে যাহার তিরোভাব ঘটে, সেই বালক কি ভাবে যে এই অসাধ্য সাধন করিল, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কবির শৈশব হইতেই এইরূপ নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তাঞ্জোর জেলার ব্রহ্মাপুরম্ (বর্তমান নাম শিয়ালি) নামক গ্রামের এক শৈব ব্রাহ্মণ-পরিবারে জাত এই শিশু বাহ্যতঃ মানব-সন্তান হইলেও বস্তুতঃ ছিল উমা-মহেশ্বরের সন্তান। তিন বৎসর বয়সেই সেই দিব্য পিতা-মাতার জন্য তাহার আকুলতা দেখা যায়। একদিন মানব-পিতার পশ্চাতে শিশু শিবমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলে পূজারী ব্রাহ্মণ তাহাকে ঘাটের উপরে রাখিয়া জলে নামিলেন। এদিকে শিশু উমা-মহেশ্বরের দিকে চাহিয়া 'মা, বাবা' বলিয়া কাঁদিতে থাকে। শিবের আদেশে উমা তাহাকে স্তন্যপান করাইলে সেই তিন বৎসরের শিশু দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হয় এবং তাহার নাম হয় 'তিরু-ঞান-সম্বন্ধর্' (অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞান-সম্বন্ধ) সংক্ষেপে 'সম্বন্ধর্'।

এই ঘটনার পরে ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার শিশু-পুত্রকে কোলে করিয়া শৈবতীর্থ পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধর্

সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলে দলে দলে ভক্ত-গায়ক তাঁহার অনুগামী হইতে থাকে। এই সময়েই সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ শৈব কবি অপ্পর্-এর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। কীর্তিমান্ কবি অপ্পর্ এই প্রতিভাশালী বালকের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

সম্বন্ধর্-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল জৈনদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া পাণ্ড্য-রাজ সুন্দর-পাণ্ড্যন্-কে শৈবধর্মে দীক্ষিত করা। এই ঘটনার সহিত সম্বন্ধর্-কৃত নানা অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনদের সহিত তর্কযুদ্ধ, রাজার আরোগ্য-বিধান, জল-স্রোতের বিপরীত মুখে শৈবশাস্ত্রগ্রন্থের পৃষ্ঠা ভাসাইয়া দেওয়া, অগ্নি-বেষ্টিত হইয়াও অক্ষত থাকা ইত্যাদি নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া সম্বন্ধর্ বিজয়গৌরবের অধিকারী হইলেন। বিপুল-সংখ্যক জৈন নানাভাবে এই তরুণ শৈবাচার্যকে নির্যাতিত, এমন কি প্রাণে মারিবার চেষ্টা করিলেও সম্বন্ধর্ পরবর্তীকালে (পাণ্ড্যরাজের শৈবমতে দীক্ষা-গ্রহণের পরে) যে প্রতিশোধ-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভয়াবহ। সম্বন্ধর্-এর সম্মতিক্রমে পাণ্ড্যরাজধানী মাদুরায় আট সহস্র জৈনের যে নিধন-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল, ভক্তজীবনের সহিত আমরা কোন মতেই তাহার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাই না।

সে যাহাই হউক, সম্বন্ধর্-এর রচনার পরিচয় দেওয়ার আগে আমরা তাঁহার তিরোভাবের দিনটির উল্লেখ করিতে চাই। সেইটি ছিল তাঁহার বিবাহের দিন। বর-বধূ সমস্ত আনুষ্ঠানিক কার্য শেষ করিয়া শিব-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন প্রভুকে প্রণাম জানাইতে। কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল সঙ্গীত। কিন্তু সেই সঙ্গীতের সুরধ্বনি মিলাইয়া যাওয়ার পূর্বেই বর-বধূর নর-দেহ মনুষ্যদৃষ্টির অগোচরে চলিয়া গেল।

শিবের বন্দনা-গানে কবির প্রথম শ্লোকটি এইরূপ: কর্ণে যাঁহার কুণ্ডল, বৃষের উপরে আরূঢ় যিনি, যাঁহার শিরোদেশে শুভ্র চন্দ্র, শ্মশানের বিভূতি-মণ্ডিত যাঁহার দেহখানি, বহুদিন পূর্বে যিনি অনুগৃহীত করিয়াছিলেন পদ্মাসন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মাপুর[২]-নিবাসী সেই প্রভুই আমার মন-চোর।[৩]

ব্রাহ্মণকবি যে তাঁহার প্রভুকে ব্রাহ্মণের বেশে সাজাইয়াছেন নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাহার নিদর্শন—

কণ্ঠে যাঁহার বেদমন্ত্র, গলায় যাঁহার যজ্ঞোপবীত, শুভ্র বৃষবাহন ভূতগণবেষ্টিত ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত সেই দেবতা ঐ আসিতেছেন সমারোহের সঙ্গে। 'হে নগ্ন ভিখারী, তুমিই আমাদের প্রভু'—এই কথা বলিয়া যাহারা তাঁহার চরণাগত হয়, তিনিই তাহাদের পাপ দূরীভূত করেন।[৪]

প্রভু কি শুধুই শিব, শুধুই মঙ্গল? তবে জগদ্ব্যাপী এই অমঙ্গল আসে কোথা হইতে? কবি একটি পদে প্রভুর বিচিত্র রূপের কথা বলিয়াছেন এইভাবে: তুমিই গুণ, আবার তুমিই দোষ। তুমি বন্ধু, তুমি ভগবান। অনন্ত জ্যোতির অধিকারী তুমি। শাস্ত্রের তাৎপর্য তুমি, তুমি সম্পদ্, তুমি আনন্দ। তুমি

---

২ ব্রহ্মাপুর কবির জন্মভূমি।

৩ তোড়ুডৈয় চেবিয়ন্ বিডৈয়েয়িয়োর্ তুবেণমতিচুডিক্
কাড়ুডৈয় চুডলৈপ্ পোডিপূচি এন্ উল্লঙ্কবর্ কল্বন্
এড়ুডৈয় মলরান্ মুননাল্ পনিন্দু এত্ত অরুল্ চেয়্দ
পীড়ুডৈয় ব্রহ্মাপুরমোবিয় পেম্মান্ ইবনণ্ড্রে।

৪ বেদম্ ওদি বেণ্নূল্পুণ্ড্ বেণ্‌ণৈ এরুদেয়িপ্
ভূতম চূলপ্ পোলিয় বরুবার্ পুলিয়িন্ উরিতোলার্
নাথা এনবু নক্কা এনবু নম্বাবেনমিণ্ড্র্
পাদম্ তোলুবার্ পাবম্ তীর্প্পার্ পলন নগরারে।

আমার সব। তোমার প্রশংসা আর কত করি বলো ?[৫]

এমন প্রিয় প্রভুকে যখন বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় নিন্দা করে, তখন স্বভাবতই কবি ক্ষুব্ধ হন। সেই ক্ষোভের মুহূর্তে তিনি একই সঙ্গে প্রতিপক্ষকে তিরস্কার করিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার মহিমা কীর্তন করিয়াছেন : বুদ্ধি-বিহীন বৌদ্ধ ও জৈনেরা আমার প্রভুর নিন্দা করে। কিন্তু আমার মন-চোর প্রভুর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, তিনি পৃথিবীতে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। আবার প্রভুর এ কী মায়া—*যে মত্তহস্তী (গজাসুর)* আসিল তাহাকে আক্রমণ করিতে, তিনি তাহার চর্ম দ্বারা দেহ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। লোকে তাঁহাকে পাগল বলে, কিন্তু আমি জানি, তিনি আমাদের মহান্ প্রভু।[৬]

দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের বিভূতি-মণ্ডিত ললাট একটি অতিপরিচিত দৃশ্য এবং বাঙালীর পক্ষে কিছুটা কৌতুককরও বটে। এই বিভূতিকে সাধারণতঃ বলা হয় তিরূনীরূ (তিরু নীরু) অর্থাৎ শ্রীভস্ম। শৈব ব্রাহ্মণ ললাটে 'তিরূনীরূ' মাখিবার কালে নিশ্চয়ই স্মরণ করে উহার অতীত মহিমার কথা। সম্বন্ধরকে অপদস্থ করিবার জন্য জৈনেরা একবার পাণ্ড্য-রাজের দেহে সুকৌশলে ব্যাধিসঞ্চার করিয়া শৈবসাধুকে আহ্বান করে রাজার আরোগ্য-বিধানের জন্য। রাজার রোগ-শয্যার একদিকে প্রবীণ জৈনাচার্য, অপরদিকে কিশোর সম্বন্ধর্। উভয়দিকেই সমানে মন্ত্রপাঠ চলিতে থাকে। কিন্তু যে দিকে জৈনাচার্য বসিয়াছিলেন, রাজার শরীরের সেই দিক্‌কার অর্ধাংশে যন্ত্রণা ক্রমশই উৎকট হইয়া পড়ে। আর সম্বন্ধর্-এর দিকে বাকি অর্ধাংশ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। তখন যে স্বরচিত মন্ত্র-সহযোগে সম্বন্ধর্ রাজদেহে বিভূতি মাখাইয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

মন্ত্রম্ আবদু নীরু, বানবর্ মেল্ অদু নীরু,
সুন্দরম্ আবদু নীরু, তুতিক্কপ্‌ পডুবদু নীরু,
তন্ত্রম্ আবদু নীরু, সমযত্তিল্ উল্লদু *নীরু,*
চেম্-তুবর্ বয়ে উমৈভঙ্গন্ তিরু আলবায়ান্
তিরুনীরে।[৭]

শৈবদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র পঞ্চাক্ষর 'নমঃ শিবায়'। এই মন্ত্র কণ্ঠে লইয়া সম্বন্ধর্ মাদুরা যাত্রা করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি-অর্জনে। আবার এই মন্ত্র কণ্ঠে লইয়াই তিনি নর-দেহ পরিত্যাগ করেন শিবের মন্দিরে সেই বিবাহ-রাত্রে—

বেদচতুষ্টয়ের প্রকৃত সার—আমার প্রভুর নাম 'নমঃ শিবায়'। তাহারাই প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, যাহারা প্রেমাশ্রু-বিগলিত নয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে উচ্চারণ করে 'নমঃ শিবায়'।[৮]

---

৫ কুট্রনী গুণঙ্গনী কূডলালবায়িলায়্
চুট্রনী পিরাঙ্গনী তোডরন্দিলঙ্গু জোতিনী
কট্রনূল্ করুত্তু্নী অর্থম্ ইন্বম্ এণ্ডি্বৈ
মুট্র্নী পুকলন্দুমুন্ উরৈপ্পদেন মুকম্মনে।

৬ বুদ্ধরোডু পোরিয়িল্ চমণুর্ পুরুক্কু্রন্ এরিনিল্লা
ওত্তচোল্ল উলগম্ বলি তেরুন্দু এনদু উল্লম্বর্ কল্বন্
মত্তয়ানৈ মরুক উরিপোর্ত্ত তোয়্মায়ন্ মিহুবেরূপ্‌
পিত্তর্‌পোলুম্ ব্রহ্মাপুর মেবিয় পেম্মান্ ইবনণ্ডে্।

৭ মন্ত্রের মহাশক্তি পবিত্র ভস্মে। স্বর্গবাসী দেবগণও ইহা ব্যবহার করেন। সৌন্দর্য-বিধায়ক মহাস্তত্য এই বিভূতি। তন্ত্রের মহিমা ধর্মের গরিমা এই বিভূতির মধ্যে—যে বিভূতি পরিধান করেন রক্তাধরউমাদেহধারী (অর্ধনারীশ্বর) আমার প্রভু নীলকণ্ঠ।

৮ কাদলাকিক্ কচিন্দু কমনীর্ মল্‌কি
ওদুবার্ তমৈ নন্নেরিক্কু উয়প্পদু
বেদনান্‌কিন্ উমৈয়্‌প্‌ পোরুল্ আবদু
নাথনাম 'নমঃ শিবায়' বে।

'তেবারম্'-এর দ্বিতীয় কবি—অপ্পর্ যিনি বয়সে প্রবীণ এবং কীর্তিতে অগ্রণী হইয়াও সম্বন্ধর্-কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। অপ্পর্-এর এই শ্রদ্ধার মূলে দুইটি কারণ থাকিতে পারে—(১) সম্বন্ধর্-এর অসামান্য প্রতিভা, (২) অব্রাহ্মণ বেল্লাল-কুল-জাত অপ্পরের স্বাভাবিক দৈন্যবোধ। প্রথমোক্ত কারণটিই আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সম্বন্ধর-ও যে অপ্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাহা বোঝা যায় প্রবীণ কবিকে নবীন কবির পিতৃ-সম্বোধন হইতে। তাঁহার এই 'অপ্পা' (পিতা) সম্বোধনই কালক্রমে প্রবীণ কবির পূর্বনামকে[১] পিছনে ফেলিয়া 'অপ্পর্' নামটিকেই কালজয়ী করিয়া তুলিয়াছে।

এই দীর্ঘায়ু শৈবকবি কিন্তু প্রথম জীবনে ছিলেন একজন প্রধান জৈনাচার্য। পিতৃমাতৃহীন অপ্পর্ যখন তাঁহার কুলধর্ম (শৈবধর্ম) পরিত্যাগ করিয়া যৌবনে জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন সব চেয়ে বেশি আঘাত পাইয়াছিলেন তাঁহার দিদি তিলকবতী। আবার যেদিন কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জৈনাচার্য ধর্মসেন (জৈনাশ্রমে ইহাই ছিল অপ্পরের নাম) সংসারে তাঁহার একমাত্র আশ্রয় দিদির কাছে চলিয়া আসেন, সেদিন এই একাকিনী কুমারীর আনন্দের সীমা ছিল না। জৈনগণ ধর্মসেনের ধর্মপরিবর্তনে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মার কাছে অভিযোগ করিলে ধর্মসেন কারারুদ্ধ হন। কিন্তু শিবের ঐকান্তিক অনুগ্রহে ধর্মসেন (অপ্পর্) কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া রাজা মহেন্দ্রবর্মাকে শৈবধর্মে দীক্ষিত করেন। তামিলনাডের চোল রাজবংশ বরাবরই শৈব ছিল। পাণ্ড্যরাজ- ও পল্লবরাজ-বংশকে জৈনধর্ম হইতে শৈবধর্মে আনয়ন করেন যথাক্রমে সম্বন্ধর্ এবং অপ্পর্। এইভাবে সপ্তম শতাব্দী শেষ না হইতেই সমগ্র তামিলনাডে শৈবধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

(ক্রমশঃ)

---

১ কবির পূর্বনাম ছিল তিরুনাবুক্করস্ অর্থাৎ রসনা-ধিপতি—ইহাও প্রকৃত নাম বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয় কবি-কীর্তির জন্যই হয়তো তাঁহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অস্ফুট স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

সে অনেক দিনের কথা—বোধ হয় ১৯১৯ বা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইবে, অনেকটা শরীর সারিতেই ৺কাশী গিয়াছি। তীর্থদর্শনাদি বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য উহার সহিত ছিল না। বাঙালী-টোলায় থাকিতাম ও রোজই সকালে ও বৈকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াইতাম।

একদিন এইরূপ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার একরূপ সহপাঠী দুইটি বন্ধুর সহিত দেখা হইল। পরস্পর কুশলাদি প্রশ্নের পর একটি বন্ধু হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি এখানে রামকৃষ্ণ মিশনে যাও নাই?' 'না' বলায় 'উহা বেশ জায়গা, একদিন অবশ্যই যাইও। আমরাও সেখানে প্রায়ই যাই ইত্যাদি' বলিতে লাগিলেন। অপর বন্ধুটি বলিলেন, 'হাঁ হে, সেখানে একজন America-returned (আমেরিকা-ফেরত) সাধু আছেন, সেখানে গেলে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারিবে।' শেষোক্ত বন্ধুটির কথায় একটু হাসিলাম, উহা যে আমার পক্ষে একটি বড় প্রলোভন নহে, তাহাও তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইলাম। কিন্তু বন্ধুগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহাদের নির্বন্ধাতিশয়ে অবশেষে সেই America-returned সাধুটির নিকটে যাইতে হইল। ইনিই স্বামী তুরীয়ানন্দ বা শ্রদ্ধেয় হরি মহারাজ।

যে দিন তাঁহার নিকটে প্রথমে যাই, বেশ মনে পড়ে, সে দিন সেখানে উভয় আশ্রমের (রামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম) অনেক সাধুকেই দেখিয়াছিলাম, সন্দিগ্ধ মনে তাঁহাদের অনেকের প্রতিই সে দিন ভক্তি হয় নাই ও সঙ্গের বন্ধুটি একে একে সকলের পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেও উঁহাদের দু-এক জনকেই আমি সে দিন প্রণাম করিয়াছিলাম।

কিন্তু সেবাশ্রমের এক কোণে অবস্থিত 'অম্বিকাধামে' যখন এই মহাপুরুষকে প্রথম দর্শন করিলাম, তখন তাঁহার সৌম্য মূর্তি ও মধুর বাক্যালাপ শুনিয়া মাথাটি আপনিই সেখানে নত হইয়া পড়িল। তারপর বন্ধুটির বিশেষ আগ্রহে ও উক্ত মহাপুরুষের অপার স্নেহে প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নিকটে যাইতে হইত। তিনিও আমার সর্ববিধ কথা অতি মনোযোগ সহকারে শুনিতেন ও আমার বালকোচিত চাপল্যের কথা শুনিয়া কখনও খুব হাসিতেন, কখনও বা তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া আমার ভুলগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপেই মনে পড়ে, একদিন যখন বৈকালে তাঁহার সহিত বেড়াইতেছি, তখন ৺কাশীতে বহু লোকের সমাগম দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখ, দেখ, ইহাদের কি ভক্তি, আজ পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হইবে, তাই কত ক্লেশ সহ্য করিয়া কত দূর দেশ হইতে আসিয়া ইহারা এখানে সমবেত হইয়াছে। গ্রহণের সময়ে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া ইহারা ভগবানের নাম করিয়া ধন্য হইবে।'

আমরা তখন কিছু কিছু ইংরেজী বই পড়িয়াছি। ভূগোলে গ্রহণের বিষয়ে যাহা লেখে, তাহাও শিখিয়াছি। সুতরাং মহারাজের ঐ কথায় হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'মহারাজ, উহা তো কুসংস্কার, রাহু তো চন্দ্রকে গ্রাস করে

না। পৃথিবীর ছায়াই চন্দ্রের উপর পড়ে বলিয়া আমরা চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাই। এই কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া লোকে স্নান করিবে ও তাহাদের পুণ্য হইবে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব?' মহারাজও হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'দেখিতেছি, তুমি সবই জানিয়া ফেলিয়াছ।' তার পরদিন তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সস্নেহে বলিলেন: দেখ, গ্রহণ-বিষয়ে কাল তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, উহার একটি অর্থ আছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা নির্লোভ ছিলেন। কোন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রের ভিতরে ঐ সকল পুণ্যার্জনের কথা ঢুকাইয়া দেন নাই। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল, সকলেই ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সকলে তো তাহা একরূপে পারে না—উহারও অধিকারী-ভেদ আছে। সেজন্য আমাদের শাস্ত্র তিন প্রকারের বিধি নির্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা উত্তম অধিকারী তাঁহাদের বলিয়াছেন, প্রতিদিন কষ্ট স্বীকার করিয়াও ভগবানের নাম কর, উহাতে শান্তি পাইবে—উহাই 'নিয়ম-বিধি'। উত্তম অধিকারিগণ ঐ নির্দেশ পাইয়াই প্রতিদিন ভগবানের নাম করিতেছেন। যাহারা তাহা পারিতেছে না, তাহাদের জন্য 'মোদ-বিধি' অর্থাৎ আনন্দ-দায়ক কিছু তাহাদিগকে দিয়া ভগবানের দিকে তাহাদের মন নিয়োজিত করিতে প্রবৃত্ত করিতেছেন। আর উহাতেও যাহারা ভগবানের নাম করিবে না, তাহাদের জন্য 'দণ্ড-বিধি' বা নরকাদির ভয় দেখাইতেছেন। গ্রহণ-স্নানে পুণ্য সঞ্চয় করা বা অক্ষয় স্বর্গলাভ ঐ মোদ-বিধির অন্তর্গত। তবুও উহার লোভে এই সকল লোক কিছুটা ভগবানের নাম করিবে—ইহাই শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নহে।

আর একদিন মনে পড়ে—গঙ্গাস্নানের কথায় একটু হাসিয়া মহারাজকে বলিয়াছিলাম, 'মহারাজ, গঙ্গাস্নান করিলে বিশেষ পুণ্য কেন হইবে? গঙ্গা তো নদী মাত্র। আর এ কাশীর গঙ্গাকে তো নদীও বলা যায় না'—শীতকাল, তখন গঙ্গায় কোন স্রোত ছিল না। মহারাজ ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন ও বলিলেন, 'দু-এক পাতা ইংরেজী পড়িয়া তোমরা গঙ্গাকে এইরূপ অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছ! কিন্তু যাঁহাদের বই পড়িয়া তোমরা এইরূপ শ্রদ্ধাহীন হইয়াছ, জানো—স্বামীজী তাঁহাদের মাথায় কিরূপ আঘাত করিয়া আসিয়াছেন? তিনিও এই গঙ্গার স্তব করিতে করিতে কিরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন! আর শুধু তিনি কেন, আচার্য শঙ্কর হইতে কে না এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, শ্রদ্ধাবান্ হও।'

পূজনীয় মহারাজের পুণ্যসঙ্গকালে একদিন তিনি বলিলেন, 'তুমি কি গীতা পড়িয়াছ? কাল হইতে আমরা ইঁহার (তাঁহার নিকট উপবিষ্ট নড়াইল কলেজের অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত) সহিত গীতা পড়িব, তুমিও ইচ্ছা করিলে উহাতে যোগ দিতে পারো।' সানন্দে আমি ইহাতে সম্মতি দিলাম ও তাঁহার শরীর অতিশয় অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তার পরদিন হইতে তিনি গীতা পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। গীতা পূর্বে কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই জ্ঞান-তপস্বীর মুখে উহা নূতন আকার ধারণ করিল, সাধারণতঃ তিনি কোন ভাষ্য বা টীকার উল্লেখ করিতেন না, সরল সহজভাবে তিনি উহা ব্যাখ্যা করিতেন, কিন্তু যেখানে প্রয়োজন হইত, তিনি মুখে মুখে শঙ্কর বা শ্রীধরের মতামত উল্লেখ করিতেন। ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে আমাদের পাঠ আরম্ভ হইয়াছিল, উহা হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত পড়াইয়া পরে প্রথম হইতে পঞ্চম

অধ্যায় পর্যন্ত পড়াইয়াছিলেন; যাহাতে আমরা আমাদের চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারি, ইহাই বোধহয় তাঁহার প্রথমে আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে পড়াইবার কারণ।

অপরিণত মনে তখন যে কি পড়িয়াছিলাম প্রায় কিছুই মনে নাই, তবে মনে হইতেছে মনঃসংযমের কথা উঠায় তিনি বলিয়াছিলেন, উহা খুবই কষ্টকর, তাই শ্রীভগবান্ ধীরে ধীরে মনকে বিচারাদির দ্বারা সংযত করিয়া আত্মসংস্থ করিতে বলিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমেরিকা হইতে একটি ভক্ত আমাকে এই বিষয়ে লিখিয়াছিল, আমি তদুত্তরে লিখিয়াছিলাম যে, যখনই ধ্যানে বসিবে, মনে করিবে—তোমার বুকের সামনে একটি 'No Admission' (প্রবেশ নিষেধ)-এর নোটিশ ঝুলিতেছে। ইষ্টচিন্তা ব্যতীত অন্য কিছুই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা হইলেই দেখিবে অন্য সব চিন্তা ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে। ভক্তটি লিখিয়াছে, সত্যই উহাতে সে অনেক উপকার পাইয়াছে। ঐ অধ্যায়েরই প্রথমে যখন 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং' পড়িতেছিলাম, তখন অতি গম্ভীর স্বরে উদাত্ত সুরে তিনি উহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাহার পর অনেক দিন পর্যন্ত যখনই তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিয়াছি, তখনই ঐরূপ সুরেই উহা আবৃত্তি করিয়া বলিতেন, 'হাঁ, এইরূপেই নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, তুমি ছাড়া তোমার উদ্ধারকর্তা আর কেহ নাই।'

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে একদিন বাহির হইতে তাঁহার নিকটে কিছু সদুপদেশ লইতে আসিয়াছিলাম, দেখিলাম তিনি অদ্বৈতাশ্রমের গেট দিয়া বাহিরে যাইতেছেন, প্রণাম করিতেই বলিলেন, 'কি প্রয়োজন?' মনের আকূতি জানাইলে বলিলেন, 'আগে চোখ খোল, পরে চশমা দেওয়া যাইবে, পূর্বে চশমা দিয়া তো কোন লাভ নাই'। এই পুরুষকারের উপরেই তিনি পুনঃ পুনঃ জোর দিতেন।

আর একবার যখন তাঁহার আদেশে কলিকাতায় যাইয়া আমার পাঠ সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন আবার যাহাতে কোন বন্ধনে না পড়ি, সেজন্য তাঁহার নিকটে আশীর্বাদ চাহিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'বন্ধন মনে করিলেই তো বন্ধন, নতুবা কে তোমায় বাঁধে? তুমি তো সদাই মুক্ত।'

এইরূপে নানাভাবে তিনি আমাদের গীতা পড়িতে উৎসাহ দিলেও সব সময়ে উহা যে গম্ভীরাত্মক হইত—তাহা নহে। খুব সম্ভব পঞ্চদশ অধ্যায় পড়াইবার সময়ে নির্মম হইয়া সংসারবৃক্ষ ছেদনের কথা উঠিতেই তিনি কৃত্রিম গাম্ভীর্য দেখাইয়া বলিলেন, 'না না……, এখানটি তুমি পড়িও না।' আমি অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন মহারাজ!' তদুত্তরে তিনি সেইরূপ গাম্ভীর্য দেখাইয়া বলিলেন, 'এ যে বৈরাগ্যের কথা, ইহা কি পড়িতে আছে?' আমি হাসিয়া ফেলিলাম, তিনিও তাঁহার স্বভাবোচিত উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন, তখন জানিতাম না যে, এইরূপে তিনি আমাদের ভিতরে বৈরাগ্যের বহ্নি জ্বালাইয়া দিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী *

স্বামী মাধবানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা এবং সমগ্র জগতে তাঁর বিরাট দানের প্রতি আজকাল আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যায়, সমগ্র জগতে তাঁর কার্য এবং বক্তৃতাবলীর ব্যাপক প্রভাব। তরুণ বয়স থেকেই আমি স্বামীজীর বিষয় ব'লে আসছি; কিন্তু যতই বয়স হচ্ছে ততই বুঝছি যে, তাঁর থেকে বিচ্ছুরিত প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি অনুধাবন করা আমার পক্ষে অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। বর্তমানে তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু বলা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার, কারণ অন্যান্য ব্যক্তি ও তাঁর মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান দেখা যায়।

জগতে বহু বড় বড় আধ্যাত্মিক নেতা হয়েছেন; সাধারণতঃ ভারতবর্ষে চিরকালই অগণিত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই মহাপুরুষ উচ্চতম পর্যায়ের এবং তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন এক অতুলনীয় কার্যকারিতার মাধ্যমে। ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এরূপ একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যিনি সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ ক'রে তার স্বর্গীয় আনন্দে ডুবে না গিয়ে জগৎকে ভালবেসেছেন এবং নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছেন স্বদেশে ও বিদেশে মানুষের দুঃখভার লাঘব করবার জন্য।

১৮৬৩ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ—মাত্র এই ৩৯ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর এই অল্প আয়ু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভবিষ্যৎ ছিল যেন খোলা বই। যা হোক, তিনি জানতেন—বিবেকানন্দ স্বরূপতঃ কে এবং কেন এসেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তখন পাশ্চাত্যের জড়বাদ ভারতের বুকে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করছিল এবং সে-যুগে তাঁর মতো প্রতিভাবান্ কলেজ-যুবকের পক্ষে একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যারিস্টার বা বড় রাজনৈতিক নেতা হওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা দিল একটা বিরাট পরিবর্তন—তিনি রাতারাতি একজন উচ্চ স্তরের সাধকে পরিণত হলেন এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিলেন—এটা সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার! শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে, তাঁর প্রিয় শিষ্য মহান্ ঋষিদের মধ্যে একজন এবং তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব জগতে প্রচার করবার জন্য জগন্মাতা তাঁকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন স্বামী বিবেকানন্দকে।

সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দকে একবার মাত্র দর্শন ক'রে (তখন তাঁর নাম ছিল 'নরেন্দ্রনাথ' অথবা সংক্ষেপে 'নরেন') শ্রীরামকৃষ্ণ 'ঐ নরেন আসছে' ব'লে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। কখন কখন তিনি পুরা নাম উচ্চারণ করতে পারতেন না—'ঐ ন, ন, ন—আসছে' ব'লে সঙ্গে সঙ্গে সমাধিতে মগ্ন হতেন। কখন কখন

* হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে, ১৯৫৬, ১২ই ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত বক্তৃতা: Vedanta and the West পত্রিকার ১৯৫৯ খৃঃ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ কর্তৃক অনূদিত।

স্বামীজীকে একটু স্পর্শ করেই তিনি সমাধিস্থ হতেন অথবা তাঁর গানের দু-এক কলি শুনে তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে পৌঁছে যেতেন। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, স্বামীজী কিরূপ পবিত্র উপাদানে গঠিত ছিলেন।

সেই পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত যুগে তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা; উপরন্তু তিনি গতানুগতিক ছিলেন না। এমন কি গোঁড়া হিন্দুরা যা খায় না, তাও তিনি খেতেন। তা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, সে প্রাচীন সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ, প্রাচীন ভারতের ঋষি—জগতের হিতের জন্য মানবদেহ ধারণ ক'রে এসেছে এবং ঠিক সেই ভাবেই তিনি তাঁর শিষ্যকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

কলকাতার কাছে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের শেষ অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, 'আমার ইচ্ছা হয়, শুকদেবের মতো একেবারে পাঁচ-ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু জীবনরক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।'

যাঁরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পড়েছেন, তাঁরা জানেন, কেউ ঈশ্বরানুভূতির কথা জিজ্ঞাসা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ রোমাঞ্চিত হতেন। ঈশ্বরের ব্যক্তিভাবাপন্ন দিকটির অনুভূতি লাভ করাও মানুষের পক্ষে একজীবনে সম্ভব নয়—জন্ম-জন্মান্তর লেগে যায়। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের সর্বোচ্চ অনুভূতি চাইলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ছি, ছি, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! বহুজনের হিতের জন্য তোকে আত্মবিসর্জন করতে হবে,—সে অনুভূতি এই স্বার্থপূর্ণ নিম্ন পর্যায়ের অনুভূতি অপেক্ষা মহত্তর। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না, তুই কি না শুধু নিজের মুক্তি চাস! সুতরাং জগৎ ভুলে ঐ নির্বিকল্প সমাধির কথা তুই মনে আনিস না; বরং জগৎকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ কর্। সমাধি তোর করায়ত্ত; তুই মায়ের কর্মী—মায়ের সেবক হবি। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল; যখন সময় হবে—যখন তুই তাঁর (জগন্মাতার) কাজ শেষ করবি, তখন ঐ চাবি তোকে ফিরিয়ে দেবো। —প্রকৃত-পক্ষে ঘটনা এইরূপই ঘটেছিল।

তাই মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে প্রথম যৌবনেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় এসেছিলেন; এবং এর পূর্বেই তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। কাশীপুরের বাগানেই একদিন তিনি জাগতিক সত্তা, ব্যক্তিগত সত্তা ভুলে গিয়ে গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়েছিলেন। যখন তিনি ক্রমশঃ স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ করছিলেন, তখনও তিনি দেহের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারেননি। ঘটনাটি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'বেশ হয়েছে, থাক্ খানিকক্ষণ ঐ রকম হয়ে। ওরই জন্য সে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুলেছিল। এতে ওর কোন ক্ষতি হবে না।'

স্বামীজীর জীবন এইভাবে গড়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে কেউ যদি জগতের কল্যাণ করতে চান, তবে তাঁকে সরাসরিভাবে ভগবানের আদেশ পেতেই হবে। যে পর্যন্ত না তিনি এই আদেশ পাবেন, ততক্ষণ তাঁর প্রকৃত শক্তি হয়নি; কারণ এই জগৎ আলোড়নকারী শক্তি একমাত্র ভগবানেই নিহিত। কেউ যদি অন্তরঙ্গভাবে ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করে, তবে তার মধ্যে সেই শক্তির প্রকাশ হয়; স্বামীজী স্পর্শ করেছিলেন, তাই তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে স্বামীজী বেদান্তের অর্থ ও লক্ষ্য দুই-ই দেখেছিলেন। বিশ্ব এক, এবং এতে সেই এক ভগবানেরই বিভিন্ন প্রকাশ। সূর্যকে যেমন ঘন বা পাতলা মেঘাবরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রকম দেখায়, সেইরূপ মানুষে মানুষে, পুরুষে স্ত্রীতে, মানুষে পশুতে এবং অন্যান্য বস্তুতেও বিভিন্ন রকম দেখা যায়। সুতরাং তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, কোন মানুষের স্বকীয় চিন্তাধারা পালটানো যুক্তিসঙ্গত নয়। এ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই অনুসৃত রীতি—স্বামীজী তারই অনুসরণ করেছিলেন; আর তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখপাত্রস্বরূপ। ভারতের ধারাবাহিক চিন্তাধারার ঐতিহ্য অনুসরণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ জেনেছিলেন, বিভিন্নরূপে সেই একই সত্য প্রকাশিত হচ্ছে। সকল ধর্মই সেই জ্যোতির্ময় সত্যে পৌঁছবার এক একটি পথ। কারও পক্ষে নিজের পথ পরিবর্তন করা ঠিক নয়; যেমন বৃত্তের ব্যাসার্ধগুলি সব একই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলেছে, সেইরূপ যে-কোন পথ দিয়ে আন্তরিকভাবে অগ্রসর হ'লে সেই একই লক্ষ্যে অর্থাৎ একই ঈশ্বরে পৌঁছনো যায়।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিতে দেবদেবীর বহু মূর্তি থাকে এবং ঐগুলি প্রধান মূর্তির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রধান মূর্তি মন্দিরেই থাকে এবং অন্যান্য মূর্তিগুলিকে সারা শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিভূস্বরূপ ছিলেন এবং সারা বিশ্বে তাঁর বাণী বহন করবার জন্য এবং শিক্ষাবলী বিলোবার জন্যই এসেছিলেন। তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে প্রিয়তম গুরুর প্রতিনিধিই মনে করতেন। সেই হেতু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাবলীর মধ্যে কোনই পার্থক্য দেখা যায় না; যদিও বক্তৃতাকালে শ্রোতাদের প্রয়োজনানুসারে স্বামীজী ঐগুলি নিজের কথায় প্রকাশ করেছেন। মূলতঃ ঐ শিক্ষাগুলি এক: 'তুমি আত্মা-স্বরূপ, তুমিই সেই সর্বশক্তিমান্ আত্মা। তুমি তোমার স্বরূপ জানবার চেষ্টা কর। তোমার ভিতর যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু রয়েছে, তা প্রকাশ কর। ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্য তোমার মূল্যবান্ জীবন অপচয় ক'রো না; বরং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন কর। এই জগতে এই জীবনেই নিজেকে সেই আত্মস্বরূপে অনুভব কর।' —এই সেই বাণী।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন সাকার উপাসনায় এবং নিরাকার ভাবে সেই একই ঈশ্বরকে দর্শন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও এই একই অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। সুতরাং স্বামীজীর বাণী ও রচনাতে সেই মহান্ সত্য বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে—নিজেকে পূর্ণ বা শুদ্ধ করবার জন্য বাইরে থেকে কোন জিনিস আনতে হবে না; তুমি তো পূর্ণ আছই, তুমি কেবল তোমার স্বরূপকে প্রকাশ কর, তোমার ভিতর যে দেবত্ব আছে, তা বিকশিত কর।

ধর্মব্যাপারে আমাদের এবং অপরের মধ্যে যে অনৈক্য দেখা যায়, তার কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন যে, এই পার্থক্যগুলি সেই একই সত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। এই মতটিকে তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছেন: মনে কর, তুমি একটি ক্যামেরা নিয়ে সূর্যের দিকে এগোচ্ছ এবং প্রতি পদক্ষেপে একটি ক'রে ছবি তুলছ; যদিও ছবিগুলি সেই একই সূর্যের রূপ প্রকাশ করছে, তথাপি দুটি ছবি কখনই একরূপ হবে না। আমাদের মনগুলিকে সেইরূপ বিভিন্ন ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যার দ্বারা আমরা প্রতিনিয়তই সেই অনন্তকে—আত্মাকে,

মানুষের অন্তর্নিহিত স্বরূপকে ছবিতে ধরবার চেষ্টা করছি। স্বভাবতই আমাদের মনের গঠন অনুযায়ী কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের স্তর অনুযায়ী ছবিগুলিকে সামান্য পৃথক্ দেখায়; তথাপি তারা একই বস্তুকে, একই সত্যকে, সেই একই আত্মাকে প্রকাশ করে। সুতরাং নিজের ধর্ম পরিবর্তন করা বা অপরকে নিজের ধর্মে আনবার চেষ্টা করা একেবারেই অযৌক্তিক। নিজ নিজ কর্মস্থানে প্রত্যেকেই মহৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: আন্তরিকভাবে এবং দৃঢ়ভাবে সত্যকে অনুসরণ কর: এমন পথ বেছে নাও, যা তোমার অন্তর সবচেয়ে বেশী স্পর্শ করে এবং তুমি নিজেকে যে পথের উপযুক্ত মনে কর। যদি তুমি আন্তরিক ভাবে ঐ পথ অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্যে পৌঁছবে।

স্বামীজীও ঠিক একই কথা বলেছেন—তাঁর মন ছিল ব্যাপক এবং বিশাল; সেইজন্য তিনি প্রত্যেক দেশের লোকের বোধগম্য ভাষায় বলতে পারতেন। অবশ্য অধিকারী-ভেদে তাঁর বলার ভঙ্গি ছিল পৃথক্, এবং তিনি লোক বুঝে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু লক্ষ্য ছিল একই—মানবজাতিকে স্বরূপোপলব্ধির চেষ্টা করানো, পরস্পরকে জানবার এবং বাঁচবার মতো পথ দেখিয়ে দেওয়া।

ভারতে যেখানেই তিনি দারিদ্র্য ও ব্যাধি দেখতেন, সেখানেই তিনি সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করতেন। আর তিনি যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ড (দর্শন-ভাগ) অর্থাৎ বেদান্তের সেই চরম সত্যই প্রচার করেছেন; কারণ আমেরিকার সরকার জন-সাধারণের ঐহিক বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই আমরা স্বামীজীকে বলতে দেখি, 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিতর, ভারত এবং আমেরিকার ভিতর আদর্শের আদান-প্রদান হোক, যাতে উভয় দেশই লাভবান্ হয়।' তিনি লক্ষ্য করে-ছিলেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারত অতুলনীয় আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী এবং আমেরিকাও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের চরম শিখরে উন্নীত। তিনি চেয়েছিলেন, ভারত আমেরিকার কাছে বিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষা করুক, আর পাশ্চাত্যেরা প্রাচ্যের শক্তিশালী আধ্যাত্মিক ভাবধারা গ্রহণ করুক।

আমি মনে করি, সে দিন নিশ্চয়ই আসবে, যে দিন বিনা-সন্দেহে ও নিঃসংশয়ে ভারত আমেরিকার সাথে, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সাথে হাত মিলাবে এবং উভয়ে মহত্ত্বের শিখরে উঠবে। আমরা উভয়েই সমভাবে অনুভব করি যে, মূলতঃ আমরা এক; আমরা অপরের অশুভ চিন্তা করতে পারি না, বা অপরকে ভয়ও করি না। যীশুখৃষ্ট যখন বলেছিলেন, 'প্রতি-বেশীকে নিজের মতো ভালবাস'—তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে একটা সহজ সত্য কথাই বলে-ছিলেন; এ কোন আলংকারিক ভাষা নয়। বাস্তবিক এ সেই মহান্ সত্য যে, এক আত্মাই সর্বত্র প্রকাশিত—যেমন একই সূর্য অসংখ্য জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের একাগ্র মন তাঁকে উচ্চাঙ্গের আচার্যে পরিণত করেছিল এবং তাঁর নিজের জীবন ছিল তাঁর শিক্ষারই অনুযায়ী; তাই লোকে অধিকারী পুরুষের প্রদত্ত শিক্ষার মতো তাঁর শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রত। ভারতেও তিনি কখন কখন সর্বধর্মের ঐক্য প্রচার করতেন। এখনও আমরা প্রায়ই দেখি, লোকে প্রাচীন ঋষিদের সত্যকার বাণী বুঝতে পারে না। এক-ধর্মাবলম্বী লোকেরা অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হিংসা করে। কিন্তু সকলের প্রতি

স্বামীজীর উপদেশ ছিল : 'তোমরা ধর্মের নির্দিষ্ট বিধিগুলির গভীর অনুশীলনে যত্নবান্ হও; তা হ'লে দেখবে, শেষে কোনই পার্থক্য নেই। তাঁর একটি প্রিয় দৃষ্টান্ত ছিল—মাটির ইঁদুর ও মাটির হাতী। স্বভাবতই এদের পৃথক্ দেখায়; এরা যে পৃথক্, তা একটি শিশুও বলবে, এটা একটা ইঁদুর, ওটা একটা হাতী। কিন্তু উভয়ে একই মাটির তৈরী; সেইরূপ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে, উত্তরে ও দক্ষিণে, পুরাতনে ও নূতনে, পুরুষে ও স্ত্রীতে – কোনই পার্থক্য নেই। সকল পার্থক্য কেবল বাইরে; মূলতঃ কোনই অসঙ্গতি নেই। কেবল প্রকাশের তারতম্য —স্তরভেদ। সেই একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। বালক যুবকে, যুবক বৃদ্ধে পরিণত হয়; কিন্তু আমরা কখন বলি না যে, যৌবন শৈশবের বা বার্ধক্য যৌবনের বিরোধী; এই অবস্থাগুলি স্বাভাবিক পরিণতি। সুতরাং আবরণ সরিয়ে যে-পরিমাণে আমরা আমাদের ভিতরের শক্তি প্রকাশ ক'রব, সেই অনুপাতে আমাদের ভিতর যে-বস্তু সঞ্চিত রয়েছে, তারও অভিব্যক্তি ঘটবে।

এই সর্বজনীন মর্মস্পর্শী বাণীই স্বামী বিবেকানন্দ জগতে প্রচার ক'রে গেছেন। এই বাণী তিনি লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে; কিন্তু তাঁকে তিনি নিজের কঠোর সাধনা এবং প্রবল মননশক্তির দ্বারা সঞ্জীবিত করেছিলেন, নতুবা তা অত শক্তিশালী হ'তে পারত না।

স্বামীজীর হৃদয় ছিল তাঁর বুদ্ধির মতোই বিশাল, অধিক বললেও অত্যুক্তি হবে না। পতিত, দুর্বল, অজ্ঞ—সকলকেই তিনি ভালবাসতেন। বিশেষতঃ তাঁর ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, দুঃখভারে জর্জরিত, রুগ্ন, অজ্ঞ, উৎপীড়িত ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। তাঁরই অমোঘ আশীর্বাদে রামকৃষ্ণ মিশন মানবজাতির কিঞ্চিৎ সেবা করতে সমর্থ হয়েছে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে।

একদিকে ভগবান বুদ্ধ আমাদের যা দিয়ে গেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ ক'রে দিয়েছেন। ভগবান বুদ্ধের ছিল উদার করুণাপূর্ণ হৃদয়; কিন্তু আমরা মানবজাতির কল্যাণ কেন ক'রব, তা তিনি ব'লে যাননি। স্বামীজী কেবল দর্শনই প্রচার করেননি, ঐ উচ্চ আদর্শগুলির ব্যবহারও তিনি দেখিয়ে গেছেন, যাতে সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। এও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের প্রাচীন একটি উপদেশ উদ্ধৃত ক'রে বলছিলেন, 'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন'—তখনই সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, 'জীবে দয়া!—কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা!'

তিনি এই 'সেবা' কথাটি গভীর অনুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন; কিন্তু ঐ কথাটির আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কখন কখন নষ্ট হয়ে গেছে। 'সেবা' কথাটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নিজেকে ছোট ক'রে অপরকে (সেব্যকে) উচ্চ আসন দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই সেবাও পৃথক্ হয়ে যায়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যদি কোন দেবতার পূজা করা হয়, তবে তার উপকরণও ঐ নির্দিষ্ট দেবতার অভিপ্রেত হ'তে হবে। শিবপূজার সময় আমরা বিশেষ পূজার সামগ্রী ব্যবহার করি, যেমন বেলপাতা প্রভৃতি; কিন্তু ঐ সামগ্রীগুলির কোন প্রয়োজন থাকবে না, যখন আমরা বিষ্ণুর পূজা ক'রব, তখন

তুলসীপাতা বা অন্যান্য বস্তুর দরকার হবে। সেইরূপ সেই একই ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। যখন তিনি মূর্খ অজ্ঞ ব্যক্তিরূপে আমাদের কাছে আসবেন, তখন আমরা তাঁকে বিদ্যা দিয়ে পূজা ক'রব; যখন তিনি জরাজীর্ণ রুগ্ন ব্যক্তিরূপে আমাদের কাছে আসবেন, তখন আমরা তাঁকে ঔষধ দিয়ে সেবা ক'রব। ঠিক একইরূপে খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে আমরা সেই বিভিন্নরূপধারী ভগবানকে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপকরণ দিয়ে সেবা করতে পারি। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ দেখিয়ে গেছেন।

ভারতবর্ষে এখনও জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণেরা এদেশে উচ্চ জাতি ব'লে পরিগণিত এবং নিম্নশ্রেণী লোকদের অস্পৃশ্য ক'রে রাখা হয়েছে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাবহারিক দর্শন সেখানে দৃপ্তস্বরে ঘোষণা করেছে: যদি ব্রাহ্মণ-সন্তানের একজন শিক্ষক হ'লে চলে, তবে অস্পৃশ্যের সন্তানের জন্য চারজন শিক্ষক দিতে হবে; তার প্রয়োজন বেশী। সাধারণতঃ এ-কথা বুঝতে গেলে সাধারণ বুদ্ধিতে যেভাবে 'সাম্য' কথাটি বোঝা হয়, এ সে-রকম সাম্য নয়, একেই 'ব্যাবহারিক আধ্যাত্মিকতা' বলে। যেখানে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করবার জন্য বেশী সাহায্যের প্রয়োজন, সেখানে বেশী সাহায্য কর; কারণ ব্রাহ্মণ-সন্তান তার অন্তর্নিহিত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবেই; অন্যদিকে অপর ব্যক্তিটির সাহায্যের প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রথমে তাদের আবরণগুলি সরিয়ে দাও; কারণ ওখানে আবরণ ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। ক্রমশঃ সবাই এক স্তরে উন্নীত হবে।

স্বামীজী বেদান্ত উপলব্ধি করেছিলেন এবং জেনেছিলেন যে, প্রাচীন বেদের শিক্ষাগুলি বিজ্ঞানসম্মত। এমন কি, এই বিংশ শতাব্দীতেও বৈদান্তিক চিন্তাগুলি প্রকৃতপক্ষে এই মানব-সভ্যতার উপর শিকড় গাড়তে পারে; তিনি আমাদের এই প্রাচীন জ্ঞানের সঙ্গে ক্রমবিকাশ-বাদের সামঞ্জস্যের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের অ্যামিবা থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত—ডারউইনের যে ক্রমবিকাশবাদ, তা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন বেদান্তের আলোকে—সে ব্যাখ্যা ঐ ক্রমবিকাশবাদের বিপরীত। সত্যি কথা বলতে কি, কোন বস্তুরই প্রথম বা শেষ নেই। একটি অসীম শৃঙ্খলে যদি পর্যায়-ক্রমে সাদা এবং কালোর শিকলি থাকে, তবে ঐ শৃঙ্খলের যে-কোন জোড়া থেকে শুরু করলে তা হয় সাদা-কালো, সাদা-কালো অথবা কালো-সাদা, কালো-সাদা এইরূপই হ'তে থাকবে। সেইরূপ ঈশ্বর থেকে অ্যামিবা এবং পুনরায় অ্যামিবা থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত—সেই একই দেবত্বের শৃঙ্খল দেখা যাবে। পাশ্চাত্যের বিবর্তন-বাদীরা এক দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং নীচু থেকে উঁচু দিকেই গণনা শুরু করবেন। কিন্তু বৈদান্তিকেরা অন্য দৃষ্টিতে দেখবেন এবং বলবেন, এ-সব ঈশ্বর থেকে নিম্নগামী। বাস্তবিক এটি একটি শৃঙ্খল। অবশ্য ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ পর্যায়ক্রমেই চলতে থাকে। আমাকে এই দৃষ্টান্তটি দিতে হচ্ছে, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন গভীর সর্বতোমুখী উচ্চ পর্যায়ের আচার্য, যিনি মেটাতে পারতেন মানবজাতির অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মপিপাসা—সে প্রাচ্যেরই হোক আর পাশ্চাত্যেরই হোক।

যদি সত্যি কেউ স্বামীজীর শিক্ষা থেকে

লাভবান্ হ'তে চান, যদি কেউ এই বিশ্বে নিজের জীবনকে ফলপ্রসূ করতে চান, তবে তাঁর মহান্ শিক্ষাগুলি নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করুন। গীতা বা তারও পূর্ববর্তী সময় থেকে এ-কথা প্রশংসিত হয়ে আসছে যে, 'নিঃস্বার্থ হয়ে কর্তব্য কর্ম কর'। আধ্যাত্মিক পটভূমিকা নিয়ে হৃদয়ের অন্তঃস্থল দিয়ে জানো যে, তুমি বিভিন্ন বেশধারী ভগবানের সেবা ক'রছ—তা সংসারে বা সমাজেই হোক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, স্বদেশে বা বিদেশেই হোক। যদি তুমি কর্মমাত্রকে পূজার মতো ক'রে কর, তা হ'লে যে শুধু কর্মগুলিই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হবে তা নয়, পরন্তু তোমার শক্তিও বিকশিত হবে।

আমি মনে করি, এই বর্তমান কলহসঙ্কুল জগতে মানবজাতির মধ্যে ঐক্য ও সদিচ্ছা প্রচারের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী অমোঘ। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের বিশ্ববরেণ্য নেতারা অন্যান্য ব্যাপারে লিপ্ত থাকার দরুন তাঁর শিক্ষাবলীর প্রতি খুব কমই দৃষ্টিপাত করেছেন। তাঁরা যদি স্বামীজীর ঐ শিক্ষাগুলিকে দৈনন্দিন সমাজ-জীবনে প্রয়োগ করতে পারতেন, তবে আমাদের জীবন ঐক্যপূর্ণ ও মধুময় হয়ে উঠত। এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু করবার আছে—আমাদের মর্মস্থল থেকে তাঁর বাণী ও শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি ক'রে ঐ গুলিকে জীবনে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করতে হবে। এইরূপে ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হ'লে দেখা যাবে যে, এই চিন্তা জড়বস্তু অপেক্ষা কত শক্তিশালী এবং যতই আমরা তীব্রতররূপে ঐগুলি অনুভব ক'রব এবং ঐগুলিকে ভিত্তি ক'রে কর্মে প্রবৃত্ত হবো, ততই আমরা ঐ চিন্তারাশির শক্তি বিকীর্ণ করবার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ 'নিজে দেবতা হও; এবং অপরকে দেবত্বে উঠতে সহায়তা কর।' আমরা দেবতা; আমরা ব্রহ্ম—কিন্তু আবৃত। আমরা নিজেরাই নিজদিগকে সম্মোহিত ক'রে রেখেছি; সুতরাং এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য নিজদিগকে মোহমুক্ত করা। বাইরে থেকে কোন জিনিস যোগ করতে হবে না, কারণ আমরা পূর্ণ-ই হয়ে রয়েছি। 'তত্ত্বমসি'—অর্থাৎ নিজের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও যে, 'তুমি সেই'। যেই মোহাবরণ খসে পড়বে, অমনি আমরা যা ছিলাম, তাই হয়ে যাব। তখন এই আসা-যাওয়া অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর হাত থেকে পূর্ণ নিষ্কৃতি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভিত্তিহীন পার্থক্যগুলির দ্বারা আমাদের সর্বজনীন ঐক্যের পথে বিঘ্ন ঘটানো কখনই উচিত নয়। বিজ্ঞান জড়বাদের উপর ভিত্তি ক'রে এই বিশ্বকে মিলিত করছে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রায়ই ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। আধ্যাত্মিক ঐক্যই আমরা চাই, কারণ আত্মার ক্ষেত্রে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। এই বস্তুতান্ত্রিক জগতে কোন ব্যক্তির যতই বিষয়-সম্পত্তি থাকুক না কেন, তা অপরের তুলনায় সীমাবদ্ধ। অনেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে মনে করতে পারে যে, 'আমি এখনও যথেষ্ট সাম্রাজ্য অধিকার করতে পারিনি—অপরের রাজ্যও চাই।' এইভাবে আরও কত কি! কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনই সীমানা নেই। কোন পাখি আকাশে তার ইচ্ছামত যত উপরেই উঠুক না কেন, সে কখনও আকাশের ছাদে বাধা পাবে না। আধ্যাত্মিক পরিস্থিতিতেও সেই একই ব্যাপার—আমরা যতই এর গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ ক'রব, ততই বিশাল থেকে বিশালতর হবো এবং অবশেষে সমগ্র

মানবজাতিকে প্রেমে আলিঙ্গন করতে সমর্থ হবো।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আমাদের সকলের শিক্ষার আদর্শভূত। তাঁর বিঘোষিত বাণীর কিছু অংশও যদি আমরা জীবনে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করি এবং তিনি যে মহান্ সত্য প্রচার ক'রে গেছেন, তার সামান্য অংশও যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, তবে এই বিশ্বে আমাদের মানবজীবনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

রামভক্ত কবি তুলসীদাস কয়েকবার ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ দর্শন করেছিলেন, তিনি বলেছেন, 'যখন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন সে কাঁদে, কিন্তু জগৎ হাসে। আমাদের জীবন এরূপ হোক, যেন আমরা হাসিমুখে এ জগৎ থেকে বিদায় নিতে পারি এবং জগৎও যেন আমাদের জন্য কাঁদে।' স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে আমাদের এমন অমূল্য বস্তু দান ক'রে গেছেন যে, সেই বরণীয় ভাবে আমরাও আমাদের জীবন গড়তে পারি। ·· এই শুভ পুণ্য তিথিতে স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত মহান্ সংঘের পক্ষ থেকে বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর প্রেম, পবিত্রতা, সহৃদয়তা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী নিবেদন করছি।

স্বাগত বিবেকানন্দ

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

বিশ্বতোরণে বাজে দুন্দুভি খুলেছে অসীম জ্যোতির দ্বার,
নিখিল ধরার ধ্যানের বেদীতে জাগিল মধুর মুরতি কার?
বিশ্ববিজয়ী হে বীর কেশরী, স্বামীজী বিবেকানন্দ,
জগন্মাতার স্নেহের দুলাল, এসেছ নিখিলানন্দ!
হে যুগসূর্য! ভারত-আকাশে উদিয়া আবার ছড়াও আলো,
নব চেতনায় জাগাও সবারে ঘুচায়ে মোহের জড়িমা কালো।
ভেদের গরলে ব্যথা-জর্জর আর্ত ধরার বেদনা হর,
অশিব নাশিয়া এস শিব তুমি, সত্য ও শিব, শুভঙ্কর।
আলোক ভাবিয়া আলেয়ার পিছে দিশাহীন পথে চলেছি সবে
পথের দিশারী! পথ-নির্দেশ তোমাকে আবার দিতেই হবে।
নর-নারায়ণ ডাকিছে তোমারে, নর নারায়ণ মিলালে তুমি;
ধন্য হোক এ ধরণী তোমার ও-দুটি কমল-চরণ চুমি।
বিশ্ব-জুড়িয়া বাজে দুন্দুভি বজ্র-কণ্ঠ বাজিছে কার?
তথাগত যেই যুগে যুগে আসে, চিরাগত বাণী ধ্বনিছে তার।

সমালোচনা

The New English Bible: The New Testament—Published by Oxford Univ. Press and Cambridge Univ. Press (1961). Popular Edition Pp. 432. Price 8s. 6d. (Larger Library Edition with notes. Pp. 460. Price 21s.).

স্থানের ব্যবধানে যে ভাষার পরিবর্তন হয়, এ সত্য 'যোজনান্তরী ভাষা'—এই সংক্ষিপ্ত চিন্তা-সূত্রের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, কালের ব্যবধানেও যে ভাষা রূপান্তরিত হয়, তাহাও সমান সত্য; এখানেও বোধহয় আমরা অনুরূপ সূত্র রচনা করিতে পারি—'দশকান্তরী' না হইলেও 'শতকান্তরী ভাষা' তো বটেই।

যীশুখৃষ্ট যে চলতি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আজ কোথায় হারাইয়া গিয়াছে; সাধু হিব্রু গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতির মাধ্যমে অনূদিত হইতে হইতে তাহা ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছিয়াছিল ঘটনার সহস্র বৎসর পরে, এখন হইতে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে! ইংরেজীতেও নানা অনুবাদ-প্রচেষ্টার পর রাজা জেমসের সময় বাইবেলের অনুমোদিত প্রামাণ্য সংস্করণ (Authorised Version) প্রকাশিত হয় ১৬১১ খৃঃ। রাজাদেশে নিযুক্ত ৪৭ জন অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের পণ্ডিতের শতাব্দীব্যাপী সম্মিলিত চেষ্টার ফলে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। ২৭০ বৎসর পরে (১৮৮১) নিউ টেস্টামেণ্ট কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়া Revised Version নামে চালু হয়।

আলোচ্য গ্রন্থটি ঐ প্রকার কোন সংশোধিত সংস্করণ নয়; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই জনসাধারণ ও ধর্মপ্রচারকগণ অনুভব করিতেছিলেন, আধুনিক ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ আবশ্যক; পুরাতন ভাষা ও বাগ্বিধি (idiom) অনেক স্থলে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হইয়া আসিতেছে, তা ছাড়া এ-যুগে গ্রীক ও হিব্রু ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন এবং নবতম পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, পুরাতন অনুবাদের বহু স্থলে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই কাজ করিতে হইতেছে।

রোম্যান ক্যাথলিক ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সমসাময়িক ভাষার পটভূমিকায় খৃষ্টের জীবন ও বাণী যথাযথভাবে বুঝিবার জন্য একটি নূতন অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪৬ খৃঃ হইতে প্রতি বৎসর পণ্ডিতগণ সম্মিলিত হইয়া চারিটি সংসদের মাধ্যমে (১) ওল্ড টেস্টামেণ্ট (২) এপোক্রাইফা ও (৩) নিউ টেস্টামেণ্টের অনুবাদ এবং (৪) সবগুলির সাহিত্যিক সমীক্ষণ করিতে থাকেন; প্রথম দুইটির কাজ অগ্রসর হইতেছে, তৃতীয়টি প্রকাশিত হইয়াছে ১৯৬১ খৃঃ—প্রায় ১৩ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ।

এই গ্রন্থ পুরাতন অনুবাদের নূতন সংস্করণ নয়, ইহা সম্পূর্ণ নূতন অনুবাদ; এবং ইহার উদ্দেশ্য—মূলের অর্থবোধ করিয়া আধুনিক ইংরেজী-ভাষাভাষীদের পাঠের সুবিধা করিয়া দেওয়া। এই পুস্তক প্রকাশের জন্য পুরাতন প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি যে বাতিল হইয়া যাইবে, এ আশঙ্কা অমূলক; পুরাতন অনুবাদের গম্ভীর কাব্যধর্ম ইহাতে নাই, তথাপি জনসাধারণ নিজে নিজে পাঠ করিয়া বুঝিবার সুবিধার জন্য বোধহয় এই পুস্তকই বেশী পছন্দ করিবেন।

সমালোচনা দীর্ঘ না করিয়া আমরা নূতন অনুবাদের কিছু নিদর্শন দিতেছি, তাহা হইলেই বাইবেল-অভিজ্ঞ পাঠকগণ সহজেই পরিবর্তনের সুর ধরিতে পারিবেন।

Sermon on the mount :

When he saw the crowds he went up the hill. There he took his seat, and when the disciples had gathered round him he began to address them. And this is the teaching he gave :

'How blest are those who know that they are poor ; the kingdom of Heaven is theirs.···

How blest are those whose hearts are pure ; they shall see God.'·· ···

বাইবেলের প্রারম্ভে চিরপরিচিত 'begat' আর এখানে পাওয়া যাইবে না, এখানে আছে : 'Abraham was the father of Isaac.' Lord's Prayer-এর প্রথমে বিশেষ পরিবর্তন নাই, শেষে আছে :

'Forgive us the wrong we have done
As we have forgiven those
who have wronged us.
And do not bring us to the test,
But save us from the evil one.

ভক্ত খৃষ্টান সেই পুরাতন ভাষাতেই হয়তো প্রার্থনা করিবেন, কিন্তু অর্থবোধ করিবেন এই নূতন ভাষায়,—এইখানেই এ অনুবাদের সার্থকতা ! অনুবাদকগণের এই সাহসী প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

বেদ-মীমাংসা (প্রথম খণ্ড)—অনির্বাণ। প্রকাশক : অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ, ১নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ২৪০ ; মূল্য ১০৲।

বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠক-সমাজের পরিচয় অল্পই। 'বেদ-মীমাংসা' গ্রন্থে এই পরিচয় করিয়ে দেবার প্রচেষ্টা রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা ও প্রকাশ যত হবে, ততই আমাদের দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় রত্নভাণ্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং ভবিষ্যৎ কিরূপে সুন্দর হ'তে পারে, তার জন্য বর্তমানের কর্মধারাও হবে নিয়ন্ত্রিত।

'বেদ-মীমাংসা'-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বেদ-ব্যাখ্যার পদ্ধতি-আলোচনা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ বেদাঙ্গ প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এইগুলির সম্বন্ধে ধারণা না হ'লে বৈদিক দেবতা, সাধনা, দর্শন, জীবন ও ঋক্-সংহিতার মন্ত্র-ব্যাখ্যা সহজে বোধগম্য হবে না, তাই পরবর্তী খণ্ডের জন্য ঐগুলি রাখা হয়েছে।

দুরূহ বিষয় ঝরঝরে ভাষায় লেখা, গল্পের মতোই অনায়াসে পড়া যায়, মন কিন্তু ধীরে ধীরে ভাবগম্ভীর বিষয়ে প্রবেশ ক'রে আনন্দে ভরে ওঠে। সুধী গ্রন্থকার ও প্রকাশক এজন্য ধন্যবাদার্হ। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই—সবই সুন্দর। এই গ্রন্থ প্রত্যেক লাইব্রেরিতে রাখবার মতো।

ত্রয়ী—চতুর্থ প্রকাশ (১৯৬১); বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসুধীরচন্দ্র দেবমৌলিক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪৬।

ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের পত্রিকা 'ত্রয়ী'র চতুর্থ প্রকাশ প্রমাণ করছে—শিক্ষার্থীদের রচনা-শক্তি যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সমতালে চলেছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ১৩টি বাংলা ও ১৭টি ইংরেজী লেখা রয়েছে এর মধ্যে। কয়েকটির শিরোনাম : অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ, স্বপ্ন-মঞ্জরী, কলিকাতায় সকাল-সন্ধ্যায় ধোঁয়ার উপদ্রব—কারণ ও নিবারণের সহজ ও সুলভ উপায় ; Science, Technology and Society ; The world as I see it today (Atom and Hydrogen Bombs) ; Pre-stressed Concrete ; Indian Engineers in the making ; Public Health Engineering.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ১৪ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর) শুক্রবার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১০৯ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৭,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী তেজসানন্দ (সভাপতি), স্বামী গম্ভীরানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীঃ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভোগরাগ, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ১,৫০০ নরনারী বসিয়া এবং বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পরও বহু ভক্ত মাতৃ-সন্দর্শনে আসেন।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটীঃ যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি—ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও কালীকীর্তন হইয়াছিল। প্রায় ১৪,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় প্রথমে স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর 'কল্পতরু ও কাশীপুর উদ্যান-বাটী' কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ (সভাপতি), অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং স্বামী অজজানন্দ। রাত্রে রামায়ণ-কথক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী কথকতা করেন।

২রা জানুআরি অপরাহ্নে রামনাম-সঙ্কীর্তন ও স্বামী গম্ভীরানন্দের উপনিষদ্-ব্যাখ্যার পর স্বামী ওঁকারানন্দ 'বর্তমান যুগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন। রাত্রে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রযোজনায় স্বামী চণ্ডিকানন্দ স্ব-রচিত কথিকাসহ 'শ্রীশ্রীসারদা-লীলাগীতি' কীর্তন করেন।

৩রা জানুআরি অপরাহ্নে স্বামী দেবানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে হাওড়া সমাজ কর্তৃক 'নদীয়া লীলা' কীর্তনাভিনয় হয়।

উৎসবের কয়েকদিন উদ্যানবাটীতে সহস্র সহস্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

কাঁকুড়গাছিঃ যোগোদ্যানেও প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন।

বিহারে বন্যার্তসেবা

বিহারে সাম্প্রতিক বন্যায় মুঙ্গের জেলায় বারহিয়া (Barhia) থানা (কিউলের পরে তৃতীয় স্টেশন) সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৪০টি গ্রামে বন্যা-পীড়িতদের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া ৩১০ জন বয়স্ক ও ৩৪৪ জন বালক-বালিকার মধ্যে এ-পর্যন্ত নূতন ৯০০ কম্বল, ১,১২২ ধুতি, ১,০২০ শাড়ী ও ৪,১৪১ ছোটদের গরম পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে এবং কোট ও প্যাণ্টের উপযোগী ১,৬০১ গজ খাকী খাদি বস্ত্র বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন (২৪ পঃ)

(১) **কলিকাতা স্টুডেণ্টস্ হোম :** এই প্রতিষ্ঠানের (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে ৮৯ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৬১ জন ফ্রি, ১২ জন আংশিক খরচ দিয়া ছিল।

সাহায্য : কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের ৮২ জন দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফি বাবদ সাহায্য করা হয়।

গ্রন্থাগার : আশ্রম-লাইব্রেরির ৩,০৭৫ সুনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রেরা ৮৭০টি পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে ১,০৮০ খানি গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়। ৬টি দৈনিক ও ১৮টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়।

ভ্রমণ ও সম্মিলন : বিদ্যার্থীরা এই বৎসর পুরী ভুবনেশ্বর ব্যতীত কৃষ্টি- ও ঐতিহ্য-সম্পন্ন আরও কয়েকটি স্থানে ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। নববর্ষ উপলক্ষে ও বিজয়াসম্মিলনে আশ্রমের বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে।

(২) **শিল্পপীঠ :** ১৯৫৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই লাইসেন্‌সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ৫৪০, তন্মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে ৩৬০, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল উভয় বিভাগেই ৯০ করিয়া। শিল্পপীঠ-লাইব্রেরিতে ১,৫৩৭ পুস্তক রাখা হইয়াছে; ৫টি দৈনিক ও ১১টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ক্লাসের ছাত্রদিগকে তাহাদের শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন স্থানে—যথা রুরকেলা, ভূপাল প্রভৃতিঅঞ্চলে লইয়া যাওয়া হয়। দেওঘরে একমাস যাবৎ তৃতীয়-বার্ষিক ছাত্রেরা শিবির-জীবন অভ্যাস করে।

চণ্ডীগড় : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জানুআরি, ১৯৫৭ হইতে মার্চ, ১৯৬১ কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

১৯৪৭ খৃঃ ভারতবিভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে লাহোরের কেন্দ্র বন্ধ হইয়া যায়। পঞ্জাবের নূতন রাজধানী চণ্ডীগড়ে একটি আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়। ১৯৫৬ খৃঃ চণ্ডীগড়ে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ খৃঃ ৩ একর জমিতে আশ্রমের নিজস্ব একটি ভবন নির্মিত হইলে আশ্রম সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্তমানে আশ্রমে নিত্যপূজাদি এবং হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত আলোচনা ও রামনাম-সঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। আশ্রমের বাহিরে সাময়িক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়। নবনির্মিত গ্রন্থাগারে ৮০৭ পুস্তক আছে। হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৯,২৩১। ১৯৬০ জুলাই হইতে কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে, ছাত্র-সংখ্যা ১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। গুরু নানকের জন্মতিথিও বিশেষ উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত সোসাইটি: কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ। রবিবারের বক্তৃতা:

মে, '৬১: কর্ম ও অনুভূতি; আধ্যাত্মিক স্তরোদ্ঘাটন; দৈবী কৃপা; মানসিক পবিত্রতা।

জুন: যোগদর্শন; বেদান্ত কি শিক্ষা দেয়? ঈশ্বরের প্রার্থনা; স্বাধীনতা।

জুলাই: অন্তরে শান্তি ও বাহিরে কর্ম; ভগবৎপ্রেমিক শ্রীচৈতন্য; সেবায় আনন্দ; ভালমন্দের ঊর্ধ্বে; আত্মবিশ্লেষণের জন্য প্রার্থনা।

অগস্ট: অভ্যাস ও উপদেষ্টা; আমরা কি পুনর্জাত? যোগ ও আধ্যাত্মিক জীবন; অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।

সেপ্টেম্বর: বিশ্বাস ও শক্তি; বেদান্ত ও বর্তমান জগৎ; ধর্মকে কি কর্মজীবনে রূপায়িত করা যায়? প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাস।

অক্টোবর: ভক্তির অভ্যাস; 'আমিই পথ, সত্য ও জীবন'; ঈশ্বর সহজ; বিশ্বাস; আত্মজয়।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে 'ভাগবত' এবং বৃহস্পতিবারে উপনিষদের ক্লাস হয়। জুলাই ও অগস্ট মাসে মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারের ক্লাস বন্ধ থাকে। সেপ্টেম্বরে বৃহস্পতিবার 'নারদীয় ভক্তিসূত্রে'র ক্লাস হয়।

সাণ্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে:

মে: বুদ্ধ; সত্য, সততা ও সৌন্দর্য; আধ্যাত্মিক জীবন, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা।

জুন: মনের পবিত্রতা; রাজযোগ; বেদান্তের বাণী; ঈশ্বরের প্রার্থনা।

জুলাই: ভালমন্দের ঊর্ধ্বে; বিশ্বাস ও যুক্তি; প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য; কর্ম ও উপাসনা; মুক্তি কি?

অগস্ট: প্রাচীন ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার উপনিষৎ; শিষ্য ও শিক্ষা; পুনরবতরণ; ধ্যান।

সেপ্টেম্বর: বেদান্ত ও বর্তমান জগৎ; ঈশ্বরের ইচ্ছা ও মানুষের অহংকার; প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাস, জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা।

অক্টোবর: 'আমিই পথ, সত্য ও জীবন'; ঈশ্বরই শক্তি; 'তুমিই সেই'; মানুষ কি অশান্ত? বিশ্বাস।

এতদ্ব্যতীত সপ্তাহ-অন্তর মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়। জুলাই ও অগস্ট মাসে গীতা ক্লাস বন্ধ থাকে।

ব্রেজিলে বেদান্ত-প্রচার

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল রাজ্যের রিওডিজেনাইরো শহরে স্থানীয় বেদান্তানুরাগী ভক্তগণ একটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। গত জুলাই, অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬১) আরজেণ্টাইন বুয়েনস এয়ারিস বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া বক্তৃতা ও ক্লাস প্রভৃতি দ্বারা সকলের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। ব্রেজিলে তিনটি শহরে তাঁহাকে কতকগুলি সাধারণ বক্তৃতা এবং বেতার-ভাষণও দিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বেদান্তের শিক্ষানুযায়ী ধর্মজীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক অনেকগুলি নরনারী তাঁহার নিকট সাধনোপদেশও লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আশ্রমে আগ্রহশীল শ্রোতৃবৃন্দের নিকট স্বামী বিজয়ানন্দ ধর্মালোচনা করিতেন এবং সকলের আধ্যাত্মিক সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তাঁহার তিনমাস অবস্থান স্থানীয় বেদান্ত-জিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়াছে এবং তাঁহারা পুনরায় সামনের গ্রীষ্মে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১০-৫০ মিঃ সময়ে স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ (দেবেন মহারাজ) বেলুড় মঠে ৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সকাল আন্দাজ ৭টার সময় যখন তিনি গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, তখন মস্তিষ্কে রক্তচাপের ফলে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়। তাঁহাকে মঠবাড়িতে আনা হয়, কিন্তু জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে না।

১৯১৩ খৃঃ কনখলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২২ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। প্রথমে কনখল সেবাশ্রমে এবং পরে মঠে তাঁহার নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মজীবনে তিনি সকলেরই প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ ! ওঁ শান্তিঃ !! ওঁ শান্তিঃ !!!

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী : প্রস্তুতি সংবাদ

(জানুআরি ১৯৬৩—জানুআরি ১৯৬৪)

১৯৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে যখন বেলুড় মঠে 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী' উৎসবের উদ্বোধন হইবে, তখন গ্রাম উন্নয়ন, চরিত্রগঠন ও প্রকৃত মানুষ-গঠন বিষয়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণীগুলি ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামবাসীর মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার সমাজ-উন্নয়ন-বিভাগের (Union Ministry of Community Development) উদ্যোগে মুদ্রিত হইবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার যোগাযোগ ও প্রচার দপ্তর (Union Ministry of Information and Broadcasting) কর্তৃক স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে একটি প্রামাণিক চলচ্চিত্র প্রস্তুত করা হইবে।

শিক্ষা-সচিব (Secretary, Education Ministry) শ্রী কৃপাল 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ' বিভিন্ন ভাষায় ছাপাইয়া সারা ভারতে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সমাজ-উন্নয়ন-সমিতির সভানেত্রী (Chairman, Central Social Welfare Board) শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখ ১৭টি ভারতীয় ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের 'ভারতের নারী' পুস্তক ছাপিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ১৯৬৩ খৃঃ তিনি একটি বিশেষ সংখ্যাও (Special number) প্রকাশ করিবেন বলিয়াছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতির সহযোগিতায় ভারতে ও ভারতের বাহিরে স্বামীজীর শিক্ষা ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, আলোচনা ও সভার ব্যবস্থা করা হইবে।

বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের এক সম্মেলন হইবে; সমন্বয় ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারাণসীতেও অনুরূপ একটি সম্মেলন হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত গত ২৫শে ডিসেম্বর ভোরে ৫টা ৫ মিনিটের সময় ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতার ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে পৈতৃক বাসভবনে মস্তিষ্কে রক্তচাপের ফলে (Cerebral Thrombosis) পরলোক গমন করেন। তাঁহার শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার নশ্বর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দাহ করা হয়।

চিরকুমার ভূপেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা ও দেশের কল্যাণ-কামনায় পরিপূর্ণ। বিখ্যাত বিপ্লবী, সমাজতান্ত্রিক, নৃতাত্ত্বিক, লেখক ও মার্ক্সবাদী পণ্ডিত হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডের পর বহুদিন তিনি ইওরোপ ও আমেরিকায় কাটান।

তাঁহার রচিত বহুগ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানি : বাংলায়—ভারতীয় সমাজপদ্ধতি, বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ইংরেজীতে : Studies in Indian Social Policy, Dialectics of Hindu Spiritualism, Dialetics of Land Economics of India, Indian Art in relation to culture, Swami Vivekananda the Patriot-Prophet.

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরবিশ্রাম লাভ করুক—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।। ওঁ শান্তিঃ।।।

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব

গত ১৮ই হইতে ২৩শে পৌষ পর্যন্ত পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দের ১০৬তম জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান বারাসতস্থিত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে পূজা, হোম, চণ্ডী ও শিবমহিম্নঃস্তোত্র পাঠ, শিবানন্দ-বাণী ও জীবনী আলোচনা, শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ পাঠ, রামনাম-সংকীর্তন, রামকৃষ্ণকথামৃত ও রামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ, 'সাধক রামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে কথকতা, তুলসী-দাসী রামায়ণ গান, চৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ, লীলা-কীর্তন, প্রহ্লাদ-যাত্রাভিনয়, কালী-কীর্তন, রামকৃষ্ণনাম-কীর্তন, ঠাকুর-মা-স্বামীজী-মহাপুরুষজীর প্রতিকৃতি ও সংকীর্তন সহ শোভাযাত্রা, বাউলগান, প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী গম্ভীরানন্দ।

সন্ন্যাসসঙ্কল্প-স্মরণোৎসব

আঁটপুর : শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দের পুণ্য জন্মস্থান হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আঁটপুর গ্রাম। এই গ্রামে প্রেমানন্দ মহারাজের জননীর আহ্বানে ১৮৮৬ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার ৮ জন গুরুভ্রাতা গমন করেন, রাত্রে খৃষ্টজীবন আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা সংসার-ত্যাগের পবিত্র সঙ্কল্প করেন। তাহারই স্মরণার্থে উক্ত স্থানে প্রতি বৎসরের ন্যায় গত ২৪শে ডিসেম্বর বহু ভক্তের সমাবেশে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

গত ২৩শে হইতে ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতা রবীন্দ্রভারতী-প্রাঙ্গণে (জোড়া-সাঁকো) নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ৩৭তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীউমাশঙ্কর যোশী। এই সম্মেলনে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যথা—কথাসাহিত্য, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, নাটক, সঙ্গীত, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ কর্তৃক আলোচিত হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক ও বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রাবলীরও একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল।

ভারতরাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য

আয়তন	১২,৫৯,৭৯৭ বর্গমাইল (৩২,৬২,৮১১ বর্গ কিলোমিটার) [শেষনিরীক্ষা-সাপেক্ষ]
সীমান্ত-রেখা	৯,৪২৫ মাইল (১৫,১৬৮ কি.মি.)
উপকূল-রেখা	৩,৫৩৫ „ (৫,৬৮৯ „)
লোকসংখ্যা ('৬১ খৃঃ গণনা-অনুসারে)	৪৩·৮০ কোটি
রাজ্য-সংখ্যা	রাজ্য-১৫, ইউনিয়ন টেরিটরি-৭
বার্ষিক আয় (কেবল রাষ্ট্রের— ১৯৬১-৬২খৃঃ আনুমানিক)	৯৬২·৯২ কোটি টাকা
বার্ষিক ব্যয় (কেবল রাষ্ট্রের)	১,০২৩ ৫২ কোটি টাকা
বেতার-কেন্দ্র	২৮
রেলপথ (মার্চ ৩১, '৬০)	৩৫,২১৩ মাইল (৫৬,৬৭০ কি.মি)
বৈদেশিক বাণিজ্য ('৬০খৃঃ)	১,৬৩৪·৬৪ কোটি টাকা
আমদানি („)	১,০১১·৬১ „ „
রপ্তানি („)	৬২৩·০৩ „ „
বিদেশী পর্যটক („) (পাকিস্তান ও তিব্বত ছাড়া)	১,২৩,০৯৫
জাতীয় সড়ক	১৪,৮৮১ মাইল (২৩,৯৪৯ কি.মি.)
তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ('৬০)	৯৪
„ „ অফিস	৪,১৫১ (অক্টো, '৬০)
বিশ্ববিদ্যালয় ('৬০)	৪৩

['India—1962' হইতে সংকলিত]

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৪ই মাঘ (২৮. ১. ৬২) রবিবার শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ শততম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

* * *

বহু পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ও মহাসমাধির দিন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল :

জন্ম : বাংলা ২৯শে পৌষ (সংক্রান্তি), সন ১২৬৯, ইং ১২ই জানুআরি, ১৮৬৩ খৃঃ সোমবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। জন্ম-সময় : প্রাতঃ ৬-৪৯ মিঃ (সূর্যোদয়ের কয়েক মিনিট পূর্বে)।

মহাসমাধি : বাংলা ২০শে আষাঢ়, সন ১৩০৯, ইং ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খৃঃ, শুক্রবার কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি, রাত্রি ৯টার কয়েক মিনিট পর।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর মহাসমাধি

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে প্রায় ৮৩ বৎসর বয়সে গত ২৭শে পৌষ, (১৩ই জানুআরি) শুক্রবার রাত্রি ৩টা ১০মিঃ সময়ে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। বিশেষ কোন ব্যাধি না থাকিলেও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতাই তাঁহার দেহত্যাগের প্রধান কারণ হইয়াছিল।

কলিকাতার সাধু ও ভক্তগণ টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া ভোর হইতেই বেলুড় মঠে আসিতে থাকেন। সকালে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' যোগে তাঁহার মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচারিত হইলে অগণিত ভক্ত নরনারী তাঁহাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য মঠ-প্রাঙ্গণে সমবেত হন।

বেলা ১০॥ টায় পুষ্পশোভিত পূত দেহ নীচে মঠের বাঁধানো প্রাঙ্গণে নামানো হয়। সেখানে আম্রবৃক্ষের ছায়ায় চন্দ্রাতপতলে সুসজ্জিত খাটের উপর তাঁহার দেহ রক্ষিত হইলে পর যথাবিহিত আরাত্রিক করা হয়। অতঃপর সাধু ও ভক্তগণ ঐ দেহ প্রদক্ষিণ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দেন। মঠের ঘাটে আনুষ্ঠানিক স্নানাদি কৃত্য সম্পন্ন হইলে পুষ্পশোভিত খাটে স্থাপিত দেহ শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মন্দিরের সামনে অল্পক্ষণের জন্য নামানো হয়। বেলা ১ টায় বেলুড় মঠের দক্ষিণপ্রান্তে গঙ্গাতীরে তাঁহার পুণ্যদেহ অগ্নিতে সমর্পিত হয়। সমবেত ভক্তগণ অগ্নিতে ঘৃত, তিল, যবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য আহুতি দেন। বেলা ৪ টায় চিতানল নির্বাপিত হয়। শেষকৃত্য-সমাপনের পর চিতাভূমি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।

* * * * *

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল অমৃতলাল সেনগুপ্ত, ডাকনাম অমূল্য। বাংলা ১২৮৬ সনের ২৭শে ফাল্গুন শিবরাত্রির রাত্রে (ইং ৯ই মার্চ, ১৮৮০ খৃঃ) তিনি হুগলি শহরে প্রতাপপুর-পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নবীনকৃষ্ণ সেনগুপ্ত মহাশয় সেখানে ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল ২৪ পরগনা জেলার অন্তঃপাতী বারাসতের সন্নিকট বামুনমোড়া গ্রামে। নবীনকৃষ্ণ মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে অমৃতলাল সেখানকার নবাব হাইস্কুলে কিছুকাল পড়াশুনা করেন।

পূর্বাশ্রম-সম্পর্কে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী সদানন্দের ভাগিনেয় ছিলেন। কলিকাতায় পাঠকালে ছাত্রাবস্থায় তিনি স্বামীজীকে দর্শন করেন এবং তাঁহার বক্তৃতাও শুনিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় প্রধানতঃ স্বামী সদানন্দের প্রভাবেই ১৯০২ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন ও মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের নিকট প্রেরিত হন। ১৯০৩ খৃঃ স্বামী সদানন্দের সহিত তিনি জাপানে যান এবং প্রায় ছয় মাস সেখানে থাকিয়া চীন হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯০৬ খৃঃ স্বীয় দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বামী শঙ্করানন্দ কয়েক বৎসর তাঁহার সেবা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে ভারতের বহু তীর্থ ও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের বহু কেন্দ্রে গমন করেন।

তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনেক কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি সেবাকার্যও পরিচালনা করেন। গৃহনির্মাণ ব্যাপারেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, ভুবনেশ্বর মঠের ও বেলুড়মঠে ব্রহ্মানন্দ মন্দিরের নির্মাণকার্য তিনি তত্ত্বাবধান করেন। পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল, উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহ তিনি ভক্তদিগকে তাঁহার বক্তব্য বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদের বহু পত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিয়া তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতিকথার অনুবাদ করাইতেছিলেন। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাদাম কালভে'র স্মৃতিকথাটি তাঁহারই উদ্যোগে অনূদিত।

১৯৪৭ খৃঃ ৩১শে মার্চ স্বামী শঙ্করানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯৫১ খৃঃ ১৯শে জুন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

স্বামী শঙ্করানন্দজীর জীবনে একদিকে যেমন কঠোর তপস্যা, অন্যদিকে তেমনি সকল কার্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগ লক্ষিত হইত। নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাবলম্বনের ভাব ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। স্বামী শঙ্করানন্দজীর অন্তর্ধানে * শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল; ভক্তগণ হারাইলেন একজন স্নেহশীল পথনির্দেশক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

* এতদুপলক্ষে আগামী ১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারি) বুধবার বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হোম ও সংকীর্তনাদি হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ : মহান্ আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ

ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমার হৃদয়ের আর এক তন্ত্রীতে, সর্বাপেক্ষা গভীরতম তন্ত্রীতে আঘাত করিয়াছেন—আমার গুরুদেব, আমার আচার্য, আমার জীবনের আদর্শ, আমার ইষ্ট, আমার প্রাণের দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম উল্লেখ করিয়া। যদি কায়মনোবাক্য দ্বারা আমি কোন সৎকার্য করিয়া থাকি, যদি আমার মুখ হইতে এমন কোন কথা বহির্গত হইয়া থাকে, যাহা দ্বারা জগতের কোন ব্যক্তি কিছুমাত্র উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন গৌরব নাই, তাহা তাঁহার।...যাহা কিছু দুর্বল, দোষযুক্ত সবই আমার। যাহা কিছু জীবনপ্রদ, যাহা কিছু বলপ্রদ, যাহা কিছু পবিত্র—সকলই তাঁহার শক্তির খেলা, তাঁহারই বাণী এবং তিনি স্বয়ং। সত্যই বন্ধুগণ, জগৎ এখনও সেই মহামানবের সহিত পরিচিত হয় নাই।...

ভদ্রমহোদয়গণ! আমাদের শাস্ত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর ঈশ্বরেচ্ছায় সকলেই যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেন, তবে বড়ই ভাল হইত, কিন্তু তাহা যখন হইবার নয়, তখন আমাদের মনুষ্যজাতির অনেকেরই পক্ষে একটি সগুণ আদর্শ না থাকিলে একেবারেই চলিবে না। এইরূপ কোন মহান্ আদর্শ পুরুষে বিশেষ অনুরাগী হইয়া তাঁহার পতাকাতলে দণ্ডায়মান না হইলে কোন জাতিই উঠিতে পারে না, কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এমনকি একেবারে কাজই করিতে পারে না। রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক বা বাণিজ্য-জগতেরও কোন আদর্শ পুরুষ কখন সর্বসাধারণ ভারতবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন না। আমরা চাই আধ্যাত্মিক আদর্শ। উচ্চ-আধ্যাত্মিকতা-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের নামে আমরা একত্র সম্মিলিত হইতে চাই—সকলে মাতিতে চাই। ধর্মবীর না হইলে আমরা কাহাকেও আদর্শ করিতে পারি না। রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এইরূপ এক ধর্মবীর—এইরূপ এক আদর্শ পাইয়াছি। যদি এই জাতি উঠিতে চায়, তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এই নামে সকলকে মাতিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তুমি আমি বা যে-কেহ প্রচার করুক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। আমি তোমাদের নিকট এই মহান্ আদর্শ পুরুষকে স্থাপন করিলাম।

[২৮শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৭, 'কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর' হইতে]

পানপাত্র*

স্বামী বিবেকানন্দ

এই তব পানপাত্র, তোমারি উদ্দেশে
সৃষ্টির উন্মেষ হ'তে এ পাত্র-রচনা।
জানি জানি এ পানীয় কালকূট ঘোর,
তোমারি মন্থিত সুরা,—দূর অতীতের
বাসনা বেদনা ভ্রান্তি যুগ-যুগান্তের।

দুর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ,
প্রতি পদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাত্রার।

তোমারি মতন সেও পাবে বক্ষে মোর
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধ'রে,—এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—আর কারো তরে নয়,
এ শুধু তোমার। মোর বিশ্ব-রচনায়
আছে তারো স্থান। লও এই পানপাত্র—
বুঝিতে বলিনি আমি, কি অর্থ ইহার,
শুধু চোখ বুজে দেখ—স্বরূপ আমার।

---

* 'The Cup' কবিতার অনুবাদ : শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ।

[স্বামীজীর কবিতা—কি ইংরেজী, কি বাংলা—অতি গভীর ও গম্ভীর ভাবদ্যোতক। কবে, কোথায়, কি পরিবেশে রচিত জানা থাকিলে এ সকল রহস্য-গূঢ় কবিতার অর্থ কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বর্তমান কবিতাটির রচনার স্থান কাল কিছুর সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। বিষয়বস্তু হইতে মনে হয়—ইহা তাঁহার জীবন-দেবতার বাণী।—উঃ সঃ]

কথাপ্রসঙ্গে

'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর'

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কিছু জানিতে বা বুঝিতে গেলে অবশ্যই আমাদের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ', 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' খুলিয়া বসিতে হইবে। প্রথমটিতে আমরা পাই অতুলনীয় ভাষায় ও ভঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনার যুগোপযোগী দার্শনিক ব্যাখ্যা। ঠিক ঐ ভাবে লিখিত না হইলে বোধ হয় এ-যুগের তথাকথিত যুক্তিবাদী মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-কথা পড়িতে কোন আগ্রহ বোধ করিত না! দ্বিতীয় গ্রন্থটি সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই—লেখক নিজেকে কোথাও অন্তরালে রাখিয়া, কোথাও ছদ্ম নামে ঢাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত মুমূর্ষু মানবের কানের কাছে পরিবেশন করিয়াছেন, এ-যুগের অগণিত অবিশ্বাসী মন আধ্যাত্মিক ভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছে! তৃতীয় গ্রন্থখানি শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী আধুনিক ব্যক্তিদের অনেকেই পড়েন নাই, হয়তো নামও শোনেন নাই! চোখে দেখিলে প্রথমেই বলিয়া উঠিবেন, 'এ এক কি নকলের ব্যাপার! এ রকম একখানা বই না ছাপাইলে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া প্রচার করা যায় না?' যাহা হউক, যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা এ গ্রন্থের মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়াছেন; বিশেষতঃ অশিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত জনগণ—সরল-বিশ্বাসী গ্রামবাসিগণ, যাঁহারা দার্শনিক তত্ত্ব ধরিতে পারেন না বা বুঝিতে চাহেন না, এই গ্রন্থের মাধ্যমেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছেন!

এই তিনখানিই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আকর-গ্রন্থ! অন্য যেগুলি রচিত হইয়াছে, অল্পবিস্তর এইগুলির উপরই ভিত্তি করিয়া! এগুলির পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক আর দু-একখানি গ্রন্থ যা আছে, তাহা হয় জীবনের কয়েকটি ঘটনা-বৃত্তান্ত, না হয় ব্যক্তিগত মতামত, না হয় জীবনচরিত রচনার প্রচেষ্টা ও উপদেশ-সংগ্রহ! সেগুলি উপরি-উক্ত তিনখানি গ্রন্থের মতো রসোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মানুষ যখন আরও জানিতে চাহিবে, তখন তাহাকে অবশ্যই তাঁহার শিষ্য ও ভক্তদের জীবনের মধ্যে অনু-সন্ধান করিতে হইবে, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের মতো যুগপুরুষের জীবন কখনও দুচারখানি গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। অন্তরঙ্গ, শিষ্য ও ভক্তদের জীবনের পরতে পরতে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুস্যূত হইয়া আছেন, তাঁহারা সকলেই 'শ্রীরামকৃষ্ণময়'! এই কথা উল্লেখমাত্র করিয়া, লোকলোচনের অন্তরালে অবগুণ্ঠিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিস্বরূপা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নামটুকু মাত্র করিয়া আমরা যুগদেবতার বিজয়শঙ্খ স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুদেব সম্বন্ধে কি বলিয়া-ছিলেন, কি লিখিয়াছেন, তাঁহাকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তাহারই আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তো নরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'জানি তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ, কেন এসেছ।' নরেন্দ্রনাথও কি প্রথম দর্শনেই চিনিয়াছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ কে এবং তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধ কি?

উভয়ের জীবনীগ্রন্থে যতটুকু লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়—কলেজের ছাত্র নরেন্দ্র-

নাথ তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে একটু বিকৃতমস্তিষ্কই ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু এক দুর্বার আকর্ষণে বারংবার দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল পূজারীর কাছে গিয়া বুঝিয়াছিলেন: ইনি সাধারণ পাগল নহেন, ঈশ্বরের জন্য পাগল, মানব-কল্যাণের জন্য পাগল! শরীর দেখিতে দুর্বল হইলেও মন প্রচণ্ড শক্তিশালী, তাঁহার মতো পালোয়ান ও আত্মবিশ্বাসী যুবকের মন তিনি ভাঙিয়া গড়িয়া দিতে পারিতেন, এবং দিয়াছিলেনও।

নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে ছয় বৎসর দিনের পর দিন দেখিয়াছিলেন, রাতের পর রাত পরীক্ষা করিয়াছেন, প্রশ্ন করিয়াছেন, প্রাণপাত করিয়া সেবা করিয়াছেন, সর্বশেষ আত্মসমর্পণ করিয়া গুরুকৃপায় শ্রেষ্ঠ অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের সংশয়ী যুবক, খৃষ্টান কলেজে পাশ্চাত্য দর্শন-অধ্যয়নরত নরেন্দ্রনাথ প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে চমকিত করিয়া উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ দেখেছি, এই যেমন তোকে দেখছি। শুধু দেখেছি নয়, তোকে দেখাতে পারি, যদি আমার কথা শুনে চলিস্।' সত্যানুসন্ধিৎসু সাধকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু 'শোনা'র প্রয়োজন হয় না। অতঃপর শুরু হয় 'করা'র পালা। নরেন্দ্রও তাই ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে বরণ করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইলেন। অকূল সমুদ্রে ধ্রুব তারা যেমন নাবিককে নিশ্চিন্ত করে, নরেন্দ্র যেন লক্ষ্য সম্বন্ধে কতকটা সেইরূপ নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু পরীক্ষা এখনও বাকী। উভয়তঃ পরীক্ষা। নরেন্দ্র পরীক্ষা করিলেন, ইনি যথার্থ ত্যাগী কিনা, যাহা বলেন তাহা সত্যই জীবনে পালন করেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে শিষ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাপাঠে সে-কথা আমরা জানি! এখন শ্রীরামকৃষ্ণ পরীক্ষা করিবেন: নরেন্দ্র সত্যই আমাকে ভালবাসে কিনা? 'রামে'র অভাবে সে 'শ্যাম'কে ধরিবে কি না।—দিনের পর দিন নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আসে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার সহিত একটিও কথা বলেন না, কোন দিন বা ফিরিয়াও তাকান না, উপেক্ষা করেন, অবহেলা করেন, দুই-তিন মাস কাটিয়া গেল। একদিন বলিলেন, 'হ্যারে, তোর সঙ্গে কথাও বলি না, তবু তুই আসিস কেন?' ধীরভাবে নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, 'আপনার কথা শুনতে তো আসি না, আপনাকে দেখতে আসি, ভালবাসি ব'লে!' পরীক্ষা শেষ, এবার আত্মসমর্পণের পালা।

এখানেও দেখি শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথমে বলিতেছেন, 'তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।' কি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বস্ব, কেন তিনি তাহা এই যুবককে দিলেন? তাঁহার আজীবন সাধনার সম্পদ্ তিনি এই যোগ্যতম আধারে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন,—নরেন্দ্র মহামায়ার বরপুত্র, তাঁহারই কাজের জন্য ধরাতলে আসিয়াছেন।

এই যুগ্ম আত্মার জীবনীকার রম্যাঁ রলাঁ যথার্থই লক্ষ্য করিয়াছেন: বিশ্ব পরিভ্রমণ করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল শক্ত সবল চরণযুগল; বিশ্বকে তাঁহার বাণী শুনাইবার জন্য প্রয়োজন ছিল বজ্রকঠোর কণ্ঠস্বর! বিবেকানন্দে তিনি দুইই পাইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহার দ্বিতীয় সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব জীবনের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, উত্তরাধিকার-সূত্রে সকল সাধনসম্পদ্ লাভ করিয়াও নরেন্দ্রনাথ ভিখারীর মতো শ্রীগুরু-সমীপে উপনীত, চাই জীবনের শ্রেষ্ঠ

অনুভূতি—শুকের মতো নির্বিকল্প সমাধি! পুরুষকারের চির-উপাসক নরেন্দ্রনাথ আজ কৃপার ভিখারী। অপূর্ব শিষ্যের অপূর্ব প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণ কত আনন্দিত হইয়াছিলেন জানি না, মুখে নরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন: তোর লজ্জা করে না, বার বার ঐ কথা বলতে! তুমি এসেছ কি সমাধিতে ডুবে থাকতে! কোটি কোটি জীব সংসার-তাপে দ হয়ে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছে তোমার মুখের একটি কথা শোনবার জন্য! বিরাট মহীরুহের মতো তুমি জগতের মানুষকে শান্তির ছায়া দেবে! নরেন্দ্রের মন তবু অচল অটল। সত্যকে অপরোক্ষ না করিয়া তিনি কী শান্তির কথা কাহাকে শুনাইবেন? গুরু বুঝিলেন, নরেন্দ্র সর্বশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ! শ্রীগুরুর আশীর্বাদে নির্বিকল্প ভূমি স্পর্শ করিয়া 'বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায়' নরেন্দ্রের মন মায়ার জগতে অবতরণ করিল!

নরেন্দ্রের মনে এখনও সন্দেহ,—একটি সংশয় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না! অপার করুণাময় অন্তর্যামী গুরুদেবতা বলিয়া উঠিলেন, 'কি রে, এখনও সন্দেহ? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ, তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' এ কথার কি অর্থ? নরেন্দ্রনাথ কি বুঝিয়াছিলেন? বেদান্তের ব্রহ্মবাদ ও অবতারবাদ যে এক নয়—এই কথাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন প্রিয়তম শিষ্যকে বুঝাইয়া গেলেন? শিশিরবিন্দু ও সমুদ্র স্বরূপতঃ জল হইলেও শিশিরবিন্দু কখনও অসীম সিন্ধু হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর গুরুভ্রাতা-গণকে সংঘবদ্ধ করিয়া পরিব্রাজক নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরু-প্রদত্ত গুরুতর ভার মস্তকে লইয়া বাহির হইলেন,—কি করিতে হইবে, কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই জানেন না। শুধু জানেন, গুরুদেব যে মহা দায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন, তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি শ্রীগুরুর ইচ্ছা, প্রতি নিঃশ্বাসে তিনি শ্রীগুরুর অস্তিত্ব অনুভব করিতেছেন। তথাপি 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই কথা মনে করিয়া গাজীপুরে সিদ্ধযোগী পওহারী বাবার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন; কৃপালব্ধ যোগানুভূতি দৃঢ় করিবার জন্য তাঁহার সাহায্যও প্রার্থনা করিলেন; রাত্রে বাবাজীর গুহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমান-ভরা মূর্তি। দিনের পর দিন এইরূপ দর্শনলাভ করিয়া বুঝিলেন, আর কাহারও কাছে যাইতে হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্বস্ব দিয়া ফকীর হইয়াছেন। তাঁহার কেন এ দীনতা?—'রাজপুত্র তিনি, পিতৃধনে তাঁর পূর্ণ অধিকার'। পরে একদিন পওহারী বাবাকে দর্শনমাত্র করিতে গিয়া তাঁহার গুহায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের চিত্র দর্শন করিয়া নরেন্দ্র অবাক্ হইলেন! বুঝিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'জিতভৃত যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগ-সহায়।' বাবাজীও বলিলেন, 'ইনি যোগীশ্বর'।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল। এবার বাহির হইলেন আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিব্রাজকাচার্য বিবেকানন্দ। ভারত-ভ্রমণের পর আমেরিকায় বজ্রনির্ঘোষে হিন্দুধর্মের—তথা বেদান্তের উদার বাণী প্রচার করিয়া যখন তিনি পাশ্চাত্যকে মুগ্ধ করিয়াছেন ও প্রাচ্যকে সচকিত করিয়াছেন, তখনও কোথাও তিনি প্রাণের প্রিয়তম গুরুদেবতার কথা সাক্ষাৎভাবে বলিতেন না, গুরুভ্রাতাদেরও লিখিতেন: 'রামকৃষ্ণ অবতার' এ-কথা প্রচার না করিয়া নিজের জীবন দিয়া দেখাও তাঁহার স্পর্শে মানুষ

দেবতা হয়। অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ১৮৯৬ খৃঃ নিউইয়র্কে তিনি 'মদীয় আচার্যদেব' নামক বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। সেখানেও দেখা যায়, গুরুদেবের কথা তিনি বলিতেই পারিতেছেন না; আধ্যাত্মিকতা, জড়বাদ, ত্যাগ ও ভোগ প্রভৃতির ভূমিকাতেই বক্তৃতা প্রায় শেষ হইয়াছে। ঐ বৎসরের শেষে ইংলণ্ডে—'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে আর একটি বক্তৃতায় তিনি বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন এই অপূর্ব জীবনের কাহিনী ও উদ্দেশ্য। এই দুই ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল;—অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ইংলণ্ডের এক পত্রিকায় 'A Real Mahatman' নাম দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। স্বামীজী আকৃষ্ট হইয়া অধ্যাপকের সহিত দেখা করেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের বৃহত্তর জীবনী লেখার জন্য উপাদান তাঁহার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন।

গুরুভ্রাতারা যখন স্বামীজীকে অনুরোধ করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখিবার জন্য—তিনি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেন, উপরন্তু বলিতেন: আমি বা আমরা সকলে মিলিয়া শত শত জীবন চেষ্টা করিলেও সেই মহাজীবনের সামান্য অংশও প্রকাশ করিতে পারিব না। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী কি চোখে দেখিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, যখন আমরা শুনি তিনি বলিতেছেন: একটি জাতির তিন হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবন তাঁহার ভিতরে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার জীবনালোকে আমাদের আজ বুঝিতে হইবে শুধু হিন্দুধর্মই নয়, অন্যান্য সকল ধর্ম।

কলিকাতার অভিনন্দনের উত্তরে বলিতেছেন: যদি এই অধঃপতিত জাতি উঠিতে চায় তবে তাহাকে একটি উচ্চতম আদর্শ ধরিতে হইবে, আমি তোমাদের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ মহান্ আদর্শ স্থাপন করিতেছি। ওঠ, জাগ।

মাদ্রাজে ভারতীয় মহাপুরুষগণের কথা বলিতে গিয়া তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আলোড়িত করিয়াছেন। কৃষ্ণ বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্যের কথা বলিয়া বলিতেছেন: শ্রীকৃষ্ণে যে সমন্বয়ের কথা ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা আজ পরিপূর্ণ হইল। শঙ্করের মস্তিষ্ক ও চৈতন্যের হৃদয়—দুটি একত্র করিয়া একজনের আবির্ভাব প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন একজন ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় আজ নাই। তবে যদি জীবনে ভাল কিছু বলিয়া থাকি, যাহাতে মানুষের উপকার হইয়াছে, সে কথা তাঁহার, তাঁহারই।

এই কথার সূত্র ধরিয়া আমরাও উপসংহার করি, স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা! যে বাণী তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ভরিয়া দিয়াছিলেন, সেই বাণীই বিবেকানন্দ বিশ্বজগতে বিঘোষিত করিয়াছেন। বিবেকানন্দ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণী, অথবা বলিব—বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণীমূর্তি।

গাজীপুরে অলৌকিক দর্শনের পর স্বামীজী মর্মের অব্যক্ত বেদনা একটি কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন:

> প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর,
> কভু দেখি—আমি তুমি, তুমি আমি।
> বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর!

এই দৃষ্টি হইতেই আমাদের বুঝিতে হইবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিরন্তন সম্বন্ধ; বুঝিতে হইবে বিবেকানন্দের কথায় কাজে চিন্তায় একই অদৃশ্য কল্যাণ-শক্তি আজীবন প্রেরণা জোগাইয়াছে; বুঝিতে হইবে—বিবেকানন্দের পত্রে প্রবন্ধে, বক্তৃতায় কবিতায়, বাণী ও রচনায় শ্রীরামকৃষ্ণই ওতপ্রোত, শ্রীরামকৃষ্ণই প্রকাশিত।

চলার পথে

'যাত্রী'

মৃত্তিকায় উপ্ত হইয়া বীজ বৃক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া মৃত্তিকাই যে বৃক্ষের জন্মদাতা, তাহা নহে। কারণ ঐ বৃক্ষোদ্ভবের মধ্যে পার্থিব মৃত্তিকার সংযোগ যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অপার্থিব সূর্যের সানন্দ সাহায্যও। এই উভয় যোগাযোগের সুষ্ঠু বিবরণই বীজের বৃক্ষত্ব-জন্মের পূর্ণ ইতিহাস বহন করিয়া থাকে। মানবের, বিশেষ করিয়া মহামানবের, জন্ম-রহস্যও সেই প্রকার একটি কারণেই নিঃশেষিত নহে, বরং একটি বাহ্য এবং আর একটি অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমটি সেই কারণেই দিন-ক্ষণ, মাস-বৎসর তথা জৈবিক বিবরণের তালিকাতেই শেষ হইয়া যায়; আর একটিতে পরিলক্ষিত হয় ইহারই এক অপার্থিব পূর্বাভাস। এবং এই পূর্বাভাস আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হইলেও মহামানবের জন্ম-রহস্য উদ্‌ঘাটনে ইহার অবদান অবহেলা করিবার মতো নহে। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বিবরণীতে এই উভয় প্রকার সংযোগের আভাস অনুভব করি। অনুভব করি, সর্বভূতহিতে সর্বাত্মীয়তাবোধে এই মহামানবের একীভূত সত্তার নির্বিশেষ প্রকাশ। আর সেই সঙ্গে বুঝিয়া লইতে পারি—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—এই শাস্ত্রবাণীর প্রচ্ছন্ন জীবনবাদ কি অদ্ভুত সত্যানুভূতিতে সদাই বিধৃত!

নরেন্দ্রনাথের জন্ম কলিকাতার শিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্তবংশে। নানা ভাষায় পারদর্শী, দেশভ্রমণানুরাগী ও রন্ধনকার্যে সুনিপুণ তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত একজন খ্যাতনামা এটর্নী ছিলেন। বিশ্বনাথের সহধর্মিণী ভুবনেশ্বরী একাধারে বুদ্ধিমতী, সুরূপা ও ধর্মানুরাগিণী। সংসারের বিবিধ কর্তব্যের মধ্যেও তিনি রামায়ণ-মহাভারত পাঠের সুযোগ করিয়া লইতেন। আচারে-ব্যবহারে, স্বকীয় তেজস্বিতায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ভুবনেশ্বরীর এক বিশেষ আভিজাত্য ছিল; এই আভিজাত্যের অধিকারী হইয়াই নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

বাংলার বুকে শীতের কুহেলীময় আবেষ্টন তখনও দূর হইয়া যায় নাই। পৌষের দীর্ঘ নিশার অন্ধকার সেদিনের মতো বিদূরিত করিয়া সূর্যের আলোক ও তাপ কুহেলীর আবরণ প্রায় সরাইয়া ফেলিয়াছে। ঊর্ধ্বে ঐ শুভ্র স্বচ্ছ নীলাকাশ তখন অপূর্ব-আলোকস্নাত হইয়া কেমন এক অতল রসমাধুর্যে ভরপুর। এমনি সময়ে এই ক্ষণটিতেই, এই সূর্য-হসিত পৃথিবীর আলোকের লগ্নে, আর এক আবির্ভাবের সংযোগ হইল। ১৮৬৩ খৃঃ ১২ই জানুআরি, সোমবার, বাংলা ১২৬৯ সালের পৌষ-সংক্রান্তি কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে, সূর্যোদয়ের পরেই ৬টা ৪৯ মিনিটে—পিতা বিশ্বনাথ দত্তের গৃহে শুভ শঙ্খধ্বনির মধ্যে মাতা ভুবনেশ্বরীর কোলে পদ্মপলাশনেত্র নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিল, ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতায় শিমুলিয়া-পল্লীতে। কাশীর ৺বীরেশ্বর শিবের আশীর্বাদে তাঁহাদের এই পুত্রলাভ হয় বলিয়া নরেন্দ্রনাথের নাম হইল বীরেশ্বর—বাপ-মায়ের স্নেহ-আহ্বানে ঐ দীর্ঘনাম স্বল্পাক্ষর 'বিলে' নামে পরিণত হইল। অন্নপ্রাশনের সময় এই 'বিলে'ই 'নরেন্দ্রনাথে' পরিবর্তিত হয়।

নরেন্দ্রনাথের এই পার্থিব জন্ম-বৃত্তান্তের সহিত সেই রহস্যঘন অপার্থিব জন্ম-কারণটিও আমাদের স্মরণ করিতে হইবে। এবং সেই ইঙ্গিত-সঞ্চয়ন-মানসেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী-সংগ্রহে আমাদের সযত্ন প্রয়াস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: একদিন দেখছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম ক'রে উহা ক্রমে সূক্ষ্ম ভাব-জগতে প্রবিষ্ট হ'ল।...নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তি-সমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখতে পেলাম।...মন ক্রমে অখণ্ডের রাজত্বে প্রবেশ ক'রল। সাত জন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন। জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা, দেব-দেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করেছেন। বিস্মিত হয়ে দেখি—সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হ'ল। অদ্ভুত দেবশিশু অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক অন্যতম ঋষিকে বলতে লাগলো—'আমি যাচ্ছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'... নরেন্দ্রনাথকে দেখামাত্র বুঝলাম, এই সেই ব্যক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে নরেন্দ্রনাথের এই আসল জন্মেতিহাস শুধু নরেন্দ্রনাথের নয়, বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দের জন্মেতিহাসের ঐতিহ্যবাহী ভিত্তিভূমি। ঐ জ্যোতির্ময় দেবশিশুই শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং অসীমের সেই ধ্যানলোকে সমাধিস্থ সাতজন ঋষির একজনই ঐ দেবশিশুর আকর্ষণে এই ধরণীতে নরেন্দ্রনাথরূপে আসিয়াছিলেন। এই অপূর্ব বৃত্তান্ত শুধু একটা উদার রসবোধ নয়, মানব-প্রয়োজনে ইহা হৃদয়-সংবেদনের এক স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। ইহা যেন এক জ্যোতির্বিহঙ্গের নিঃসীম আনন্দ-সত্তার অপার অজস্রতায়—মুক্তপক্ষে বিচরণ করিতে করিতে, হঠাৎ এক অত্যদ্ভুত প্রেমের আকর্ষণে কেমন এক প্রত্যাশিত সম্ভাবনায় এই পৃথিবীর নীড়ে আসিয়া ক্ষণিকের জন্য অবস্থান। তথাপি তাঁহার এই বিশ্রামহীন ক্ষণিক অবস্থানেও ধরার মানবের অভ্যস্ত জীবন-পরিমণ্ডলে কিরূপ দুর্বার আশ্বাসের বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা এই জীবন-সম্প্রসারণের মধ্যে, বিচারকের ভঙ্গিতে নয়, সুহৃদের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিব। লক্ষ্য করিব, কেমন করিয়া এক সুগভীর হৃদয়বত্তায় মহাপ্রেম যেন জ্ঞানের হাত ধরিয়া তাহাকে এই ধরায় আনয়ন করিয়া আধ্যাত্মিক জাগৃতির জন্য তাহাকে রাখিয়া গেলেন। দেখিব, ব্রহ্মের রস-রূপ কেমন করিয়া এই মানবলোকে পুষ্পিত ও বিকশিত হয়। দেখিব, কেমন করিয়া স্রষ্টা তাঁহার নিয়মহীন আত্মস্ফূর্তির স্বতন্ত্রতায়, নিজেরই সৃষ্টির মধ্যে বীজরূপে প্রবেশ করিয়া বিশ্বাত্মার সঙ্গে মানবের ক্ষুদ্রাত্মাকে বিজড়িত করিয়া ভাবজীবন গড়িতে সাহায্য করেন।

চল পথিক, এই জীবন-গঙ্গায় অবগাহন করিবে চল। চল, জ্যোতিঃস্নানের অপূর্বতায়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরই হলেন এ-যুগের যুগমানব, 'মহাজন'; মহাজন-প্রদর্শিত পথই আমাদের আলো পাবার একমাত্র পথ। 'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥'—বেদসমূহ ভিন্ন, স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতেও পরস্পর মিল নাই, মুনি-ঋষিরাও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। আর ধর্মের মূল তত্ত্বটি লুকানো আছে গুহায়—হৃদি কন্দরে। আমাদের অন্তরেই নিহিত রয়েছে সেই অনাদি অনন্ত শাশ্বত সত্য-বস্তুটি। মহাপুরুষগণ যে পথ বেয়ে অন্তরে প্রবেশ করলেন, Kingdom of Heaven (স্বর্গরাজ্য) আবিষ্কার করলেন—কলম্বাসের মতো আমেরিকা আবিষ্কার করলেন—এটি পূর্ব হতেই ছিল, শুধু জানা ছিল না। সেই পথই আমাদের আলো পাবার পথ। ঠাকুর এসে যুগের উপযোগী ক'রে নতুনভাবে দেখালেন সেই শান্তির পথ। ঠাকুরের অমৃত-ময়ী উপদেশ-বাণীগুলি মস্তিষ্ক-প্রসূত নয়। তিনি পণ্ডিত বা বিদ্বান্ ছিলেন না। 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা' তিনি শেখেননি। শিখেছিলেন আত্মবিদ্যা, জেনেছিলেন পরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা শাস্ত্রগ্রন্থাদি, যে বিদ্যা আয়ত্ত করলে অর্থাগম হয়। আর পরা বিদ্যা অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান। এই বিদ্যা লাভ করলে আলোর রাজ্যে যাওয়া যায়। অনাবিল শান্তির পথ পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি এলেন আমাদের পথ দেখাতে, সে সময় সমস্ত দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটেছিল। আমরা বিদেশীর চাকচিক্যময় বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হয়ে রাস্তার কুকুরের মতো তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ধর্মের রাজ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায় খেয়োখেয়ি ক'রে মরছিল। ফলে নতুন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, 'ব্রাহ্মসমাজ', এই রকম সামাজিক অবস্থায় এলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তাই সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর কাছে আসত। আর মন ভরিয়ে নিয়ে যেত তাঁর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃতে। এই কথামৃত-পানে তাঁরা ধন্য হতেন আর পত্রিকা মারফত অন্যকেও ধন্য হওয়ার আহ্বান জানাতেন।

'কথামৃত' পুস্তকে আমরা পাই অমৃতত্বের সন্ধান। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব এবং মহাপুরুষের আশ্রয় পাওয়া একান্ত দুর্লভ। দেবানুগ্রহ ভিন্ন সবগুলি একত্র পাওয়া যায় না। ঠাকুর বলতেন, 'বাড়িতে মাছ এলে, মা ছেলেদের হজমশক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম রান্না করেন। কারও জন্য ঝাল বেশী, কারও কম ঝাল, কাউকে শুধু ভাজা, আবার যে পেটরোগা তার জন্য একটু হলুদ দিয়ে ঝোল ক'রে দেন।' আস্বাদন করান সকলকেই, উপযুক্তভাবে; যার পেটে যেমন সয়। ঠাকুরের কাছেও যারা আসত, তাদের প্রত্যেককেই তাদের ভাবের উপযুক্ত খাদ্য তিনি দিতেন। জ্ঞানীরা পেত জ্ঞানের উপদেশ 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন';

* আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০.১১.৫৬ তারিখ সন্ধ্যায় আরাত্রিক-অন্তে ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে।

আবার সগুণ ব্রহ্মের উপাসকরা তাদের পথ পেত। শাক্তরা পেত মাতৃনাম, বৈষ্ণবরা শুনত কৃষ্ণপ্রেমে গদ্‌গদভাবে কীর্তন। ঠাকুর সকলের জন্য এসেছিলেন। সকলকে তাদের প্রাণের বস্তু দান করতেন।

গীতার সম্বন্ধে এই রকম উক্তি আছে, গীতা পাঠ করলে সর্বশাস্ত্র-পাঠের ফল পাওয়া যায়। কারণ গীতা হ'ল দুগ্ধস্বরূপ। উপনিষদ্ হ'ল গাভী, দোগ্ধা গোপালনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং, আর যে অমৃত তিনি দোহন করলেন সেটি গীতা, আর পান করাচ্ছেন সুধীজনকে। যারা জ্ঞানী ও বিবেকবান্, তারাই এই অমৃত-পানে এর অর্থবোধে ধন্য হয়। তাই বলা হয়—'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।' কেননা 'যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা।' তাই গীতা পড়লেই সব পড়া হয়ে যায়। কৃষ্ণের কাছ থেকে গীতা শুনে অর্জুনের মোহ দূর হ'ল, বীরত্বের স্মৃতি তিনি ফিরে পেলেন। যুদ্ধের শেষে এক সময়ে কৃষ্ণের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে অর্জুন তাঁকে বললেন, 'সখা, গীতা প্রায় ভুলেই গিয়েছি, আর একবার আমাকে গীতা শ্রবণ করাও।' উত্তরে কৃষ্ণ বললেন: ভাই, বড়ই বিপদে ফেললে, আমারও সে আর এখন মনে নেই।

ন চ শক্যম্ তন্ময়া বক্তুম্ ভূয়স্তথা অশেষতঃ।
পরমং ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥

তখন যে-অবস্থায় বলেছিলাম, আমার মনের সে অবস্থা এখন আর নেই। সে সময় আমি পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলাম। ঐ যোগযুক্ত থাকাকালেই আমার মুখ থেকে গীতা বেরিয়েছে। উপাসনার বিভিন্ন বিষয় গীতায় যা বলেছি, সব তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলাম ব'লে সম্ভব হয়েছে।

ঐ হিংসা-রাগ-দ্বেষ মারামারি-হানাহানির মধ্যে 'গীতা'রূপ অমৃত উত্থিত হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের ঐ আবহাওয়ার মধ্যে ভগবান যোগযুক্ত হয়েছিলেন। অত কোলাহলের মধ্যেও অনন্ত নীরবতা! 'Intense activity in the midst of eternal calmness'—স্বামীজী বলতেন।

শ্রীকৃষ্ণ ধীর, শান্ত, সমাহিত হয়ে তাঁর মনকে অন্তর্নিবিষ্ট করেছিলেন। তার ফলে বেরিয়েছিল গীতা। অর্জুনকে ক্লৈব্য পরিত্যাগ ক'রে বীরত্বে উদ্দীপ্ত করবার জন্য গীতা-উপদেশ তিনি দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ একবারমাত্র ঐ যোগযুক্ত অবস্থায় গীতা বলতে পেরেছিলেন। পরে আর অতটা সম্ভব হয়নি। তিনি ছিলেন সন্দীপন মুনির ছাত্র। তাঁর আশ্রমে তিনি বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ঠাকুর প্রায় নিরক্ষরই ছিলেন। তিনি যা বলতেন, তাও যোগযুক্ত থেকে। 'কথামৃতে' যা পাই, তা সর্বশাস্ত্রসার। ঐ রকম নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ কথা বোঝানো কিভাবে সম্ভব হ'ল? তাঁর কথা শোনবার জন্য সে-যুগের বড় বড় মনীষী, ব্রাহ্মসমাজের নেতারাও তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। এই পাগল পূজারীর অমৃতময়ী বাণী শোনবার জন্য সকলেই আকুল হয়ে ছুটে আসত। এই অমৃতবাণী আসত কোথা থেকে, কে এই কথা ব'লত। ঠাকুরের ভেতর থেকে জগদম্বাই ঐ কথা বলতেন। তিনি যন্ত্রী হয়ে তাঁর বাণী ঠাকুরের মুখ দিয়ে বলাতেন।

সিঁথি ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুর গিয়েছেন, সেখানে ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় নেতারা তাঁর সঙ্গে আনন্দে নৃত্য ও কীর্তন করেছেন।

স্বামীজী-প্রমুখ ঠাকুরের কয়েকজন শিষ্যও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু দক্ষিণেশ্বরের প্রতিমা-পূজারীকে তাঁরা বর্জন করেননি। কি আশ্চর্য ব্যাপার! প্রতিমা-

পূজার বিরোধীরাই শ্রেষ্ঠ প্রতিমা-পূজককে নিয়ে নৃত্য কীর্তন করছেন, উৎসবাদিতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনছেন। তাঁরা কালী মানেন না, কিন্তু কালীর পূজারীকে তাঁরা মানছেন! এর কারণ এই আশ্চর্য পূজারী তাঁদের ভাবের কথা তাঁদের মতো করেই বলতেন, তাঁদের গান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। এই যে যোগযুক্ত অবস্থা, এই অবস্থায় তাঁর 'কথামৃত' তিনি জগৎকে দান করেছেন। এই অবস্থাতেই গীতা বলেন শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুরের কালী একাধারে নিরাকার—আবার তিনি সকলের মা। খৃষ্টান-মুসলমান সকলেরই মা তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি গির্জায় গিয়ে দেখবেন, খৃষ্টানরা তাঁর মাকে সেখানে কিভাবে ডাকছে। সকলকেই তিনি মাতৃসন্তান জ্ঞান করতেন। কিন্তু কি ক'রে এমন হ'ত? পণ্ডিতদের সমস্ত শাস্ত্র তাঁদের মস্তিষ্ক-প্রসূত। তাঁদের Intellect (বুদ্ধি) আছে। কিন্তু ঠাকুরের ছিল Intuition, অনুভূতি। সমস্ত সত্য তিনি দেখেছিলেন। তিনি জানতেন, সত্য এক, ভিন্ন পথের সাধকরা শুধু ভিন্ন ভিন্ন রূপে সত্য উপলব্ধি করেন। মূলতঃ সত্য এক। ঠাকুর বলতেন, জলকে যেমন কেউ বলে ওয়াটার, কেউ বলে পানি, কেউ বলে অ্যাকোয়া। কিন্তু নামের এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জল মূলতঃ একই। দ্বাদশ বর্ষ সাধনার দ্বারা তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, 'যত মত তত পথ'—সব ধর্মই সত্য।

বিভিন্ন মতের বিবাদ মেটাবার জন্য তিনি এসেছিলেন। এই বিবাদটাই ছিল ধর্মের গ্লানি, এই গ্লানি থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য এসেছিলেন অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ। দ্বাদশ বর্ষ ধরে তিনি যে কত ভাবে সাধনা করলেন! সর্ব মতের সাধনা তিনি করলেন। এত প্রকারের সাধনা একই জীবনে এর আগে আর কোন মহাপুরুষকে করতে দেখা যায়নি। তিনি অনন্যশরণ হয়ে মাকেই ধরেছিলেন, তাই মা-ই তাঁর সব ভার নিয়েছিলেন। জগদম্বা তাঁর সন্তানের সাধনার জন্য পঞ্চবটী নির্দিষ্ট করেছিলেন। সবই মা নির্দিষ্ট ক'রে রেখে-ছিলেন তাঁর পরমপ্রিয় সন্তানের জন্য।

দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি শ্যামা-মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, বারাণসী যাওয়া মায়েরই স্বপ্নাদেশে বন্ধ হ'ল। সমন্বয়াচার্যের সাধনপীঠে পূর্ব হতেই সমন্বয় সাধিত হ'ল, শ্যামার পাশে শ্যামের মূর্তি স্থাপিত হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আগমনের পূর্ব হতেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে থাকলো। তিনি এলেন, তাঁর পঞ্চবটীর বেড়া বাঁধবার কঞ্চি-বাখারি-দড়ি-পেরেক সব ভেসে এল; এল বৃন্দাবনের রজঃ, বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। নির্জনে তন্ত্র-সাধনার জন্য এলেন ভৈরবী। তাঁকে গুরুত্বে বরণ করলেন তিনি, নারীকে দিলেন শ্রদ্ধার আসন। তারপর এলেন তোতাপুরী সাধনার শেষ অবস্থায় সাহায্য করতে। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে তোতা-পুরীর ৪০ বছর লেগেছিল, সেই অবস্থা ঠাকুর তিনদিনে লাভ করলেন।

সব ধর্মের সাধনা ক'রে তিনি বুঝলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এটি ব্রহ্ম, আর তার শক্তি, সেটি তাঁর মা, ব্রহ্মা বিষ্ণু সবই মায়ের রূপ। শুক-শারীর দ্বন্দ্বে আছে: শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, শারী বলে, আমার রাধা শক্তি দিয়েছিল। এই শক্তিই জগতের মূল 'আধারভূতা ত্বমেকা ভবানী'। এই শক্তিকেই তিনি বিভিন্ন সময় সম্মান জানিয়েছেন

বিভিন্ন রূপে। বাল্যে ধনী-কামারনীকে ভিক্ষামাতা-রূপে নিয়েছিলেন, ভৈরবীকে পেয়েছিলেন তন্ত্র-সাধনের গুরু-রূপে। আর জননী সারদামণিকে বাল্যেই কুটো বেঁধে রেখেছিলেন জীবনসঙ্গিনী হিসাবে এবং পরে মাতৃভাবে পূজা করেছিলেন। এই সব কথা এখন ক্রমে ক্রমে লোক বুঝছে আর অবাক্ হচ্ছে, ঘরে ঘরে আজ তাঁর পূজা করছে। অদ্ভুত এই দেব-মানব! অপূর্ব তাঁর জীবন ও বাণী!

সাধনার শেষে মুহুর্মুহুঃ তাঁর সমাধি হচ্ছে, জগদম্বার সঙ্গে তাঁর সত্তা এক হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় শরীর বেশী দিন থাকে না। ঠিক এই সময় তাঁর এই দেবতনু লোকহিতার্থে রক্ষা করার জন্য মা এক সাধুকে পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরে। সেই সাধু জোর ক'রে তাঁর বাহ্য চৈতন্য একটু ফিরিয়ে এনেই তাঁকে খাবার খাওয়াতেন। মা-ই তাঁর ছেলেকে রক্ষা করার সব ব্যবস্থা করছেন। তারপর ঠাকুরের এল অন্তর্দশা। মায়ের কোল ছেড়ে তিনি নড়তে চাইতেন না। মায়ের কোল-ঘেঁষা হয়ে থাকতেন। মা তখন ধর্মসংস্থাপনের জন্য মানব-সমাজকে গ্লানিমুক্ত করার জন্য তাঁর সঙ্গে এক রফা করলেন। তাঁকে বললেন 'তুই ভাব-মুখে থাক'।

দুটো জগৎ আছে। বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ। বাইরের দিকে শুধু চাওয়া-পাওয়ার জগৎ। আর অন্তর্জগতের জন্য চাই শুধু দিব্য চক্ষু—প্রেমচক্ষু। এটির দ্বারা সকলের অন্তরের বস্তু উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয়ের কাজ বোঝা যায় এরই দ্বারা। একবার তার শক্তি অনুভব করলে, একবার তার ধ্বনি শুনলে, বহির্জগতের দিকে আর মন যায় না। এই দুই জগতের মাঝে একটা দ্বার আছে। 'ভাবমুখে থাকা' মানে ঐ দরজায় বসে থাকা। ঠাকুর তাই বলতেন, 'মা রাশ ঠেলে দেন। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে, তিনি ঠেলে দিচ্ছেন আর মেপে যাচ্ছি।' তাঁর বাণী শুনতে শুনতে বুদ্ধির পারে চলে যাওয়া যায়। কারণ এটা পুঁথিগত বিদ্যার ব্যাপার নয়, অনুভূতি প্রত্যক্ষদর্শনের ব্যাপার। ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত অবস্থায় 'গীতা' বেরোয়। 'কথামৃত'ও তাই। যোগযুক্ত অবস্থার ফলস্বরূপ। এটি শুধু ঠাকুরের বাণী নয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার বাণী—যুগধর্ম। এটি পড়লে সব শাস্ত্র পড়া হয়। পথ দেখা যায় অন্ধকারে। তিনি বলতেন, 'বাদশাহী আমলের টাকা এখন চলবে না, এখন রানীর টাকা চাই। দশমূল পাঁচন এখন চলে না, ডি-গুপ্ত চাই।' তাঁর কাছে এসে সকলে আলো পেত, পথ পেত। গীতার কথা কত হাজার বছর ধরে চলে আসছে আজও। কারণ সেটি ভগবানের বাণী। আর সেই পাগল পূজারীর কথামৃতও আজ সম-শ্রদ্ধেয়। কারণ এও মায়েরই বাণী। এর মধ্যে আছে:

(১) কি ক'রে সংসারে থাকা যায়?

(২) ঈশ্বরে কি ক'রে মন হয়?

(৩) ঈশ্বরের দর্শন হয় কি না?

(৪) মনের কি অবস্থায় তাঁর দর্শন পাওয়া যায়?

স্বামীজীকে প্রথম দর্শন

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দকে আমি ঠিক ঠিক প্রথম দর্শন করি, যখন (১৮৯৭) তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্বে (১৮৯০) তাঁকে একবার দেখেছি মণি গুপ্ত মহাশয়ের মসজিদবাড়ির জোড়া মন্দিরের নিকট।

মণিবাবুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি, হঠাৎ তাঁকে সম্বোধন ক'রে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক বললেন, 'কিরে খোকা, কেমন আছিস?'

মণি গুপ্ত তাড়াতাড়ি তাঁর পদধূলি নিয়ে বললেন, 'তিনি যেমন রেখেছেন। তুমি বুঝি বেণী ওস্তাদের বাড়ি যাচ্ছ?'

যুবক 'হ্যাঁ' ব'লে চলে গেলেন বেণী ওস্তাদের কাছে গান শিখতে। মণিবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কে?' তিনি বললেন, 'ঠাকুর যাঁকে সহস্রদল পদ্ম বলতেন এবং সপ্তর্ষির একজন ঋষি ব'লে সম্বোধন করতেন, ইনি সেই নরেন্দ্রনাথ।'

তারপর কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল। তখন কারও সন্ন্যাস-নাম প্রচার হয়নি। পরে মণিবাবুর নিকট পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে।

কুমারটুলির সুবিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়িতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিছুদিন অবস্থান করেন। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা করেন এবং আমেরিকাবাসীর উপর তাঁর যে অপূর্ব প্রভাব, স্বামীজীর বাগ্মিতা-শক্তি প্রভৃতির কথা আছে, এমন একখানি পুস্তিকা তখন সেখানে গোসাঁইজীর আদেশে দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছিল, সেই পুস্তিকা পাঠে জানলাম—নরেন্দ্রনাথই স্বামী বিবেকানন্দ। সেই পুস্তিকায় বরানগর ও আলমবাজার মঠের কথাও উল্লিখিত ছিল।

আমি ১৮৯৩ খৃঃ মাঝামাঝি থেকে বরানগর মঠের স্বামীজীদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলাম। আমরা তখন যুবক। স্বামীজী যখন ভারতে ফিরে আসেন, তখন সবে এন্‌ট্রান্স পাস ক'রে কলেজে ভরতি হয়েছি। বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজ, যোগেন মহারাজ, গিরিশবাবু, অতুলবাবু, পূর্ণবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের লীলা-সহচরদের সঙ্গে স্বামীজী-প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা হ'ত। যখন রামনাদে ও মাদ্রাজে স্বামীজীর বিরাট অভ্যর্থনা হয় এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় সেইগুলি প্রকাশিত হ'ল, তখন আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা অপূর্ব ভাবের প্রেরণা আসে এবং স্বামীজীর সংবাদ নেবার জন্য আমি প্রায়ই বৈকালে বা সন্ধ্যার পর, কখনও প্রাতঃকালে বলরাম-মন্দিরে যেতাম।

চারদিকে অভ্যর্থনা হচ্ছে, অথচ কলকাতায় কোন অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়নি—এই বিষয় নিয়ে সেখানে যখন আলোচনা হচ্ছিল, তখন ঠাকুরের 'ছোট নরেন'—যিনি এটর্নি ছিলেন—বললেন, 'ইণ্ডিয়ান নেশনে' শ্রীযুত এন. এন. ঘোষ স্বামীজীর খুব উচ্চ প্রশংসা করেছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ওপর তাঁর খুব প্রভাব আছে। ঐখানে একবার প্রস্তাব করি;

দেখি, যদি ওদিক থেকে কোন সমিতি গঠিত হয়।

তখন চারদিক থেকে চেষ্টা হ'তে লাগলো একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করবার জন্য। কলকাতার প্রসিদ্ধ লোকেরা এবং শ্রীযুত হীরেন দত্ত মহাশয় এ-বিষয়ে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সিংকে সভাপতি ক'রে স্বামীজীকে একটি মানপত্র দেবার কথা হয়।

আমিও তৎকালে শ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য সতীশ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে গোসাঁইজীকে দর্শন করতে যাই। তিনি আমার স্বর্গত পিতাকে চিনতেন এবং সস্নেহে বললেন, 'তুমি প্রসন্নের ছেলে?' গোসাঁইজীর ওখানে দেখেছি নিত্য সন্ধ্যাকালে সংকীর্তন হ'ত এবং গোসাঁইজীর ভাববিহ্বল নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। একদিন দেখি, গোস্বামী মহাশয় একাগ্র মনোযোগ সহকারে স্বামীজীর মান্দ্রাজ-ভাষণের পাঠ শুনছেন এবং মাঝে মাঝে বলছেন, সব ঠিক শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে।

অভ্যর্থনা-সমিতি যখন গঠিত হয়, তখন ভক্ত শচীন্দ্রনাথ বসুর অধ্যক্ষতায় আমি একজন ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলাম। একদিন বেলা ১০ টার সময় বলরাম-মন্দিরে গিয়েছি, তখন তিনি আমাকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নিকট এক চিঠি দিলেন এবং বললেন, 'স্বামীজী বজবজে আসছেন, এই চিঠিটা যেন তিনি (নরেন্দ্র মিত্র) সারদা মহারাজকে পাঠিয়ে দেন।' অভ্যর্থনা-সমিতির অর্থাভাবে বজবজ থেকে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত স্বামীজীকে আনবার জন্য একটি স্পেশাল ফার্স্ট ক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হয়। স্বামীজীর আসবার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখি গিরিশবাবু প্রভৃতি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ-স্বামীজীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন: স্পেশাল ট্রেন আসবে ভোর ৬ টার সময়, এই শীতে কি লোক হবে? যাতে সর্বসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন, এটাই আমাদের ইচ্ছা।

পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন, 'আমাদের কারও অগ্রণী হওয়া উচিত নয়। স্বামীজীকে ওরা বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে নিয়ে যাবে। বাইরে থেকে আমাদের দেখাই ভাল, কি বলেন মাস্টার মশায়?'

গিরিশবাবু একটু হতাশ ভাব দেখিয়ে বললেন, 'মান্দ্রাজে যে-রকম অভ্যর্থনা হয়েছে, আর আমাদের বাংলাদেশে—ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় যদি সে-রকম জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা না দেখা যায়, তবে বড়ই লজ্জার কথা।'

এই সময় নব-প্রকাশিত 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ এসে গিরিশবাবুর কথা শুনে বললেন, 'কাল দেখবেন স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য হাজার হাজার লোক যাবে। কলকাতা শহরে এবং আশেপাশে সর্বত্র বড় বড় প্লাকার্ড মারা হয়েছে এবং লক্ষাধিক হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হয়েছে। এতে নিশ্চয়ই লোক হবে।'

শচীনবাবু বললেন, 'কমিটি থেকে দুটি বিরাট তোরণ করা হয়েছে, একটি শিয়ালদায়—হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে, আর একটি রিপন কলেজের সম্মুখে। এই সমস্ত রাস্তা আমরা স্টেশন থেকে রিপন কলেজ পর্যন্ত পতাকা, ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছি।'

যাই হোক, প্রায় শেষ-রাত্রিতে ভোর ৫টার সময় আমি স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাই স্বেচ্ছাসেবকরূপে, তখন দেখি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা দায়—এত বিরাট জনতা এবং

হ্যারিসন রোডে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির নিকট থেকে সমস্ত বাড়ির অধিবাসীরা ফুল পতাকা লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছিল। এদিকে সংকীর্তনের দল, নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীর দল এবং বিরাট জনতা। কোন রকমে স্বেচ্ছাসেবকদের চিহ্ন থাকাতে মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নির্দেশে আমরা প্ল্যাটফর্মে স্পেশাল কামরার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন স্বামীজীর সেই স্পেশাল ট্রেন এল, তখন মাননীয় আনন্দ চার্লু ভিড়ের ঠেলা-ঠেলিতে পড়েই গেলেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা কোন রকমে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। তখন চারুচন্দ্র মিত্র মশায় আমাদের আদেশ দিলেন, 'তোমরা স্বামীজীকে বেষ্টন ক'রে আমরা যে রাস্তা দেখাচ্ছি, সেই রাস্তা দিয়ে আমাদের অনুসরণ ক'রে নিয়ে যাবে।' আমরা তদনুসারে স্বামীজীকে ঘিরে ঘিরে চললাম। কামরা থেকে যখন স্বামীজী নামেন, তখন প্রণাম করতেই বললেন, 'That's all right'. (বেশ, বেশ!)

স্বামীজী পৌঁছানো-মাত্রই চারিদিকে স্বামীজীর জয়ধ্বনি উঠতে লাগলো। চারুবাবু নির্দেশ দিলেন কোচম্যানকে ঘোড়া খুলে দিতে, এবং আমাদের গাড়ী টেনে নিয়ে যেতে বললেন। স্বামীজী তাতে আপত্তি করলেন, কিন্তু চারুবাবু বললেন, 'আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা করছি, আপনার আপত্তি টিকবে না। এরা রিপন কলেজ পর্যন্ত অনায়াসে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে।'

তখন স্বামীজী ফুলমালা-সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে সকলকে প্রণাম করতে লাগলেন। ক্যাপটেন সেভিয়র, মিসেস সেভিয়র, গুডউইন সাহেব ফিটনে উপবিষ্ট। ফিটনের পিছনে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ঠাকুর ও স্বামীজীর জয়ধ্বনি করছেন। যখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের কাছে বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীজীর বাসভবনের সম্মুখে লোকের ভিড়ে ফিটন দাঁড়িয়ে ছিল। তখন আমরা দেখি ত্রিতলের বারান্দা থেকে গোঁসাই স্বামীজীকে জোড়হস্তে প্রণাম করছেন। স্বামীজীও তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন।

অতিকষ্টে স্বামীজীকে কোন রকমে পুরাতন রিপন কলেজের সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সামান্য একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় টেবিল চেয়ার দিয়ে স্বামীজীকে বসানো হ'ল। সেখানে বক্তৃতা করা অসম্ভব। স্বামীজী শুধু দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে বললেন, 'তোমাদের উৎসাহ এবং সম্বর্ধনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, আনন্দিত হয়েছি। এখানে বক্তৃতা করা অসম্ভব। তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ভঙ্গ হোক।'

তখন ফেরবার সময় দেখি, আমার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র লোকের দ্বারা প্রায় পিষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাকে কোন রকমে তুলে বার ক'রে দেওয়া হ'ল। আমাদের এবং যুবকদের এত উৎসাহ যে আমরা বললাম, পশুপতিনাথের বাড়ি পর্যন্ত এই ফিটন আমরা টেনে নিয়ে যাব। এইভাবে যখন আমরা তাঁকে টেনে নিয়ে যাই, তখন ধীরে ধীরে লোকের ভিড় কমতে লাগলো। রাস্তার এক পাশে দেখি, স্বামী সুবোধানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যদিকে লাটু মহারাজ—জনতার মধ্যে দূর থেকে তাঁরা স্বামীজীকে দর্শন করছেন।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পূর্ণবাবুর বাড়ির সামনে স্বামীজী ফিটন থামাতে বললেন এবং সারদা মহারাজকে বললেন, 'পূর্ণ-ভাইকে খবর দে।'

পূর্ণবাবু তখন স্নান করছিলেন, সেই ভিজে কাপড়েই স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে বললেন, 'আমি স্টেশনেই আপনাকে দূর থেকে দর্শন ক'রে চলে আসি, আপিস যেতে বেলা হবে ব'লে।' স্বামীজী বললেন, 'সন্ধ্যের পর যাস। দেখা করিস।'

আমরা জয়ধ্বনি করতে করতে পশুপতি বোসের বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি টেনে নিয়ে গেলাম। সেখানেও পুষ্প-সজ্জিত বিরাট তোরণ। ফটকের সামনে পশুপতি বোস প্রভৃতি স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী যোগানন্দ সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দিলেন। স্বামীজী দু-জনকেই প্রণাম করলেন, বললেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'।

মহারাজও উত্তর দিলেন, 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা'। মাষ্টারমশাই এসে প্রণাম করতেই স্বামীজী হেসে বললেন, 'সখি রে'! তারপর নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু প্রণাম করতেই 'এ যে বিন্দে-দূতী দেখছি' ব'লে তাঁদের সঙ্গে নানারকম রহস্যালাপ করতে লাগলেন। সেই নীচে এক পাশে এক বেঞ্চিতে হুটকো গোপাল বসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে দেখে বললেন, 'ওরে হুটকো, আমি সেই নরেনই আছি। ওখানে লুকিয়ে আছিস কেন, এদিকে আয়। বাংলা বুলি ভুলিনি।'

এই ভাবে ১০ মিনিট কাল অতিবাহিত হ'লে পশুপতি বোস প্রভৃতি স্বামীজীকে ভেতরে নিয়ে যেতে এলেন।

উপরে উঠেই গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর গলায় একটা মালা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় স্বামীজী গিরিশবাবুর হাত ধরে বলছেন, 'ও কি জি-সি'[১]? এতে যে আমার অকল্যাণ হবে। তোমার রামকৃষ্ণকে 'জয় রাম' ব'লে সাগর পার ক'রে দিয়েছি।'

গিরিশবাবু স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছেন। এমন কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরে সে আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছিল; এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। তখন স্বামীজী মাস্টার মশায়ের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাস্টার মশায়কে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'মাস্টার মশায়, এ সব যা দেখছেন (পাশ্চাত্য-বিজয), আমি নিমিত্ত-মাত্র। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। আর আমাদের মা-ঠাকরুনকে—ঠাকুর যে আমাকে ইঙ্গিত করেছিলেন, তা জানিয়ে তাঁর অনুমতি ও আদেশ চেয়েছিলাম। যার আশীর্বাদে অনায়াসে সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে আমি হলাম সেখানকার (পাশ্চাত্য দেশের) বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক সহস্র সহস্র নরনারীর কাছে সব চেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি। সবই অনুভব করছি, সেই ঠাকুরের খেলা। অনেক কথা বলবার আছে, পরে এক সময় আপনাকে ব'লব। কিন্তু এখন আমার মত এই—এদেশে ধর্মপ্রচার অনেক হয়েছে, এখন চাই শিক্ষা। সাধারণ মানুষ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে পারে, পেট ভরে দুমুটো খেতে পারে, লেখাপড়া শিখে জীবিকা অর্জন করতে পারে—এই হচ্ছে বর্তমান ভারতের বিশেষ প্রয়োজন। মাস্টার মশায়, যখন ওদেশে

---

১ গিরিশবাবুকে সাধারণতঃ স্বামীজী জি-সি (G. C.) ব'লে সম্বোধন করতেন।

ঐশ্বর্য চোখে প'ড়ত, তখন দেশের দুরবস্থা ভেবে আমার কান্না পেত, আর মেঘদূতের শ্লোক[২] মনে হ'ত:

চারদিকে বিদ্যুতের মতো সুন্দরীর দল, আকাশস্পর্শী প্রাসাদোপম বাড়ি দুধারে, সেই সব বাড়ি হাস্য-কৌতুকে নৃত্য-সঙ্গীত প্রভৃতিতে মুখরিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—আর আমাদের দেশে চারদিকে আবর্জনা, দুর্গন্ধ, অর্ধ-উলঙ্গ মানুষ—শ্রীহীন ক্ষীণদৃষ্টি, নিরক্ষর নরনারী দেখে আমার মনে হ'ল, এদের সেবা করাই ভারতের বর্তমান ধর্ম। খালি পেটে ধর্ম হয় না, ঠাকুর বলতেন না? এই (সেবা) ধর্ম প্রচার করাই আমার লক্ষ্য। পাশ্চাত্য দেশের সব প্রলোভন থেকে ঠাকুর আমাকে রক্ষা করেছেন। আর আশ্চর্য কাণ্ড—কেউ কেউ ঠাকুরের ভাব, আগে থেকেই জেনে বসে আছে, কেউ বা স্বপ্নে। আমি সে দেশে মেয়েদের দেখেছি মা-বোনের মতো। তাদের মধ্যে অনেকে আমাকে মা-বোনের মতোই সেবা করেছে। ভোগভূমি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন। আর এদেশে সেখানকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, উন্নত চিন্তাগুলি, সামাজিক স্বাধীনতা—ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রচার করতে হবে।

এমন সময় শ্রীশ্রীমহারাজ এসে বললেন, 'তোমার চা-টা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

স্বামীজী বললেন, 'রাজা, বিজয়বাবুকে দেখলাম আসবার সময়। তাঁকে মঠে এনে রাখতে পারলি না?'

রাজা মহারাজ বললেন, 'এখন তাঁর বহু শিষ্য-শিষ্যা। আমাদের শোবার জায়গা হওয়াই মুস্কিল। তিনি একলা থাকতেন, সে আলাদা কথা।' স্বামীজী বললেন, 'আমি শিগ্‌গির তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।'

যেদিন স্বামীজী প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হ্যারিসন রোডের বাড়িতে যান, সেদিন আমি জানতে পেরে পূর্বেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখি—গোঁসাইজীর সম্মুখে একটি পৃথক আসন রাখা হয়েছে। স্বামীজী যে সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন, সেই সময়ের জন্য গোঁসাইজী প্রতীক্ষা করছিলেন। গোঁসাইজীর নিকট তখন ১০।১৫ জন লোক উপস্থিত ছিল। কিন্তু যখন স্বামীজী ওপরে এলেন, তখন বেজায় ভিড়। উভয়ে উভয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন—অনেকক্ষণ। গোঁসাইজী বললেন, 'জয় রামকৃষ্ণ! আপনার ভেতর তিনিই সব করছেন। আমি ঢাকায় দেখেছি, উপাসনা করছি, আমার পার্শ্বে তিনি অঙ্গ স্পর্শ ক'রে রয়েছেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে যাই, পঞ্চবটীতে এবং তাঁর ঘরে তাঁকে দর্শন করতে পাই।'

গোঁসাইজীকে আমি পঞ্চবটীতে প্রদক্ষিণ করতে দেখেছি এবং ঠাকুরঘরেও সে-রকম ঊর্ধ্ববাহু হয়ে 'জয় রামকৃষ্ণ' ব'লে নৃত্য করছেন—দেখেছি।

স্বামীজী বললেন, 'আমিও পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে এই রকম অনেক দেখেছি এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, আমি নিমিত্ত-মাত্র, তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন।'

গোঁসাইজী বললেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড! একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গেছি, লোকজন বিশেষ কেউ ছিল না। একাকী বসে আছেন, ভাবস্থ। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই বললেন,

২ বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহত-মুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীর-ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

'তোমার উপাসনা ধ্যানট্যান হচ্ছে তো? দেহের ছয় রিপু বিবেক-বৈরাগ্যের পথে বড় অন্তরায়।' উত্তরে বললাম, 'আমার কিন্তু কাম-দমন হয়নি।' তখন ঠাকুর বললেন, 'সে কি! এত ভগবানের নাম নিচ্ছ, কামদমন হয়নি!'

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্পর্শ ক'রে বললেন, 'যা সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে যা'—বলেই সমাধিস্থ। গোঁসাইজীও দেহের মধ্যে এক বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করলেন।[৩]

স্বামীজী বললেন, 'স্পর্শমাত্রেই যে তিনি শক্তি সঞ্চার করতেন, তা তো আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছি। আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষে কয়েকটি আশ্রম স্থাপন করি, সম্প্রতি মাদ্রাজ কলকাতা ও কাশীতে স্থাপিত হচ্ছে। আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়র-দম্পতি হিমালয়ে নির্জনে একটি আশ্রম স্থাপন করতে চাচ্ছেন। স্থান খোঁজা হচ্ছে, এখনও ঠিক হয়নি। তাঁদের ইচ্ছা পবিত্র হিমালয়ে আশ্রম স্থাপন করবেন এবং সেখানে তাঁরা ভগবৎ-উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করবেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য দু-একজন সাধু-ব্রহ্মচারীও থাকবে। আপনি আশীর্বাদ করুন, আপনি জ্যেষ্ঠ—গুরুবৎ পূজনীয়, যাতে এই সংকল্পগুলি শীঘ্র কাজে পরিণত করতে পারি।'

গোঁসাইজী উত্তরে বললেন, 'আপনি সিদ্ধ-সংকল্প পুরুষ; যা সংকল্প করবেন, তাই সিদ্ধ হবে। আর এই সংকল্প আপনার নয়, তিনিই আপনার ভেতরে এই সংকল্প উদয় ক'রে দিচ্ছেন।'

এই প্রসঙ্গের পর ঠাকুরের দিব্যভাবের কথা বলতে বলতে উভয়েই ভাবে অভিভূত হলেন। পরে দুজনে দুজনকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, তারপর স্বামীজী চলে এলেন।

এই পুণ্য ছবি আমার স্মৃতিপটে এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

৩ গোঁসাইজীর মৌন অবস্থায় লিখিত পুস্তকে প্রকাশিত।

আবার এস গো ফিরে

শ্রীরবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমপুরুষ হে রামকৃষ্ণ, আবার এস গো ফিরে!
স্বার্থ দ্বন্দ্ব মায়া প্রতারণা আমারে রয়েছে ঘিরে।
জীবনে আঁধার আসিছে নামিয়া,
আলোর ঠিকানা দেখিছে না হিয়া,
দিকহারা হয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলেছি সাগর চিরে!

উঠিয়াছে ঝড়—তুমুল তুফান, তরীতে চলেছি একা।
সে তরী থামাব যত ভাবি হায়, কূল নাহি যায় দেখা!
দেখা দাও মোরে ওগো ভগবান্
পরশে জাগাও পাষাণ এ প্রাণ,
অন্ধ আঁধার হোক অবসান তোমার করুণা-তীরে!
আমার জীবনে হে রামকৃষ্ণ, আবার এস গো ফিরে।

পুরাতন গ্রামে নূতন মন্দির

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

কেউ বলে—মন্দির, কেউ বলে—আশ্রম, কেউ বা বলে—মঠ। সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি মিলাতে না মিলাতে এখানে বেজে ওঠে আরতির বাজনা। চঞ্চল হয় গ্রামবাসীর মন। একে একে অনেকেই হাজির হন এসে। যাঁরা আসতে পারেন না, তাঁরা আক্ষেপ করেন, আপসোস করেন। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও কম যান না। নাতি-নাতনীদের পথের সাথী ক'রে তাঁরাও বের হয়ে পড়েন। কারও হাতে হ্যারিকেন, কারও হাতে টর্চ। আশে-পাশের গাঁয়ের লোকেরাও অন্ধকার পথ ভেঙে এসে হাজির হন মন্দিরে। মহাপুরুষের পাদস্পর্শে ধন্য এই মাটির ছোঁয়া লাগিয়ে সকলেই চান পবিত্র হ'তে। জাতিভেদ নেই, আপন-পর নেই, সকলেই সমান, সকলেরই এক পরিচয়—তাঁরা ভক্ত।

মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীতে মনোরম পুষ্প-সজ্জার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নীচে তাঁর মানসপুত্র রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ধূপ-ধুনার গন্ধে সমস্ত স্থানটি আমোদিত। আরতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় সমবেত-কণ্ঠে স্তোত্রগান। প্রতিদিনই এই ভাবে চলে আরতি, চলে ভক্ত-সমাগম।

গ্রামের নাম শিকড়া-কুলীনগ্রাম। সংক্ষেপে কেউ বলে—শিকড়া, কেউ বলে—কুলীনগ্রাম। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামটির আছে মন হরণ করবার মতো মাধুর্য। টাকী রোড গ্রামটিকে দু-ভাগ ক'রে চলে গেছে পূর্ব-পশ্চিমে। দূর-দূরান্তের গাছপালার কালো রেখা এই গ্রামের নিশানা নির্দেশ করছে। অগণিত তরুশ্রেণী। যেন কোন নিপুণ হস্ত এই সকল তরুকে একটির পর একটি ক'রে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে রেখেছে। আম-কাঁঠাল-নারিকেল-সুপারির সুনিবিড় ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট গ্রাম। এখানে আছে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দুটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। একটি পোস্ট-অফিসও আছে। সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে ব্রহ্মানন্দ সমাজ-কল্যাণ-কেন্দ্র। গ্রামের উৎসাহী যুবকরাই কেন্দ্রটির প্রাণস্বরূপ।

একদা এই গ্রামের জমিদার ছিলেন ঘোষ-বাবুরা। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই ঘোষ-বংশেই জন্মগ্রহণ করেন—রাখাল মহারাজ। ধনীর গৃহে অশেষ আদর-যত্নের মধ্যে তাঁর শৈশব কেটেছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, দক্ষিণেশ্বরের প্রস্ফুটিত পদ্ম যখন ভক্তরূপ ভ্রমরকুলকে আকর্ষণ করছিল, ধনীর দুলাল রাখালচন্দ্রও তারই আকর্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। সংসার থেকে ছিন্ন হয়েছিল তাঁর মায়িক সম্বন্ধ। সাংসারিক সকল আকর্ষণ কাটিয়ে তিনি আশ্রয় নেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে, পরে গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। যে অবিচলিত নিষ্ঠায় সেই গুরুদায়িত্ব তিনি বহু বৎসর ধরে বহন ক'রে গিয়েছেন, তা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে 'রাজা' নামে ভূষিত করেছিলেন। এই আপ্তকাম, পরার্থে উৎসর্গীকৃত সমাধি-প্রজ্ঞ মহাপুরুষকে তাঁর গ্রামবাসী কোন দিন ভুলতে পারেনি।

বহু দিন থেকে তারা চেষ্টা ক'রে আসছে ব্রহ্মানন্দের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য। পর্যাপ্ত অর্থ-সংস্থান না হ'লে এ কাজে হাত দেওয়া চলে না। গ্রামবাসীদের একক চেষ্টায় তা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে এগিয়ে আসেন রামকৃষ্ণ মিশন। গঠিত হয় রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ ট্রাস্টী-বোর্ড। ভক্ত, শিষ্য ও দেশবিদেশের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হয় মন্দির ও রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম। ব্রহ্মানন্দের জন্ম-ভিটার উপরই স্থাপিত হয়েছে এই মন্দির। নির্জন শান্ত পরিবেশ। অশ্রামটি প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের চারিদিকে আম-কাঁঠাল-নারিকেল-সুপারির বাগান।মঠের চত্বরে শ্যামল তৃণের গালিচা পাতা। এক পাশে ফুলের বাগান, বাগানটি নানা রঙের ফুলের শোভায় উজ্জ্বল, মধুরগন্ধে আমোদিত।

আশ্রমটিকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি মাসে উৎসব প্রায় লেগেই আছে। প্রতিষ্ঠা-দিবস, শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। চলে হাজার হাজার নরনারায়ণের সেবা। এ ছাড়া শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহারাজদের জন্মোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দূর-দূরান্ত থেকে সমবেত হন ভক্ত ও শিষ্যের দল। কলকাতা থেকে আসেন বিখ্যাত বক্তারা। মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী নিয়ে হয় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটলেও পল্লীগ্রামের এই উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে। আশ্রমটি ব্যক্তিগত বা পরিবারগত মালিকানায় আবদ্ধ নেই। শুধু গ্রামবাসী নয়, আশপাশের গ্রামের পাঁচজনের হাতও মিলিত হয় প্রতিটি উৎসবে। সকলেই অনুভব করেন, এই আশ্রম, এই উৎসব কারও একার নয়, এ সর্ব-সাধারণের। সমস্ত গ্রামটারই যেন আজ রঙ পালটেছে। একটা শুচিতা, একটা আনন্দ, একটা তৃপ্তি, একটা সন্তোষ যেন প্রত্যেকের মন ভরে দিয়েছে। বেলুড় মঠে মাঝে মাঝে ভক্তদের দীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিকড়ার আশ্রমে একবার দীক্ষাদান-কেন্দ্র নির্দিষ্ট হয়েছিল। পাঁচ দিন ধরে দীক্ষাদান-পর্ব চলে। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তেরা দীক্ষা-গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখের একদিন পূর্বে এখানে এসেছেন। গ্রামবাসীরা একযোগে তাঁদের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, যাতে কারও কোন অসুবিধা না হয়। রাত্রিবাসের জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে দিয়েছেন —আর সেই সঙ্গে করেছেন ভক্তদের সেবা।

কলকাতা থেকে প্রায়ই আসেন কথক। পাঠ হয় গীতা, চণ্ডী, রামকৃষ্ণ-পুঁথি। বেলা ৩টার পর থেকে শুরু হয় লোক-সমাগম। মেয়েরাই আসেন বেশী। দু-তিন ঘণ্টা ধরে চলে পাঠ—আলোচনা। শিষ্য, ভক্ত ও যাত্রী-সাধারণের আগমন দিন-দিনই বেড়ে চলেছে। ফলে বাসস্থান ও রাত্রিবাসের স্থান সঙ্কুলান করা একটা সমস্যায় পরিণত হয়। সুখের বিষয় জনৈক ভক্ত আশ্রম-সংলগ্ন জমিতে টাকী রোডের উপরই একটি অতিথিভবন নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন। মহিলা ও পুরুষদের থাকার পৃথক্ বন্দোবস্ত আছে। শহরের যাবতীয় সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা এখানে আছে। তবে একটি অভাব এখনও আছে, সেটি বিজলী বাতির।

কলকাতা থেকে এই গ্রামটির দূরত্ব মাত্র ৩০ মাইল। বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর, কামারপুকুর, জয়রামবাটীতে অনেকেই গিয়েছেন। একবার আসুন এই নূতন তীর্থে। পল্লীর শান্ত পরিবেশ, গ্রামবাসীর আতিথেয়তা, মন্দিরের পবিত্রতা আপনার মনকে নিশ্চয় আনন্দে ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ ক'রে তুলবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অস্ফুট স্মৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটে যে সকল যুবক আসিত, তাহারা যাহাতে শ্রদ্ধাশীল ও বীর্যবান্ হইয়া গড়িয়া উঠে, সে বিষয়ে তিনি সর্বপ্রকারে তাহাদিগকে উৎসাহ দিতেন। স্বামীজীর ছবি তাহাদের মানস-পটের উপর অঙ্কিত করিয়া তিনি বলিতেন, এই দেখ না স্বামীজীই ছিলেন ছেলে, আর তোমরা? তোমরা তো ছেলে নও, অন্য কিছু। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন : ও মদ্দা পায়রা, ঠোঁট ধরিলেই ঠোঁট ছিনাইয়া লয়, ও তেজীয়ান্ বলদ, লেজে হাত দিবার জো নাই, হাত দিলেই তিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠে। আর তোমরা একটুতেই ঝিমাইয়া পড়। স্বামীজীর মতো ছেলেই আমাদের চাই।

এই তেজবীর্যের সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ কোনও যুবকের ভিতরে দেখিলে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন, আর বার বার সে কথা অপরের নিকটে গল্প করিতেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—একটি যুবক দুই বৎসর রাজরোষে অন্তরীণ (interned) থাকিবার পর মুক্ত হইয়া তাহার মাতাকে লইয়া ৺কাশীদর্শনে আসিয়াছিল। কাশীর অন্যান্য স্থান দর্শন করিবার পর সে রামকৃষ্ণ মিশন দর্শন করিতে আসে ও পূজনীয় হরি মহারাজের নিকটে আসিয়া স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে বলিতে থাকে। কথাপ্রসঙ্গে সে বলে, আমি স্বামীজীর ভক্ত, ঐরূপ সর্বত্যাগী তেজস্বী সন্ন্যাসীই আমরা দেখিতে চাই। কিন্তু পরে অন্য কথা বলিতে বলিতে সে বলিল : কিন্তু যাঁহারা সংসারের ঝঞ্ঝাট পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই, আমি তাঁহাদিগকে বলি, coward (কাপুরুষ)।

যুবকের এই প্রগল্ভ বাক্য শুনিয়া মহারাজ কিছুমাত্র বিচলিত বা দুঃখিত না হইয়া হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন : ঠিকই তো, তবে কিন্তু তোমার স্বামীজীও ঐরূপ সংসার ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কি বলো? —ছেলেটি ইহা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইল ও ধীরে ধীরে আরও দুই একটি কথার পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

ছেলেটি চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন : এইরূপ ছেলেই তো চাই, দেখ না কেমন আমাদের মুখের উপরে আমাদিগকে coward (কাপুরুষ) বলিয়া গেল, স্বামীজী এইরূপ ছেলেই পছন্দ করিতেন।

তরুণ ব্রহ্মচারীদের কোন ত্রুটি দেখিলে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া উহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন, আবার তাঁহাদের সামান্য মাত্র গুণ দেখিলে বলিতেন : তোমরা তো সোনার চাঁদ ছেলে হে, আজ স্বামীজী থাকিলে তোমাদিগকে মাথায় করিয়া নাচিতেন।

চিরদিনের বেদান্ত-তপস্বী হরি মহারাজ, শেষ দিন পর্যন্ত বেদান্তের চর্চা ও তদনুযায়ী কঠোর জীবন যাপন করিয়াই তাঁহার দিনগুলি অতিবাহিত করেন; কিন্তু তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেখিয়াছি, স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্ম-যোগের উপরে তাঁহার কি অবিচলিত শ্রদ্ধা!

মিশনের সেবাশ্রমের সাধু-কর্মিগণকে দেখাইয়া বলিতেন: ইহারাই ঠিক ঠিক কাজ করিতেছে। অপরে তো শুধু গুলতান করিয়াই সময়ক্ষেপ করিতেছে।

কিন্তু ইহাদের কার্যগুলিও যাহাতে শ্রদ্ধা-ও ভাবসমন্বিত কর্মযোগীর আদর্শানুযায়ী হয়, সে দিকেও তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন, ঐ সকল কার্যে তাহাদের ভিতরে অহঙ্কারের কিছুমাত্র ফুট দেখিতে পাইলে তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতেন: তোমরা কি ভাবিয়াছ, তোমাদের এই সকল কার্যের দ্বারা তোমরা অসামান্য কিছু করিয়া ফেলিতেছ? তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা তো আমি ১৫৲ মাহিনায় মেথর দিয়া করাইতে পারি। আর যাহারা অফিসে কাজ করিতেছ, তাহার জন্য হয় তো বা মাসিক ২০।২৫ টাকার মতন খরচ করিলে তোমাদের অপেক্ষা ভাল লোক পাওয়া যাইতে পারে, ইহার জন্য অহঙ্কারের কি আছে?

কিন্তু ইহা যে তাঁহার অন্তরের কথা নয় ও উহা শুধু কর্মীদের অহংভাব দূর করিয়া শুদ্ধভাবে কাজ করাইবার জন্যই বলিয়াছিলেন, তাহা পরদিন তাঁহার কথাতেই আমরা বুঝিতে পারিলাম।

মহারাজের ঐ কথা শুনিয়া কাশীর জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত মঠের জনৈক সাধুকে বলিতেছিলেন: মহারাজ তো ঠিকই বলিয়াছেন, আপনাদের মতো কৃতী ছেলে সংসারে থাকিলে কত কাজ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া কি সামান্য কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন! পূজনীয় মহারাজের নিকটে উহা বলিলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন ও বলেন: ও কি করিয়া আমার কথার অর্থ বুঝিবে? ও পণ্ডিত হইলেও সংসারী, শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ বলিয়াছেন, 'মূলো খেলে মূলোর ঢেকুরই উঠে', উহারও তাহাই হইয়াছে, চিরদিন সংসার করিয়া আজ নিষ্কাম কর্মের অর্থ ও কি করিয়া বুঝিবে? আমি তো ঐভাবে বলি নাই, বলিয়াছি—অহঙ্কারশূন্য হইয়া নিষ্কামভাবে তোমরা সেবা কর, তাহাতেই তোমরা তোমাদের চরম লক্ষ্যে পৌছিবে।

জপ-ধ্যান সম্বন্ধেও কাহারও ঐরূপ অহঙ্কারের আভাস দেখিলে তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন: তুমি ঠাকুরঘরে বসিয়া কি করিয়া আসিলে? মালা জপ করিলে, না কলা চটকাইয়া আসিলে? অর্থাৎ ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান করিলে এরূপ অহঙ্কার আসে না।

আমাদের সহিত যখন তাঁহার দেখা হয়, তখন তাঁহার তপস্যায় কালাতিপাত করিবার ভাব চলিয়া গিয়াছে, বেদান্তের ভাবানুযায়ী তখন তিনি তাঁহার জীবনকে দৃঢ় করিয়াছেন ও শুদ্ধ আত্মা যে দেহ মন বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার প্রতি কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। শরীর অশক্ত, অতিকষ্টে হাঁটিতে পারেন, তবুও সর্বদা শাস্ত্রচর্চা ও অপরের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত। কিসে আমাদের ভিতরে একটু চৈতন্যের উদ্রেক হইবে, ইহা লইয়াই সর্বদা চিন্তা, দেহবুদ্ধিযুক্ত আমরা চিরদিন দেহকে সত্য বলিয়া মনে করিতাম ও ইহার সুখে ও দুঃখে যে আমাদেরই সুখ দুঃখ হয়, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না, কিন্তু তাঁহার ঐ কঠিনরোগ-শয্যাতেও দেখিয়াছি, কিরূপে মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতেছেন, 'দুঃখ জানে আর শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থেকো'। আমাদের নিকটে তাঁহার এ গান শুধু কথার কথা বলিয়াই মনে হইত। কিন্তু যেদিন দেখিলাম, তাঁহার হাতের পাতায় একটি দুষ্টব্রণ হইয়াছে ও কলিকাতা হইতে বিখ্যাত সার্জেন ডাঃ সুরেশ ভট্টাচার্য আসিয়া উহা

অপারেশন করিয়া নিত্য সেই ক্ষত স্থান প্রোব (Probe) দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন, আর তিনি উহা ছোট ছেলের মতো আনন্দ করিয়া দেখিতেছেন, তখন উহা উক্ত ডাক্তারের ও আমাদের সত্যই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। কি করিয়া মানুষ এরূপ দেহবুদ্ধিশূন্য হইতে পারে, তাহা বুঝি নাই !

আর এক দিনের কথা পূজনীয় মহারাজের উপদেশাদি শুনিয়া মনে একটু বৈরাগ্য আসিয়াছে, 'সংসার অসার' এ-কথাও মুখে মুখে বলিতেছি ও আরও কিছু চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একটি ছেলের কথা উঠায় মহারাজকে বলিয়াছিলাম, মহারাজ, উহার সংসারের প্রতি খুবই টান। তখন 'সংসার' বলিতে আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়িই বুঝিতাম। কিন্তু ইহা ছাড়া যে সংসার-অর্থে আর কিছু হইতে পারে, তাহা মনে আসে নাই। মহারাজ আমাদের প্রগল্ভ কথা শুনিয়া শুধু বলিয়াছিলেন : ঠিক, কিন্তু জেনো শরীরটাও সংসার। ইহা শুনিয়া তখন আমাদের মাথায় সত্যই বাজ পড়িয়াছিল। যে শরীরটার কথা নিত্য চিন্তা করিতেছি, সে যে আমার বন্ধনের কোনরূপ কারণ হইতে পারে, পূর্বে কখনও ভাবি নাই, আমাদের অবস্থা দেখিয়া মহারাজ পুনরায় বলিলেন : কি বলো ঠিক তো ? তখন মাথা নিচু করিয়া বলিয়াছিলাম, হ্যাঁ মহারাজ, আশীর্বাদ করিবেন, যেন উহা জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি।

বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত তিনি সর্বদা বেদান্তের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব অতি সহজভাবে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেন। বলিতেন : আমরা তো পূর্ণ ব্রহ্মই আছি, তবু দেখ না মায়ার প্রভাবে আমরা নিজদিগকে কি ক্ষুদ্র মনে করিতেছি ! এই উপলক্ষে তিনি গল্প করিতেন : দেখ পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে একটি জীর্ণ মন্দিরের গায়ে স্বামীজী কয়লা দিয়া লেখা এই দোঁহাটি দেখিতে পাইয়াছিলেন—

চাহী চামারী চুহী সব নীচ্ উনকো নীচ্।
ইয়ে তু পুরন ব্রহ্ম থা, যব তু নেহী হোতী বীচ্॥

কে ঐ দোঁহাটি লিখিয়াছেন বা কোথায় তিনি উহা পাইয়াছিলেন, কাহারও জানা নাই ; কিন্তু কি সুন্দর উহার অর্থটি !—হে আকাঙ্ক্ষা বা বাসনা, তুই সর্বাপেক্ষা নীচ, তুই চামারনী, মেথরানী সদৃশ, এ (নিজ আত্মা) তো পূর্ণ ব্রহ্মই ছিল, তুই ইহার নিকটে আসিয়া তো ইহাকে কি ছোটই না করিয়াছিস্।

কখনও কখনও মাথা দোলাইয়া মহারাজ গাহিতেন :

'গুটিপোকায় গুটি করে,
কাটলেও সে তো কাটতে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি
কভু সে তো কাটতে নারে।'

বলিতেন : এইরূপই মায়া ; শ্রীশ্রীঠাকুর এই মায়ার কথা বুঝাইতে গিয়া নিজের মুখ একটি গামছা দিয়া ঢাকিয়া বলিতেন, এই দেখ আমি তো এত নিকটে, অথচ সামান্য এই গামছার আড়ালের জন্য তোমরা আমাকে দেখিতে পাইতেছ না।

এই সকল কথা বলিয়া কখন কখন মহারাজ গাহিতেন :

'এমনি মহামায়ার মায়া
রেখেছে কি কুহক ক'রে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য
জীবে কি তা জানতে পারে।'

আবার কখনও বলিতেন : শ্রীশ্রীঠাকুর কতগুলি ছোট ছোট ঘট দেখাইয়া বলিতেন, 'এই ঘটগুলি একই জল দ্বারা পূর্ণ কর তো, আর

উহাদের প্রত্যেকের উপরে ১, ২ করিয়া বিভিন্ন নম্বর দাও, দেখিবে কিছু পরে মনে হইবে উহাদের প্রত্যেকটি ঘটের জল আলাদা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ঘটগুলি ভাঙিয়া ফেলিলে সব ঘটেই সেই একই জল দেখিতে পাইবে' —ঐ ঘটগুলিই উপাধি, ঐগুলি দূর না করিলে আমাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না।

কখন বলিতেন, সাধন-ভজন দ্বারা উহা উপলব্ধি হয়। আবার কখন বলিতেন: তবে সাধন-ভজন কি জানো? উহা শুধু ডানা ব্যথা করা। শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন সুন্দর উপমা দিয়া বলিতেন, 'মাস্তুলের পাখি'—জাহাজ কালা-পানিতে গেলে যেমন তাহার বাসার খোঁজে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সকল দিকে উড়িয়া গিয়া, বাসার সন্ধান না পাইয়া শেষে মাস্তুলেই আশ্রয় লয়। সাধন-ভজন করিলেও শেষে দেখা যায় যে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের শেষ আশ্রয় আর কিছুই নাই। কিন্তু উপযুক্ত সাধন-ভজন ব্যতীত উহা বুঝিবার উপায়ও নাই।

ভক্তিযোগ *

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কর্ম কঠিন, জ্ঞান দুর্লভ—তপঃসাধ্য অতি ;
ওপথের যত সাধক সতত কৃচ্ছ্র সাধনে ব্রতী।
প্রকৃতিরে তারা চায় পরাজিতে ইন্দ্রিয় করি রোধ,
নিয়ত যুঝিয়া প্রবৃত্তি সাথে তবে লভে সম্বোধ।

স্বভাবের দাবী তুচ্ছ করিয়া তাদের চলিতে হবে,
কর্ম করিলে নিষ্কাম মনে জ্ঞানোদয় ঘটে তবে।
ভক্তিযোগের সাধন-মার্গে নাই এ বিড়ম্বনা
সেথা শুধু চাই প্রাণ-ভরা প্রেম, প্রেমভরা প্রার্থনা !

ইষ্টের হবে শরণাপন্ন, রবে না অহংকার,
আত্মসমর্পণই যে প্রধান ভক্তির উপচার।
যা করেন প্রভু, ইচ্ছা সে তাঁর—মেনে নিও কায় মনে,
শুষ্ক তপের প্রয়োজন নেই ভক্তির প্রাঙ্গণে।

বুদ্ধির দীপে জ্ঞানের আলোকে আঁধার হলেও দূর
থাকে যে তবুও অহমিকাটুকু ভরিয়া চিত্তপুর।
মনের ময়লা ধুয়ে যায় শুধু ভক্তি-বারির স্রোতে,
নিরাপদে দেয় ভক্তে উতরি চরণাশ্রয়-পোতে।

---

* 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ' দ্রষ্টব্য।

ভক্তি যে নারী ! ঢুকে পড়ে তাই একেবারে অন্দরে,
জ্ঞান কর্মের স্বরূপ পুরুষ—প্রবেশ পায় না ঘরে।
ভক্তি নহে তো ভাবপ্রবণতা, ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস
অন্তরঙ্গ সখী সে যে রহে অন্তরে বারো মাস।

বুদ্ধির সাথে নাহি তার যোগ, অনুভূতি সম্বল ;
জাহ্নবী সম পবিত্র ধারা বিগলিত হৃদিতল ;
মর্ম-গোমুখী হ'তে নিঃসৃত প্রেমের যমুনা সম
বঁধুর প্রণয় মধু রসময়, সে যে চির অনুপম।

ভক্তি যে শুধু দৃঢ় নির্ভর জগন্নাথের পরে !
গাঢ় অনুরাগ আসক্তি প্রীতি তাঁহারই চরণে ঝরে।
সকল কর্ম, সব জ্ঞান তব, সাধন ভজন যত,
নিঃশেষে দাও ঢেলে তাঁর পায় মুগ্ধা প্রিয়ার মতো।

তিনিই তোমার শেষ আশ্রয়, তিনিই তোমার গতি ;
নির্ভয়ে করো নির্ভর পায়ে, জীবনে অচলা মতি,
সুখে দুখে তব অলস বিলাসে আপদে বিপদে সদা
তাঁরই ভাবনায় ভরা যেন রহে হৃদয়টি সর্বদা।

তোমার প্রাণের এই ভালবাসা, এই যে আত্মদান,
ভক্তি প্রেমের এই অনুরাগে আকৃষ্ট ভগবান।
শরণ মাগিয়া চরণে তাঁহার প্রাণ মন সঁপো যদি;
হৃদয়ে তোমার বহিবে সতত প্রেমের অমৃত নদী।

ভক্ত চাহে না মুক্তি মোক্ষ পরমেশ্বরই পরমপ্রিয়,
ভক্তের দাস ভগবানও সদা ভালবেসে তাঁকে তৃপ্তি দিও।
প্রেমের ভিখারী যিনি চিরদিন, পরম প্রেমিক নিজেও যিনি—
ভক্তিযোগের প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়ে যান সহজে তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব শৈশব *

স্বামী নির্বেদানন্দ

আধ্যাত্মিকতায় ওতপ্রোত জীবন

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সাধারণ জীবন থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। বড় বড় লোকের জীবন যেমন সাধারণতঃ ঘটনাসম্ভার ও আশ্চর্য কার্য-কলাপের সঙ্গে জড়িত থাকে, এ জীবন তা নয়। সেজন্য এই জীবন আলোচনা করার আগে তার উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা প্রয়োজন। সে দৃষ্টিভঙ্গি এলে তবেই এই জীবনটি অনুধাবনের পথে নির্ভুলভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে, এবং এই জীবনের ঘটনাগুলির সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও জনসেবকরূপে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। তিনি বাগ্মীও ছিলেন না, লেখকও ছিলেন না; রাজনৈতিক নেতা বা সমাজ-সংস্কারকরূপেও তিনি কখন আবির্ভূত হননি কোনদিন। তাঁর সমকালীন ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজের ধর্মনেতাদের প্রসিদ্ধি ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখতে গেলে নজরেই পড়েন না তিনি। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আভিজাত্য, কেশবচন্দ্র সেনের সর্বজনবিদিত বাগ্মিতা ও গম্ভীর ব্যক্তিত্ব, স্বামী দয়ানন্দের বিশাল পাণ্ডিত্য ও তর্কে উৎসাহ—এই সবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অতি সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনের পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। আভিজাত্য, পার্থিব সম্পদ, বিদ্যাগৌরব, ঐহিক প্রতিষ্ঠা বা নামযশ, এ-সব কিছুই ছিল না তাঁর। সাধারণ লোক যা দেখে মুগ্ধ হয়, সে-সব চোখ-ধাঁধানো উপকরণের একান্ত অভাব ছিল তাঁর জীবনে।

তবু এই সাধারণ জীবনের মধ্যেই অতি একটা কিছু ছিল, যা মহামূল্যবান্ ও গভীর অর্থপূর্ণ; সাধারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি যা এড়িয়ে যায় সহজেই। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত তাঁর গুরুদেবের জীবন-চিত্র আঁকতে গিয়ে যে দ্বিধা অনুভব করেছেন, তা কখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করে-ছিলেন যে, তাঁর সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলতায় পর্যবসিত হ'তে পারে। যদি ধরা যায়, বিবেকানন্দের এ স্বীকৃতি বিনয়েরই প্রকাশ, তবু এ কথা নিশ্চিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে এমন একটা কিছু আছে, জীবনীকারের চোখে যা সহজে ধরা পড়ে না। সাধারণ বড় লোকদের মতো জীবনের সব উপাদানই তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে আহরণ করেননি। সেজন্য শুধু এই জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটুকু বিস্তারিত ভাবে দেখালে তাতেই তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ ছবি কখনও ফুটে উঠতে পারে না।

তাঁর জীবনের বহিঃসীমা চারিদিকের পার্থিব পরিবেশ স্পর্শ ক'রে গিয়েছিল, সন্দেহ নেই; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে সে জীবনের সম্পর্ক-মূলক ব্যাখ্যা ও বিবৃতির সীমা ঐ পর্যন্তই। কিন্তু এ জীবনের অধিকাংশই রয়ে গেছে সাধারণ জীবনীকারের জ্ঞানের সীমার বাইরের এক জগতে, আর এইখানেই নিহিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সৌন্দর্য, গরিমা, শক্তি ও তাৎপর্য। প্রকাশ্য বহির্দেশে না থেকে এ জীবনের মহিমা লুকিয়ে আছে অন্তরের অতলস্পর্শী গভীরতায়। বাইরে অবশ্য তিনি আর পাঁচ জন মানুষের মতোই চলাফেরা করতেন; কিন্তু তাঁর চিন্তা ও অনুভূতি

* 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।

উৎসারিত হ'ত অতীন্দ্রিয় গভীরতা থেকে, আর দিব্যানন্দের বিভায় ভাস্বর ক'রে রাখত তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে। কেন্দ্র থেকে বহির্দেশ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র সত্তাই আধ্যাত্মিকতাব মাধুর্যে অপরূপ। তাঁর সমগ্র সত্তা—কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতার টানাপোড়েনে বোনা। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের সমতুল্য সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য যে-কোন লোকের কাছে এ জীবনের বিষয়বস্তু অনধিগম্যই থেকে যাবে। এইজন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি ও তাঁর গুরুভাইরা সকলে মিলেও এই জীবনের যথার্থ ও সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ কখনও ক'রে উঠতে পারেননি।

তা ছাড়া এ বিষয়ে চেষ্টা করতে গিয়ে একটা বিকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলার সম্ভাবনাও রয়েছে বেশ। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি গল্প মনে পড়ে। একজন অন্ধের ইচ্ছা হয়েছিল, দুধ কেমন তা জানতে। তাকে বলা হ'ল, দুধ বকের মতো সাদা। বক আবার দেখতে কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হ'ল, বক দেখতে কাস্তের মতো। সাদৃশ্যের বিষয়-বস্তু বকের রং থেকে তার গলার আকৃতিতে চলে গেল। যাই হোক, অন্ধটি আবার জিজ্ঞাসা ক'রল, কাস্তে দেখতে কেমন? বন্ধুটি এবার আর উপমা খুঁজে না পেয়ে নিজের হাতটি কাস্তের মতো ক'রে বাঁকিয়ে অন্ধটিকে তা ছুঁয়ে দেখতে ব'লল। অন্ধটি বন্ধুর বাঁকানো হাতের ওপর হাত বুলিয়ে দেখে আনন্দে ব'লে উঠল, 'যাক, এখন পরিষ্কার বোঝা গেল। দুধ বাঁকানো হাতের মতো একটা কিছু হবে।' গল্পের উপমাটি একেবারে ঠিক ঠিক। আধ্যাত্মিকতায় যিনি অন্ধ, তিনি যদি শুধু বহির্জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ধারণা করতে চান, তা হ'লে তাঁর সেই ধারণা স্বভাবতই এমনি হাস্যকর বিকৃতি লাভ করবে। এমন লোকেরও অভাব ছিল না, যাঁরা সত্যসত্যই শ্রীরামকৃষ্ণকে বাতিকগ্রস্ত বা পাগল ব'লে স্থির করেছিলেন! গল্পটির ঐ অন্ধের পর্যায়ে পড়েন তাঁরা নিশ্চয়ই।

পঞ্চাশ বছরের স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুজাতির আধ্যাত্মিকতার সমগ্র ইতিহাসটি জীবন্ত ক'রে তুলেছিলেন। তাঁর জীবনের অতলস্পর্শী গভীরতা ও অন্তহীন বিশালতা ধারণায় আনা যায় না। জগতের রহস্য ভেদ ও অস্তিত্বের চিরন্তন সত্যের উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর জীবনের মর্ম পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। স্বজ্ঞার তীব্র আলোক সম্পাত ক'রে দেখতে হবে তাঁর জীবনের আধ্যাত্মিক সংগঠন। আধ্যাত্মিকতার পথে যত বেশী এগিয়ে যাওয়া যাবে, এ জীবনের মূল্য ও তাৎপর্য চোখে পড়বে তত বেশী।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে হবে, এবং যথাসম্ভব ধারণায় আনার চেষ্টা করতে হবে তাঁর অতুলনীয় জীবনের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি। অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী তাঁর কয়েকজন শিষ্য এই অসাধারণ জীবনীর কিছু উপাদান লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন।

আশ্চর্য শিশু

বাংলার এক অখ্যাত শান্ত পল্লীতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুআরির ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক জগতের ঠিক বিপরীত এক জগৎ ছিল তাঁর জন্মভূমি। প্রাচীন যুগের সরলতার ভিত্তিকে এখনও সে আঁকড়ে আছে। হুগলি জেলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রাম এটি,—রেলস্টেশন

থেকে মাইল পঁচিশ দূরে অবস্থিত। চারিদিকের ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাল- ও আম্রকানন-শোভিত এই পল্লীটি মধ্যযুগের পরিবেশ আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এক-শ বছরেরও আগে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-দম্পতি—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রাদেবী পুত্রকন্যাদিসহ এই গ্রামে বাস করতেন। খুব ছোট ছিল তাঁদের পরিবার। ক্ষুদিরাম গ্রামে পৌরোহিত্য ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখনকার দিনে ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভ্রমের কাজ ছিল এটি, যদিও অর্থাগমের দিক থেকে সুবিধের ছিল না মোটেই। কাজেই স-সম্মানে বসবাস করলেও আর্থিক অবস্থা তাঁর সচ্ছল হয়নি কখনও; কোনরূপে সংসার চলে যেত, এই পর্যন্ত।

বাড়ি বলতে ছিল খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর কয়েকখানি। তার একদিকে একটি জলাশয়, অপরদিকে গ্রামের পথ। গ্রাম্য পথের ওধারে এক জীর্ণ শিবমন্দির। মন্দিরটি এখনও আছে। গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবাকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষুদিরাম ও তাঁর সহধর্মিণীর অনাড়ম্বর ভক্তিময় জীবন বয়ে চ'লত এখানে। তাঁদের সহজাত সরলতা, সততা, ভালবাসা ও বদান্যতা প্রতিবেশীদের মুগ্ধ ক'রে রাখত।

বাড়ির একপাশে একটি ছোট ঢেঁকিশাল। একটি ঢেঁকি ও ধানসিদ্ধ করার একটি উনুন থাকত সেখানে। উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে পরিচিত বিখ্যাত সন্তানকে চন্দ্রাদেবী এই চালারই এককোণে প্রসব করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নবজাত পিচ্ছিল শিশু উনুনটির ভেতর আত্মগোপন করে। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে বিভূতিভূষিত অবস্থায় বাইরে আনা হয় তাকে। ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই শিশু কি সংসার ত্যাগ করতে চেয়েছিল, না সাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে নিজেকে গোপনে রাখতে প্রয়াসী হয়েছিল? সে কথা কে আর বলবে!

জন্মস্থানের পরিবেশটি একটু সেকেলে ধরনের হলেও তার চারিদিক ছিল তখন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-সম্ভারে ভরা। বাংলায় তখন বসন্তকাল এসেছে। শীতের সুদীর্ঘ আড়ষ্টতা কাটিয়ে তরুরাজি নব-পত্রোদ্গমে ও মনোরম কুসুম-মঞ্জরীতে অপরূপ রূপ-লাবণ্যে ভরে উঠেছে; তার শাখায় শাখায় ছন্দ জেগেছে বিহগকুলের কলতানে। যেন নব-জীবন ও সজীবতার স্পর্শে সব কিছুই আনন্দে উথলে পড়ছে। এই বসন্ত-মহোৎসবের সময় প্রকৃতিদেবী তাঁর মাননীয় অতিথিকে বরণ ক'রে নিলেন।

মাতা ও পিতা উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-বিষয়ে অনেক কিছু অলৌকিক দর্শন লাভ করেছিলেন। আধুনিক পাঠকদের বিশ্বাসের উপর অত্যধিক চাপ না দিয়েও এ কথা বলা চলে যে, সূতিকাগারের আদিম যুগোপযোগী পরিবেশ বেথলিহেম ও পবিত্র অশ্বশালার-কথাই মনে করিয়ে দেয়।

হিন্দুরা পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য গয়ার বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে যে-দেবতার পাদপদ্মে পিণ্ডদান ক'রে থাকেন, তাঁরই নামে যথাকালে এই শিশুর নাম রাখা হ'ল 'গদাধর'। গয়ার তীর্থদর্শনে গিয়ে ক্ষুদিরাম গদাধরের দর্শনলাভ করেছিলেন, এবং অনাগত এই শিশুর কথাও জানতে পেরেছিলেন সেই সময়। গদাধর ক্রমে বড় হয়ে সদানন্দময় বালকে পরিণত হ'ল। সুদর্শন, রঙ্গপ্রিয় এই বালকটি প্রাণের প্রাচুর্যে ভরে থাকত সব সময়। নির্দোষ হাস্যকৌতুক ও স্নেহময় ব্যবহারে সকলকেই

মুগ্ধ ক'রে রাখত সে। তার আকৃতি ও আচরণে অল্প পরিমাণ নারীসুলভ স্নিগ্ধতা ছিল। সেজন্য মেয়েরা তাকে পছন্দ ক'রত বেশী। তের বছর বয়স পর্যন্ত তার প্রতি এই স্নেহপ্রদর্শনের পথে কোন লজ্জা বা শালীনতার মনোভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

যাই হোক, বালকের প্রথম কয়েক বছরের জীবনে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না—পাড়ার আমুদে ছেলে একটি, সকলের স্নেহের দুলাল—এই পর্যন্ত। তারপর একদিন হঠাৎ সে ভাবের রাজ্যে চলে গেল। এর পর থেকেই সাধারণ জীবনের পথ থেকে বাইরে চলে গেল তার জীবন।

একদিন গ্রীষ্মকালে পাঁচ-ছজন সাথীকে নিয়ে টেকোয় মুড়ি খেতে খেতে গদাধর ধান-ক্ষেতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মুড়ি চিবুতে চিবুতে মাঠের ভেতর দিয়ে আলপথ ধরে সহজ ভাবেই চলেছিলেন তিনি, এমন সময় হঠাৎ এক টুকরো ঘন কালো মেঘ উঠে দেখতে দেখতে গোটা আকাশ ছেয়ে ফেললো। গদাধর একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিলেন—কেমন ক'রে মেঘের ওপর মেঘ এসে জমছে, এমন সময় কোথা থেকে এসে এক ঝাঁক ধবধবে সাদা বকের সার সেই কালো মেঘের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলে গেল। এই বর্ণবৈষম্য যে অপূর্ব শোভার সৃষ্টি ক'রল, বালকের মন গেল তাতে তন্ময় হয়ে। আনন্দে বিভোর হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ল বালক। সে অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লোকেরা তাকে তুলে নিয়ে বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেল।

এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই। এর ভেতর ভাববার কথা আছে অনেক। প্রকৃতির অতি মনোরম শোভা দেখে কোন কোন কবির ভাবসমাধি হবার কথা শোনা যায়। কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের মনের এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতার পেছনে রয়েছে সে-বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষা, চিন্তা, কল্পনাশক্তির পরিবর্ধন ও ভাবের সাধনা। ছয়-সাত বছরের একটি ছেলের পক্ষে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য দেখে ভাববিহ্বল হয়ে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে যাওয়াটা বোধ হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলাভের একটি অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। কিভাবে এটি সম্ভব হ'ল? এ প্রশ্নের উত্তর নেই নিশ্চয়ই। ব্যাখ্যা করার সব আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ এখানে। যদি বালককে মানসিক বা স্নায়বিক বিকারগ্রস্ত বলে ধরে নেওয়া না হয়, তা হ'লে এই ঘটনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এই হাস্যমুখর বালকের ছোট শরীরটির ভেতর অসীম বিস্তার, আর কী অতলস্পর্শী গভীরতাই না লুকিয়ে ছিল!

যাই হোক, তাঁর জীবনে ভাবরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল এই প্রথম আর সেটা ঘ'টল গভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে। সুন্দরের প্রতি এই সহজাত প্রীতি দেখেই বোঝা যায় যে, কবি-মন নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বাল্য-জীবনের আরও কয়েকটি বিশেষ ঘটনায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুমোরদের কাছে বসে থেকে তিনি মূর্তি গড়া ও তাতে রং লাগানো লক্ষ্য করতেন। কালে এ বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী হয়ে ওঠেন। সঙ্গীত ও কাব্য তাঁর খুব প্রিয় ছিল। গ্রাম্য রাখালদের গাওয়া গান তিনি গেয়ে বেড়াতেন, রামায়ণ-মহাভারতের ভাল ভাল অংশ বেছে নিয়ে তা আবৃত্তি করতেন। কখন সাথীদের সঙ্গে মিলে পুরাণের চিত্তাকর্ষক অংশগুলির অভিনয়ও করতেন, এতে আনন্দও পেতেন অফুরন্ত।

ন-বছর বয়সে গ্রামের এক যাত্রাভিনয়ে একবার তাঁকে শিবের ভূমিকায় নামতে হয়েছিল। অভিনয়ের সময় দেখা গেল, মাথায় জটা প'রে, কোমরে বাঘছাল জড়িয়ে, বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হয়ে, ত্রিশূল হাতে নিয়ে ধীর গম্ভীর পদে তিনি আসরে প্রবেশ করছেন। এই অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মন সাধারণ জগৎ থেকে উঠে গেল; যাঁর ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন, সেই শিবের চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। শিব তাঁর সারা মন অধিকার ক'রে বসলেন। ফলে শরীর স্থির, নিস্পন্দ হ'ল, গণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো আনন্দাশ্রু, আর মুখে ফুটে উঠল একটা দিব্য বিভা। এগুলি না থাকলে ধরে নিতে হ'ত—তিনি মৃত! এই পূর্ণ আত্মসমাহিত ভাব প্রায় তিন দিন ছিল।

গ্রামের কয়েকজন মেয়ে একবার পাশের গ্রামে চলেছেন বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে। তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে গদাধরের আর একবার এই রকম ভাবসমাধি হয়েছিল। দেবীর উদ্দেশ্যে ভজন গাইতে গাইতে চলেছেন সবাই, হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন গদাধর। গণ্ড বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। মৃগী রোগীকে সুস্থ করার জন্য মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া, মাথায় বাতাস করা ইত্যাদি যা কিছু করণীয়, তা সবই করা হ'ল। কিন্তু বালকের বাহ্যজ্ঞান কিছুতেই ফিরে এল না। মেয়েরা শেষে মরিয়া হয়ে যখন বালকের কানে দেবীর নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন, তখন তার মন ধীরে ধীরে আবার সাধারণ জ্ঞানের ভূমিতে ফিরে এল।

ঘন ঘন এ-রকম ভাবসমাধি হ'তে দেখে গদাধরের মাতাপিতা নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এজন্য গদাধরের নিজের কোন অস্বস্তি ছিল না। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার আগে যে বিপুল আনন্দে তাঁর মন আপ্লুত হ'ত, সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন তিনি। কোন দেবতার ধ্যানের চেষ্টামাত্র সেই দেবতাকে মানস-চক্ষে দেখতে পেতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল ভাবের তরঙ্গে তাঁর চেতনা হারিয়ে যেত। এত স্বাভাবিক ও সাবলীল-ভাবে এসব ঘ'টত যে, এর ভেতর কোন অসাধারণত্ব আছে ব'লে তিনি ভাবতেই পারতেন না। তা ছাড়া ভাবের উপশমের পরেই তিনি পূর্বের মতো সুস্থ হয়ে উঠতেন। বাড়ির লোকদের তাই বলতেন, তাঁরা যেন এ বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন না হন। এই ভাবসমাধি তাঁর শিশুমনের ওপর একটা দিব্য ভাবের ছাপ রেখে যেত সন্দেহ নেই; কিন্তু এতে তাঁর মনের শিশুসুলভ ভাব একটুও ব্যাহত হ'ত না। মনের আনন্দে তিনি একই ভাবে হেসে খেলে বেড়াতেন, যেন ইতিমধ্যে জীবনের স্বাভাবিকতাকে বিপর্যস্ত করার মতো কিছুই ঘটেনি। ভাবাবেশের ফলে তাঁর মনে উৎসাহ-হীনতা আসেনি, স্বভাব উগ্র হয়নি; তাঁকে প্রলাপ বকতেও দেখা যায়নি। গদাধরের বিশ্বাস ছিল যে, ভাবসমাধি সহায়ে তিনি দেবত্বের সংস্পর্শ লাভ করতেন। এ-কথাও নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর এই বাহ্যসংজ্ঞা-হীনতার ভেতর একটা অতিমানবতার ভাব আছে। তা সত্ত্বেও এতটুকু অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেত না তাঁর আচরণে।

এই ভাবসমাধির যথার্থ রূপ জানতে হ'লে ফলিত-মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে যে সব মতবাদ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলির ওপর নির্ভর না ক'রে এ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে যা বলেছেন, তাতে আস্থাবান্ হওয়াই বোধ হয় ভাল। তা নিরাপদও বেশী। ঐ পণ্ডিতেরা বরং শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবনালোকে

নিজেদের পর্যবেক্ষণ-সম্ভূত মতগুলি একটু পালটে নিতে পারেন। এঁদের মতানুসারে বালক গদাধরের চিকিৎসা করালে কি যে ঘ'টত বলা কঠিন। ইওরোপের জনৈক পণ্ডিতের মতে বালকের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার শিখা নির্বাপিত হয়ে যেত সে চিকিৎসায়, আর জগৎ বঞ্চিত হ'ত শ্রীরামকৃষ্ণের অমূল্য অবদান থেকে। একই যুক্তি দ্বারা অবশ্য এ-কথাও বলা চলে যে, এ ধরনের চিকিৎসা গদাধরের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট ক'রে দিত না; বরং মহাপুরুষদের অতিমানসিক অনুভূতির আলোক-সম্পাতে কতকগুলি গভীর তথ্যের সন্ধান এনে দিয়ে ফলিত মনোবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলত। অবশ্য এ-দুটির ভেতর কোনটিকেই ঠিক ব'লে সহসা সিদ্ধান্ত করার কোন প্রয়োজন নেই। গদাধরের ভাবসমাধি-কালে বাস্তবিক যা ঘ'টত তা লক্ষ্য ক'রে, এবং তিনি নিজে এ বিষয়ে যা বলেছেন তা শুনে নিজের বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কল্যাণকর ব'লে মনে হয়।

পুরী যাওয়ার পথে যে সব পরিব্রাজক সাধু ও তীর্থযাত্রীরা গ্রামের অতিথিশালায় এসে উঠতেন, তাঁদের সান্নিধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসাটা বালকের কাছে একটা মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের জন্য জল তুলে দিয়ে, রান্নার কাঠ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে সাধুদের সেবা করতে খুব ভাল লাগত তাঁর। তাঁদের ভজন, স্তোত্রপাঠ ও ধর্মপ্রসঙ্গ পরমানন্দে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতেন তিনি। তাঁদের আলাপ-আলোচনা থেকে সাধুদের কাহিনী, তীর্থবর্ণনা ও ধর্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ আহরণ ক'রে তিনি সঞ্চয় ক'রে রাখতেন তাঁর শিশু-মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে। পর্যটক-জীবনের রহস্য তাঁকে অভিভূত ক'রে ফেলত। এই সব ধর্মপ্রাণ মহাত্মাদের জীবন দেখে তাঁর শিশুমনের কল্পনায় ত্যাগ ভক্তি পবিত্রতা ও চিত্তপ্রসাদের রাজ্যের একটা মনোরম ছবি ভেসে উঠত। এভাবে বালক গদাধরের নমনীয় মনের ওপর হিন্দুসন্ন্যাসী ও ভক্তদের সনাতন জীবনধারার একটি সুস্পষ্ট স্থায়ী ছাপ পড়ে যায়।

ন-বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন হয়। তখন থেকে গৃহদেবতার সেবার সুযোগ পেলেন তিনি। পূজা করার অধিকার পেয়ে মন পরমানন্দে ভরে উঠল। জগদীশ্বরের দিব্য মহিমার ধ্যানে এবং রঘুবীরের নিত্য পূজার মাধ্যমে তাঁর চরণে নিজ হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তি নিবেদন ক'রে তিনি আনন্দে মেতে উঠতেন। এইটিই তাঁর বিশেষ গুণ, তাই এ-কাজ করার সময় তাঁর উৎসাহ যেন উপচে পড়ত। কখন কখন দেবতার ধ্যানে মনপ্রাণ তন্ময় হয়ে যেত তাঁর। তখন অতীন্দ্রিয় দর্শনের আলোকে তাঁর শৈশবের চিত্ত উদ্ভাসিত হ'ত। তা ছাড়া প্রত্যেকটি স্থানীয় ধর্মানুষ্ঠান, বিশেষ ক'রে বহুলোকের সমাবেশ হ'ত যেখানে, তাঁকে দুর্বার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেত।

অবশ্য অন্য সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন; বিদ্যালয়ে কোন রস পেতেন না; বিশেষ ক'রে গণিত-শাস্ত্র একেবারেই ভাল লাগত না তাঁর। হিসাব করা তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির বিরুদ্ধ বিষয় ছিল; গণিত-শাস্ত্রের সঙ্গে তা জড়িত বলেই বোধ হয় এরূপ হ'ত। বুদ্ধির অভাবহেতু তিনি বিদ্যাভ্যাসে পরাঙ্মুখ হয়েছিলেন, তা বলা চলে না; বরং অনন্যসাধারণ স্মৃতি, কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। পর্যটক-গায়কদের কাছে মহাকাব্য ও পুরাণের গল্প একবার

মাত্র শুনে নিয়েই তিনি তা হুবহু আবৃত্তি করতে পারতেন। কয়েকটি গ্রাম্য বালককে নিয়ে গড়া তাঁর নিজের যাত্রার দল ছিল একটি। তার জন্য গান ও নাটক রচনা করতেন তিনি নিজেই। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সভায় ঘোর বিতর্ককালে অনেক সময় তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সমাধানে কোন কোন জটিল প্রশ্নের সহজ মীমাংসা ক'রে দিতেন যীশুখৃষ্টের মতো। তখন বয়সের তুলনায় তাঁর বিচারশক্তির সমধিক বিকাশ দেখে অবাক্ হয়ে যেতেন সবাই। তিনি যে ক্ষুরধার-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবুও বিদ্যালয় তাঁর ভাল লাগত না। এ ভাল না লাগার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার কলকাতায় এসে টোল খুললেন। সপ্তদশবর্ষীয় গদাধর টোলে এসে তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কোনরূপ 'চাল-কলা বাঁধা' বিদ্যা লাভ করার ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁর জীবনের একমাত্র দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল ভগবান লাভ করা। কাজেই অভীষ্টপথে যা সহায়ক নয়, সে-সব বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না মোটেই। যে-সব পণ্ডিতদের সাহচর্যে তিনি আসতেন, তাঁদের খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতেন তিনি। কাজে ও কথায় তাঁদের জীবনে কোন মিল আছে কি না, মনোযোগ দিয়ে তিনি তা লক্ষ্য করতেন; দেখতেন, পবিত্রতা ও ভক্তিভাবের একান্ত অভাব রয়েছে সেখানে। এদিকে ভক্তি ও পবিত্রতাকেই তিনি আসন দিতেন জগতের আর সব কিছুর ওপরে; কারণ—তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, এ-সব গুণের অধিকারী না হ'লে কেউ কখনও ভগবান লাভ করতে পারে না।

পাণ্ডিত্যের প্রতি বালক গদাধরের এই মনোভাবের সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল তাঁর জীবনের স্থির বিশ্বাসের ওপর। ভক্তিহীন, পাপমলিন এই সব পণ্ডিতদের অন্তঃসারশূন্যতা উত্তরকালে তিনি অনাবৃত ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর অন্তর্ভেদী মন্তব্য-সহায়ে। তিনি বলতেন, চিল-শকুনি যেমন খুব উঁচুতে ওঠে, কিন্তু তার দৃষ্টি পড়ে থাকে সব সময় ভাগাড়ের পচা মড়ার ওপর, তেমনি ভক্তিহীন পণ্ডিতরা বুদ্ধির পাখায় ভর ক'রে অনেক উঁচুতে উঠতে পারলেও তাঁদের মন কিন্তু সব সময় বদ্ধ হয়ে থাকে ইন্দ্রিয়-জগতের হীন বিষয়ের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলিকে পাশ (বন্ধন) ব'লে কখন কখন পরিহাস করতেন তিনি; কারণ ওগুলি মনে অভিমান জাগিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। আধ্যাত্মিকতা-বিবর্জিত পণ্ডিতদের দোষগুলি স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দিতেন তিনি এভাবে। অবশ্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিনয়, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ-পরতা ও ভগবদ্ভক্তি থাকলে তিনি পণ্ডিতকে স্থান দিতেন খুব উঁচুতে। এই জন্যই রামকৃষ্ণদেব শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়েছিলেন মহাপ্রাণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে, এবং তাঁর সামনেই বলেছিলেন, যে সৎশিক্ষা মানুষকে উন্নত করে, তা সত্যি তিনি পেয়েছেন। তা ছাড়া শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মাত্মাদের আলাপ আলোচনা শুনতে খুবই ভালবাসতেন তিনি। তবু দেখা যায়, ভগবান লাভের জন্য পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অধ্যাত্ম-সাধনার ওপরই জোর দিতেন তিনি বেশী। তাঁর একজন শিষ্যের শাস্ত্রপাঠে অত্যধিক আসক্তি দেখে তা নিয়ে ঠাট্টাও করেছিলেন একবার। মন তাঁর ভরে থাকত দিব্যভাবের সুরলহরীতে। সেজন্য আর কোন ভাব-তরঙ্গের স্থান ছিল না সেখানে; অন্য সব সুরই কর্কশ ঠেকত তাঁর কানে, এমন কি বুদ্ধির মার্জিত সুর হলেও। তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যদি একই পর্দায় বাঁধা থাকত সে সুর, তা হ'লে অবশ্য অন্য কথা। শিশুকাল থেকেই এ বৈশিষ্ট্য দেখা যেত তাঁর ভেতর। গদাধরের মনের গঠনই ছিল এমনি যে, তাঁর প্রাণের আধ্যাত্মিক আকুলতার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললে কোন কিছুই সইতে পারতেন না তিনি। শুধু জীবিকার্জনের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি এই পর্যায়ে পড়ে ব'লে সেগুলির সংস্পর্শ গদাধরের স্নায়ুতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতবাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নির্বিকল্প অদ্বৈত অনুভূতি লাভ করিবার জন্য জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া চিরারাধ্যা জগন্মাতা কালিকার মানসমূর্তি দুই ভাগে কাটিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।—জানিতেন, উহা মায়েরই অভিপ্রেত; মায়েরই নামরূপাতীত স্বরূপের উপলব্ধির চেষ্টা মাকে প্রত্যাখ্যান করা নয়। মায়ের মূর্তি মানসপটে জাগিয়া মনকে যে নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিবার বাধা জন্মাইতেছে, উহা মায়েরই পরীক্ষা। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। তাই নিঃসঙ্কোচে নিঃসংশয়ে তিনি অত বড় একটা আপাত-নিষ্ঠুর কর্ম করিয়া ফেলিলেন; জগন্মাতাকে বলি দিলেন জগন্মাতাকেই নিবিড়তরভাবে, বিপুলতররূপে পাইবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়, নির্মম অথচ মধুর।

তাঁহার অদ্বৈত-বেদান্ত-সাধনার গুরু তোতাপুরীর যে অবস্থা লাভ করিতে চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল, তিনি তিন দিনেই তাহা লাভ করিলেন। গুরুমুখে ব্রহ্মোপদেশ শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলেন, সেই ধ্যান সর্ববিকল্পবর্জিত সমাধিতে গিয়া মিশিল এবং ঐ সমাধি ভাঙিল তিন দিন পরে। গুরু বিস্মিত হইলেন, বুঝিলেন শিষ্য অলোকসামান্য অধিকারী। একটু ভয়ও পাইলেন, চলিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না।[১]

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তোতাপুরী শিষ্যের টানে এগারো মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ভালই করিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের পক্ষে, শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে এবং পরবর্তী কালের আমাদের পক্ষেও। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সুদীর্ঘ সংস্পর্শের ফলে তোতাপুরী মানিয়াছিলেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যিনি জ্ঞানীর নির্গুণ প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্ম তিনিই ভক্তের সগুণ ব্রহ্ম—বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পালয়িতা, উপাস্য ভগবান। যতক্ষণ জগৎ দেখিতেছি, ততক্ষণ জগতে ওতপ্রোত জগদীশ্বরকে স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কার্য।—এই মত শ্রীরামকৃষ্ণের কোন মৌলিক অভিমত নয়, উপনিষদেই নির্গুণ ও সগুণের এই সমন্বয় বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে অনেক সময়ে আমরা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত ভুলিয়া যাই, মতবিশেষের উপর জোর দিয়া একদেশী হইয়া পড়ি। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিতে গিয়া তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে যাওয়া, মায়ের নাম করা প্রভৃতিকে উপহাস করিতেন, কুসংস্কার বলিতেন। ইহা একদেশিতা—অপ্রয়োজনীয় একদেশিতা। উপনিষদে এই একদেশিতার সমর্থন পাওয়া যায় না। যাহা হউক শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুর ঐ একদেশিতা দূর করিয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্প্রসার তোতাপুরীর পক্ষে যে পরম শুভকর হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন।

তিন দিনে অদ্বৈতসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষে আরও কিছুকাল গুরুর সাহচর্যের প্রয়োজন ছিল। কেননা তিনি তো প্রণালীবদ্ধ ভাবে বেদান্তের অনুশীলন করেন নাই, বৈদান্তিক সত্য ও সাধনার

[১] "তখন সে আমায় বলে, 'তুমি আমায় ছেড়ে দাও।' ও কথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল; আমি সেই অবস্থায় বললাম, 'বেদান্ত বোধ না হ'লে তোমার যাবার জো নাই।'" শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ।

শাস্ত্রকথিত বিবিধ উপন্যাস কিছুই তাঁহার জানা ছিল না। ধ্যান করিতে বসিয়াই সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। ছাদে যাইবার সিঁড়ি না মাড়াইয়া যেন এক লাফে ছাদে উঠিয়াছিলেন। এখন ছাদ হইতে নামিয়া সিঁড়িগুলি -পর্যবেক্ষণ করিতে চাহিলেন। তাই এগারো মাস তোতাপুরীর কাছে ঐ সব শুনিলেন, শুনিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলেন। সমাধিলাভ করিবার পর শ্রবণ মনন। উলটা বিধি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে অনেক জিনিসেরই ক্রম উলটা। অতএব বিস্ময়ের কিছু নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও বলিয়াছেন, 'কোন কোন গাছে যেমন আগে ফল, তার পর ফুল দেখা দেয়, তাঁহার ক্ষেত্রেও সেইরূপ,—আগে সিদ্ধি, পরে সাধনা। দীর্ঘদিন তোতাপুরীর সাহচর্য এবং তাঁহার সহিত বেদান্তচর্চার আরও একটি সার্থকতা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যে আনুষ্ঠানিক-ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, জগতের নিকট তাঁহার পরিচয় যে আচার্য শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অনুগামী সন্ন্যাসী বলিয়া—এই সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন ছিল। ইতঃপূর্বে তিনি বৈষ্ণব-মতের এবং তন্ত্রের নানা সাধনা করিয়াছিলেন। সেই সকল অভ্যাস, ভাব ও সংস্কার মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল। তান্ত্রিক সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখন দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে তোতাপুরীর নিকট বেদান্ত শুনিতে বার বার নিষেধ করিতেন, ইহাও জানা ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁহার নিষেধ শুনেন নাই। কেননা তিনি জগন্মাতার আদেশ পাইয়াছিলেন। যাহা হউক তোতাপুরী যদি এই আশ্চর্য শিষ্যকে সন্ন্যাস দিয়া এবং তাঁহার তিনদিন-ব্যাপী সমাধি লক্ষ্য করিয়াই দক্ষিণেশ্বর হইতে বিদায় লইতেন, তাহা হইলে অদ্বৈত-বেদান্তের প্রভাব কতটা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে স্থায়ী হইত—বলা কঠিন। হয়তো ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রাণপণে তাঁহাকে স্বমতে টানিতে চেষ্টা করিতেন এবং অদ্বৈত-উপলব্ধি শ্রীরামকৃষ্ণ-চিত্তের স্থায়ী পটভূমিকা না হইয়া একটা সাময়িক প্রচেষ্টা-রূপে পরবর্তী কালে ব্যাখ্যাত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে দশনামী সন্ন্যাসী, ইহা আমরা ভুলিয়া যাইতাম এবং তাঁহাকে একজন তান্ত্রিক সাধক বা বৈষ্ণব মহাপুরুষ বলিয়াই প্রচার করিতাম। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে অনেকটা এইরূপই ঘটিয়াছিল। দশনামী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়া তিনি গুরুর নিকট বসবাস করেন নাই। সঙ্গী ভক্তদের কীর্তনের দল নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষৌরকারের নির্মম ক্ষুর দ্বারা গৌরহরির চাঁচর কেশদাম কর্তন তাহারা অতিকষ্টে বাষ্পময় চোখে কোন মতে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু সন্ন্যাস লওয়া হইয়া গেলে তাহারা আর তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া স্বতন্ত্র পুরুষরূপে গণ্য করিতে চাহিল না; কীর্তনের দলে টানিয়া লইয়া হরিনাম করিতে করিতে কাটোয়া হইতে প্রস্থান করিল। হরিনামের রোলে বেদান্তের মহাবাক্য ডুবিয়া গেল। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের উত্তর জীবনে অদ্বৈত-বেদান্তানুশীলনের কথা বিশেষ শোনা যায় না। সে প্রয়োজনও বোধ করি ছিল না, কেননা তিনি ভক্তিপ্রচারের ব্রত লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্যের অনুবর্তীরা তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাসে দীক্ষিত দশনামী সন্ন্যাসী বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছিলেন কি? না। দশনামী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ যেন শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে

একটি প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়! তাঁহার বিখ্যাত জীবনীগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে' তাঁহাকে বহুস্থলে অদ্বৈতবেদান্ত-মতাবলম্বীদের প্রতিদ্বন্দ্বি-রূপে বেশ বিশদভাবেই চিত্রিত করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যকে বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, উপনিষদে যাহা অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা শ্রীচৈতন্যের অঙ্গজ্যোতি। এইরূপ আলঙ্কারিক বর্ণনা ভক্তের ভক্তিভাবকে উদ্দীপিত করে সন্দেহ নাই, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিতে উহা অপসিদ্ধান্ত। দ্বৈতকে ছাড়াইয়া তবে তো আমরা অদ্বৈতের কথা বলি। সেই অদ্বৈতকে পুনরায় টানিয়া আনিয়া দ্বৈতের অঙ্গীভূত করা চলে কি? হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এবং কাব্যের অলঙ্কার এক কথা, কিন্তু আধ্যাত্মিক সত্যের যাথাযথ্য স্বতন্ত্র বিষয়। যাহা হউক শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে অদ্বৈতকে গৌণ স্থান দিবার প্রয়োজন হয় নাই। তোতাপুরীর নিকট এগারো মাস বেদান্ত-শ্রবণকে এই জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আজ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সমন্বয়াবতার বলি। তিনি শুধু হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ের কথাই বলেন নাই। হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত নানা মতেরও সমন্বয় শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু এই সমন্বয়ের জন্য তাঁহাকে কোন একটি নির্দিষ্ট মতকে খাটো করিতে হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অদ্বৈত-বাদী, তখন তিনি পুরাপুরি অদ্বৈতবাদী। আবার যখন তিনি ভক্ত, তখন তিনি পুরাপুরি ভক্ত। আন্তরিকতা-প্রণোদিত মানুষের যে কোন প্রকারের আধ্যাত্মিক সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট মূল্যবান্ ছিল। এই আশ্চর্য উদারতা তিনি পাইলেন কোথা হইতে? অদ্বৈতবেদান্তের সুদৃঢ় উপলব্ধি এবং ব্যাপক চর্চা হইতে। তোতাপুরীর নিকট এগারো মাস বেদান্ত শুনিয়া তিনি বেদান্তের গভীর, গভীরতর, গভীরতম অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তোতাপুরীর নিজের যে অন্তর্দৃষ্টি আসে নাই, শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের তাহা আসিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি অদ্বৈত সাধনা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সমন্বয়াবতার-রূপে পাইতাম না। অদ্বৈতের পটভূমিতেই সমন্বয় সম্ভবপর। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত-সাধনা বর্তমান কালের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হইয়াছে। অদ্বৈত-জ্ঞানই মানুষের নানা দ্বন্দ্ব ও কলহ দূর করিতে পারে, সকল মানুষের মধ্যে মিলন-সেতু রচনা করিতে পারে। মানুষে মানুষে মিলন—বর্তমান কালে যত প্রয়োজনীয়, অন্য কোন যুগেই তত প্রয়োজনীয় ছিল না, কারণ এক এক মানব-গোষ্ঠী পূর্বে পরস্পর হইতে বহু দূরে দূরে বাস করিত। এক পৃথিবীর বুকে চিন্তা ও ভাবের নানা খণ্ড পৃথিবী নিজ নিজ কক্ষে ঘুরিত, মাঝে-মাঝে সংঘর্ষ ঘটিলেও তেমন মারাত্মক কিছু ঘটিত না। এখন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠী গায়ে গায়ে বাস করিতেছে, মানুষের চিন্তা ও ভাবের পৃথক্ বিশ্বগুলি অত্যন্ত কাছাকাছি ঘূর্ণিত হইতেছে। মারাত্মক দুর্ঘটনা যে কোন মুহূর্তে ঘটিতে পারে। এই দুর্ঘটনার প্রতিষেধক কি? অদ্বৈতজ্ঞান;—শ্রীরামকৃষ্ণ উহাকে যেমন উপলব্ধি করিয়াছেন, রূপ দিয়াছেন, শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ শুধু আকাশে বাসা বাঁধে নাই—পৃথিবীর মাটিতেও শিকড় বিস্তার করিয়াছে। উহার বাণী শুধু 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' নয়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিও উহার অন্যতম ঘোষণা। শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদের একটি নূতন নাম যদি দিতেই হয়, উহাকে বলা উচিত 'সমন্বয়ী

অদ্বৈতবাদ'। পূর্বগামী অদ্বৈত-বেদান্তের আচার্যেরা যাহা বলিয়াছেন, এই অদ্বৈতবাদে তাহার সবটাই আছে, অধিকন্তু আছে একটি সর্বাবগাহী সহিষ্ণুতা ও প্রেম-দৃষ্টি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী অদ্বৈতবাদের বীজ উপনিষদেই রহিয়াছে। কিন্তু পূর্বতন আচার্যেরা উহার কার্যকারিতা লক্ষ্য করেন নাই, করিলেও সম্পূর্ণভাবে উহাকে কাজে লাগান নাই। তাই তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ অনেক সময়ে উদ্ধত, রূঢ় এবং একদেশী। পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতবাদে একটি মর্মস্পর্শী বিনয়, মাধুর্য ও উদারতার সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার জীবন বেদান্ত-বাক্যের দূরপ্রসারী ব্যাখ্যা। (ক্রমশঃ)

বসন্তে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমার ভিতরে যা-কিছু রয়েছে জীর্ণ ও পাণ্ডুর—
তোমার করুণা-সমীরে ঝরিয়া যাক্;
সুর-হারা মোর জীবন-বাঁশরি! ঢালিয়া দেবে না সুর?
মধুহীন রবে আমারই এ মৌচাক?

তোমার ফাগুন আগুন লাগালো শিমূলের ডালে ডালে;
পলাশে পলাশে রাঙালো কানন ভূমি;
জরায় পঙ্গু বসুন্ধরার কুঞ্চিত কপালে
সোনার কাঠির পরশ রাখিলে তুমি!

ঘুমের দেশেতে এলো জাগরণ! মৃতের রাজ্যে প্রাণ!
কোথা হ'তে কী যে ঘটিল আচম্বিতে!
দিগন্তব্যাপী সবুজসিন্ধু! সারাবেলা অফুরান
আকাশ মুখর পাখিদের সঙ্গীতে!

আমি যেন কোন্ শীতের পৃথিবী একান্তে প'ড়ে আছি!
কুয়াশায় ঢাকা আমার চক্রবাল!
আমার কাননে হাসে না কুসুম! আসে নাকো মৌমাছি!
বসন্ত মোরে ভুলে আছে কত কাল!

দখিনা পবনে অবনীরে তুমি দিলে নবযৌবন;
তুমি জীবনের অনন্ত নির্ঝর!
পুষ্পবিহীন নিশ্চুপ রবে কেবল আমারই বন?
দয়াল, আমারে দেবে না রূপান্তর?

তামিল শৈবসঙ্গীতে 'তেবারম্'

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

'তেবারম্'-এ সংকলিত অপ্পর্-এর পদসংখ্যা সম্বন্ধর্-এর পদসংখ্যার তুলনায় কিছু কম[1] হইলেও ভক্তিরসে ও কাব্যরসে অপ্পর্‌কেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করা হয়। ভক্তকবি তাঁহার আরাধ্য দেবতার রূপ বর্ণনা করিতেছেন এইভাবে :

ঐ দেখ, সবুজ-কানন-বেষ্টিত 'পূবণম্'-এর পবিত্র দেবতার বিভূতি-মণ্ডিত দেহ, ঐ যে তাঁহার উজ্জ্বল ত্রিশূল, ঐ যে তাঁহার প্রবৃদ্ধ জটায় শিশুচন্দ্র, ঐ যে গলায় তাঁহার 'কোণ্ড্রৈ' পুষ্পের সুগন্ধ মাল্যখানি, তাঁহার এক কানে 'কুলৈ' (পুরুষের কর্ণভূষণ), অন্য কানে 'তোডু' (রমণীর কর্ণভূষণ), ঐ যে তাঁহার হস্তিচর্মে ঢাকা দেহ, ঐ যে তাঁহার সমুজ্জ্বল কিরীট ![2]

সাধকের জীবনে সিদ্ধি খুব সহজলভ্য নয়। অনেক পিচ্ছল পথের উপর দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয়। স্খলন-পতন স্বাভাবিক। সংসারের বিষয়-বাসনা অহর্নিশি তাঁহাকে ভুলাইতে চাহে। বৃথাই তাঁহার দিনগুলি কাটিয়া যায় 'সুতমিতরমণীসমাজে'। আবার দৈবানুগ্রহ পাইয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। অতীত জীবনের পঙ্কিল মুহূর্তের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষণে ক্ষণেই তাঁহার চিত্ত অনুশোচনায় দগ্ধ হয়, হৃদয় অভিভূত হয় দৈন্য-নির্বেদ-গ্লানিতে। অপ্পরের রচনায় ভক্ত-জীবনের এই করুণ মর্মকথা অতি চমৎকার-রূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অনুতাপ-দগ্ধ কবি এই বলিয়া খেদ করিতেছেন :

ন্যায়তঃ আমি বাঁচিতে পারি না। দিনের পর দিন আমি নিজেকে কলঙ্কিত করিয়াছি। শাস্ত্র অধ্যয়ন করি বটে, কিন্তু উহার তাৎপর্য কিছুই বুঝি না। তুমি আমার প্রভু, তোমাকেও হৃদয়ে স্থান দিই না। আমি প্রচণ্ড কামরোগ দূর করিতে পারি নাই; বাসনার পাশ হইতে মুক্তি লাভ করি নাই। আমি এত দিন চর্মচক্ষু দিয়াই দেখিয়াছি, আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াও খুলে নাই। অজ্ঞানজনিত যে পাপকর্ম সঞ্চিত হইয়াছে, এখনও তাহার ভোগ শেষ হয় নাই। হে প্রভু, আমি বড় ক্লান্ত।[3]

কবির মনে হইতেছে, তাঁহার মতো হতভাগ্য বুঝি পৃথিবীতে আর কেহ নাই। জন্ম বংশ কর্ম—সবই তাঁহার পাপ-দুষ্ট :

কুবংশে আমার জন্ম। কোন সদ্‌গুণ আমার নাই। নাই কোন সৎ অভিপ্রায়।

---

১ 'তেবারম্'-এর মোট ৭,৯৫০টি পদ বা স্তবকের মধ্যে সম্বন্ধর্, অপ্পর্ এবং সুন্দরর্—ইঁহাদের পদসংখ্যা যথাক্রমে ৩,৮৪০, ৩,১১০ এবং ১,০০০।

২ বডিবেরু ত্রিশূলন্ তোণ্ড্রুম তোণ্ড্রুম্
বলর্ চডৈ মেলিল মদিয়ম তোণ্ড্রুম্ তোণ্ড্রুম্
কডিম্মেরু কমল্ কোণ্ড্রৈক্ কণ্ণিতোণ্ড্রুম
কাদিল্ বেণ্‌কুলৈ তোডু কলন্দু তোণ্ড্রুম্
ইডিয়েরু কলিট্ট্রু রিবৈপ্ পোরবৈ তোণ্ড্রুম্
এলির্ চিকলুম তিরুমুডিয়ুম্ ইলঙ্গিত্ তোণ্ড্রুম্
পোডিয়েরু তিরুমেনি পোলিন্দু তোণ্ড্রুম
পোলির্ তিকলুন্ পূবণত্তেম্ পুনিদনারক্কে।

৩ নীতিয়াল্ বাল্মাট্রেন্ নিত্তলুম্ তুয়েন্ অল্লেন্
ওদিয়ুম উণরমাট্রেন্ উন্নৈউল্ বৈক্কমাট্রেন্
… … … …
কলিত্তিণ্ডেন্ কামবেন্ কাদন্মৈয়েন্নুম্ পাশম্
ওলিত্তিলেন্ উন্কণোক্কি উণরবেন্নুম্ ইমৈতিরন্দু
বিলিত্তিলেন্ বেলিকতোণ্ড্রবিনৈ এন্নুম্চরক্কুক্ কোণ্ডেন্
আলিত্তিলেন্ অয়র্ত্ত প্পোনেন্ অতিকৈবীরট্টনারে।

কেবল পাপ-কর্মেই আমি বড়। আমি নিজে সৎ নই, সজ্জনের সংসর্গও পাই নাই। আমি পশু নই, অথচ আমার আচরণে আমি পশু ছাড়া অন্য কিছু নই। যাহা কিছু ঘৃণ্য, সেই সমস্ত বিষয়ে আমি অনেক কথা বলিতে পারি। আমি দরিদ্র নই, তথাপি আমি কেবল যাচ্ঞা করিতেই জানি, কাহাকেও কিছু দিতে জানি না। মূর্খ আমি, কেনই বা জন্ম লইলাম।[৪]

অবশেষে একদিন হৃদয়-দেবতা প্রসন্নমুখে আসিয়া কবির সম্মুখে দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরেন এবং অমানিশার গভীর অন্ধকারেও কবি দেখিতে পান তাঁহার পরম সুন্দর মূর্তিখানি। অপ্পর্ সেই শুভ দিনের উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন এইভাবে :

আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, সচল জলরাশিকে যিনি তাঁহার জটাবন্ধনে অচল করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, যিনি চিন্তাবিহীন আমাকে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছেন। আমি যাহা পড়ি নাই, সেই সমস্তই যিনি আমাকে পড়াইয়াছেন; যাহা দেখি নাই, সেই সমস্ত যিনি দেখাইয়াছেন; যাহা কেহ আমাকে বলে নাই, তাহা যিনি বলিয়াছেন; আমার পিছনে পিছনে আসিয়া যিনি দয়া করিয়া আমাকে কুৎসিত ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া ভক্তে পরিণত করিয়াছেন, সেই 'পূন্তুরুত্তির' পবিত্র দেবতাকে আমি দেখিয়াছি।[৫]

প্রভুর চরণে আশ্রয় লওয়া যে কত মধুর, কবি একটি শ্লোকে পর পর কয়েকটি চিত্রকল্পের সাহায্যে সেইটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন :

মধুর-ধ্বনি বীণার ন্যায়, সন্ধ্যাকালীন পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায়, মৃদুবহ দক্ষিণ সমীরের ন্যায়, নবাগত বসন্তের ন্যায়, মৌমাছি-গুঞ্জিত জলাশয়ের ন্যায় মধুর আমার প্রভুর পদচ্ছায়া।[৬]

প্রভুর কৃপাধন্য কবি নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করেন। ভক্তজনের স্বাভাবিক দৈন্যবোধের পরিবর্তে তিনি যেন অনেকটা সদম্ভেই ঘোষণা করেন :

আমরা কাহারও অনুগত নই, যমরাজকেও ভয় করি না। আমরা রহিব সদাপ্রসন্ন, রোগ থাকিবে অনেক দূরে। কাহারও নিকট নতি-স্বীকার আমরা করিব না। দুঃখ আমাদের কিছু নাই, আমরা যে সদানন্দ।[৭]

শৈব কবি যে শিবভক্ত মানুষকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইবেন—ইহা স্বাভাবিক, যদিও ইহার মধ্যে সম্প্রদায়গত মনোভাবটি একটু উগ্র-রূপেই প্রকাশমান। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও যে ভক্তিহীন দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও সুবিদিত। অপ্পরের একটি পদে শিবভক্তি-পরায়ণতা সম্পর্কেও অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই। কবি বলিয়াছেন :

---

৪ কুলম্ পোল্লেন্ গুণম্ পোল্লেন্ কুরিয়ুম্ পোল্লেন্
কুট্রমে পেরিদুউভেয়েন্ কোপমায়
নলম্ পোল্লেন্ নান্ পোল্লেন্ ঞানিয়ল্লেন্
নল্লার্ ভডু ইশৈন্দিলেন্ নডুবেনিণ্ড্র
বিলঙ্গল্লেন্ বিলঙ্গালাদু ওলিন্দেন্ অল্লেন্
বেরুপ্পনবুম্ মিকপ্ পেরিদুম্ পেচবল্লেন্
ইলম্ পোল্লেন্ ইরপ্পদু অল্লাল্ ঈয়মাট্টেন্
এন্ চেয়্ বান্ তোণ্ড্রিনেন্ এলৈয়েনে।

৫ নিল্লাদ নীর্ চাডৈমেল্ নিরূপিত্তানৈ
নিনৈয়া এন্ নেঞ্জৈ নিনৈবিত্তানৈক্
কল্লাদন এল্লাম্ কর্পিত্তানৈক্
কনোদন এল্লাম্ কাট্টিনানৈচ্
চোল্লাদন এল্লাম্ চোল্লিয়েন্নৈত্
তোডর্ন্দিঙ্গু অডিয়েনৈ আলাক্কোণ্ডু
পোল্লাবেন্নোয়্ তীর্ত্ত পুনিতন্ তন্নৈপ্
পুণ্ডুয়নৈপ্ পূন্তুরুত্তিক্ কণ্ডেনানে।

৬ মাচিল্ বীণৈয়ুম্ মালৈ মদিয়মুম্
বীচু তেণ্ড্রলুম্ বীঙ্গু ইলবেনিলুম্
মূচু বণ্ডরৈ পোয়্কৈয়ুম্ পোণ্ড্রদে
ঈশন্ এন্দৈয়িণৈয়ডি নীঝলে।

৭ নাম্ আরক্কুম্ কুডিয়ল্লোম্ নমনৈ অঞ্জোম্...
এমাপ্পোম্ পিণি অরিয়োম্ পণিবম্ অল্লোম্
ইন্বমে এন্নালুম্ তুন্বম্ ইল্লৈ।

মহাদেবের প্রতি যাহাদের ঐকান্তিক ভক্তি নাই, তাহারা যদি আমাকে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির সহিত স্বর্গ ও মর্ত্যের শাসন-কর্তৃত্বও দিতে চাহে, আমি তাহাদের সেই দানকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিব। আর যাহাদের সমস্ত অঙ্গ কুষ্ঠরোগে গলিত, অথবা যাহারা 'পুলৈয়া' প্রভৃতি নীচজাতিভুক্ত কিংবা যাহারা গোমাংসভোজী, তাহারাও যদি গঙ্গাজট শিবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হয়, তবে নমস্য দেবতা বলিয়া আমি অবশ্যই তাহাদের বন্দনা করিব।[৮]

চিদম্বর প্রভৃতি শৈবতীর্থ-পরিক্রমা ভক্ত-জীবনের একটি পরম আকাঙ্ক্ষা। শৈবকবিদের রচনাতে এই সমস্ত তীর্থ, মন্দির ও দেবতার মাহাত্ম্য অতিশ্রদ্ধা-ভরে বর্ণিত হইয়াছে। অপ্পরের কতিপয় পদে এখন একটি ভিন্ন সুরের আভাস পাওয়া যায়, যাহা দেশকালাতিশায়ী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। পূজা-অর্চনা-তীর্থাটন প্রভৃতি বাহ্য আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপরে কবি ভগবদুপলব্ধির মহিমাকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। (ভগবান্ বুঝাইতে কবি 'ঈশন্' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন; অবশ্য ইহা 'শিব'-এর প্রতিশব্দরূপেও ব্যবহৃত।) কবির বক্তব্য সংক্ষেপে এইরূপ:

ঈশ্বর (বা প্রভু) যে সর্বকালে ও সর্বদেশে অবস্থান করিতেছেন, আবার তিনি যে আমাদের অন্তরেও বিরাজমান, এ কথা যাহারা বুঝিতে না পারে, তাহাদের গঙ্গাস্নানেই বা কি প্রয়োজন, কাবেরী-স্নানেই বা কি প্রয়োজন? তাহাদের বেদাধ্যয়ন নিষ্ফল, শাস্ত্র-শ্রবণও অর্থহীন। কেনই বা তাহারা উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠান করে? পর্বতে উঠিয়া তপশ্চর্যাতেই বা তাহাদের কি প্রয়োজন?[৯]

'তেবারম্'-এর তৃতীয় এবং শেষ কবি সুন্দরমূর্তি 'নায়নার্', সংক্ষেপে, সুন্দরর্। পূর্ব-জন্মে ইতি কৈলাসেই অবস্থান করিতেন শিবের অনুচর-রূপে। একদিন উমার মাল্য-রচনার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিল তাঁহার দুই কুমারী পরিচারিকা। উভয়ের রূপ-দর্শনে মুগ্ধ সুন্দরর্ নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন শিবের চরণপ্রান্তে। ভক্তের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শিব তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন মর্ত্যভূমিতে। অবশ্য সেই সঙ্গে কুমারী পরিচারিকা-দুটিকে পাঠাইতে ভুলিলেন না।—স্পষ্টই বোঝা যায়, ব্রাহ্মণ-সন্তান সুন্দরর্ দুইটি অব্রাহ্মণ কন্যাকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অবাঞ্ছিত ঘটনার কতকটা পরিশোধক-রূপেই এই কৈলাস-কাহিনীর উদ্ভাবন। পিতা কর্তৃক স্ব-সম্প্রদায়ের একটি সুলক্ষণা ব্রাহ্মণকন্যার সহিত সুন্দরের বিবাহ-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহের আসরে কোথা হইতে এক শৈব সন্ন্যাসী আসিয়া দাবি করিয়া বসিলেন যে, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত সুন্দরের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না, কারণ তাঁহার (সুন্দরের) পিতামহ নিজেকে এবং অধস্তন পুরুষকে সেই সন্ন্যাসীর কাছে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া

৮ শঙ্খনিধি পদ্মনিধি ইরণ্ডুম্ তন্দু
ধরনিয়োডু বানলেত্ তরুবর এনুম্
মঙ্গুবার্ অবর্ চেল্‌বম্ অতিপ্পোমল্লোম
মাদেবর্‌কু একান্তর্ অল্লর্ আকিল্ (
অঙ্গমেলাম্ কুরৈন্দলুকু তোলুনোয়রায়্
আ-বুরিত্তু্ তিণ্ড্রু উললুম্ পুলৈয়র্ এনুম্
গঙ্গৈবারচডৈক্ করন্দার্‌কু অন্পর্ আকিল্
অবর্ কণ্ডীর্ নাম্ বনঙ্গুম্ কডবুলারে।

৯ গঙ্গৈ-য়াডিলেন্ কাবিরি-য়াডিলেন্…
এঙ্গুম্ ঈশন্ এনাদবর্‌কু ইল্লৈয়ে।
বেদমোদিলেন্ চাত্রম্ কেট্‌কিলেন্…
ঈশনৈ উল্‌কুবার্‌ক্ অণ্ড্রি ইল্লৈয়ে।
নণ্ড্রু নোর্‌কিলেন্ পট্টিনিয়াকিলেন্
কুণ্ড্রু মেরিহিরুন্তবম্ চেয়্‌য়িলেন্…
এণ্ড্রুম্ ঈশন্ এন্বার্‌কু অণ্ড্রিল্লৈয়ে।

গিয়াছেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ সুন্দরর্ সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পিত্তা (ওহে পাগল), ব্রাহ্মণ কখনও ব্রাহ্মণের কিঙ্কর হইতে পারে?' এই সন্ন্যাসী আর কেহই নন, স্বয়ং শিব। ঘটনাক্রমে সুন্দরর্ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইলে শিব তাঁহাকে গান রচনার জন্য আদেশ দিলেন। যে 'পিত্তা' (পাগল) শব্দের দ্বারা কবি প্রভুকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, প্রভুর আদেশে সেই শব্দ দিয়াই তাঁহার প্রথম পদ রচিত হইল। পদটি এইরূপ:

হে পিত্তা (পাগল), হে চন্দ্রচূড় মহাপ্রভু, হে করুণাময়, আমি বিস্মরণ-রহিত হইয়া নিরন্তর তোমাকে চিন্তা করিতেছি। তুমিই তো তোমাকে আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে। হে পিত্তা, হে পেন্নৈ নদীর দক্ষিণ তীরস্থ বেন্নেয়্নল্লূর গ্রামের অধিবাসী, একবার আমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করিয়া এখন আর এ-কথা বলিতে পারি না যে, আমি তোমার সেবক নই।

কৈলাসে শিবের সেবা-পরায়ণ নিত্য-অনুচর কবি যে মর্ত্যলোকে জন্ম লইয়া এমন ভাবে শিবকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অনুতাপের সীমা নাই। কবি বলিতেছেন:

এতদিন আমি তোমার কথা না ভাবিয়া কুকুরের মতো চারিদিকে ঘুরিয়া মরিতেছিলাম। অবশেষে হতাশ আমি তোমার দুর্লভ করুণার অধিকারী হইলাম। বেণুবনমনোহরা পেন্নৈ নদীর দক্ষিণ তীরে বেন্নেয়্নল্লূর্ গ্রামে আমি তোমার সেবক হইয়াছিলাম। এখন আর এ-কথা বলিতে পারি না যে, আমি তোমার সেবক নই।

কবির দু-একটি পদে বেশ একটু রহস্য-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং প্রভু মহাদেবকে লইয়াই এই রহস্য। মহাদেবের দুই পত্নীর সহিত সম্পর্ক। সুন্দররও দ্বিপত্নীক। এক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবানে বেশ একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কবির আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুলের দুশ্চিন্তায় তাঁহার ঘরকন্নার জীবন যে অশান্তিময় ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একবার অনশনক্লিষ্ট কবি কৃপাভিক্ষা-প্রসঙ্গে গুরুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন: সুন্দরী রমণী ঘরে থাকার যে কী দায়, তাহা তো তুমিও জানো প্রভু—'মাদর্ নল্লার্ বরুত্তমদু নীযুমরিদিয়ত্তে'।

আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে, অভাবগ্রস্ত দ্বিপত্নীক কবির পারিবারিক জীবন অনেক সময়ে তাঁহার সাধনার পথে গুরুতর অন্তরায় সৃষ্টি করিত। এইরূপ সঙ্কটের কালে কবির একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর প্রার্থনা ছিল এইরূপ: সংসারের কোলাহলে আমি তোমাকে ভুলিয়া গেলেও হে প্রভু, আমার জিহ্বা যেন অবিরত বলিতে পারে 'নমঃ শিবায়'।—'নাবলা উনৈ নান্ মরক্কিনুম্ চোল্লু না নমচ্ চিবায়বে।'

প্রায় আট সহস্র পদবিশিষ্ট 'তেবারম্'-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানেই শেষ হইল। তের শত বৎসর পূর্বে তামিলনাডের তিন ভক্তগায়কের কণ্ঠে সুর-সংযোগে যাহার সৃষ্টি, আজও তামিলদের সভায়-সজ্ঘমে, মন্দিরে-কোয়েলে যাহা পরম সমাদরে গীত হইয়া থাকে, আমরা সেই সুমহৎ সঙ্গীত-ধারাকে সুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রসহীন গদ্যে কিছুটা পরিবেশনের চেষ্টা করিলাম। বঙ্গদেশের কীর্তনের ন্যায় 'তেবারম্' কাব্য ও সঙ্গীতের এক সুন্দর সমন্বয়। বর্তমান প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি সুর-হারা কীর্তনের ন্যায় অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। কোন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর জানা না থাকিলেও বাঙালী পাঠক যেমন মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত সুর সংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া লয়, 'তেবারম্' সম্পর্কে তামিলভাষীও তাহাই করিয়া থাকে।

অষ্টগ্রহ-সম্মেলন

'জ্যোতির্বিদ্'

'অষ্টগ্রহ সম্মেলন', 'অষ্টগ্রহ-সম্মেলন'!—চারিদিকে পোস্টার প্লাকার্ড, নির্বাচনী ইস্তাহারের পাশে পাশে শহর বাজার সরগরম করিয়াছে! সংবাদপত্রও প্রচারকার্যে যোগ দিয়াছে; জনসাধারণকেও যোগ দিতে বলা হইতেছে—কবে কোথায়? গ্রহ-সম্মেলনে নয়—গ্রহশান্তি উপলক্ষে যাগ-যজ্ঞে;—পার্কে প্যাণ্ডালে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে হবন নামকীর্তন চলিযাছে! জনসাধারণের এক শ্রেণীর মনে ভয়-ভাবনা, আর এক শ্রেণীর মনের ভাব—ও কিছু নয়, তবে দেখা যাক কি হয়! সকলেরই মনে কিন্তু একটা কৌতূহল: ব্যাপারটা কি? অষ্টবজ্র-সম্মেলন শুনিয়াছি, অষ্টগ্রহ-সম্মেলন আবার কি—কবে কোথায়?

প্রশ্নের উত্তর দিতে সর্বপ্রথম আগাইয়া আসিয়াছেন জ্যোতিষীরা; পুরাতন নজির দেখাইয়া তাঁহারা বলিতেছেন; অষ্ট গ্রহ কেন, সাত বা ছয় গ্রহ একত্র হইলেই প্রলয়কাণ্ড হইতে পারে—কুরুক্ষেত্রের সময় ছয় গ্রহ মিলিত হইয়াছিল। সেদিনও বিহার-ভূমিকম্পের সময় দুদিন আগে পাছে সপ্তগ্রহ একত্র হইয়াছিল। মহাপ্রলয় না হউক, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তুষার-ঝঞ্ঝা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, মহামারী, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব—কি যে হইবে, কিছু বলা যায় না, লোক-ক্ষয় হইবেই; গ্রহযোগ দুর্যোগ!

প্রতি অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্য একত্র হয়—তাহাতেই সমুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া জোয়ার ভাটা খেলিয়া যায়, নদীকে চঞ্চল করে; ভাদ্র অমাবস্যার বান নদীর তটভূমি প্লাবিত করে। সূর্যের সহিত বুধও প্রায় মিলিত হইয়া ত্রিগ্রহ-যোগ ঘটায়, সে কিছু নয়; উহাদের সহিত আর একটি গ্রহ মিলিলেই—চতুর্গ্রহ হইতেই দুর্যোগ শুরু হয়। তাহার ফলে সারা পৃথিবীতে না হউক, ব্যক্তিগত জীবনে অল্পবিস্তর ধাক্কা লাগেই। পঞ্চগ্রহযোগ, ষড়্গ্রহযোগ, সপ্ত-গ্রহযোগ ইহাদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান,—অষ্টগ্রহযোগ যোগের শেষ সীমা, নবগ্রহযোগ তো আর সম্ভব নয়, কারণ রাহু কেতু কখনও একত্র হইবে না! ইহারা সর্বদা পরস্পরের বিপরীত স্থানে থাকে।

এখন জ্যোতিষের (astrology) বিচারেই দেখা যাক—ব্যাপারটা কি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) আলোচনা একটু পরে হইবে। প্রাচীন ও প্রাচ্য জ্যোতিষ অনুসারে গ্রহ নয়টি! রবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি—এই সাতটি বারের নামে সপ্তগ্রহ প্রত্যক্ষ, রাহু ও কেতু অপ্রত্যক্ষ; ইহারা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কারণ—পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষতলের ছেদবিন্দু; অবশ্য পৌরাণিক কাহিনী ইহাদের অদ্ভুত রূপ দিয়াছে।

সম্প্রতি (কর্কটস্থ) রাহু ব্যতীত বাকী আটটি গ্রহ মকর-রাশিতে মিলিত হইয়াছিল, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে মনে হইতেছিল—উহারা ঐ অঞ্চলে আছে, দৃষ্ট হইতেছিল বলা যায় না। শনি, মঙ্গল, শুক্র ও বৃহস্পতি কিছুদিন পূর্ব হইতেই মকর-রাশিতে ছিল, তখন উহাদের খালি চোখে দেখা সম্ভব ছিল, কিন্তু মকর-সংক্রান্তির পর ১লা মাঘ সূর্য মকর-রাশিতে প্রবেশ করায় সূর্যালোকের ছটায় আর উহাদের দেখা সম্ভব নয়, অবশ্য এবারকার

অষ্টগ্রহযোগের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণসূর্যগ্রহণ (ভারতে অদৃশ্য), যেখান হইতে (প্রশান্ত মহাসাগরে) পূর্ণসূর্যগ্রহণ দেখা যাইবে, সেখানে গ্রহণকালে চন্দ্রের ছায়াবৃত সূর্যের আশে-পাশে প্রায়-অন্ধকার আকাশে পাঁচটি না হউক, চারটি গ্রহ কাছাকাছি দেখা সম্ভব। জ্যোতিষের বিচারে পৃথিবী হইতেছে বিশ্বের কেন্দ্র, মানুষই হইতেছে দ্রষ্টা, সব কিছুর উপলক্ষ্য।

অধিকাংশ লোকেরই রাশিচক্র সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। 'মকর-রাশিতে অষ্টগ্রহ-সম্মেলন' বলিতে সাধারণ মানুষ মনে করে, মকর-রাশি আকাশের একটি নির্দিষ্ট এলাকা, আটটি গ্রহ সেই স্বল্পপরিসর স্থানে সমবেত হইয়াছে, অতএব ধাক্কাধাক্কি হইয়া একটা প্রলয়-কাণ্ড হওয়া খুবই স্বাভাবিক, ইহা এড়াইবার উপায়—গ্রহশান্তি-যজ্ঞ, কবচ-ধারণ ইত্যাদি ইত্যাদি!

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই ঐরূপ কিছু নয়! 'রাশি' শব্দের অর্থ 'রাজি' বা 'অনেকগুলি'। এখানে 'রাশি' অর্থ নক্ষত্রের রাশি। অনেকগুলি নক্ষত্র আকাশের কোথাও একই দিকে দৃষ্ট হয়, মানুষ সেখানে তাহাদের একটি আকার কল্পনা করিয়া নাম দিয়াছে মাত্র। কতকগুলিকে মণ্ডল বলা হয়, যথা সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ-মণ্ডল (constellation)। আকাশের মধ্যস্থলের যে অঞ্চল দিয়া সূর্যের আপাত-গতিপথ গিয়াছে, তাহাকে রাশিচক্র (zodiac) বলা হয়, যথা মেষ বৃষ মিথুন প্রভৃতি ১২টি।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্যই প্রতিক্ষণে মহাকাশে সূর্যের পটভূমিকা পরিবর্তিত হইতেছে; গ্রহদের পটভূমিকা পরিবর্তনের কারণ—পৃথিবীর গতি ও তাহাদের নিজস্ব গতি। চন্দ্রের ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব গতিই প্রধানত দায়ী।

মণ্ডল বা রাশির নক্ষত্রগুলি পরস্পর হইতে অতি দূরে অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে কোন দৃঢ়বদ্ধ সম্বন্ধই নাই। ১০।১৫ হাজার কি ৫০ হাজার বছর পরে উহাদের আপেক্ষিক অবস্থান একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, কারণ নক্ষত্রগুলিও প্রচণ্ড গতিশীল, কিন্তু অতি দূরে দূরে অবস্থিত বলিয়া ১০০ কি ১,০০০ বছরেও তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন চোখে ধরা পড়ে না। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, রাশিগুলির আকার প্রকার ও নাম নিতান্তই কাল্পনিক, তবে উহারা মহাকাশে একটি দিক নির্ণয় করে, যেমন কম্পাসের কাঁটা পৃথিবীর দিক নির্ণয় করে।

ঘড়ির কোন কাঁটা যদি ১২টার ঘর হইতে ঘুরিতে শুরু করিয়া আবার ১২টার ঘরে ফিরিয়া আসে, তবে মোট ৩৬০° অতিক্রান্ত হয়, ইহাকে ১২ ভাগে ভাগ করিলে প্রতি ভাগে ৩০° ডিগ্রি করিয়া পড়ে। সূর্যের গতিপথ 'রাশিচক্র' ঘড়ির মতোই ১২ ভাগে (মাসে) বিভক্ত, এক এক ভাগ এক এক রাশি, উহার পরিমাণ ৩০°।

মাঘ মাসে সূর্য মকর-রাশিতে অবস্থান করে বা মকর-রাশির মধ্য দিয়া যায়—অথবা পৃথিবীর গতির জন্য মনে হয় সূর্যের পটভূমিকা ধনুরাশি হইতে পরিবর্তিত হইয়া মকর-রাশি হইল, ৩০ দিনে ৩০° ডিগ্রি অতিক্রান্ত হইলে মনে হইবে সূর্য কুম্ভরাশিতে গেল! অন্যান্য গ্রহসম্বন্ধেও এইরূপ।

এখন ১লা মাঘ (১৫ই জানু.) হইতেই শনি ও বৃহস্পতি, রবি বুধ ও কেতু এই ৫টি গ্রহ মকরের পটভূমিকায় ছিল, এবং ১১ই মাঘ (২৫ জানু.) মঙ্গল মকরে প্রবেশ করে, তখন সপ্তগ্রহ মিলিত হয়। অতঃপর ২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রু.) সন্ধ্যা

৪।৩১মিঃ গতে চন্দ্র মকরে প্রবেশ করিলে অষ্টগ্রহ সম্মেলন হইল। ২½ দিন পরে ২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রু.) সন্ধ্যায় চন্দ্র মকর ত্যাগ করিলে এই যোগ ভাঙিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গ্রহেরা নিজস্ব দূরত্ব বজায় রাখিয়া নিজ নিজ কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কাহারও সহিত কাহারও ধরা-ছোঁয়া নাই, সামান্য আকর্ষণ থাকিতে পারে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। গ্রহদের তুলনায় মকর-রাশির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র শ্রবণা (Altair) যে কতদূরে তাহার কোন ঠিকানাই নাই!

তবে জ্যোতিঃশাস্ত্র যে বলেন, কোন রাশিতে গ্রহগুলি প্রবেশ করিলে বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন ব্যক্তির উপর তাহাদের শুভাশুভ ফল হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ, পূর্বে পূর্বে এই অবস্থায় এইরূপ হইয়াছিল, অতএব বর্তমানে এই অবস্থায় এইরূপই হইবে বা হইতে পারে। ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করিবার দাবি তাঁহাদের নাই। যদি ফল অন্যরূপ হয়, তবে বুঝিতে হইবে কোন অদৃষ্ট কারণ (unknown factor) রহিয়াছে। জ্যোতিষের বিচার এ পর্যন্তই থাক।

এখন দেখা যাক, জ্যোতির্বিজ্ঞান কি বলে। জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রথমেই বলে: তোমাদের গ্রহের সংখ্যা-গণনাই ভুল রাহু কেতু তো গ্রহই নয়, কাল্পনিক বিন্দু; সূর্য চন্দ্রও গ্রহ নয়। সূর্য নক্ষত্র, চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ; পৃথিবী গ্রহ, তবে জ্যোতিষের বিচারে উহা গণনার কেন্দ্র বলিয়া গ্রহের তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিচারে সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র; বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহেরা পর পর দূরত্ব বজায় রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে (বৃত্তাভাস elliptic orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সূর্য হইতে তাহাদের দূরত্ব, প্রদক্ষিণ-কাল, আয়তন, ঘনতা, তাহাদের উপগ্রহের সংখ্যা, অক্ষরেখার নতি (inclination of axis) প্রভৃতি তথ্য জ্যোতর্বিজ্ঞানের করতলগত।

জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন আমাদের চারিটি গ্রহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তেমনি আবার কয়েকটি গ্রহ আবিষ্কার করিয়া উপহার দিয়াছে। শনির পর আছে ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো; মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অনেকগুলি ছোটবড় গ্রহ রহিয়াছে, তাহারাও নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, ইহাদিগকে গ্রহপুঞ্জ (asteroids) বলা হয়; মঙ্গলের পরবর্তী গ্রহটি—বৃহত্তর গ্রহের (বৃহস্পতির?) আকর্ষণ-বিকর্ষণে ভাঙিয়া গিয়াছে অথবা গ্রহরূপে পরিণত হইবার পূর্বাবস্থাতেই টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। পৃথিবীর ভয়, 'ঐ কি আমারও ভবিষ্যৎ?'

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে এখন পৃথিবী হইতে আপাতদৃষ্টিতে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি মকর-রাশি অঞ্চলে দৃষ্ট হইতেছে, ইউরেনাস ও নেপচুন মীনে এবং প্লুটো সিংহে অর্থাৎ অন্যত্র অন্যদিকে রহিয়াছে। অতএব অষ্টগ্রহের সম্মেলন হয়ই নাই, বড় জোর পঞ্চগ্রহের সম্মেলন হইয়াছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহদের আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন প্রভাব স্বীকার করে না, সূর্যের আকর্ষণ সর্বাধিক হইলেও নিকটতা-বশতঃ সমুদ্রের জলরাশিকে স্থানচ্যুত করিবার শক্তি চন্দ্রের অধিক। বর্তমান গ্রহসংস্থানে বুধ ব্যতীত অন্য সকল গ্রহ পৃথিবী হইতে দূরেই (opposition-এ) রহিয়াছে, তাহাদের আকর্ষণ নগণ্য। চিত্রে বর্ণিত ৩রা-৫ই

ফেব্রুআরি গ্রহ-সন্নিবেশ হইতে বুঝা যাইতেছে গ্রহগুলি কেহ এক স্থানে জড়ো হয় নাই, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে রহিয়াছে দূরে মকর-রাশির পট-ভূমিকা দেখানো হইয়াছে—পৃথিবী হইতে যদিও আটটি গ্রহ মকররাশির দিকে দেখা যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতের আকর্ষণের কেন্দ্র সূর্য হইতে মাত্র চারটি গ্রহ মকর-রাশির দিকে, অন্যগুলি বিপরীতে রহিয়াছে। এবং প্রধান বা বৃহৎ গ্রহগুলি সূর্যের অপরদিকে পৃথিবী হইতে দূরে রহিয়াছে বলিয়া উহাদের আকর্ষণ সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে এক্ষেত্রে যোগই হয় নাই। তবে চন্দ্র মকরে প্রবেশ করিয়া শনি-মঙ্গলের প্রভাব পৃথিবীতে সঞ্চারিত করিবে—আবার মকর-রাশি ত্যাগ করিবার পূর্বে শুক্র-বৃহস্পতি প্রভৃতির প্রভাবের সূচনা করিবে। অতএব শুভাশুভ প্রভাবের মিশ্রিত ফল হইবে। যাহা চিরদিন হইয়া আসিতেছে, তাহাই হয়তো একটু তীব্রভাবে অনুভূত হইবে।

মানুষের মনের উপর বা কোন দেশের ভাগ্যের উপর গ্রহগণের কোন প্রভাব আছে কি নাই—তাহা জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচ্য

[আনুপাতিক দূরত্ব দেখানো সম্ভব হইল না]
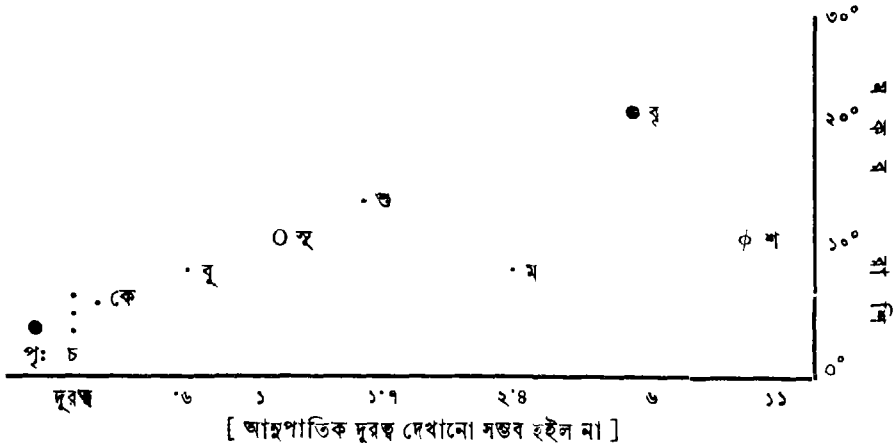
নগণ্য। এক্ষেত্রে গ্রহদের আকর্ষণ-জনিত বিপর্যয়ের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। জ্যোতিষ-মতেও অষ্টগ্রহ-সম্মেলন তখনই হইবে, যখন সব গ্রহগুলি একাংশ বা এক ডিগ্রির মধ্যে অবস্থান করিবে। এক রাশিস্থ হইলেই সম্মেলন হয় না। চিত্রে দেখা যাইতেছে শনি ও মঙ্গল পৃথিবী হইতে এক দিকে দেখা যাইয়াছে। অন্য গ্রহগুলি আর এক দিকে অবস্থিত। উহাদের পার্থক্য প্রায় ১৬°, অর্থাৎ এক রাশির (৩০°) প্রায় অর্ধেক! বিষয় নয়। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহ-নক্ষত্রের জন্ম জীবন মৃত্যু অধ্যয়ন করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। যে সকল কারণে বিরাট প্রাকৃতিক পরিবর্তন বা ভৌগোলিক বিপর্যয় সংঘটিত হয়, তাহা এই তথাকথিত অষ্টগ্রহ-সম্মেলনের ফলে নয়। কোন নক্ষত্র, ধূমকেতু বা গ্রহের প্রচণ্ড আকর্ষণে কোন গ্রহের অক্ষ-রেখার নতি (inclination of axis) পরিবর্তিত হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। তাহার ফলে একটি গ্রহের ঋতুপরিবর্তন ও জীবনধারা সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া যাইতে পারে।

এই আলোচনায় আর অধিক অগ্রসর হইয়া লাভ নাই! কেহ বলেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান একটি অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞান; কাহারও কাছে ইহাই বিশ্বরহস্য ভেদ করিবার চাবিকাঠি! মোটামুটি আমরা বুঝিলাম—জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অষ্টগ্রহের সম্মেলনই হয় নাই, এবং এই প্রকার গ্রহ-সম্মেলনের জন্য বিরাট কিছু প্রাকৃতিক পরিবর্তনও হয় না। মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান নীরব! জ্যোতিঃশাস্ত্র যতটুকু বলেন—তাহা পূর্বদৃষ্ট অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান!

মানুষের মনই জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরাট ধারণা করিয়াছে; মানুষের মনই জ্যোতিঃশাস্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। আমরা সকলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলিত নীহারিকা (spiral nebulae), ছায়াপথের সর্পিল জগৎ (galactic system), তাহার বাহিরেও ঐরূপ অসংখ্য জগৎ (extra-galactic systems), সর্বশেষ—আলোর গতির বাহিরে যে অদৃশ্য কোটি কোটি দ্বীপ-জগৎ (Island Universes বা Multiverse) রহিয়াছে—তাহা কল্পনা করিতে পারি না, তাই বলিয়া ঐ সকল সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিতেও পারি না।

ছায়াপথের সর্পিল জগতের এক কোণে সূর্য তাহার পরিবারবর্গ লইয়া প্রচণ্ডবেগে এক অনির্দিষ্ট পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই ক্ষুদ্র সৌরজগতের এক অলক্ষিত গ্রহ পৃথিবীতে বাস করিয়া আমরা মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা দেখিতেছি। জানি না—প্রতিক্ষণে বিরাট বিশ্বের নানা স্থানে কত সৃষ্টি, কত প্রলয় হইয়া যাইতেছে। আমাদের চিন্তা নিতান্তই পৃথিবী-কেন্দ্রিক, মানবকেন্দ্রিক তথা স্বার্থকেন্দ্রিক—তাই আমরা ভীত হই, বিচলিত হই! অকল্পনীয় বিরাট বিশ্বের অনন্ত জীবনস্রোতে যদি নিজেদের মিশাইয়া দিতে পারি, তখন দেখিব, বুঝিব—এ-বিশ্বে কিছুই হারায় না, কিছুই ফুরায় না, কিছুই মরে না! জীবনের তরঙ্গ আজ এখানে ডুবিয়া যায়, কাল ওখানে ফুটিয়া ওঠে!

মানুষ যতই বিজ্ঞানের চর্চা করুক, যতই সভ্য হউক, তাহার ভিতরের সেই আদিম মানব আজও মরে নাই, হয়তো কখনও মরিবে না। তাই অষ্টগ্রহের সম্মেলনের কথা শুনিলে দেশ জাতি-নির্বিশেষে মানুষ মহাপ্রলয়ের চিন্তায় মৃত্যুভয়ে কেহ বা প্রার্থনা করিবে—'কনফেসন' করিবে, কেহ গ্রহশান্তির জন্য যজ্ঞ করিবে—প্রায়শ্চিত্ত করিবে, কেহ গ্রহপীড়া এড়াইবার জন্য কবচ ধারণ করিবে, কেহ বা ভগবৎকৃপা লাভের জন্য নাম সংকীর্তন করিবে! ইহাতে বাধা দিবার কিছু নাই। এইগুলি করিয়া মানুষ তাহার দুর্বল মনে যদি কিছু বল পায় তো ক্ষতি কি! বিপদ কাটিয়া গেলেই মানুষ আবার সদম্ভে বলিবে, আমাদের এইসব পুণ্য ক্রিয়ার জন্যই মহাপ্রলয় পিছাইয়া গেল। জ্যোতিষীরা নীরবে বলিবেন, বিপদ এখনও কাটে নাই!

লীলা

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকৌশলে গুপ্ত কর আপনারে, বুঝি—
এ তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়! তবু পাইয়াছি খুঁজি
তোমার সন্ধান,
তমসার পারে তুমি আছ জাগরিত!
আর—মোর কর্মে যত দ্যুতি বিকিরিত
সে দ্যুতি তোমারি দান!
জানি আমি নিঃসংশয়ে গৌরবাগৌরব,
ভাল মন্দ, সে তোমার সত্তার সৌরভ
নাহি আত্ম-অভিমান।
শুধু দিবা শেষে সমস্ত কর্মের পুঁজি
সমর্পিব তোমাতেই লবে তুমি বুঝি,
কণ্ঠে লব এই গান—
'জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক তব'
রূপাতীত নহ কত রূপ নব নব
লীলায় কি প্রাণবান্!
দেহাতীত সত্য তুমি, তবু লীলা লাগি
দেহীর উৎসব-মঞ্চে নিত্য রহ জাগি
তুমি পূর্ণ ভগবান্।
জয় হোক, জয় হোক, জয় হোক তব,
হেরিতে তোমার লীলা মর্ত্যে জন্ম লব
বারংবার দিব প্রাণ।

পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

একটি ধ্যানের প্রাণ
সুর হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে,
চিন্ময় ধ্যানের প্রহরে:
ঝরে পড়ে কথামৃত হয়ে—
গভীর শান্তির স্বাদ হৃদয়ের কাছে আনে বয়ে।

মহাসরস্বতী হয়ে আর একজন,
পাশে আছে মিলিত নয়ন,
অপার প্রশান্তি বুকে রেখে;
জীবনের চঞ্চলতা তাঁর কাছে ধ্যান হ'তে শেখে।

অনন্তের অনুগামী দুজনের একই অভিসার,
বিশুদ্ধ বিভূতিলীলা অফুরন্ত কল্যাণ ভৃঙ্গার।

সমালোচনা

ঋগ্বেদ (প্রথম খণ্ড): সায়নভাষ্য—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। প্রকাশক: শ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়, (হাওড়া)। পৃষ্ঠা—৬৬+১৭০; মূল্য টাকা ৪·৫০।

আলোচ্য গ্রন্থে ঋগ্বেদের প্রথম চার অধ্যায়ের সায়নভাষ্য অনুসারে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যা পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ সরল ও মূলানুগ।

বিস্তৃত উপক্রমণিকায় ঋগ্বেদের পরিচয়, খিলগ্রন্থ, উপাখ্যান, অনুশীলন, ঋষি, দেবতা, দর্শন ও ছয় বেদাঙ্গ এবং পরিশিষ্টে সায়নাচার্য, মাধবাচার্য, উইলসন, রমেশ দত্ত ও দুর্গাদাস লাহিড়ীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

আশা করি, এই খণ্ড পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইবে এবং ঋগ্বেদের অবশিষ্ট অংশগুলি প্রকাশিত হইলে বাংলায় একটি মূল্যবান্ সংযোজন হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—শ্রীজনমেজয় দাস। প্রকাশক: শ্রীদেবকুমার সরকার, বুড়োশিবতলা, চন্দননগর। পৃষ্ঠা ২৮; মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।

আলোচ্য পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথ ও স্বামীজীর সাহিত্য, শিক্ষা, দেশপ্রেম, উপনিষদের ভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বাণী উদ্ধৃত ক'রে তাঁদের অলোকসামান্য প্রতিভার কিছু আভাস পাশাপাশি দেখাবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তবে এভাবে এই দুই বিরাট প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব ব'লে মনে হয় না। পুস্তকটিতে অজস্র বানান ভুল চোখে পড়ে।

বেদান্তপরিভাষা: (মূল ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা)—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাপ্তিস্থান: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৩২৪; মূল্য ৬৲।

শ্রীমদ্‌ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিত 'বেদান্ত-পরিভাষা' অদ্বৈত-বেদান্তের উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ প্রকরণ-গ্রন্থ। বেদান্ত-পরিভাষার মতো একখানি প্রকরণ-গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে পারিলেই অদ্বৈত-বেদান্ত সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হইতে পারে, সেইজন্য বেদান্ত-পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য-তালিকায় এই গ্রন্থখানি পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থের আটটি পরিচ্ছেদ; ছয়টি পরিচ্ছেদে বেদান্ত-শাস্ত্রে গৃহীত ছয়টি প্রমাণ—যথা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—অতি সুন্দরভাবে আলোচিত এবং প্রমাণ-প্রমেয় যথাযথভাবে প্রদর্শিত, সপ্তমে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য এবং অষ্টমে জীবন্মুক্তিসাধন ও মোক্ষ নিরূপিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের মূল ও সরল সংস্কৃতে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যার নাম 'পরিভাষা-সংগ্রহ'; শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও বিষয়-বস্তুর ভাবগত অর্থ পরিস্ফুট হওয়ায় ব্যাখ্যার নামকরণ সার্থক হইয়াছে। যাঁহারা বেদান্তের অনুশীলন করিবেন এবং যাঁহারা বেদান্ত-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যাখ্যা উপযুক্ত হইবে বলিয়া মনে হয়।

এই সঙ্গে মূল গ্রন্থ ও ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও

ইহার উপাদেয়তা আস্বাদন করিতে পারিতেন।

ছাপা কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

রত্নমালা—সঙ্কলয়িতা স্বামী মেধানন্দ। প্রকাশক: শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ পাল, ১৮ নটবর পাল রোড, হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৩১, মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ তাঁহার সাধনময় পূত-জীবনে পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠকালে যে-সব সারগর্ভ শ্লোক তাঁহার স্মারক-পুস্তিকায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অমৃতোপম শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইয়া 'রত্নমালা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি শ্লোক রত্নতুল্য এবং সমগ্র পুস্তক একটি রত্নমালা। রত্নমালার মতোই ইহা কণ্ঠে ধারণযোগ্য। গুরুতত্ত্ব, ব্রহ্মের স্বরূপ, ঈশ্বর সর্বাত্মক, ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, নীতি-সার প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রমত এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক শ্লোকের সরল অনুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় শ্লোকগুলির মর্মার্থ সহজেই বোধগম্য হইবে। সাধককণ্ঠের ভূষণ এই রত্নমালা।

Sri Ramakrishna and Sarada Devi—By Swami Apurvananda, Published by the President, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras 4. Pp. 245; price Rs. 2·50.

স্বামী অপূর্বানন্দ কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা' পুস্তকখানি পাঠকসমাজে অত্যন্ত সমাদর লাভ করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তক তাহারই ইংরেজী অনুবাদ। ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি একসঙ্গে সুবিন্যস্ত। আশা করি বাংলার ন্যায় ইংরেজী সংস্করণটিও সমাদৃত হইবে; বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যাঁহারা সংক্ষেপে একখানি পুস্তকের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু জানিতে চান, এই পুস্তক তাঁহাদেরই জন্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশামৃত—শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত। তারা লাইব্রেরি, ১০৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৪০; মূল্য ২৲।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ উপদেশ-সমূহের সঙ্কলন। আত্মজ্ঞান, ঈশ্বর, মায়া, অবতার, জীবের অবস্থাভেদ, গুরু, ধর্ম, সংসার ও সাধন, ভক্তি, ব্যাকুলতা, সমন্বয়, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ উক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পুস্তকটি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইতে পারে।

শ্রীনাম-ভাগবতম্ (প্রথম খণ্ড)—শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষঠাকুর। তপোবন— ১।২৯ অরবিন্দ নগর, কলিকাতা-৩২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—২১২ + ৪০; মূল্য ৪৲।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী কীর্তনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত। নগর ও পল্লীর শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে সুর-তাল-লয় সহকারে ইহা কীর্তিত হইবার উপযুক্ত এবং কৃষ্ণ-নাম প্রচারের বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে হয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকার প্রারম্ভে লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'শ্রীনাম-ভাগবত কোন কাব্য বা ইতিহাস অথবা তত্ত্বগ্রন্থ নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের···লীলাসমূহের ইহা একটি সূত্রগ্রন্থ মাত্র।' ইহাতে ভক্ত শ্রীভগবানের লীলা স্মরণ ও মনন করিবার একটি সহজ উপায় লাভ করিবেন।

শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা—ত্রিদণ্ডি-স্বামী ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত। শ্রীচৈতন্যমঠ, মায়াপুর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮৬; মূল্যের উল্লেখ নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের অমূল্য উপদেশাবলী ভক্তমাত্রেরই প্রাণের জিনিস। আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-রহস্য সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ, মাধ্বমত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, নিম্বার্কমত, শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস এবং 'শিক্ষাষ্টক' প্রভৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বুঝিবার পক্ষে গ্রন্থখানি বিশেষ সাহায্য করিবে।

(১) 'স্বয়ং ভগবান্' শ্রীকৃষ্ণকা প্রাকট্য, (২) শ্রীরাধা-মাধব-রস-সুধা (ষোড়শ গীত), **(৩) শ্রীরাধা-মহিমা, (৪) শ্রীরাধা-স্বরূপ-গুণ-মহিমা।** গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত।

নির্ভুল ও সুন্দর মুদ্রণ, বিশুদ্ধ অনুবাদ, ভাল কাগজ অথচ দাম সস্তা—এই কারণে 'গীতা প্রেস' হইতে প্রকাশিত হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর সহিত পাঠক-সমাজ সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তিকাগুলির সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য।

এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার স্বরূপ ও মহিমা শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সহকারে হিন্দীতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, মাঝে মাঝে উপযুক্ত ক্ষেত্রে হিন্দী কবিতা ও সঙ্গীত সন্নিবেশিত। ইহাদের কয়েকটি শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমীতে ভাষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। একটি পুস্তিকায় ১৬টি হিন্দী গানের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ণিত।

যুগশঙ্খ : বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৩৬৭)—সম্পাদক **:** শ্রীঅসীমাভ গোস্বামী। প্রকাশক **:** শ্রীরাখালরাজ তরফদার, বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ। পৃষ্ঠা ৬০।

এবারের 'যুগশঙ্খ' পত্রিকাটিতে রয়েছে এমন কতকগুলি লেখা, যা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যথা: 'আবার তোরা মানুষ হ', 'স্বামীব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে', 'লক্ষণাবতী ও তৎকালীন বাংলা', 'মানবতন্ত্রী বিবেকানন্দ', 'দেখে এলাম হরিদ্বার'। 'বিদ্যামন্দির সংবাদ-পরিক্রমা'য় সারা বছরের কার্যধারা পরিস্ফুট।

সন্দীপন (১৯৬১): প্রকাশক—স্বামী বিমুক্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৭২।

শিক্ষণ-মন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা সন্দীপনের দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠ ক'রে আমরা আনন্দিত হয়েছি। তিনটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ দ্বারা সংখ্যাটি অলংকৃত, যথা: (১) Ramakrishna Movement: Its relation to the Indian Society.—Swami Virajananda. (২) শিক্ষা-সমস্যা-প্রসঙ্গে—স্বামী প্রেমেশানন্দ, (৩) বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ (সংকলন)। এগুলি প্রকাশ ক'রে সম্পাদকগণ শিক্ষাব্রতীদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

অন্যান্য লেখাগুলিও সুনির্বাচিত এবং সেগুলিতে তরুণ শিক্ষাব্রতীদের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ১৪ই মাঘ (২৮শে জানুআরি) রবিবার শুভ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মতিথি-উৎসব সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দে ও উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, চণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষদ্‌-ব্যাখ্যা, কালীকীর্তন, হোম ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সহস্র সহস্র নরনারী স্বামীজীর উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় ৮,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূর্বপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া বলেন, স্বামীজী স্বদেশপ্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া স্বামীজী সকলকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে বলিয়াছেন। স্বামীজীর আদর্শে প্রকৃত নেতার লক্ষণ বিশ্লেষণ করিয়া স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, স্বামীজী ছিলেন প্রকৃত নেতা, তাঁহার প্রদর্শিত সেবার আদর্শ গ্রহণ করিলে স্বার্থবুদ্ধি চলিয়া যাইবে এবং সর্ববিধ কল্যাণ হইবে।

পুরীঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ডক্টর হরেকৃষ্ণ মহতাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিশ্র ওড়িয়াতে 'সমাজ-সংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে এবং স্বামী তীর্থানন্দ 'স্বামীজীর বৈদান্তিক ভাবধারা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, স্বামীজীর বাণী জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলেই জীবন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিবে।

২৮শে জানুআরি আশ্রমে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ হয়।

২৯শে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া, আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়।

রাঁচি (মোরাবাদী)ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৮শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজাদি এবং অপরাহ্ণে স্থানীয় উকিল শ্রীকান্তকুমার লাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় ভজন-সঙ্গীতের পর শ্রীতারাকুমার ঘোষ বাংলায়, অধ্যাপক শ্রীমানসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে এবং অধ্যাপক শ্রীরঘুপ্রসাদ পাঁড়ে হিন্দীতে স্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সভার শেষে সমবেত ভক্তগণকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

উদ্বোধনঃ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে গত ২৬শে পৌষ (১১ই জানুআরি) বৃহস্পতিবার শ্রীমৎ

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ মহারাজের জীবনীপাঠ, ভোগরাগ ও ভজন হয়। বহু ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ৭০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বিশেষ সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

দক্ষিণেশ্বর : গত ১৪ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীসারদা মঠে বিশেষ পূজা, হোম এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। ভোরে মঙ্গলারতির পর দেবীসূক্ত পাঠ এবং ভজনাদি দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা, চণ্ডীপাঠ ও ভজন হয়। মঠ-প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি পত্র-পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ ভজন করিলে পর প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ও জীবনী হইতে উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া শোনান। প্রায় ২,০০০ ভক্ত মহিলাকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ভজনের পর রাত্রি ৯টা পর্যন্ত কালীকীর্তন হইয়াছিল।

স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের স্মৃতিপূজা

বেলুড় মঠ : গত ১০ই মাঘ (২৪শে জানুআরি) বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন ও বিশেষ ভোগরাগ হইয়াছিল। শঙ্করানন্দজীর একখানি প্রতিকৃতি তাঁহার ঘরে পুষ্প ও মাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। যেখানে তাঁহার শেষ কৃত্য হয়, সে স্থানটিও অতি সুন্দরভাবে সাজানো হয়। সমবেত ভক্তগণ পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। দ্বিপ্রহরে ১১,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ স্বামী শঙ্করানন্দজীর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী ওঙ্কারানন্দ 'গুরু' ও 'অধ্যক্ষ' শব্দ-দুটির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন : শ্রীরামকৃষ্ণই শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ, তাঁহার শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের মধ্যে নিত্য ক্রিয়াশীল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাব গোষ্ঠীগত চিন্তা-ধারার বহু ঊর্ধ্বে—এইটি উপলব্ধি করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা

নরেন্দ্রপুর : পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গত ১১ই হইতে ২১শে জানুআরি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে শিল্প- ও কৃষি-সম্বন্ধীয় প্রদর্শনীতে বহু শিক্ষণীয় জিনিস দেখানো হয়। মেলায় অনেক দোকানপাট বসিয়াছিল।

আনন্দদায়ক বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ব্রতচারী ও রায়বেঁশে লোকনৃত্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, বাউলগান, রামায়ণগান, যাত্রা, থিয়েটার, তরজা, কৃষ্ণলীলা-কীর্তন, লোক-সঙ্গীত, লাঠিখেলা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, বিবেকানন্দ-

গীতি-আলেখ্য, পুতুলনাচ, হরিসঙ্কীর্তন, মূকাভিনয়, গাদিখেলা, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, ব্যায়াম-প্রদর্শনী, বাজিপোড়ানো প্রভৃতি।

উৎসবের শেষ দিনে পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহ হইতে প্রতিদিন বহু লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছিল।

শিক্ষা-প্রদর্শনী

বেলুড়ঃ মহান্ কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দিরের পক্ষ হইতে যে 'শিক্ষা-সপ্তাহ' প্রতিপালনের আয়োজন করা হয়, তাহার প্রধান আকর্ষণ ছিল এক শিক্ষা-প্রদর্শনী। এই বৎসর প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে বিপুল জন-সমাবেশ হইয়াছিল। চারু ও কারুকলার মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্নমুখী দিক্‌গুলির নিপুণ পরিবেশন দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। স্বামীজীর জীবন ও ভাবধারার সঙ্গে দর্শকগণের সম্যক্ পরিচয় স্থাপনের জন্য প্রদর্শনীতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শিক্ষা-সংক্রান্ত আকর্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, ইতিহাস, বাংলাভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংস্কৃত সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, শিক্ষার ইতিবৃত্ত, গণিত, শিক্ষার শ্রাব্য ও চাক্ষুষ উপকরণ (Audio-visual aids) ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, জীববিদ্যা, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ছিল প্রধান। শিক্ষার বহুমুখী প্রবাহের দিক্‌টি এখানে রঙে রেখায়, বিবিধ সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তাই গুণমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ দর্শন শ্রবণ ও মননের সাহায্যে এই সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীটি আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উপভোগ করিতে সমর্থ হয়।

কার্যবিবরণী

সারগাছিঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী (১৯৫৭—'৬১ মার্চ) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের দীর্ঘ ৪০ বৎসরের পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত এই আশ্রম। ইহাই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯৭ খৃঃ হইতে আশ্রমটি অনাথ- ও আর্ত-সেবায় রত।

আশ্রমের বর্তমান কর্মধারার প্রধানতঃ তিনটি বিভাগঃ (১) ধর্ম ও কৃষ্টি, (২) শিক্ষা এবং (৩) চিকিৎসা।

(১) দৈনন্দিন পূজা ও উপাসনা, একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন এবং মহাপুরুষদের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষগুলিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষি সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠনে ৪৭টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, শ্রোতৃসংখ্যা ছিল গড়ে ২৫০।

(২) ১৯৫৯ খৃঃ আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয়টি বহুমুখী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং সাহিত্য কৃষি ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুইটি জুনিয়র বেসিক স্কুল, জুনিয়র শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র এবং সাধারণ পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। ৫০২ জন প্রাপ্তবয়স্ককে লিখন-পঠনক্ষম করা হইয়াছে।

ছাত্রসংখ্যার তুলনামূলক তালিকা

	'৫৮	'৫৯	'৬০-৬১
বহুমুখী বিদ্যালয়	১৬৯	১৫৫	২৪৯
বেসিক স্কুল	২৯০	৩৮৬	৩৫৯
সমাজ-শিক্ষা	৪০	৪০	৯৩
শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ	৪০	১০০	১০০

৬টি গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার করা হইতেছে, এই গ্রন্থাগারগুলির কাজ বর্তমানে গ্রাম্য গ্রন্থাগারের জন্য নির্মিত ভবনেই হইতেছে। মোট গ্রন্থসংখ্যা ৯,০০৯। পাঠাগারে

১৪টি দৈনিক এবং ৬৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়, দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৯১।

(৩) দাতব্য চিকিৎসালয়ে '৫৯ খৃঃ ৮,০৬২ নূতন ও ৫,৭১২ পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হয়। পশুচিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে।

বহরমপুর শাখা: এখানে একটি বড় লাইব্রেরি ও পাঠাগার পরিচালিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশাখাপত্তনম্ঃ রামকৃষ্ণ আশ্রম বঙ্গোপসাগরের মনোরম উপকূলে ১৯৩৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: আশ্রমে নিত্যপূজা, একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বাল্মীকি-রামায়ণ পাঠ হয়; ইহা ছাড়া গীতা উপনিষৎ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ২,৩০৮; পাঠাগারে ৬টি সংবাদপত্র এবং ২০টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। সারদা শিশুবিদ্যালয়ে ১৮০টি শিশু পড়ে, এই বিদ্যালয়টিকে স্বামীজীর শতবার্ষিকীতে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শিশুদের লাইব্রেরিতে সচিত্র পুস্তক রাখা হইয়াছে। শিশুশিক্ষার জন্য শ্রুতি-চাক্ষুষী (audio-visual) শিক্ষার প্রতি এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। ১৯৫৯ ডিসেম্বরে জেলেদের কলোনিতে তাহাদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার)ঃ নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী প্রতি শনিবার পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল:

বিষয়	বক্তা
জুন:	
শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধনার মর্মবাণী	স্বামী অপূর্বানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী	" অজজানন্দ
ভাগবতের বাণী	ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত
জুলাই:	
নিষ্কাম কর্ম	স্বামী জীবানন্দ
সতীলীলা	ভারতী-সংসদ
গীতা	স্বামী সাধনানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগেশ্বরী-প্রসঙ্গ	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য	শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমদ্ভাগবত	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
তুলসীদাসী-রামায়ণ	শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ সেন
স্বামী বিবেকানন্দ	স্বামী যুক্তানন্দ
সেপ্টেম্বর:	
শ্রীমদ্ভাগবত	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
শ্রীশ্রীমা	শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
"	শ্রীগণপতি পাঠক
গীতা ও চণ্ডীর তুলনা	স্বামী নিরাময়ানন্দ
চণ্ডীর কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী সুশান্তানন্দ
শক্তিতত্ত্ব	শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী সাধনানন্দ
নভেম্বর:	
মায়ের গান	শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ
ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য	স্বামী সুন্দরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	" সুশান্তানন্দ
ভারতের জাতীয় বিশেষত্ব	" সুন্দরানন্দ
ডিসেম্বর:	
শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী মুক্তাসঙ্গানন্দ
ধর্মপ্রসঙ্গ	" শুদ্ধসত্ত্বানন্দ
চণ্ডীতত্ত্ব	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মায়ের কথা	স্বামী ঈশানানন্দ
শিবানন্দ-জীবন ও বাণী	শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। কেন্দ্রাধ্যক্ষ : স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী : স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা, উপনিষদ্ ও রাজযোগের ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ক্লাস ও বক্তৃতাদি বন্ধ থাকে।

জুন '৬১ : এই অশান্ত 'অহং'টিকে লইয়া কি করা যায়? সাকার ও নিরাকার ঈশ্বরের লক্ষণ; শান্ত মনের রহস্য; শক্তি ও নির্ভীকতার সাধনা।

জুলাই : বৈদান্তিক দৃষ্টিতে বন্ধন ও মুক্তি।

সেপ্টেম্বর : আত্মার সন্ধানে মানুষ; সুখের সন্ধান ও প্রাপ্তি; আত্মার মুক্তিদাতা কে?

অক্টোবর : কিরূপে মন জয় করা যায়? জ্ঞানের সাধন ও প্রেম; ভারতে জগজ্জননীর উপাসনা; দুইটি আদর্শ এবং দুইটি পথ; পুরুষকার সহায়ে আত্মানুসন্ধান।

নভেম্বর : সর্বজনীন আত্মা ও ঈশ্বরের ব্যক্তি-সত্তা; প্রার্থনা ও ইহার শক্তি; আমাদের ইচ্ছা কি স্বাধীন? কিভাবে দুঃখ জয় করা যায়?

ডিসেম্বর : ধর্মে বিচারের স্থান; আত্মজ্ঞানী পুরুষ জগতে কিভাবে থাকেন? দৈবী কৃপা ও পুরুষকার; ঈশ্বর কখন আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হন? ঈশ্বরপুত্র খৃষ্ট; শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার শিষ্যগণ।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রস্তুতি-সভা

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটুটে (কলিকাতা) : গত ২০শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় স্বামীজীর শতবার্ষিকীতে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হয়। বিশিষ্ট বক্তাগণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, স্বামীজী ছিলেন যুগস্রষ্টা, তাঁহার উদাত্ত আহ্বানে ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে। আমাদের কর্তব্য ঋষিঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহার বাণী জীবনে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করা। শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বলেন, স্বামীজীর ভাবধারা ঠিক ঠিক গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়াই আমাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই, তিনি সকলকে স্বামীজীর আদর্শে মানুষ হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে বলেন।

সভান্তে স্বামীজীর প্রিয় কয়েকটি গান গাওয়া হয়। ইনস্টিট্যুট-হল শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশে পূর্ণ হইয়াছিল। এই সভায় বিশেষ করিয়া যুবক ও ছাত্রগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী মাধবানন্দ

গত ১৯শে জানুআরি সকালে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বর্তমানে তিনি বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন এবং মোটামুটি ভাল আছেন।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

পোর্টব্লেয়ার : শ্রীরামকৃষ্ণ সেণ্টার কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় গত ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে বিশিষ্ট সভ্য এবং অতিথিবৃন্দের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। স্তোত্রপাঠের পর শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও উপদেশ অবলম্বনে বক্তৃতা হয়। কয়েকটি সঙ্গীতের পর সভার কার্য শেষ হয়।

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব

মহাজাতি সদন (কলিকাতা): গত ২৭শে পৌষ (১২ই জানুআরি) শুক্রবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনের ট্রাস্টীগণের উদ্যোগে স্বামী গম্ভীরানন্দের সভাপতিত্বে বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দিলে পর বিখ্যাত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে স্বামীজীর প্রিয় কয়েকখানি গান পরিবেশন করেন।

যাদবপুর : গত ২৯শে জানুআরি সন্ধ্যায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে এক ভাষণে বলেন: স্বামীজী মুমূর্ষু ভারতকে বললেন, 'ওঠো', আর সেই থেকে ভারতবর্ষের চলা শুরু হ'ল। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরই বিকাশ। তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। ভারতের মূলধন ধর্ম। হিন্দুধর্মের মর্মবাণী তিনি প্রচার করলেন পাশ্চাত্যে। গণ্ডী-দেওয়া কোন ধর্মের মধ্যে স্বামীজী আবদ্ধ ছিলেন না। ডাক্তার, শিক্ষক—সকলেই সেবাভাবকে প্রাধান্য দিলে তাঁদের কর্ম পূজায় রূপান্তরিত হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন যক্ষ্মা হাসপাতালের ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেন।

মহামনা মালব্য-শতবার্ষিকী

গত ২৫শে ডিসেম্বর ডক্টর রাধাকৃষ্ণন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সপ্তাহব্যাপী শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের বাহিরে মালব্যজীর ৯ ফুট উচ্চ ব্রঞ্জ-নির্মিত পূর্ণাঙ্গ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। মূর্তিটি বিরাট মর্মর-বেদীতে সমাসীন। মালব্যজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, ছাত্র—সকলেই ছিলেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মালব্য স্বয়ং ২০ বৎসর যাবৎ ইহার উপাচার্য ছিলেন।

বেদপাঠ ও প্রার্থনা দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। এক শত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মালব্যজীর মূর্তি মাল্যভূষিত করা হয় এবং তাঁহার প্রিয় ভজন ও গানগুলি গাওয়া হয়। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন বলেন, মালব্যজী ছিলেন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি; যাহা তিনি সত্য ও ন্যায় বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই করিতেন।

২৮শে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতি আলোচনার কেন্দ্ররূপে 'মালব্য ভবনের' উদ্বোধন এবং ভবনের সম্মুখে স্থাপিত মালব্যজীর আবক্ষ মর্মর-মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

শান্তিনিকেতনেও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সভাপতিত্বে 'মদনমোহন মালব্য'-শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীনেহরু বলেন, যাঁহাদের সেবায় ভারতের স্বাধীনতা আসিয়াছে, মালব্যজী তাঁহাদেরই একজন। স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁহার দান কম নয়, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মিলন ঘটাইয়াছেন।

কার্যবিবরণী

কৃষ্ণনগর : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৫৯-৬১ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ : আশ্রমে নিত্য পূজা, রবিবারে ধর্মালোচনা এবং সাময়িক উৎসবগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পরিচালিত হইতেছে।

প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত প্রচার

প্রাচ্যবাণীর সংস্কৃত নাট্যাভিনয় সঙ্ঘ এবার দক্ষিণ ভারতবর্ষের মাদ্রাজ, পন্দিচেরী প্রভৃতি অঞ্চল এবং উত্তর ভারতবর্ষের বৃন্দাবনধামে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক শ্রীরামানুজাচার্যের জীবনচরিত অবলম্বনে বিরচিত সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়াছেন। মাদ্রাজে ২৫শে ডিসেম্বর, পন্দিচেরীতে ২৭শে ডিসেম্বর এবং বৃন্দাবনে ৬ই জানুআরি যথাক্রমে অখিল ভারত বৈষ্ণব সম্মেলন, পন্দিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম এবং ইউনেস্কো-ভারতসরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের (East-West Spiritual Values Conference) তত্ত্বাবধানে এই নাটক অভিনীত হয়। বৃন্দাবনে বিশ্বের ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও হিমবাহ

গত ৮ই জানুআরি কেম্ব্রিজে ৫০ জন বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করেন যে, ইওরোপের গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হইতেছে, কিন্তু আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে তদ্বিপরীত হইতেছে। হিমবাহ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ কার্যে নিযুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের এই বৈজ্ঞানিকগণ কেম্ব্রিজে ব্রিটিশ গ্লেসিওলজিক্যাল সোসাইটির (British Glaciological Society) ২৫ তম বার্ষিক অধিবেশনে মিলিত হন। তাঁহারা বলেন, ইওরোপে গ্রীষ্ম দীর্ঘতর ও উষ্ণতর হওয়ার কারণ এই মহাদেশের হিমবাহগুলি সঙ্কুচিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায় হিমবাহগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

ডক্টর গর্ডন রবিন (Dr. Gordon Robin, Director of Polar Instituto) বলেন, পর্যবেক্ষণের একটি ক্ষেত্র দক্ষিণ মেরু অঞ্চল, সেখানে সঞ্চিত প্রচুর তুষার গলিয়া গেলে সারা পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রায় ১৫০ ফুট উঁচু হইয়া যাইবে। তিনি বলেন, আরও পর্যবেক্ষণ চালানো হইবে, যাহাতে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিব, তুষার কি পরিমাণে বাড়িতেছে বা কমিতেছে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৪শে ফাল্গুন (৮. ৩. ৬২) বৃহস্পতিবার শুভ শুক্লা-দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজাপাঠ ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরবর্তী রবিবার (১১. ৩. ৬২) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

দেশসেবার পথে তিনটি সোপান

আমিও স্বদেশহিতৈষিতায় বিশ্বাসী। স্বদেশহিতৈষিতা-সম্বন্ধে বিশ্বাসী আমারও একটা আদর্শ আছে। মহৎ কার্য করিতে হইলে তিনটি জিনিসের আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা, আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ আগাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত।

হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে, কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে এবং কোটি কোটি ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে এবং ঐ চিন্তায় বিভোর হইয়া তোমরা কি তোমাদের নামযশ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়সম্পত্তি, এমন কি শরীর পর্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা-প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথাবাক্যে শক্তিক্ষয় না করিয়া কোন কার্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা-অপনোদনের জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পার কি?—কিন্তু ইহাতেও হইল না।

তোমরা কি পর্বতপ্রায় বিঘ্নবাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারিহস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে?

যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিতে পার। তোমাদের সংবাদপত্রে লিখিবার অথবা বক্তৃতা দিয়া বেড়াইবার প্রয়োজন হইবে না। তোমাদের মুখ এক অপূর্ব জ্যোতিঃ ধারণ করিবে। তোমরা যদি পর্বতের গুহায় যাইয়া বাস কর, তথাপি তোমাদের চিন্তারাশি ঐ পর্বতপ্রাচীর পর্যন্ত ভেদ করিয়া বাহির হইবে।*

---

* 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতা হইতে সংকলিত।

পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই ১৮৯৭ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মান্দ্রাজ শহরে স্বামীজী যে বক্তৃতাগুলি দিয়াছিলেন, 'My Plan of Campaign' সেগুলির অন্যতম, 'আমার সমরনীতি' সেটিরই বঙ্গানুবাদ।

কথাপ্রসঙ্গে

দেশপ্রেমের দীক্ষা

ভগবৎ-প্রেমে দীক্ষার কথাই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি,—পুরাণে ভাগবতে পড়িয়াও থাকি। দেশপ্রেমে দীক্ষা আবার কি? কথাটা একটু নূতন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এইরূপই ঘটিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকায় ঝঞ্ঝাসদৃশ এক অদ্বৈতবেদান্ত-প্রচারকের আবির্ভাব সর্বজনবিদিত। কে এই যোদ্ধা সন্ন্যাসী, যিনি ভগবৎপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কঠোর তপস্যা করিয়া চরম অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, আবার দেশকে জানিবার জন্য পরিব্রাজক-বেশে দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন, দেশবাসীকে বুঝিবার জন্য ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চনীচ সকলের দ্বারে অতিথি হইয়া সকলের সহিত মিশিয়াছেন, দেশবাসীর মর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া দেশ ও জাতির জীবন-রহস্য উদ্ধার করিয়াছেন! আমরা স্বামীজীর কথাই বলিতেছি। স্বামীজীর দেশপ্রেমের অন্তর্নিহিত রহস্য আজ নূতন করিয়া বুঝিবার ও বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশবাসী ভুলিতে বসিয়াছে, অথবা ভুলিয়া গিয়াছে—বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলার তথা ভারতের কোন কোন অংশের যুবকগণ নবজাগরণের যে মন্ত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল, দেশপ্রেমের যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে সারা দেশে একটা উন্নতিতৃষ্ণার আলোড়ন বহিয়া যায়—দেশের বন্ধন-মুক্তির সাধনা নানা প্রচেষ্টায় রূপায়িত হয়।

সকলেই যে স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র সমভাবে বুঝিয়াছিলেন, বা বুঝিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কেহ বা উহাকে নিছক ধর্মীয় ভাবিয়া বর্জনীয় মনে করিয়াছিল, কেহ বা এখনও উহাকে সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক ও মধ্যযুগীয় মনে করিয়া থাকে, আবার কেহ সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐরূপ দেশপ্রেম মায়িক—অতএব অকর্তব্য, তথা অধর্ম ভাবিয়া সমালোচনাও করিয়াছে। আর, একদল নির্ভীক তরুণ স্বামীজীর দেশপ্রেমের মন্ত্রে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির ঝঙ্কার শুনিয়া আত্মবলি দিতে আগাইয়া আসিয়াছে। আরও একদল নবীন তাপস এই দিব্য দেশপ্রেমের মধ্যে সর্ববিধ প্রেমের সমন্বয় অনুভব করিয়া তাহারই সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছে।

'দেশপ্রেম'—কথাটির অর্থ বুঝিয়া তারপর আমরা স্বামীজীর দেশপ্রেমের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব। 'দেশপ্রেম' একটা নূতন কথা নয়। যেদিন দেশের ধারণা হইয়াছে, সেদিনই মানুষ জননীর মতোই জন্মভূমিকে ভালবাসিয়াছে, তাহার সেবায় জীবন দিয়াছে, তাহার উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। বিদেশীর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা জীবন্ত জাগ্রত মানুষের সহজাত ধর্ম ও কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে, দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া সর্বত্র শ্রেষ্ঠ বীরত্ব বলিয়া পরিগণিত। অবশ্য দেশের ধারণা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে; ছোট ছোট নগর-রাজ্য বা কয়েক যোজনব্যাপী রাজ্য—বৃহত্তর রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, এখনও হইতেছে—কোথাও স্বেচ্ছায় সমস্বার্থে, কোথাও বা অর্ধ ইচ্ছায়—অনিচ্ছায়, কালপ্রভাবে! বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ভৌগোলিক সীমানার মুহুর্মুহু পরিবর্তন এই তথ্যই উদ্ঘাটিত করে।

ইতিহাস ও ভূগোলের বাহ্য দিকটি নিয়ন্ত্রিত করে অবশ্যই রাজনীতি বা রাজশক্তি! রাজশক্তি যখন কল্যাণপরায়ণ হইয়াছে, তখনই দেশে নানাদিকে উন্নতি দেখা দিয়াছে, আবার কালক্রমে রাজশক্তি দুর্বৃত্ত হইলে রাজনীতি দুর্নীতিতে পরিণত হইয়াছে, দেশে সর্বত্র অধোগতির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে দেশ ও জাতি চরম অবনতির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে জাতি অবলুপ্ত হইয়াছে! চরম অবনতির অবস্থা হইতে কচিৎ কোন দেশ বা জাতি আবার উঠিয়া দাঁড়ায়, আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লইবার জন্য আগাইয়া আসে—অন্তর্নিহিত এক মহাশক্তির সাধনায় তাহার অমর ঐতিহ্য ও অজেয় কৃষ্টি সম্বল করিয়া, মূলধন করিয়া! ভারতের ক্ষেত্রে এই রূপই ঘটিয়াছে। তাই মনে হয়—দেশ শুধু ইতিহাস বা ভূগোল নয়, দেশপ্রেমের অর্থ শুধু রাজনীতি নয়; দেশপ্রেম ঐতিহ্যচেতনা—কৃষ্টিপ্রাণতা।

এখন প্রশ্ন—কোন্ মহাশক্তির প্রেরণায় মৃতবৎ ভারত পুনরুজ্জীবিত হইতেছে?—সুপ্ত ভারত জাগিয়া উঠিতেছে?—অবনত ভারত আত্মোন্নতির জন্য সচেষ্ট?

কেহ বলিবেন, 'কালের প্রভাবে'। তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায়—কালের শক্তি কাহাকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইতেছে? ভারতের ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক কৃষ্টি এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও সাধনাকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে!

স্থূলদৃষ্টি বলিবেন, 'ঐতিহ্য ও কৃষ্টি না-হয় বুঝিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আবার দেশপ্রেম কোথায়? দেশের উন্নতির কথা তিনি কখনও বলিয়াছেন, এরূপ তো শুনি নাই।' উত্তরে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, 'বীজের মধ্যে কি কখনও শাখা-প্রশাখা পত্র-পুষ্প দেখিয়াছ? তথাপি নিশ্চয় স্বীকার কর যে বীজই বৃক্ষরূপে পুষ্পিত পল্লবিত হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণে যাহা বীজরূপে ছিল, স্বামী বিবেকানন্দে তাহাই বৃক্ষরূপে বিকশিত হইয়া, প্রকাশিত হইয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার যোগ্যতম উত্তরাধিকারীকে শিখান নাই—জীবের মধ্যেই শিব রহিয়াছেন, জীবসেবাই শিবসেবা? সেই শিক্ষার বলেই কি উত্তরকালে অদ্বৈতবেদান্তবাদীর কবিহৃদয় রুদ্রমধুর ছন্দে গর্জন করিয়া গাহিয়া উঠে নাই—'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর!'

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা-প্রভাবেই বিবেকানন্দ-জীবনে ভগবৎপ্রেমের সহিত মানবপ্রেম পরতে পরতে মিশিয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার মানবপ্রেমের দুইটি দিক—একটি বিশ্বপ্রেম, অন্যটি দেশপ্রেম! প্রেমকেই স্বামীজী সকল কাজের প্রেরণাশক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলিয়াছেন:

> 'দেব, দেব' বলো আর কেবা,
> —কেবা বলো সবারে চালায়?
> পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে;
> —প্রেমের প্রেরণ!

প্রেম ও ঈশ্বর তাঁহার অভিধানে সমার্থক। শ্রীরামকৃষ্ণকেও তিনি প্রেমস্বরূপ বলিয়াই উপলব্ধ করিয়াছিলেন!

স্বামীজীর জীবনে এই প্রেম প্রচণ্ডবেগে মানবপ্রেমরূপে দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে তিনি ভালবাসিয়াছেন, বিশেষত সকল জাতির দুর্বৃত্ত অধঃপতিত হতভাগ্য পাপী-তাপীর প্রতিই তাঁহার সমধিক সহানুভূতি; মূর্খ-দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতকে তিনি আরাধ্য দেবতার আসন দিয়াছেন। এই

প্রত্যক্ষ দেবতার সেবার দ্বারাই এ-যুগের মানুষ অতি সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে, এইপ্রকার নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই শুদ্ধচিত্ত হইয়া দেশবিদেশের সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করিবে—ইহাই স্বামীজীর নবতম ঘোষণা!

পৃথিবীর সর্বত্রই দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আছে, অন্যত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার চেষ্টাও আছে। কিন্তু যুগযুগ-নিদ্রিত ভারতে ঐ চেষ্টার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী ভারতেই তাঁহার সেবাধর্মের চক্রে গতি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন! সে চক্রের ঘূর্ণন-নির্ঘোষে ভারতবাসীর নিদ্রাচ্ছন্ন মন ধীরে ধীরে সচেতন হইতেছে!

স্বামীজীর দেশপ্রেম বা ভারতপ্রেমের দুইটি দিক সহজেই ধরা পড়ে। প্রথমটি ভারতের অতি শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য-অজ্ঞতা; এগুলি স্বামীজীকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। স্পষ্টই তিনি লিখিয়াছেন—ভারতের এই দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রথম চাই মানুষ, দ্বিতীয় চাই অর্থ। মানুষের সন্ধানে প্রথম তিনি তাকাইয়াছেন—তাহার প্রিয় গুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া 'মানুষ'-গুলির দিকে, তাঁহার দ্বিতীয় আশার স্থল—তাঁহার শিষ্য ও তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত যুবকদল! কিন্তু অর্থ কোথায় পাওয়া যাইবে? এই চিন্তায় তিনি ধনী রাজা-মহারাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বুঝিয়াছিলেন, বৃথা আশা; তখন স্বীয় মস্তিষ্কবলে অর্থ উপার্জন করিয়া দেশসেবায় উহা ব্যয়িত করিবেন—এই সংকল্প লইয়া আমেরিকা যাত্রা করেন।

সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি আমেরিকার কাছে শূন্য হস্তে অর্থ 'ভিক্ষা' করিতে যান নাই, এক-তরফা সাহায্যও চাহেন নাই। চাহিয়াছিলেন বিনিময়! বিনিময়ের উপযোগী বাহ্য কোন সম্পদ না থাকিলেও অন্তরের এক অফুরন্ত সম্পদের সন্ধান স্বামীজী পাইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য ক্রমশঃ সেই সম্পদের অভাব বোধ করিবে, এবং ভারতই তাহার সে অভাব মিটাইতে পারে—ইতিহাসের এই ইঙ্গিত স্বামীজীর চোখে ধরা পড়িয়াছিল। তাহারই সূচনা তিনি করিয়া গিয়াছেন। ভারতের অযত্ন-রক্ষিত অধ্যাত্ম-সম্পদ পাশ্চাত্যের অন্তরের অভাব দূর করিবে, আর পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান প্রভৃতি ভারতের বাহিরের অভাব দূর করিবে; পারস্পরিক সেবাপ্রভাবে বিদ্বেষ-বিরহিত এক মহৎ মানবসমাজ, সাম্যে প্রতিষ্ঠিত এক নূতন সভ্যতা দেখা দিবে!—ইহাই স্বামীজীর অপূর্ব স্বপ্ন, কল্পনা অথবা ভবিষ্যৎ দর্শন!

ভারতকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন—তাহার কারণ শুধু এই নয় যে, ভারত তাঁহার জন্মভূমি; ভারতকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন—তাহার প্রথম কারণ ভারত অধঃ-পতিত, একটা মহৎ জাতি আত্মবিস্মৃত! ভারতকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় কারণ—বর্তমান ভোগসর্বস্ব মানব-জাতিকে যুগ-প্রয়োজনে আধ্যাত্মিকভাবে প্লাবিত করিবার মহাশক্তি এই ভারতেই রহিয়াছে! তাই তিনি বলিয়াছেন, 'পৃথিবীর অন্যত্র জন্মগ্রহণ করিলেও আমি ভারতকে ভাল-বাসিতাম—তাহার এই আধ্যাত্মিকতার জন্য!'

'ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী! ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ!

এই 'স্বদেশ-মন্ত্রে'ই স্বামীজী এ যুগে ভারতবাসীকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। 'নিজে জাগ্রত হও, অপরকে জাগ্রত কর'—এই নবতম যুগব্রতে তাহাকে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন! পরাধীন পরপদানত ভারতবর্ষের মধ্যেও নিত্যমুক্ত চিরোন্নত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া সগর্বে-দণ্ডায়মান স্বীয় মূর্তি দেশবাসীর সমক্ষে স্থাপন করিয়া সকলকে ডাকিয়া সগৌরবে বলিয়া গিয়াছেন, 'সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই!'

স্বামীজীর এ দেশপ্রেম সংকীর্ণ স্বজাতিপ্রেম নহে। সাধারণ মানুষের প্রীতি তাহার দেহেই কেন্দ্রীভূত। যেখানে প্রেম সেখানেই আত্মবোধ, তাই সাধারণ মানুষে দেহাত্মবোধই তীব্রভাবে প্রকটিত, দেহের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, দেহের সহিতই তাহার তাদাত্ম্য! স্বামীজীর যে দেশপ্রেম তাহা দেশাত্মবোধ—দেশের সুখে সুখী, দেশের দুঃখে দুঃখী, দেশ ও দেশবাসীর সহিত তাহার তাদাত্ম্যভাব! এই দেশপ্রেম পাশ্চাত্যে প্রচলিত দেশপ্রীতি নয়—ইহা বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত সর্বাত্মবোধ, অদ্বৈতানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বত্র আত্মদর্শন।

ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত স্বামীজীর চক্ষে পরম পবিত্র, ভারতের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড তাঁহার মনে অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিত। ভারতের নদনদী গিরিপ্রান্তর—সবই ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে চেতন! ভারত সম্বন্ধে এই তীব্র অনুভূতি তিনি যাঁহাদের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া যান, তাঁহার মানস-কন্যা 'নিবেদিতা' তাঁহাদের অন্যতম। স্বীয় গুরুদেবকে নিবেদিতা ভারতের অমর আত্মারূপেই উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন: ভারত ছিল তাঁহার আরাধ্য দেবতা—তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম বস্তু। গুরু, দেশ ও দেশের ঐতিহ্য—কেমন একভাবে তাঁহার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল! গুরুদেবের নিকট হইতে এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া ভগিনী নিবেদিতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে দর্শন করিয়াই ভারতবর্ষকে দেখিতে পাইয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভারতীয় নারীর মধ্যেই ভারতের চিরন্তন আদর্শ—ত্যাগ, সেবা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ আজও স্থির দীপশিখার মতো জ্বলিতেছে!

ত্যাগ ও সেবার এই জাতীয় আদর্শ স্বামীজী অভ্রান্তভাবে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাজনীতি নয়, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের জাতীয় সাধনা। ভারতের যে শাশ্বত রূপ—অতীত ও আগামীকালের যে উজ্জ্বল মূর্তি স্বামীজী আমাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া কি আমরা ইতিহাসের রাজন্যবর্গের লোভ ও হিংসার কাহিনী, ভূগোলের ঘনঘন সীমানা-পরিবর্তনের বর্ণনা এবং অধুনাকালের রাজনীতিকদল-কণ্টকিত নগ্ন স্বার্থপরতাকে এবং নির্বাচনী ইস্তাহারের দাম্ভিক আত্মপ্রচারকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া তাহার স্রোতে ভাসিয়া যাইব?

সুপ্ত পরাধীন ভারত যে মন্ত্রে জাগিয়া উঠিয়াছিল, অর্ধ-জাগ্রত স্বাধীন ভারত আজ সে মন্ত্র মনে করিতে পারিতেছে না! তাই তাহার পরাধীনতা ঘুচিলেও দুর্দশা ঘোচে নাই! সমান ভোটাধিকার জুটিলেও সমান ভোগাধিকার জুটিবার লক্ষণ দেখা দেয় নাই!

বৃথাই সে মনে করিতেছে—পাশ্চাত্যের আংশিক অনুকরণ করিয়া সে পাশ্চাত্য জাতিগুলির সমান হইতে পারিবে! সে দেখিতেছে না, সন্দিগ্ধচিত্ত পাশ্চাত্য জাতিগুলি পরস্পরের ভয়ে কম্পমান; সে দেখিতেছে না, তাহার আদর্শভূত জড়বাদী সভ্যতা পতনের পূর্বক্ষণে টলমল করিতেছে; সে দেখিতেছে না, এত সাধের যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মানুষকে আত্মঘাতী করিয়া তুলিতেছে।

ভারত যদি আজ যুগ-সন্ধিক্ষণেলব্ধ ত্যাগ ও সেবার মহামন্ত্র স্মরণ করিয়া পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয়, শিক্ষা সহায়ে আভ্যন্তরীণ একতা অনুভব করিয়া যথার্থ ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং স্বীয় অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উহারই মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সহিত প্রীতিপূর্ণ বিনিময়ের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তবেই ভারত অচিরে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিবে!—স্বামীজীর এই ভবিষ্যদ্-নির্দেশ আমরা যেন ভুলিয়া না যাই!

চলার পথে

'যাত্রী'

যাঁহারা উত্তর-জীবনে প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহাদের বাল্যজীবনের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। কিন্তু ঐ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখা যায়, ইঁহাদের প্রতিভা-বিকাশের কোরক-অংশটি কেমন যেন রহস্যময়—কারণ ঐ কোরক দেখিয়া পরবর্তী প্রস্ফুটনের বিচার প্রায়ই নির্ভুলভাবে করা যায় না। মনে হয়, তাঁহাদের বাল্যের সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজ ও গৃহের শাসনে একটা অব্যক্ত আকৃতিতে পরিণত হয়—এবং তাহার প্রকাশভঙ্গীও হয় বিচিত্র। যৌবনে যিনি ধীর-স্থির, গম্ভীর ও তন্ময়, বাল্যে তাঁহাকেই চঞ্চলতার প্রতিমূর্তি বলিয়া প্রতিভাত হইতে দেখি। পরবর্তীকালে—যিনি দেহকে ভুলিয়া কেবল আত্মাকে লইয়া মগ্ন থাকিতে চাহেন, তিনিই আবার কৈশোরে শরীরচর্চায়, খেলাধূলায়, এমন কি নানা উচ্ছলতায় দুর্দান্ত হইয়া উঠেন। এই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবধারার সামঞ্জস্য কোথায়—আমরা জানিনা; তাহা আদৌ আবিষ্কার করা যায় কিনা, তাহাও জানা নাই। তবে অভিব্যক্তির এই আপাতবিরোধী রূপকে যখন একটা ঘটনা বা ইতিহাসের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই, তখন ইতিহাসের স্বাভাবিক বিবৃতিতেই আমাদের এখন ফিরিয়া আসা ভাল।

বর্তমান ভারতের নবজীবনধারার ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বাল্যে—তাঁহার অসীম শক্তিকে বিকশিত করিবার প্রারম্ভে—কিভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাই এখন আমাদের চিন্তনীয়। বাহির ও অন্তরের অকুণ্ঠ সচ্ছলতার মধ্যেই তিনি লালিত হইয়াছিলেন। প্রথমপুত্র-মুখদর্শনে আনন্দিত তাঁহার মাতারও শাসন বোধ হয় সংযত ছিল—উদার পিতার হৃদয়বত্তার মাঝে ভ্রূকুটিও ছিল সংক্ষিপ্ত। কিংবা সর্বোপরি, জীবনের সেই প্রথম প্রভাতেও হয়তো অলক্ষিতে তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জীবন-রথে ভগবৎ-শক্তিই সারথিরূপে রহিয়াছেন। ফলে, যে 'অভী'মন্ত্রের উদার জয়ভেরী একদিন তাঁহার বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া বিশ্ববাসীর অন্তরে সুতীব্র স্বনন তুলিবে—এ কথা যেন তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি হয়তো জানিতেন, ভবিষ্যতে তাঁহাকে একদিন হাসিমুখে এই ধর্মস্থাপনের কুরুক্ষেত্রে বেদান্ত-গাণ্ডীবে টঙ্কার তুলিয়া 'নিমিত্তমাত্র' হইয়া, যুদ্ধে জয়ী হইয়া বনের বেদান্তকে ঘরে আনিতে হইবে। অথবা আমাদের নব ভগীরথ বিবেকানন্দকে যে এই মৃত সগর-সন্তানসন্নিভ ভারতবাসীকে প্রাণসত্তায় উদ্বেলিত করিবার জন্য উদার জয়-শঙ্খ বাজাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে—তাহারই বিশ্রামহীন প্রস্তুতি তাঁহার বাল্যকালেই প্রকাশোন্মুখ দেখিতে পাই।

কৈশোরেই তাঁহার অস্থিতে কে যেন দধীচির বজ্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরার্থে সর্বস্বদান তাই ছিল তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। মনে হয়, তাঁহার বাল্যজীবনের এক উজ্জ্বল মুহূর্তে এক অদ্ভুত মানসিক আদর্শের পরশমণি-স্পর্শে তাঁহার অন্তরের সব কিছু লোহা

সোনা হইয়া যায়। লোহার তলোয়ার সোনার হইয়া গিয়াছিল, ফলে আকার তলোয়ারের মতো থাকিলেও তাহার আন্তর প্রকৃতিতে আসিয়াছিল রূপান্তর। সেইজন্যই তাঁহার বাল্যজীবনের উচ্ছল গতিময়তা পরবর্তীকালে এক আদর্শাবগাহী গতিরূপে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই। যেখানে পূর্বে ছিল তথাকথিত বাস্তব জীবন বা বাহ্য জীবনের মধ্যে ছুটাছুটি—তাহাই উত্তর-জীবনে এক আধ্যাত্মিক রহস্যময়তার মধ্যে অবিশ্রান্ত অথচ সাবলীল প্রকাশভঙ্গী খুঁজিতে খুঁজিতে এক দ্রুততর মানস-ভ্রমণের ধ্যানময় উজ্জ্বলতায় পরিণত হইয়াছিল।

তাঁহার বাল্যের ও পরবর্তীকালের জীবনধারায় এই অসামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করিলে মনে হয়—তিনি যেন এক কালবৈশাখীর প্রমত্ত ঝঞ্ঝা। আগমনের প্রারম্ভে কত বজ্র, কত বিদ্যুৎ কত ভ্রূকুটি, কিন্তু যখন তাহা প্রবল বর্ষণে শুষ্ক তৃষ্ণাতুর পৃথিবীকে স্নিগ্ধতায় সিক্ত করিয়া এক নৈর্ব্যক্তিকতায় নিজেকে নিঃশেষিত করে—তখন পূর্বেকার সেই ভয়াল রূপই এক প্রশান্তিতে, এক পরার্থে-ব্যয়িত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। মনে হয়, 'দাও আর ফিরে নাহি চাও' মন্ত্রের ঋষি বাল্যাবধি ঐ সাধনায় মাতিয়াছিলেন।

যাহা হউক, মাতাপিতার নয়নমণি ও প্রতিবেশীর নয়নহরণ পদ্মপলাশনেত্র শিশু নরেন্দ্রনাথ ধীরেধীরে অধিকতর মনোহর হইয়া উঠিলেন। বালককে দেখিলেই সকলের মনে এক আবেগময় আনন্দ ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু হাঁটিতে শিখিয়াই বালক আর স্থির থাকিতে চাহে না। অবিরাম অশান্ত দৌরাত্ম্যে তখন হইতেই বাধাহীন—স্বাধীন। কেহই শাসনে রাখিতে পারে না। ভর্ৎসনা বা ভয়প্রদর্শন কোনটাতেই বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই। শিবাংশে জাত এই বালককে শাসনে রাখা দুষ্কর। কিন্তু এক অপরূপ ব্যবস্থায় এই দুরন্ত বালককেও শাসন করা সম্ভব হইতে লাগিল। 'যদি দুষ্টামি করিস, তবে শিব আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না' বলিয়া মাতা যখন মাথায় 'শিব শিব' বলিয়া জল ঢালিয়া দিতেন, তখন বালক শান্ত হইয়া যাইত।

এই সময়ে বাড়িতে সাধু-সন্ত আসিলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রতি কেমন এক আকর্ষণ বোধ করিতেন—শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিছু হাতের কাছে পাইলেই সেগুলি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের দিয়া বসিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য বাটীর বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলে তিনি ছাদে উঠিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতেও দ্বিধা করিতেন না। পরার্থে সবকিছু বিলাইয়া দেওয়া তাঁহার আজন্ম সংস্কার বলিয়াই মনে হয়।

চল পথিক, এই পূত চরিত্রের উন্মেষের অবস্থা অবলোকন করিবে চল। চল, ঐ মূর্তমহেশ্বর উজ্জ্বলভাস্বর-রূপের প্রস্ফুটন দেখিবে চল। এই তো সময়, তাঁহার শতবার্ষিকীর পূর্বমুহূর্তে। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

গীতা—প্রথম বক্তৃতা

স্বামী বিবেকানন্দ

(১৯০০ খৃ: ২৬শে মে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ)

গীতা বুঝিতে হইলে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি বোঝা প্রয়োজন। গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ্ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ—খ্রীষ্টান জগতে নিউ টেস্টামেণ্টের মতো ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক; কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ্ কোন ঋষি বা আচার্যের জীবন-কাহিনী নয়—ইহার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। উপনিষদের সূত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভার আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উপনিষদ্ শব্দের একটি অর্থ—(আচার্যের নিকট) উপবেশন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ইহাদিগকে কেন সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক বিবরণ বলা হয়। দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। পূর্বাপর সম্বন্ধ বা পটভূমি নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃতভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টের ৫,০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদ্গুলি ইহারও অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর আগেকার—ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ পর্যন্ত। সেগুলি এমনভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ এত বিরাট যে, যদি ইহার শ্লোকগুলি একত্র করা হয়, তবে এই বক্তৃতা-গৃহটিতে স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। ইহা ছাড়া কিছু নষ্টও হইয়া গিয়াছে। বেদ বহু শাখায় বিভক্ত; এক-একটি ঋষি-সম্প্রদায় ছিলেন এক-একটি শাখার ধারক ও বাহক। ঋষিগণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাখাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চারণের কিছুমাত্র ভুল না করিয়া বেদের অধ্যায়ের পর অধ্যায় আবৃত্তি করিতে পারেন। বেদের বৃহত্তর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু যে-অংশ পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার হইতে পারে। বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। বৈদিক রচনাবলীর পারম্পর্য-নির্ণয়ের জন্য আধুনিক গবেষকদের একটি ঝোঁক দেখা যায়—কিন্তু এ বিষয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থীদের ধারণা অন্যরূপ, যেমন বাইবেল সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা আধুনিক গবেষকদের মত হইতে ভিন্ন। বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়: একটি দার্শনিক অংশ—উপনিষদ্, অন্যটি কর্মকাণ্ড।

কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এখন একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। অনুষ্ঠান-বিধি ও স্তবস্তুতি লইয়াই কর্মকাণ্ড; বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন স্তব। কর্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিধিসমূহ পাওয়া যায়—উহাদের মধ্যে কিছু কিছু বিশদভাবে

আলোচিত হইয়াছে। বহু হোতা ও পুরোহিতের আবশ্যক। যাগযজ্ঞের বিশদ অনুষ্ঠানের জন্য হোতা, ঋত্বিক প্রভৃতির কার্য একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ক্রমশঃ এই সব স্তব ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সর্ব-সাধারণের মধ্যে একটি শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠে। দেবতাগণ তখন অন্তর্হিত হন এবং যাগযজ্ঞই তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহাই একটি অদ্ভুত ক্রমপরিণতি। গোঁড়া হিন্দু (মীমাংসক) দেবতায় বিশ্বাসী নন; যাঁহারা গোঁড়া নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাসী। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, বেদে উল্লিখিত দেবতাগণের তাৎপর্য কি, তাহা হইলে তিনি ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না। পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুদিগকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, শব্দের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়, এই পর্যন্ত। প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই উহার মধ্যে আছে। অতএব বেদ হইল শব্দরাশি, যাহার উচ্চারণ নির্ভুল হইলে আশ্চর্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একটি শব্দেরও উচ্চারণ ভুল হইলে চলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ বিধিমত উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে অন্যান্য ধর্মে যাহাকে প্রার্থনা বলা হয়, তাহা অন্তর্হিত হইল এবং বেদই দেবতারূপে পরিণত হইল। কাজেই দেখা যাইতেছে, এ-মতে বেদে শব্দরাশির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এইগুলি হইল শাশ্বত শব্দরাশি, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিন্তারই অভিব্যক্তি এবং চিন্তা ব্যক্ত হয় কেবল-মাত্র শব্দের সাহায্যে। যে শব্দরাশি দ্বারা অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হয়, তাহাই বেদ। অতএব বলা যায়, প্রত্যেকটি বস্তুর বাহিরের যে অস্তিত্ব, তাহা নির্ভর করে বেদের উপর, কারণ শব্দ ছাড়া চিন্তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যদি 'অশ্ব' শব্দটি না থাকিত, তবে কেহই অশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিত না। অতএব চিন্তা, শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলি কি? এগুলি বেদ। হিন্দুরা এই ভাষাকে মোটেই সংস্কৃত বলেন না; ইহা বৈদিক বা দেবভাষা। অন্যান্য ভাষার মতো সংস্কৃতও একটি বিকৃত রূপ। বৈদিকভাষা হইতে প্রাচীনতর আর কোন ভাষা নাই। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—বেদসমূহের রচয়িতা কে? এগুলি কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই। শব্দরাশিই বেদ। একটি শব্দই বেদ, যদি আমি ঠিকভাবে তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে।

এই বেদরাশি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান এবং এই শব্দরাশি হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত। কল্পান্তে এই সব শক্তির প্রকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রথমে কেবল শব্দে এবং পরে চিন্তায় লীন হইয়া যায়। পরবর্তী কল্পে চিন্তা প্রথমে শব্দরাশিতে ব্যক্ত হয় এবং পরে শব্দগুলি হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য যাহা বেদে নাই, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহু গ্রন্থ আছে। যদি আপনারা বলেন, বেদ মানুষের দ্বারা রচিত, তাহা হইলে এই সব দার্শনিকের নিকট আপনারা হাস্যাস্পদ হইবেন। মানুষের দ্বারা বেদ প্রথমে সৃষ্ট

হইয়াছিল—এ কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক। প্রবাদ আছে, তিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদপাঠও করিয়াছিলেন। যদি খ্রীষ্টান বলে, 'আমার ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং সেজন্যই উহা সত্য আর তোমার ধর্ম মিথ্যা।' মীমাংসক উত্তর দিবেন, তোমার ধর্মের একটি ইতিহাস আছে এবং তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, কোন মানুষ উনিশ শত বৎসর পূর্বে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে। যাহা সত্য, তাহা অসীম ও সনাতন। ইহাই সত্যের একমাত্র লক্ষণ। সত্যের কখনও বিনাশ নাই—ইহা সর্বদা একরূপ। তুমি স্বীকার করিতেছ, তোমার ধর্ম কোন-না-কোন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ কিন্তু সেরূপ নয়; কোন অবতার বা মহাপুরুষ দ্বারা উহা সৃষ্ট নয়। বেদ অনন্ত শব্দরাশি—স্বভাবতঃ যে শব্দগুলি শাশ্বত ও সনাতন, সেগুলি হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সেগুলিতেই ইহার লয় হইতেছে। তত্ত্বের দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।…সৃষ্টির আদিতে শব্দের তরঙ্গ। জীবসৃষ্টির আদিতে জীবাণুর মতো শব্দতরঙ্গেরও আদি-তরঙ্গ আছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তা সম্ভব নয়।…

যেখানে কোন বোধ চেতনা বা অনুভূতি আছে, সেখানে শব্দ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যখন বলা হয়, চারখানি গ্রন্থই কেবল বেদ, তখন ভুল বলা হয়। তখন বৌদ্ধেরা বলিবেন, 'আমাদের শাস্ত্রগুলিই বেদ, সেগুলি পরবর্তী কালে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।' তাহা সম্ভব নহে, প্রকৃতি এইভাবে কার্য করে না। প্রকৃতির বিষয়গুলি আংশিকভাবে প্রকাশিত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের খানিকটা আজ এবং খানিকটা কাল প্রকাশিত হইবে, এইরূপ হয় না। নিয়মমাত্রেই পরিপূর্ণভাবে এককালে অভিব্যক্ত হয়। নিয়মের ক্রমবিবর্তন মোটেই নাই। যাহা হইবার তাহা একেবারেই হইবে। 'নূতন ধর্ম', 'মহত্তর প্রেরণা' প্রভৃতি শব্দ নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃতির শতসহস্র নিয়ম থাকিতে পারে এবং মানুষ আজ তাহার অতি অল্পই হয়তো জানিয়াছে। তত্ত্বগুলি আছে, আমরা সেগুলি আবিষ্কার করি—এই মাত্র। প্রাচীন পুরোহিতকুল এই শব্দরাশির উচ্চারণ-বিধি অধিগত করিয়া দেবতাদের স্থানচ্যুত করিয়াছেন এবং নিজদিগকে তাহার স্থলে বসাইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন: শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা তোমরা জান না। ঐগুলি কিভাবে ব্যবহার করা যায়, আমরা জানি। এই পৃথিবীতে আমরাই জীবন্ত দেবতা। আমাদের অর্থ দাও। অর্থের বিনিময়ে আমরা বেদের শব্দরাশিকে এমনভাবে কাজে লাগাইব, যাহাতে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমরা কি নিজেরা বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ করিতে পারো? পার না; সাবধান, যদি একটুও ভুল কর, তবে ফল বিপরীত হইবে। তোমরা কি ধনবান্, ধীমান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে চাও এবং মনোমত পতি বা পত্নী লাভ করিতে চাও? তাহা হইলে পুরোহিতদের অর্থ দাও এবং চুপ করিয়া থাকো।

আর একটি দিক আছে। বেদের প্রথম অংশের আদর্শ অপর অংশ উপনিষদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথম অংশের যে আদর্শ, তাহার সহিত এক বেদান্ত ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের আদর্শের মিল আছে। ইহলোকে ও পরলোকে ভোগই ইহার মূল কথা—স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা। অর্থ দাও, পুরোহিতরা তোমাকে ছাড়পত্র দিবেন—পরকালে স্বর্গে তুমি সুখে থাকিবে। সেখানেও তুমি সব আত্মীয়-স্বজনকে পাইবে এবং অনন্তকাল

আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবে। অশ্রু নাই, দুঃখ নাই—শুধু হাসি আর আনন্দ। পেটের বেদনা নাই—যত পারো খাও। মাথা-ব্যথা নাই, যত পারো ভোজসভায় যোগদান কর। পুরোহিতদের মতে ইহাই মানব-জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য।

এই জীবন-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত আর একটি বিষয়ের সহিত আধুনিক ভাব-ধারার অনেকখানি মিল আছে। মানুষ প্রকৃতির দাস এবং চিরকালই সে এইরূপ থাকিবে। আমরা ইহাকে 'কর্ম' বলি। কর্ম একটি নিয়ম; ইহা সর্বত্র প্রযোজ্য। পুরোহিতদের মতে সকলেই কর্মের অধীন। তবে কি কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই? তাঁহারা বলেন, 'না। অনন্তকাল প্রকৃতির ক্রীতদাসরূপে থাকিতে হইবে—তবে সে দাসত্ব সুখের। যদি তোমরা আমাদের উপযুক্ত দক্ষিণা দাও, তবে শব্দগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিব, যাহাতে তোমরা পরলোকে কেবল ভালটুকুই পাইবে, মন্দটুকু নয়।'—মীমাংসকেরা এইরূপ বলেন। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ আদর্শই সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া আছে। জনসাধারণ কখনও চিন্তা করে না। যদি কেহ কখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার উপর কুসংস্কারের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই দুর্বলতার জন্য বাহিরের একটু আঘাতে তাহাদের মেরু-দণ্ড ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। প্রলোভন ও শাস্তির ভয় দ্বারা তাহারা চালিত হয়। নিজেদের ইচ্ছায় তাহারা চলিতে পারে না। সাধারণ লোককে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে; চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া তাহারা থাকিবে। পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়া এবং তাহাদের মানিয়া চলা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নাই—বাকী যাহা করণীয়, তাহা যেন পুরোহিতরাই করিয়া দিবেন।...ধর্ম এইভাবে কতখানি সহজ হইয়া যায়! কারণ আপনাদের কিছুই করিবার নাই—বাড়ি গিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকুন। নিজেদের মুক্তিসাধনার সবই অপরে করিয়া দিবে। হায়, হতভাগ্য মানুষ!

পাশাপাশি আর একটি দার্শনিক চিন্তাধারা ছিল। উপনিষদ্ কর্মকাণ্ডের সকল সিদ্ধান্তের একেবারে বিপরীত। প্রথমতঃ উপনিষদ্ বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন—তিনি ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্বের নিয়ামক। কালে তিনিই কল্যাণময় ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হন। এই ধারণা পূর্বের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরোহিতরাও এ কথা বলেন, তবে এখানে ঈশ্বরের যে ধারণা, তাহা অতি সূক্ষ্ম। বহু দেবতার স্থলে এখানে এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ কর্মের নিয়মে সকলে আবদ্ধ, উপনিষদ্ও তাহা স্বীকার করেন; কিন্তু নিয়মের হাত হইতে মুক্তিপথের সন্ধানও তাঁহারা দিয়াছেন। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নিয়মের পারে যাওয়া। ভোগ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ কেবল প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ উপনিষদ্ যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং উহাকে নিতান্ত হাস্যকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। যাগযজ্ঞের দ্বারা সকল ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাই মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না; কারণ মানুষ যতই পায়, ততই চায়। ফলে মানব হাসি-কান্নার অন্তহীন গোলকধাঁধায় চিরকাল ঘুরিতে থাকে—কখনও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না; অনন্ত সুখ কোথাও কখনও সম্ভব নহে, ইহা বালকের কল্পনামাত্র। একই শক্তি সুখ ও দুঃখরূপে পরিণত হয়।

আজ আমার মনস্তত্ত্ব খানিকটা পরিবর্তন করিয়াছি। একটি অত্যন্ত অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। অনেক সময় আমাদের মনে অনেক ভাব জাগে, যেগুলি আমরা চাই না, আমরা অন্য বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে চাই। সেই ভাবটা কি? দেখিতে পাই পনর মিনিটের মধ্যেই তাহা আবার মনে উদিত হয়। সেই ভাবগুলি এত প্রবল ও ভীষণভাবে আসিয়া মনে আঘাত করে যে, নিজেকে পাগল বলিয়াই মনে হয় এবং যখন এই ভাব প্রশমিত হয়, তখন দেখা যায় যে, পূর্বের ভাবটাকে শুধু চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। ইহার পরিণতি কি হইল? ভিতরে যে খারাপ সংস্কারগুলি ছিল, সেইগুলি কার্যে পরিণত হইয়াছে। প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কি করিতে পারে? গীতায় এইরূপ ভীষণ কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই আমাদের সমস্ত সংগ্রাম, সমস্ত চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। মনের মধ্যে সহস্র প্রেরণা একই সময়ে প্রতিযোগিতা করিতেছে—তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যখনই বাধা অপসারিত হয়, তখনই সমস্ত চিন্তা প্রকট হইয়া উঠে।

কিন্তু আশা আছে। যদি ক্ষমতা থাকে তবে মনঃশক্তিকে একই সঙ্গে বহু অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করিতেছি। মন ক্রমশঃ বিকশিত হয়—যোগিগণ এই কথাই বলেন। মনের একটি আবেগ আর একটি আবেগকে জাগ্রত করে—তখন প্রথমটি নষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি ক্রুদ্ধ হইবার পরমুহূর্তে সুখী হইতে পারো, তবে পূর্বের ক্রোধ চলিয়া যাইবে। ক্রোধের মধ্য হইতেই তোমার পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। মনের এই অবস্থাগুলি সর্বদাই পরস্পর পরিবর্তন-সাপেক্ষ। চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ শিশুর স্বপ্নমাত্র। উপনিষদ্ বলেন যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখও নয়, সুখও নয়; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা। একেবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে।

মতপার্থক্যের অন্য বিষয়টি এই: উপনিষদ্ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির—বিশেষতঃ পশু বলির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির নিন্দা করেন। উপনিষদ্ বলেন, এই সব নিতান্তই নিরর্থক। প্রাচীন দার্শনিকদের এক সম্প্রদায় বলেন যে, কোন বিশেষ ফল পাইতে হইলে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন পশুকে বলি দিতে হইবে। উত্তরে বলা যায়, 'পশুটির প্রাণ লইবার জন্য তো পাপ হইতে পারে এবং তার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।' ঐ দার্শনিকরা (মীমাংসকেরা) বলেন, এ সব বাজে কথা। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য—তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার মন বলিতেছে? তোমার মন কি বলে না বলে, তাহাতে অপরের কি আসে যায়? তোমার এ সকল কথার কোন অর্থ নাই—কারণ তুমি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতেছ। যদি তোমার মন এক কথা বলে এবং বেদ অন্য বলেন, তবে তোমার মন সংযত করিয়া বেদের নির্দেশ শিরোধার্য কর। যদি বেদ বলেন, নরহত্যা ঠিক, তবে তাহাই ঠিক। যদি তুমি বল, 'না, আমার বিবেক অন্যরূপ বলে'—এ-কথা বলা চলিবে না।

যে মুহূর্তে কোন গ্রন্থকে বিশেষ পবিত্র ও চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন আর উহাকে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। আমি

বুঝিতে পারি না, এদেশের লোকেরা বাইবেলে পরম বিশ্বাসী হইয়াও কি করিয়া বলে—'উপদেশগুলি কত সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর!' কারণ বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী—এই বিশ্বাস যদি পাকা হয়, তবে তাহার ভালমন্দ বিচারের অধিকার—আপনাদের মোটেই নাই। যখন বিচার করিতে বসেন, তখন আপনারা ভাবেন—আপনারা বাইবেল অপেক্ষা বড়। সে ক্ষেত্রে বাইবেলের প্রয়োজন কি? পুরোহিতরা বলেন: বাইবেল বা অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিতে আমরা নারাজ। ইহার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ প্রমাণ কি? সেখানেই ইহার শেষ। যদি মনে করেন, কিছু ঠিক হয় নাই, তবে বেদের অনুশাসন অনুযায়ী ইহা ঠিক করিয়া লইবেন।

উপনিষদ্ ইহা বিশ্বাস করেন, তবে সেখানে একটি উচ্চতর মানও আছে। জ্ঞানবাদীরা একদিকে যেমন বেদের কর্মকাণ্ড অস্বীকার করে না, আবার অন্যদিকে তাহাদের দৃঢ় মত এই যে, পশুবলি এবং অপরের অর্থের প্রতি পুরোহিত-কুলের লোভ অত্যন্ত অসঙ্গত। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া উভয়ের ভিতরে অনেক মিল আছে বটে, তবে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ লইয়াই ঘোরতর মতানৈক্য বিদ্যমান। আত্মার কি দেহ ও মন আছে? মন কি কতগুলি ক্রিয়াশীল ও সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর সমষ্টি? সকলেই মানিয়া লয়, মনোবিজ্ঞান একটি নিখুঁত বিজ্ঞান; এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতির দার্শনিক ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

পুরোহিতকুল এবং উপনিষদের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য আছে। উপনিষদ্ বলেন—ত্যাগ কর। ত্যাগই সব কিছুর কষ্টিপাথর। সব কিছু ত্যাগ কর। সৃজনী শক্তি হইতেই সংসারের যাহা কিছু বন্ধন। মন স্বস্থ হয় তখনই, যখন সে শান্ত। যে-মুহূর্তে মনকে শান্ত করিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই সত্যকে জানিতে পারিবে। মন যে এত চঞ্চল, তাহার কারণ কি? কল্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই ইহার কারণ। সৃষ্টি বন্ধ কর, সত্য জানিতে পারিবে। সৃষ্টির সমস্ত শক্তি বন্ধ হইলেই সত্য জানা যায়।

অন্যদিকে পুরোহিতকুল সৃষ্টির পক্ষপাতী। এমন জীবের কল্পনা কর, যাহার মধ্যে সৃষ্টির কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। এ রকম অবশ্য চিন্তা করা যায় না। স্থায়ী সমাজ-বিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল। এইজন্য বিবাহে কঠোর নির্বাচন-প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, খঞ্জ ও অন্ধের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা কম। মৃগীরোগী এবং পাগলের সংখ্যাও সেখানে কম। ইহার কারণ—প্রত্যক্ষ যৌন-নির্বাচন। পুরোহিতদের বিধান হইল—বিকলাঙ্গেরা সন্ন্যাসী হউক। অপরদিকে উপনিষদ্ বলেন: না, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে তাজা ও সুন্দর ফুলই পূজার বেদীতে অর্পণ করা কর্তব্য। আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী ও সুস্থতম ব্যক্তিরাই সত্যলাভের চেষ্টা করিবে।

এই সব মত-পার্থক্য সত্ত্বেও পুরোহিতরা নিজেদের এক পৃথক্ জাতিগোষ্ঠীতে (ব্রাহ্মণ) পরিণত করিয়াছে, এ কথা আমি আপনাদের আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় হইল রাজপুরুষের জাতি (ক্ষত্রিয়)। উপনিষদের দর্শন রাজাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত; পুরোহিতদের মস্তিষ্ক হইতে নয়। প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটা অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ-নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব

আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। ব্যষ্টির জীবনের উপর অন্য কিছুর প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত-ভাবে মানুষের ভিতর যখনই কোন অভ্যুত্থান আসিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, আর্থিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষ কখনও সাড়া দেয় নাই। আপনি যে ধর্মমত প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার পশ্চাতে অর্থনৈতিক পটভূমিকা থাকে এবং কিছু-সংখ্যক নিষ্ঠাবান্ শিষ্য ইহার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আপনি একটি গোটা দেশকে আপনার ধর্মমতে আনিতে পারিবেন।

যখনই কোন ধর্মমত সফল হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে-সম্প্রদায় আর্থিক সমস্যা সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তাহার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে। ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? মস্তিষ্কের অগ্রগতির জন্য এখনও কয়েক যুগ লাগিবে। ৬০ বৎসর বয়স হইলে মানুষ সংসার হইতে বিদায় লয়। সমগ্র জীবন একটি ভ্রান্তি। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার মতো বয়স হইতে না হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন পাকস্থলী সবল ছিল, ততদিন সব ঠিক ছিল। যখন বালসুলভ স্বপ্ন বিলীন হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিবার সময় আসিল, তখন মস্তিষ্কের গতি শুরু হয়; এবং যখন মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিল, তখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাই উপনিষদের ধর্মকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অর্থগত লাভ সেখানে খুব অল্প, কিন্তু পরার্থপরতা সেখানে প্রচুর।...

উপনিষদের ধর্ম যদিও প্রভূত রাজশক্তির অধিকারী রাজন্যবর্গের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবুও ইহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল না। তাই সংগ্রাম প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বছর পরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সময় ইহা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়। বৌদ্ধধর্মের বীজ ছিল এই রাজা ও পুরোহিতের সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় ধর্মের অবনতি হয়। একদল এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে, অন্যদল বৈদিক দেবতা, যজ্ঞ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শৃঙ্খল মোচন করিল। এক মুহূর্তে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সমান হইয়া গেল। ধর্মের মহান্ তত্ত্বগুলি ভারতে এখনও বর্তমান, কিন্তু সেগুলি এখনও প্রচার করা আবশ্যক। অন্যথা সেই তত্ত্বগুলি দ্বারা জগতের কোন উপকার হইবে না।

দুইটি কারণে প্রত্যেক দেশেই পুরোহিতগণ গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হয়। একটি কারণ—তাহাদের জীবিকা এবং অন্যটি তাহাদিগকে জনসাধারণের সঙ্গে চলিতে হয়। তাহা ছাড়া পুরোহিতদের মন সবল নয়। যদি জনসাধারণ বলে, 'দুই হাজার দেবতার কথা প্রচার কর,' পুরোহিতরা তাহাই করিবে। যে জনমণ্ডলী তাহাদের টাকা দেয়, পুরোহিতরা তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, ভগবান তো টাকা দেন না; কাজেই পুরোহিতদের দোষ দেওয়ার পূর্বে নিজেদেরই দোষ দিন। আপনারা যেরূপ শাসন ধর্ম ও পুরোহিতকুল পাইবার উপযুক্ত, সেইরূপই পাইবেন। ইহা অপেক্ষা

ভাল কিছু পাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সংঘর্ষ ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার চূড়ান্ত পর্যায় দেখা গেল গীতাতে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি বিবদমান দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা গেল—তখন এই বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি গীতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্মমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন। আপনারা যীশুখ্রীষ্টকে যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা করেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভারতবর্ষের লোক শ্রদ্ধা ও পূজা করেন। শুধু যুগের ব্যবধান-মাত্র। আপনাদের দেশের ক্রীস্‌মাসের মতো হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি (জন্মাষ্টমী) পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে; সেগুলির কিছু কিছু যীশুখ্রীষ্টের জীবনীর সহিত মিলিয়া যায়। কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। পিতা শিশুকে লইয়া পলায়ন করেন এবং গোপগোপীদের নিকট তাঁহার পালনের ভার অর্পণ করেন। সেই বৎসর যত শিশু জন্মিয়াছিল, সকলকেই হত্যা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং জীবনের শেষ ভাগে তাঁহাকে অপরের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল—ইহাই নিয়তি!

শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আমার তত আগ্রহ নাই। অতিরঞ্জন-দোষ হিন্দুদেরও আছে। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি বাইবেলের একটি গল্প বলে, হিন্দুরা বিশটি গল্প বলিবে। আপনারা যদি বলেন, তিমিমাছ জোনা-কে গলাধঃকরণ করিয়াছিল—হিন্দুরা বলিবেন, তাহাদের কেহ না কেহ একটি হাতীকে গিলিয়াছিল!···বাল্য-কাল হইতে আমি শ্রীকৃষ্ণের জীবন-সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমি ধরিয়া লইতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ না কেহ ছিলেন এবং গীতা তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গল্প বা উপকথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। উপকথা-গুলি অলঙ্কারের কাজ করে। স্বভাবতই সেগুলি যতটা সম্ভব সুশোভন করা হয় এবং আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক—ত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া হাজার হাজার উপকথা রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির উপসংহারে ঐ ত্যাগের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লিঙ্কনের মহান্ জীবনের এক একটি ঘটনাকে লইয়া বহু গল্প রচিত হইয়াছে। গল্প-গুলি বিশ্লেষণ করিলে একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই, কোন অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। কর্মের জন্য কর্ম। পূজার জন্য পূজা। পরোপকার কর—কারণ, পরোপকার মহৎ কাজ। আর কিছু চাহিও না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। অন্যথা এই উপকথাগুলিকে সেই অনাসক্তির আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। গীতা তাঁহার একমাত্র বাণী নয়।···

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সম-ভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য

কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার—সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান্। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান্ ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা কর—তোমরা তাঁহাকে জানো বা না জানো—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। কোন প্রকার অসামঞ্জস্য, কোন প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। জগতের প্রত্যেক বস্তুর একটি নিজস্ব স্থান আছে, এবং তিনি তাহার যোগ্য মর্যাদা দিতে জানিতেন। যাহারা কেবল তর্ক করে এবং বেদের মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাহারা সত্যকে জানিতে পারে না; তাহারা ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতারও স্থান বেদে আছে। প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ স্থান নির্ণয় করাই প্রকৃত রহস্য।

তারপর হৃদয়বত্তা। বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তির এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ! বুদ্ধদেবের কর্মক্ষমতা একটি বিশেষ স্তরে পরিচালিত হইত—উহা আচার্যের স্তর। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা আচার্যের কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন! যিনি প্রবল কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী[১]। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র এই মহাপুরুষ ভ্রূক্ষেপ করেন না। সংগ্রামের মধ্যেও তিনি ধীর স্থিরভাবে জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন। প্রত্যেক অবতারই তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ। নিউ টেস্টামেণ্টের উপদেশের তাৎপর্য জানিবার জন্য আপনারা কাহারও না কাহারও নিকট যাইয়া থাকেন। তাহার পরিবর্তে নিজেরা উহা বার বার পড়ুন এবং খ্রীষ্টের অপূর্ব জীবনালোকে উহা বুঝিতে চেষ্টা করুন।

মনীষীরা চিন্তা করেন এবং আমরাও চিন্তা করি। কিন্তু তাহার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের মন যাহা চিন্তা করে, শরীর তাহা অনুসরণ করে না। আমাদের কার্য ও চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। যে শক্তির বলে 'শব্দ' বেদ হয়, আমাদের কথায় সেই শক্তি নাই। কিন্তু ঋষি বা মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহা কর্মে অবশ্যই পরিণত হয়। যদি তাঁহারা বলেন, আমি ইহা করিব, তবে তাঁহাদের শরীর সেই কাজ করিবেই। পরিপূর্ণ আজ্ঞাবহতাই উদ্দেশ্য। তুমি একমুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারো, কিন্তু তুমি ঈশ্বর হইতে পার না—বিপদ এইখানেই। মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহাই হন—আমাদের চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক সময় প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক যুগের কথা আলোচনা করিলাম। পরবর্তী বক্তৃতায় 'গীতা' সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব।

---

১ গীতা ৪।১৮

ভারত-পথিক

শ্রীমতী বিভা সরকার

ভারত-পথিক তুমি, গুরুপ্রেমে দিব্য জ্ঞান লভি,
জ্ঞানযোগী হে তাপস, কর্ম্মমঞ্চে হ'লে চির অভী।
দেবতাত্মা জ্যোতিষ্মান্ নরদেহে পুরুষ-প্রধান—
জীবন্ত বেদান্ত-মূর্তি হে জ্বলন্ত তপস্বী মহান্!
প্রতীচ্য স্তম্ভিত হ'ল প্রাচ্যের এ মনীষা-প্রভায়—
গৌরব-আসনে তুমি প্রতিষ্ঠিলে গরীয়সী দেশমাতৃকায়।
অচৈতন্য স্বদেশেরে জাগালে আবার চৈতন্যের হানি কশাঘাত,
স্বজাতি-নিন্দিত-যারা, জেলে জোলা যত ছোট জাত
প্রতিষ্ঠা লভিল তারা তোমারি আহ্বানে, মানবতা-ধর্ম হ'ল জয়ী;
ধূলায় এলেন নেমে নিজে ভগবান্, কর্ম ধর্মে ধন্য ব্রহ্মময়ী।

শ্রান্ত ক্লান্ত কাঠুরিয়া যেথা কাঠ কাটে, রোদে জলে মাটি চষে চাষা,
অহোরাত্র কর্মব্যস্ত দিন-মজুরেরা সেইখানে তব ভালবাসা।
জীবে সেবা ধর্ম তব, বিশ্ব লাগি সমর্পিত ক'রে গেছ প্রাণ;
গুরু ব্রহ্ম জ্ঞানে তুমি আত্মহারা যুগস্রষ্টা মানব মহান্
বিজাতি-বিজিত দেশ আত্মজ্ঞানহারা, দাস্যবৃত্তি করে দ্বিধাহীন,
অজ্ঞান-কালিমা মাখি ধর্ম গ্লানিময়, অনাচারে পুণ্যভূমি দীন।
আকুল করিল তোমা নিপীড়িত জনতার দিশাহারা আতুর রোদন,
অজ্ঞানে নাশিতে তাই হ'লে দৃঢ়ব্রতী নবরাগে মায়ের বোধন।
'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'
উচ্চারিলে মহামন্ত্র উদাত্ত আহ্বানে হে ঋত্বিক যুগ-যজ্ঞে তুমি,
সারদা মায়ের তুমি নয়নের মণি, নবযুগ-প্রবর্তক, তোমায় প্রণমি।

স্বামীজী ও খেতড়িরাজ*

ব্রহ্মচারী বরুণ

খেতড়ি-রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহনলাল ঠাকুর মুকুন্দসিংজীর বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন বিশিষ্ট এক অতিথির সহিত পরিচয় করিবার জন্য। ইতিপূর্বে কোটার রাজা, ঠাকুর ফতেসিংহ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অতিথির সহিত আলাপ করিয়া গিয়াছেন।

জগমোহনলাল আসিয়া দেখেন কৌপীন-বহির্বাস-পরিহিত সুপুরুষ এক সন্ন্যাসী খাটিয়ার উপর মুদিতনেত্রে শায়িত। সকাল হইতে লোকের সহিত বকিয়া বকিয়া ক্লান্ত সন্ন্যাসী বিশ্রাম করিতেছিলেন। বোধ হয় একটু তন্দ্রারও সঞ্চার হইয়া থাকিবে। প্রথম দর্শনেই ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত জগমোহনলালের মনে হইল, রাস্তাঘাটে বহু ভবঘুরে অকর্মণ্য সাধু ঘুরিয়া বেড়ায়। শায়িত এই ব্যক্তি হয়তো তাহাদেরই একজন। অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীর তন্দ্রাবস্থা কাটিয়া গেলে জগমোহন-লাল তাঁহার সহিত আলাপে রত হইলেন। শীঘ্রই জগমোহনলালের ভ্রান্ত ধারণার পর্দা অপসারিত হইল। মুগ্ধ জগমোহন সেইক্ষণ হইতেই তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসীর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংহ এই পুরুষ-সিংহের সহিত পরিচিত হন। অজিত সিংহ তখন আবুপাহাড়ে 'খেতড়ি-হাউসে' অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজের পক্ষ হইতে মুন্সীজী মহারাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

বৈরাগ্য-দীপ্ত সন্ন্যাসী সেই সময় সচ্চিদা-নন্দ, বিবিদিষানন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন ছদ্মনামে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সূর্যোদয়ে যেরূপ চারিদিক প্রকাশিত হয়, সেইরূপ সন্ন্যাসী-প্রবরও যেখানে উপস্থিত হন সেখানেই আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষ হইতে থাকে। এই সন্ন্যাসী কিছুকাল পরে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে জগৎসভায় পূজিত হন। পরিব্রাজক স্বামীজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল আজমীঢ় হইতে আবুপাহাড়ে উপস্থিত হন এবং প্রসিদ্ধ আর্যসমাজী আলিগড়ের ঠাকুর মুকুন্দসিংহের একান্ত অনুরোধে আবুপাহাড়ে তাঁহার বাসভবনে ডেরা পাতেন। সন্ন্যাসীর তখন একমাত্র সম্বল দণ্ড কমণ্ডলু ও দু-একখানি পুস্তক।

এদিকে গুণমুগ্ধ মুন্সীজী ঘটনার আদ্যোপান্ত খেতড়িরাজকে বর্ণনা করিলে খেতড়িরাজ স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া সেইদিনই নিজে তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সংবাদ স্বামীজীর নিকট পৌঁছিলে তিনি স্বয়ং 'খেতড়ি-হাউসে' উপস্থিত হইয়া রাজাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন। এই মিলন নানাদিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রজ্বলিত অগ্নির সংস্পর্শে যেমন অঙ্গার উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল হয়, তেমনি স্বামীজীর পাবকসদৃশ চরিত্রের সান্নিধ্যে রাজার জীবনও উত্তপ্ত ও আলোকিত হইয়াছিল।

---

* স্বামীজীর জীবনী, পত্রাবলী, 'খেতড়িনরেশ ঔর বিবেকানন্দ', 'আদর্শ নরেশ', স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অজিত সিংহ, জগমোহনলাল প্রভৃতির অপ্রকাশিত চিঠিপত্র প্রভৃতি হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

রাজপুতানার ক্ষুদ্র একটি রাজ্য খেতড়ি, আয়তন মাত্র ৬০৩ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,৩০,০০০। তাহার অধিপতি অজিত সিংহ যুগাচার্য-প্রবর্তিত মহাযজ্ঞে নিজেকে আহুতি-স্বরূপ সমর্পণ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন, কুল পবিত্র করিয়াছেন এবং রাজ্যে অশেষ কল্যাণসাধনের নিমিত্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। তা-ছাড়াও যুগাচার্যের জগৎ-কল্যাণ-যজ্ঞে রাজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা। এই মিলনের প্রায় চার বৎসর পরে স্বামীজী জগমোহনলালকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন :

'Certain men are born in certain periods to perform certain actions in combinations. Ajit Sinha and myself are two such souls, born to help each other in a big work for the good of mankind'.

প্রথম দর্শনেই রাজা স্বামীজীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন, স্বামীজীও রাজার মধ্যে মহত্ত্বের সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। রাজা স্বামীজীকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রাথমিক শিষ্টালাপের পর রাজা প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, জীবন কি?' উত্তরে স্বামীজীর নিজ জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল : 'Life is the unfoldment and development of a being under circumstances tending to press it down.'—প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবের আত্মস্বরূপ-প্রকাশই জীবন।

জিজ্ঞাসু রাজা আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, শিক্ষা কি?' সামগ্রিক দৃষ্টিতে শিক্ষার নতুন এক সংজ্ঞা দিলেন স্বামীজী :

'Education is the nervous association of certain ideas'.—কতকগুলি চিন্তারাশিকে অস্থিমজ্জাগত করাই শিক্ষা।

গভীর অর্থদ্যোতক শিক্ষার এই ভাবটিকে বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া উদাহরণস্বরূপ রামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিলেন। স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মহারাজ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, দেশাত্মবোধ ও গভীর ধর্মজ্ঞান মহা-রাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিল। অনুরাগী মহারাজের একান্ত অনুরোধে স্বামীজী রাজ-অতিথিরূপে তাঁহার সহিত খেতড়িতে উপস্থিত হইলেন। এখানে স্বামীজীকে একান্তে পাইয়া রাজা তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিতে সমুৎসুক হইলেন।

যতই দিন অতিবাহিত হইতে থাকিল, ততই স্বামীজীর মৌলিক চিন্তাধারা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক গভীরতা রাজাকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিল। কিছু কাল পরে সদ্‌গুণান্বিত রাজা স্বামীজীর নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবরূপ মানস-সরোবর-নিঃসৃত পূতগঙ্গাবারি দ্বারা ত্রিতাপ-সন্তপ্ত পৃথিবীকে শান্তি দান করিতে অবতীর্ণ স্বামী বিবেকানন্দ গুরুপদে অধিষ্ঠিত। আর আজন্ম ভোগসুখে লালিত-পালিত ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী মহারাজা অজিত সিংহ জন্মজন্মান্তরকৃত শুভ-কর্মফলে আজ যুগাচার্যের শিষ্যত্বে অভিষিক্ত হইলেন। স্বামীজীর কৃপায় রাজার সামগ্রিক জীবন পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমে আধ্যাত্মিক ভাব-পুঞ্জ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। যথার্থ গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মধ্যে রাজপদমর্যাদাও কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। গভীর রজনীতে রাজা ভক্তিভরে তাঁহার পদসেবা করিতেছেন, স্বামীজী ইহা একদিন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা শিষ্যত্বের দাবিতে গুরুদেবের সেবা হইতে বিযুক্ত হইতে নারাজ। শুধু প্রাসাদেই নহে,

প্রকাশ্য রাজসভাতেও মহারাজ স্বামীজীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ও নানাভাবে সেবা করিতে উৎকণ্ঠিত হইতেন। প্রজা ও অমাত্যবর্গের চক্ষে রাজার মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে-বিষয়ে স্বামীজীরও বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজার গুরুভক্তি তদানীন্তন কালে একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

যেমন বৃক্ষচ্ছায়ায়, উন্মুক্ত অম্বরতলে বা গরীবের কুটীরে, তেমনি রাজপ্রাসাদেও বৈরাগ্যদীপ্ত সন্ন্যাসী ধ্যান অধ্যয়ন ও উপদেশ-দানাদিতেই দিন যাপন করিতেছিলেন। রাজ-সভায় একদিন রাজপুতানার খ্যাতনামা পণ্ডিত নারায়ণদাসের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। এই সুযোগে তিনি পণ্ডিতজীর নিকট পতঞ্জলিকৃত 'মহাভাষ্য' অধ্যয়ন করিলেন। শিক্ষার্থীর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজী চমৎকৃত হন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার নিজের কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকায় তিনি স্বামীজীর সহিত উহা আলোচনা করিয়া বিশেষ উপকার বোধ করেন। গুণগ্রাহী স্বামীজী পণ্ডিত নারায়ণদাসকে সর্বদাই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে প্রচারকার্যে নিয়ত ব্যস্ততার মধ্যেও স্বামীজী একাধিক পত্রে পণ্ডিতজীকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজ্যের অন্যান্য গুণশালী ব্যক্তিগণও স্বামীজীর সান্নিধ্যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। রাজ-গুরুর প্রতি সকলেরই অপরিসীম শ্রদ্ধা।

স্বামীজী রাজদরবারের গ্রন্থাগার হইতে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক আনাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। পাঠে নিরত স্বামীজীকে পুস্তকের পাতার পর পাতা দ্রুত উল্টাইতে দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত রাজা একদিন তাঁহাকে ইহার রহস্য জিজ্ঞাসা করেন। পৃথিবীর নানাস্থানে অনেকেই স্বামীজীকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মৃদুহাস্যে স্বামীজীই শিষ্যকে দ্রুতপঠনের রহস্যটি বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, যে-কেহ ব্রহ্মচর্য, একাগ্রতা ও অভ্যাস সহায়ে এই শক্তি অর্জন করিতে পারে। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলে মহারাজও ইহা আয়ত্ত করিতে পারেন। জিজ্ঞাসু রাজা অবসর ও সুযোগ পাইলেই স্বামীজীর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে যথাসাধ্য জ্ঞান আহরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। ধর্ম, ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য যে-কোন বিষয়ে আলোচনা করিতে কোন বাধা ছিল না। একদিন রাজা প্রশ্ন করিলেন, 'স্বামীজী, বিধি কি?' স্বামীজীর কণ্ঠে বাগ্‌দেবী সর্বদা অধিষ্ঠিত। কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই তিনি উত্তর দিলেন:

'Law is the mode in which the mind grasps a series of phenomena'.—যে প্রণালীতে মন কতকগুলি ঘটনাপরম্পরার ধারণা করে, তাহাই বিধি। বাহিরের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কারই বিধি।

অপর একদিন 'সত্য কি?' রাজার এই প্রশ্নের উত্তরে সত্যদ্রষ্টা স্বামীজী তাঁহার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ে বুঝাইয়া বলিলেন যে, পূর্ণ সত্য এক ও অদ্বিতীয়। আমরা যাহাকে সাধারণতঃ সত্য বলিয়া থাকি, উহা আপেক্ষিক সত্য। যেমন মানুষের জ্ঞানের প্রসার হইতে থাকে, অমনি সে ধাপে ধাপে এক সত্য ছাড়িয়া অপর এক সত্য আশ্রয় করে। যেটি সে পরিত্যাগ করে সেটি মিথ্যা নয়, তবে যেটি সে গ্রহণ করে সেটি প্রথমটি অপেক্ষা উচ্চতর। চরমসত্য ও পরমতত্ত্ব জানিলে সমস্ত আপেক্ষিক সত্য তুচ্ছ হইয়া যায়।

স্বামীজীর এই হৃদয়স্পর্শী উত্তরে রাজার চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

এইভাবে গুরুশিষ্যের আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী মানুষের জন্য অমূল্য এক জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত হইতে থাকে। স্বামীজীর জীবন ও বাণী অনুধ্যানে সমুৎসুক পাঠক, এই কথোপকথনের মধ্যে স্বামীজীর বিদ্যুৎসদৃশ প্রতিভার সামান্য পরিচয় পাইবেন।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানশিক্ষা অপরিহার্য; এ-বিষয়ে রাজাকে উৎসাহিত করিয়া স্বামীজী কয়েকখানি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও কিছু যন্ত্রপাতি আনিয়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরে নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত হইল। ক্ষুদ্র একটি পরীক্ষাগার (Laboratory) প্রতিষ্ঠিত হইল; প্রাসাদোপরি স্থাপিত একটি টেলিস্কোপ পরীক্ষাগারের মর্যাদা বৃদ্ধি করিল। স্বামীজীর নিকট রাজা বিজ্ঞানের সহিত আইনের পাঠও লইতে শুরু করেন। আচার্যের শিক্ষাদানের আশ্চর্য দক্ষতা। তাঁহার শাণিতবুদ্ধি জটিলসমস্যার জাল ছিন্ন করিয়া শিক্ষার্থীকে অচিরে তত্ত্বের অন্তর্মূলে লইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষাদানের সহিত ঐহিক জীবন-সমস্যা সমাধানের দ্বারা শিষ্যের জীবন সামগ্রিকভাবে সমৃদ্ধ হইল। এদিকে স্বামীজী ভারতীয় পুনর্গঠন-কর্মের প্রধান এক কর্মীকে ধৈর্যের সহিত গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

খেতড়ি-রাজ অজিত সিংহের তখন পর্যন্ত কোন পুত্রসন্তান ছিল না। পূর্ববর্তী রাজা ফতেসিংহ অপুত্রক ছিলেন। তিনি মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সে মারা গেলে তাঁহার দত্তকপুত্র অজিত সিংহ মাত্র আট বৎসর বয়সে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর খেতড়ির গদি লাভ করেন। ইহার জন্য তদানীন্তন আইন অনুসারে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে কুড়ি হাজার টাকা নজরানা দিতে হয়। মহারাজ অজিত সিংহ রানী চম্পাবতীর গর্ভে সূর্যকুমারী ও চন্দ্রকুমারী নামে দুই কন্যা লাভ করেন, কিন্তু পুত্রমুখ দর্শন না করায় রাজার মনে শান্তি ছিল না। আত্মীয় স্বজন অনেকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিলেও রাজা বহুবিবাহে সম্মত না হওয়ায় ঈশ্বরেচ্ছায় দেবদ্বিজের আশীর্বাদ অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেছিলেন। একদিন তাঁহার মনে হইল, সত্যকাম স্বামীজী যদি আশীর্বাদ করেন, তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে। একদিন সুযোগ বুঝিয়া রাজা স্বামীজীর নিকট সখেদে মনের কথা ব্যক্ত করিলেন। শিষ্যের ব্যাকুলতা, দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি দর্শনে স্বামীজী কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। গুরুকৃপায় রাজার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বামীজীর জীবনী-পাঠক খেতড়িরাজের জয়পুরস্থিত বাটীতে এক নর্তকীর 'প্রভু মেরো অবগুণ চিত না ধরো' গানে স্বামীজীর প্রতিক্রিয়ার সহিত সুপরিচিত। সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন সন্ন্যাসীর এই উত্তুঙ্গ আদর্শে 'আমি সন্ন্যাসী আর এই স্ত্রীলোক পতিতা নারী' এইরূপ ভেদদৃষ্টির শেষ আবরণও লুপ্ত হইল।

রাজপুতানার ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য খেতড়ি স্বামী বিবেকানন্দের আগমনে নতুন জীবন লাভ করিল। করুণাঘন স্বামীজী যেমন রাজার হৃদয়সর্বস্ব, তেমনি রাজ্যের দীনতম ব্যক্তিও তাঁহাকে দয়ার প্রতিমূর্তি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার চক্ষে রাজা ও দীনতম প্রজা দুই-ই সমান। রাজ্যে ধনী দরিদ্র সকলের হৃদয়ে স্বামীজীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এইভাবে কয়েকমাস অতিবাহিত করিয়া পর্যটন-সঙ্কল্প প্রবল হওয়ায় স্বামীজী খেতড়ি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভারত-পরিক্রমায় বাহির হইলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পরিভ্রমণ করিয়া সন্ন্যাসিগণই জাতীয়

জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। এক্ষণে নিজ জীবনে উপলব্ধ অমূল্য সম্পদ বহন করিয়া স্বামীজী চলিয়াছেন নগর হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে। নবজাগরণের পথ-প্রদর্শক আচার্য বিবেকানন্দ ধনী রাজা, গরীব প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ দেশবাসীর সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাষা আচার-ব্যবহার ও তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিলেন। দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জনসাধারণের দুরবস্থা দর্শনে বৈদান্তিকের মথিত হৃদয় হইতে নরনারায়ণ-সেবার সঙ্কল্প-সুধা উত্থিত হইল।

অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতবাসী কালচক্রে জীবনের প্রাথমিক সমস্যা অন্নবস্ত্র সংস্থান করিতে অসমর্থ; দীর্ঘকাল অযত্নের ফলে সমাজদেহের বিরাট অংশকে পঙ্গু করিয়া মুষ্টিমেয় ধনী ও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ স্বার্থসাধনে নিযুক্ত, পুরোহিত-সম্প্রদায় ধর্মের ধ্বজা তুলিয়া গরীব জনসাধারণকে শোষণে সচেষ্ট। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সমাজদেহের বীভৎস রূপ দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় আলোড়িত।

কুমারিকা অন্তরীপে এক শিলাখণ্ডের উপর স্বামীজী ধ্যানমগ্ন হইলেন। সমস্যা সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করিয়া শ্রীভগবানের নির্দেশে তিনি নতুন কর্মসূচী লইয়া অগ্রসর হইলেন। ভারতবর্ষের অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ পাশ্চাত্যে বিতরণ করিয়া তাহার বিনিময়ে এদেশের জনসাধারণের ঐহিক উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের সহায় ও সম্পদ আহরণ করিতে হইবে।

বিদেশ-গমনের সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি মাদ্রাজ শহরে প্রবেশ করিলেন। কিছুকালের মধ্যেই সন্ন্যাসীর প্রাণপ্রদ পূতসঙ্গে কয়েকজন মাদ্রাজী যুবক সমাগত মহাযজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদ অধিবাসীদের আহ্বানে স্বামীজী দিনকয়েকের জন্য তথায় সরকারী ইঞ্জিনিয়র মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুআরি অপরাহ্নে মহবুব কলেজে পণ্ডিত রতনলালের সভাপতিত্বে প্রায় হাজার লোকের সম্মুখে স্বামীজী 'পাশ্চাত্যদেশে আমার গমনের উদ্দেশ্য' বিষয়ে এক মনোগ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, ভাবপ্রকাশে দক্ষতা ও বাগ্মিতায় বুধমণ্ডলী চমৎকৃত হইলেন। অনেকে স্বামীজীর বিদেশ-যাত্রার জন্য অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন।

যে-কোন কারণে হউক, স্বামীজী শেষ পর্যন্ত এ স্থান হইতে বিশেষ কোন অর্থসাহায্য পান নাই। ২১শে ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজী হায়দ্রাবাদ হইতে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিতেছেন, 'ফলতঃ আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল; আর এই জন্যেই আমি গোড়াতেই মাদ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলুম। তা করতে পারলে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্য আর্যাবর্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতুম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।' এই পত্র হইতে জানা যায়, স্বামীজীর বিদেশগমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তখনও সংগৃহীত হয় নাই এবং তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত ভরসা পাওয়া যায় নাই। অনন্তর তিনি মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসুদের মধ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে ও যুবকদের নৈতিক জীবন গঠন করিয়া তাহাদিগকে জাতীয় জাগরণে প্রবুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন। এদিকে স্বামীজীর অনুগত শিষ্য আলাসিঙ্গার নেতৃত্বে মাদ্রাজী যুবকগণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী

তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমার যাওয়া যদি মায়ের অভিপ্রেত হয়, তবে সাধারণ লোকের নিকটই ভিক্ষা পাওয়া উচিত, কারণ আমি যে আমেরিকা যাইতেছি—সে শুধু ভারতের দরিদ্র বা সাধারণ নরনারীর জন্য।' এতদ্ব্যতীত যুবকগণ স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত, শিষ্য ও বন্ধুদের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের জন্য নানা স্থানে গেলেন। পূর্বে যাঁহারা অর্থ-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই কার্যকালে হাত গুটাইয়া রহিলেন।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে স্বামীজীর একবার মনে হইল, তিনি যুগাবতারের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হইয়া বিদেশগমনে উদ্যত, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রত্যক্ষ কোন নির্দেশ এখনও পাইতেছেন না কেন? আগ্রহসহকারে তিনি সুস্পষ্ট আদেশের অপেক্ষায় রহিলেন। শুনা যায়, এইকালে একাধিক রাত্রে স্বামীজীর পার্শ্ববর্তী ঘর হইতে লোকে শুনিতেছে, স্বামীজী কখন উচ্চস্বরে, কখন বা আবদারের সুরে কাহারও সহিত কথা বলিতেছেন। তিনি কি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছিলেন? আবার, একরাত্রে অত্যাশ্চর্য এক স্বপ্নদর্শনে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী পত্র পাইয়া তাঁহার সমস্ত সংশয় ও দ্বিধা তিরোহিত হইল, স্বামীজীর বিদেশযাত্রার সঙ্কল্প স্থির হইল। যে মাসে স্বামীজী হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিয়াছেন, 'মাদ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজার সাহায্যে আমাকে পাঠাবার সব রকম আয়োজন ক'রে ফেলল'; কিন্তু তৎকালীন ঘটনাবলী অনুধাবন করিলে মনে হয়, মাদ্রাজী যুবকদের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বন্ধুবান্ধবহীন ব্যয়বহুল বিদেশে গমন ও তথায় কিছুকাল বাস করিবার জন্য আবশ্যকীয় অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। কিন্তু দৃঢ়চিত্ত স্বামীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অচল অটল, যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ না হইলে স্থলপথে আফগানিস্থান-পারস্যের মধ্য দিয়া পদব্রজে যাইতেও তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। বিশ্বে নতুন ভাবতরঙ্গ প্রকটিত হইতে উন্মুখ; স্বামী বিবেকানন্দের মনে জগৎপ্লাবিনী প্রবল শক্তি তখন ক্রিয়মাণ। তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতেছেন, যুগাবতার স্বয়ং তাঁহার হাত ধরিয়া রহিয়াছেন।

এমন সময়ে খেতড়ি-মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহনলাল মহারাজের বিশেষ এক আর্জি লইয়া মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীকে একবার খেতড়িতে পদধূলি দিতে হইবে, স্বামীজীর আশীর্বাদে মাস-তিনেক পূর্বে মাঘ শুক্লা নবমীতে রাজা অজিত সিংহ একটি পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছেন। পুত্রের নাম রাখা হয় জয়সিংহ। সে সময়ে রাজা সপরিবারে আগ্রাতে বাস করিতেছিলেন। তারযোগে সুসংবাদ খেতড়ি পৌঁছিবামাত্র রাজ্যব্যাপী আনন্দোৎসব শুরু হইল। এই শুভক্ষণ স্মরণের জন্য প্রায় দুইমাইলব্যাপী কৈলাসরোড নির্মিত হইল ও আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসব পালনের জন্য বিরাট আয়োজন চলিতে থাকিল। রাজা সপরিবারে খেতড়ি চলিয়া আসিলেন; আত্মীয় বন্ধু সজ্জন আমন্ত্রিত হইয়া আসিতে শুরু করিলেন। এই আনন্দোৎসবে রাজগুরু উপস্থিত না থাকিলে উৎসব সম্পূর্ণ হইতে পারে না। রাজা স্বামীজীর সন্ধানে সুযোগ্য সেবক জগমোহনলালকে মাদ্রাজে প্রেরণ করিলেন। জগমোহনলাল মাদ্রাজ পৌঁছিয়া সমুদ্র-উপকূলে রেওয়ারী ভবনে আশ্রয় লইলেন এবং খুঁজিতে খুঁজিতে

একদিন এসিস্ট্যাণ্ট একাউণ্টেণ্ট জেনারেল মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে স্বামীজীর দর্শনলাভ করিলেন। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া সেবক জগমোহনলাল কুশলপ্রশ্নাদির পর খেতড়িরাজের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। স্বামীজী সব শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার আমেরিকা যাওয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, যাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন, এ সময় খেতড়ি যাওয়া কিরূপে সম্ভব? জগমোহনলাল কিন্তু স্বামীজীকে খেতড়িতে না লইয়া গিয়া ছাড়িবেন না। তিনি বলিলেন, 'স্বামীজী, আপনি অন্ততঃ একদিনের জন্যও খেতড়ি চলুন। আপনি না গেলে মহারাজা নিদারুণ মর্মাহত হইবেন।' তিনি খেতড়ির সংবাদাদি স্বামীজীকে নিবেদন করিয়া রাজকুমারের জন্মোৎসব আয়োজন এবং স্বামীজীর জন্য যে সকলে অপেক্ষমাণ, ইহা বিশেষভাবে জানাইলেন। স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী আমেরিকায় চিকাগো ধর্মসভায় যোগদান করিতে দৃঢ়সংকল্প, কিন্তু আলাসিঙ্গা প্রমুখ উৎসাহী যুবকদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থ তখনও সংগৃহীত হয় নাই। সেইজন্য স্বামীজীর বিশেষ কোন উদ্বেগ নাই, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন। জগমোহনলাল কঠিন সমস্যায় পড়িলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বামীজীকে কিভাবে খেতড়ি লইয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে? তিনি মহারাজকে সব কথা জানাইলেন। তদুত্তরে ১১ই এপ্রিল মহারাজা লিখিলেন:

আজ সকালে আপনার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম, আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আপনার বক্তব্য বুঝিলাম, প্রথমতঃ চাঁদা তুলিয়া অর্থসংগ্রহের সাফল্য-সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে, কারণ আপনি লিখিয়াছেন স্বামীজী আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া পদব্রজে যাইতে পারেন।

যে মহান্ ব্রতসাধনে স্বামীজী পাশ্চাত্যে যাইতেছেন, সে সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি স্বার্থপর হইতে চাহি না। বরঞ্চ যে মহাপুরুষকে আমি গুরু বলিয়া সম্বোধন করিতে সৌভাগ্যবান্ ও গৌরবান্বিত বোধ করি, তাঁহার নিকট জগৎ কোন উপকার পাইলে আমি একান্ত সুখী ও আনন্দিত হইব। আমার অর্থদানে একমাত্র বাধা আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই অর্থাৎ আমাদের জায়গীরদারগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত প্রকাশ করিবে? যাহা হউক, আমি নতুন একটি উপায় ভাবিতেছি অর্থাৎ তাঁহারা অন্যরূপ ভাবিলেও প্রয়োজনীয় অর্থ হুকুম থারুচে (discretionary fund) পাওয়া সহজ হইবে। সর্বদা ইহা ভাবিয়া আমরা আনন্দিত হইব যে, এইরূপ মহৎ একটি উদ্দেশে অর্থ ব্যয় হইতেছে। তাহাদের যাহা ইচ্ছা হয়, বলুক না কেন। লোকে যখন জানিবে যে, পথযাত্রা নির্বাহের জন্য এই অর্থ ব্যয় হইতেছে, সে সম্বন্ধে তাহাদের কি আর বলিবার থাকিতে পারে? আমার বক্তব্য আপনাকে সেইদিনই, গত শুক্রবার লিখিতে পারিতাম। ইতিপূর্বে আপনার দুইটি টেলিগ্রাম পাইলেও এই পত্রেই আপনি অর্থবিষয়ে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। আপনি কয়েকটা চিঠি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনার প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হওয়ার কারণ কখনও জানান নাই। এখন বুঝিতেছি অর্থচিন্তাই ছিল ইহার মূলে।...আমি নিশ্চিত যে, স্বামীজীর এখানে খুব গরম বোধ হইবে।...গত দশদিন যাবৎ রাজকুমার অসুস্থ, তাঁহার জন্য আমি চিন্তিত।...আপনাকে পাঠাইবার জন্য এখনই একটি টেলিগ্রাম লিখিতেছি, এখানে যদি স্বামীজীর বিশেষ গরম হইবে মনে করেন, তাঁহাকে আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না।

আমি দুঃখিত যে, হাতে এখন যথেষ্ট সময় নাই। মোদ্দা কথা এই যে, স্বামীজীর প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তা করিবেন না।

মহারাজের এই পত্র পাইয়া জগমোহনলাল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি স্বামীজীকে মহারাজের পত্রের মর্ম নিবেদন করিয়া তাঁহাকে খেতড়ি যাইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। অবশেষে স্বামীজী প্রিয় সেবক জগমোহনলালের আগ্রহাতিশয্যে খেতড়ি যাইতে সম্মত হইলেন। এদিকে সময় আর নাই। জলসার পূর্বেই খেতড়ি পৌঁছিতে হইবে। করিতকর্মা জগমোহনলাল সরাসরি জয়পুরের টিকিট কিনিলেন। স্থির হইল, স্বামীজী মাদ্রাজে ফিরিবেন না, বোম্বাই হইতেই বিদেশ যাত্রা করিবেন। মাদ্রাজী ভক্তবৃন্দ ও

অনুরাগী যুবকবৃন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্বামীজীর পদধূলি লইয়া স্বামীজীকে বিদায় দিলেন।

বোম্বাই-এ ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাসভবনে অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইল। স্বামীজীর সহিত একত্র গমন করিয়া তাঁহারা আবুরোড স্টেশনে নামিয়া পড়েন।

স্বামীজী জগমোহনলালের সহিত এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে যেদিন খেতড়ি পৌঁছিলেন, তাহার তিন চার দিন পূর্বে উৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা উপস্থিত হইলেন সন্ধ্যাকালে। রাজপ্রাসাদ পথঘাট উৎসবের উজ্জ্বল সাজে সজ্জিত, নৃত্যগীতবাদ্যে আকাশ-বাতাস মুখরিত। উৎসবে সিকর, নওলগড়, মণ্ডাবা, বিসাউ, সুরজগড়, মালসিসর, আলসিসর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রধান রাজপুত সর্দারগণ যোগদান করিয়াছেন; মহারাজা কর্নেল প্রতাপ সিংহজী বাহাদুর, মহতাবসিংজী বাহাদুর, রামপুরের নবাব হামীদ আলি খাঁ; লুহারুর নবাব অমীরুদ্দীন প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ উৎসবকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। স্বামীজী যে সময়ে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা রাজতরণীতে অতিথি অমাত্য সমভিব্যাহারে জলবিহার করিতে-ছিলেন। গুরুদেবের আগমন-বার্তা পাইবা-মাত্র খেতড়ি-রাজ আসিয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে স্বামীজীকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। স্বামীজী স্বস্তিবাক্য উচ্চারণপূর্বক প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে রাজা সগর্বে অভ্যাগতদের সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য রাজ-কুমার জয়সিংহকে সভায় আনয়ন করা হইল। তিনি শিশুর মস্তক স্পর্শ করিয়া স্বস্তিবাক্য উচ্চারণ করিতেই চতুর্দিকে আনন্দের কল্লোল উঠিল। আনন্দোৎসবের মধ্যে রাজগুরুর উপস্থিতিতে মহারাজের আনন্দকলস পূর্ণ হইল।

খেতড়িতে তখন প্রচণ্ড গরম, স্বামীজী বেশী গরম সহ্য করিতে পারিতেন না। বিদেশযাত্রার আয়োজনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই হেতু কয়েকদিন পরে তিনি খেতড়ি হইতে বিদায় লইতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজীকে যাইতে দিতে মহারাজের মন আর সরে না। বারণ করা সত্ত্বেও রাজা জয়পুর পর্যন্ত স্বামীজীর সহিত গমন করিলেন। জয়পুরে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় স্বামীজীকে তুলিয়া দিয়া রাজা তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। মহারাজের নির্দেশে একান্ত বিশ্বস্ত সেবক জগমোহনলাল স্বামীজীর সঙ্গে বোম্বাই চলিলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিয়া দিতে। জগমোহনলালকে রাজা বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন, 'দেখবেন, স্বামীজীর যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয়।' তাঁহারা বোম্বাই পৌঁছিলে জগমোহনলাল স্বামীজীকে সঙ্গে লইয়া শহরের উৎকৃষ্ট দোকানগুলি হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন। তাঁহাকে বহুমূল্য আলখাল্লা পাগড়ি প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিতে স্বামীজী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। জগমোহনলাল নিষেধ মানিতে নারাজ। তিনি তখন রাজগুরুকে উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়া সাজাইতে তৎপর। এই কালের প্রসঙ্গে সেবক জগমোহনলাল সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিতেছেন: 'খেতড়ি-মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি ও আমি বর্তমানে একত্রে আছি। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহৃদয়তার জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা ভাষায় প্রকাশ

করিতে পারি না। রাজপুতানার জনসাধারণ যে শ্রেণীর লোককে 'তাজিমি সর্দার' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং যাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজাকেও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়, ইনি সেই সর্দার শ্রেণীর লোক। অথচ ইনি এত অনাড়ম্বর এবং আমাকে এমনভাবে সেবা করেন যে, আমি সময়ে সময়ে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি।'

জগমোহনলাল পি. এণ্ড ও. কোম্পানির পেনিনসুলার জাহাজে একটি প্রথম শ্রেণীর কেবিন রিজার্ভ করিলেন; স্বামীজীর পরিচ্ছদাদি গুছাইয়া দিলেন ও আবশ্যকীয় অর্থাদিও সঙ্গে দিলেন। ৩১শে মে গৈরিক বেশধারী পরিচ্ছদ ও পাগড়ি পরিহিত বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য জাহাজে রওয়ানা হইলেন। যাত্রার প্রাক্কালে জগমোহনলাল ও মাদ্রাজ হইতে আগত আলাসিঙ্গা স্বামীজীকে প্রণাম করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। দূর দিকচক্রবালরেখায় বিলীয়মান জাহাজ নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে দেখিতে তাঁহারা কল্পনায় গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কন করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর নামই যে 'বিবেকানন্দ' ইহা অনেককাল পর্যন্ত তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি, এমন কি গুরুভ্রাতারাও জানিতেন না। অজ্ঞাতভাবে দেশ পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও 'বিবিদিষানন্দ' কখনও 'সচ্চিদানন্দ' কখনও অন্য কোন নামে নিজের পরিচয় দিতেন। কথিত আছে, স্বামীজীর প্রথমবার খেতড়িতে থাকাকালে প্রিয় শিষ্য অজিত সিংহ একদিন সুযোগ বুঝিয়া স্বামীজীকে বলেন, 'মহারাজ, আপনার বিবিদিষানন্দ-নাম বড় কঠিন। টীকা ব্যতীত সাধারণ লোকের ইহার অর্থ বুঝা দুঃসাধ্য। উচ্চারণ করাও সহজ নয়। তাছাড়া আপ্তকাম আপনি, আপনার বিবিদিষা-কাল তো অতিক্রান্ত।' স্বামীজী ইহা শুনিয়া প্রিয় শিষ্যের একান্ত ইচ্ছায় 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন এবং আমেরিকা গমনের সময় হইতে এই নামটিই ব্যবহার করিতেন।

স্বামীজী বিদেশযাত্রা করিয়াছেন, গুরু-ভ্রাতা, বন্ধুবান্ধব অনেকেই তাঁহার সংবাদ জানিতেন না। অনেকেই শুনিয়াছিলেন যে, খেতড়ির মহারাজা স্বামীজীর বিশেষ কৃপাপাত্র। মাস-দশেক পূর্বে স্বামীজী কলিকাতার মঠে রাজার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে বেলগাঁও, আলমোড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকেই রাজার নিকট পত্র লিখিয়া স্বামীজীর সংবাদ জানিতে চাহিলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক সংবাদও রটিয়াছে। কলিকাতা হইতে স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩ই জুন তারিখে খেতড়ির মহারাজকে লিখিতেছেন, 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী শরৎচন্দ্রের নিকট শুনিলাম যে, আমার দাদা বর্মায় রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে চীনদেশ বা অনুরূপ কোন স্থানে যাইবেন।' রাজার কাজ হইল এই সকল উদ্বিগ্ন অনুসন্ধানকারীদের আবশ্যকীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা। বিদেশ যাত্রার প্রথম হইতেই স্বামীজী তাঁহার এই শিষ্যকে নিজের গতিবিধি ও কার্যধারা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখিয়াছিলেন। ৬ই জুলাই-এর মধ্যে রাজা কলম্বো ও পেনাং হইতে স্বামীজীর লেখা দুইটি পত্র পাইলেন।

শিবতুল্য গুরুদেবকে যে ভাবে হউক, সামান্য সেবা করিতে পারিলে রাজা নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। রাজা কলিকাতায় (বরানগর)

মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত যোগাযোগ করিয়া স্বামীজীর জননীর আর্থিক অনটনের বিষয় অবগত হইলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে রাজা নিয়মিতভাবে স্বামীজীর জননীর সেবার জন্য টাকা পাঠাইতে থাকেন এবং তাঁহার অবর্তমানেও যাহাতে জননীর জীবিতকাল পর্যন্ত এই অর্থ নিয়মিত প্রেরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ তখন এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছেন। রাজা চিঠিপত্র মারফত তাঁহার পড়াশুনার খোঁজখবর লইতেন ও তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করিতে উৎসাহিত করিতেন। স্বামীজীর এই উদার শিষ্যটির পরিচয় পাইয়া কেহ কন্যার বিবাহের জন্য, কেহ বিদেশে অর্থাভাবে শিক্ষা সমাপন করিতে পারিতেছে না জানাইয়া রাজার নিকট অর্থভিক্ষা করিয়াছেন। স্বামীজীর পরিচয়ের সংশ্লিষ্ট যে-কোন ব্যক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া রাজা তৃপ্তিলাভ করিতেন।

মহারাজা অজিত সিংহ ভারতবর্ষে স্বামীজীর অন্যতম প্রধান কর্মীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, যেরূপ হইয়াছিলেন মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল। স্বামীজী তাঁহার এই প্রিয় শিষ্য ও কর্মীকে প্রথম হইতেই তাঁহার নিজের সংবাদ যথাসম্ভব জানাইতেন। তিনি ১৮৯৪ খৃঃ ৭ই জুলাই আলাসিঙ্গাকে লিখিতেছেন, 'খেতড়ি-রাজার সঙ্গে সর্বদা পত্রব্যবহার রাখবে', পুনরায় ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহাকে লিখিতেছেন: 'খেতড়ির রাজা ও কাথিয়াওয়াড়স্থ লিমডির ঠাকুর সাহেব যাহাতে আমার কার্যের বিষয় সর্বদা সংবাদ পান, তাহা করিবে।' তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে এক পত্রে নির্দেশ দিতেছেন, 'খেতড়ির রাজা যা কিছু খবর চান, তুমি নিজে লিখবে, যে সকল লোক আমাদের সহিত interested, তাদের regularly চিঠিপত্র লিখবে, interest জাগিয়ে রাখবে।'

স্বামীজী ও রাজার মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ভারতবর্ষে রাজা ছিলেন স্বামীজীর বৈষয়িক ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সহায়। আমেরিকা যাইবার অল্পকাল মধ্যেই স্বামীজী অর্থকষ্টে পড়িয়া বস্টন হইতে খেতড়ি-রাজকে সংবাদ দিবার জন্য মাদ্রাজে মন্মথ ভট্টাচার্যকে তারযোগে জানান। মন্মথবাবুর নিকট হইতে তারযোগে সংবাদ পাইবামাত্র রাজা কুক কোম্পানি মারফত স্বামীজীকে পাঁচশত টাকা পাঠাইলেন এবং মন্মথবাবুকে জানাইলেন, 'স্বামীজীর উত্তর পাইলে আবশ্যক অনুযায়ী আরও অর্থ পাঠাইব।' স্বামীজীর নিকট রাজার প্রদত্ত কিছু সার্কুলার নোট ছিল। মনে হয়, সেই নোট হারাইয়া যাওয়াতে স্বামীজীকে অসুবিধায় পড়িতে হয়। যাহা হউক, প্রেরিত অর্থ অবিলম্বে পৌছানোতে স্বামীজীর আর্থিক দুশ্চিন্তার কিছু লাঘব হয়। অপরপক্ষে রাজা তাঁহার রাজ্যের বিবিধ খবর, এমন কি নিজের সাংসারিক খবরও স্বামীজীকে জানাইয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, কারণ আপদে বিপদে গুরুদেবই তাঁহার নিশ্চিত ভরসাস্থল। (ক্রমশঃ)

'ঠাকুর ও স্বামীজী'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

চিকাগোর ধর্মমহাসভার উদ্যোগপর্ব চলেছে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ আসন্ন মহাসভার বিপুল তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন। হৃদয়ের মাঝে দৈববাণীর মতো শুনতে পেলেন: যাও আমেরিকায়। ধনীর দেশ আমেরিকা। ভারতের কোটি কোটি জীবন্ত নরকঙ্কালকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার যে পরিকল্পনা করেছ, তাকে ফলবতী করবার উপায় সেখানে মিলবে। আর পাশ্চাত্যের সম্মুখে হিন্দুধর্মের গরিমাকে করো উদ্‌ঘাটিত।

সহায়সম্বলহীন সন্ন্যাসী সে আদেশ-বাণী উপেক্ষা করতে পারলেন না। মজ্জার গভীরে অনুভব করলেন একটা দুর্বার আবেগ। যেতে হবে সমুদ্রপারের নূতন মহাদেশে। পাশ্চাত্যের কানে শোনাতে হবে বেদান্তের অমরবাণী। সংগ্রহ করতে হবে অর্থ। সেই অর্থে গড়ে তুলতে হবে এমন প্রতিষ্ঠান, যার কাজ হবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। স্বামীজী পাথেয় সংগ্রহ ক'রে আমেরিকা যাত্রা করলেন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে।

এখনকার দিনে টেক্‌নলজির কল্যাণে দূরত্ব অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ এখন চন্দ্রলোকে যাওয়ার পথে। কিন্তু স্বামীজী যেদিন সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলেন, সেদিন জাহাজই ছিল সম্বল, আর জাহাজে দশ হাজার মাইল অতিক্রম করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

জাহাজ কূলহীন সাগরবক্ষ বিদীর্ণ ক'রে চলেছে মন্থরগতিতে। গৈরিকপরিহিত এক সন্ন্যাসী সেই জাহাজের যাত্রী। তরুণ বৈরাগীর জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলে অসাধারণ প্রতিভার সুস্পষ্ট ছাপ। স্বদেশের কূলরেখা দৃষ্টিপথের বাহিরে। চিরপরিচিত গুরুভাইরা অনেক দূরে। সম্মুখে অজানা দেশের সকলেই অপরিচিত। তাদের আচার-ব্যবহার স্বতন্ত্র। তাদের ধর্মবিশ্বাসও পৃথক্। সেই অজানা দেশের চিত্তকে জয় করতে চলেছেন স্বামীজী। কত বাধা, কত বিঘ্ন! সেই বাধাবিঘ্ন দুরতিক্রমণীয়। তবু স্বামীজীর হৃদয়ে নৈরাশ্যের মেঘ নেই। দুঃসাহসী সন্ন্যাসীর অবিচলিত বিশ্বাসের সম্মুখে সমস্ত বাধা দিগন্তে বিলীয়মান।

বহুসমুদ্র পেরিয়ে অবশেষে স্বামীজী নূতন মহাদেশে পৌঁছালেন। বিরাট ধর্মসভা। নানা দেশের নানা পণ্ডিতদের বক্তৃতা হ'ল। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে আমেরিকাবাসী মুগ্ধ হয়ে গেল। ওজস্বিনী সেই বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই প্রতিধ্বনিত হ'ল। একটা কথা সকল সময়েই মনে রাখতে হবে—স্বামীজীকে ঠাকুরই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর বাণীকে দিগ্‌দিগন্তে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে। রামকৃষ্ণ-অবতারের বিশেষ উদ্দেশ্য All religions are true in their essence. অর্থাৎ 'যত মত তত পথ'—এই সর্বজনীন সত্যকে যুগের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে আর কোন সাধক পরমপুরুষের বিচিত্র দিককে আস্বাদন করবার চেষ্টা করেননি। ঠাকুর বললেন, All must be realised. তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে সব দিক থেকে। ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী—এঁদের প্রেরণায় এবং পরিচালনায় ঠাকুর সাধনায়

বিচিত্র পথ অতিক্রম ক'রে পরমতত্ত্বের যে-শিখরদেশে পৌঁছালেন, সেখানে সাকারবাদ আর নিরাকারবাদ কোনটাই মিথ্যা নয়। এই বিরাট উপলব্ধির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ঠাকুর ঘোষণা করলেন: যার যা ভাব, তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব।

নবযুগের একটা বিরাট প্রয়োজন ছিল এই নূতনতর উদার দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মজীবনকে বিচার করবার। ধর্মের নামে পৃথিবীতে কত রক্তপাতই না হয়ে গেছে! কত মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, হিংসার কত প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে এই সুন্দর পৃথিবীর উপর দিয়ে! ধর্মীয় গোঁড়ামি যে কত সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, তার প্রমাণ রয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়—ভূরিভূরি। সেই সব নির্যাতনের নৃশংস কাহিনী পড়লে দুঃখে ও লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যায়।

চিকাগোর ধর্মমহাসভায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী ঘোষণা করলেন: Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilisation and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honour of this convention may be the death-knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal.

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং ধর্মান্ধতার ভয়াবহ পরিণতি যে গোঁড়ামিতে, সেই গোঁড়ামি দীর্ঘকাল ধরে এই সুন্দর পৃথিবীকে তাদের শাসনে রেখেছে। ওরা পৃথিবীকে হিংসায় ভরিয়ে রেখেছে তাকে নররক্তের ধারায় ভিজিয়ে দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে, সভ্যতার বিনাশ সাধন করেছে এবং সমগ্র জাতিপুঞ্জকে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এসব সাংঘাতিক দৈত্যের আগমন না হ'লে মানবসমাজ আরও বেশী দূরে অগ্রসর হ'ত। কিন্তু ওদের অন্তিমকাল আজ ঘনিয়ে এল। আজ সকালে এই সম্মেলনের সম্মানার্থে যে ঘণ্টা ধ্বনিত হয়েছে, আমার একান্ত আশা এই ঘণ্টাধ্বনিই যেন সমস্ত গোঁড়ামির মৃত্যু সূচনা করে, তরবারির অথবা লেখনীর মাধ্যমে যত নির্যাতন ঘটেছে, তার অবসান ঘটায়, এই লক্ষ্যের অভিমুখে চলমান মানুষগুলির মধ্যে যে ভেদবুদ্ধির আধিপত্য রয়েছে, তাকে বিলুপ্ত ক'রে দেয়।

সমস্ত অনুদারতার অবসানের পথে বিচিত্র ধর্মের, বিচিত্র মতের নরনারীগুলিকে প্রেমের শ্রীক্ষেত্রে মিলিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল অপরিমেয় এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগে। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্ব-কবি লিখে-ছিলেন, 'মানুষের যোগ যদি সংযোগ হ'ল তো ভালই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু ক'রে এগোল, এক করবার অন্তরশক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল।' টেক্‌নলজির অদ্ভুত উন্নতির ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব নিশ্চিহ্ন হ'তে বসেছে, এক দেশ আর এক দেশের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই শারীরিক নৈকট্য যদি ভালবাসাকে আশ্রয় না করে, তবে তো যোগ দুর্যোগে পরিণত হবেই।

যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যে প্রেম নেই, সহানুভূতি নেই, সেখানে দৈহিক নৈকট্য শুধু অনর্থেরই কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তাই এই টেক্‌নলজির যুগে মানুষ যখন মানুষের অত্যন্ত কাছাকাছি এসে পড়েছে, তখন এই নৈকট্যকে কল্যাণের সোপানে রূপান্তরিত করবার জন্যে এমন একজন কর্ণধারের প্রয়োজন ছিল, যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হবে সমন্বয়ের বাণী। এই কর্ণধারই যুগাবতার রামকৃষ্ণ, যাঁকে রোমাঁ রলাঁ বলেছেন : the pilot and guide for the needs of the new age.

ধর্মসংস্থাপনের জন্যে অবতারপুরুষ আবির্ভূত হলেন এই বাংলার এক পল্লীতে জনৈক সত্যনিষ্ঠ নির্মল ব্রাহ্মণের গৃহে। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন, প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্মের প্রথম কথা এবং শেষ কথা। ধর্মের ব্যাপারে সাকাররূপে বিশ্বাস থাকা না থাকা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ঈশ্বরের অনির্বচনীয় মাধুর্যরসের আস্বাদন। মূর্তি, শাস্ত্র, মন্দির, মসজিদ অথবা গীর্জা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার পথে সহায়মাত্র। তিনি আরও বললেন : অনন্ত ঈশ্বরকে জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 'এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে ?' ঈশ্বরকে জানবার দরকারও নেই। এক গেলাস হলেই যখন মাতাল হওয়া যায়, তখন শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ—এ খবরে প্রয়োজন কি ? যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে—মাপতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ সব হিসাবে তোমার কাজ কি ? এই সমস্ত উপমার ভিতর দিয়ে ঠাকুর যে-সত্যকে যুগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন, সেটি হ'ল—অনুভূতি। ঈশ্বরকে অনুভব করো, আস্বাদন করো। ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও। বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। স্বামীজী ঠাকুরের প্রতিধ্বনি ক'রে চিকাগোর ধর্মসভায় ঘোষণা করলেন : ধর্ম কতকগুলি মতে বিশ্বাস নয়, ধর্ম পরোপকারও নয়, 'the whole religion of the Hindu is centered in realisation'. —হিন্দুধর্মের মর্মবাণী হচ্ছে উপলব্ধি, অনুভূতি।

ঠাকুর উপলব্ধির পথও বাতলে দিলেন, বললেন : ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়, আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটি দরকার। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও, আর আড় করেই খাও, মিষ্টি লাগবে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—এই হচ্ছে প্রকৃতির পরিকল্পনা, আর হিন্দু এই সত্যকে স্বীকার করেছে। স্বামীজীর চিকাগোর বক্তৃতায় আছে : Unity in variety is the plan of nature, and the Hindu has recognised it. গত তিন হাজার বৎসর ধরে হিন্দু সাধকেরা যা প্রচার ক'রে এসেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতে তারই নির্যাস। ঠাকুর হিন্দুর উদার ধর্ম-বিশ্বাসকে ব্যক্ত করলেন তাঁর অননুকরণীয় সরল ও সহজ ভাষায়—উপমার পর উপমার মাধ্যমে, কথা দিয়ে ছবির পর ছবি তুলে ধরলেন আমাদের সম্মুখে। সেই সব ছবির মধ্যে সত্যের প্রতিবিম্ব। ঠাকুর বললেন মাস্টার মশাইকে : তুমি মাটির প্রতিমার পূজা বলছিলে ? যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এ-সব করেছেন—অধিকারী-ভেদে। যার পেটে যা সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন। মানুষে মানুষে ঐক্য যেমন পরম সত্য, মানুষের সঙ্গে মানুষের রুচিগত, বিশ্বাসগত,

স্বভাবগত পার্থক্যও তেমনি সত্য। এই বৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে সকলের মাথা যারা একই ক্ষুরে কামাতে চায়, তাদের গোঁড়ামিই তো পৃথিবীর যত অনর্থের মূলে। ঠাকুর বললেন: ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাকার মানে না; ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান—এই ব'লে নাক সিটকে ঘৃণা ক'রোনা। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে। জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে, যতদূর পারো। —আর ভাল বাসবে।

বিরোধের কোলাহলের মধ্যে ঠাকুর আনলেন মিলনের গভীর বাণী। ঈশ্বর যখন সকলের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক'রে তৈরি ক'রেছেন, অধিকারী-ভেদ যখন তাঁরই সৃষ্টি, তখন আমার রুচি আর বিশ্বাস দিয়ে অপরকে বিচার করতে যাওয়ার মতো মারাত্মক ভ্রান্তি আর কি থাকতে পারে? নিজের রুচি আর বিশ্বাসমতো জীবনকে পরিচালিত করবার যে-স্বাধীনতা আমি আমার জন্যে দাবি করি, সেই স্বাধীনতা অন্যকেও দিতে হবে সানন্দে। আর একজন তার স্বভাবে, আচরণে আমার থেকে স্বতন্ত্র বলেই তো তাকে আরও ভাল-বাসবো এবং আরও সম্মান দেবো। ঠাকুর তাই বললেন:—আর ভালবাসবে।

ঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে স্বামীজী কর্মযোগে বললেন: Therefore the one point we ought to remember is that we should always try to see the duty of others through their own eyes, and never judge the customs of other peoples by our own standard. I am not the standard of the universe.—অন্যের কি কর্তব্য তার বিচার করতে হবে তার নিজের মাপকাঠি দিয়ে, আমার মাপকাঠি দিয়ে নয়। অন্যান্য জাতির আচারের বিচার আমরা নিজেদের কষ্টিপাথরে করতে পারিনে।

ঠাকুরে যা বীজ, স্বামীজীতে তা পরিণত হয়েছে মহীরুহে; ঠাকুরে যার আরম্ভ, স্বামীজীতে তার পরিপূর্ণতা। স্বামীজী তো ঠাকুরের নিজের হাতেরই সৃষ্টি। রলাঁ (Romain Rolland) ঠাকুরের জীবনচরিতের মধ্যে এক জায়গায় লিখেছেন: The great moulder of souls cast with his fingers of fire the bronze of Vivekananda as well as the delicate and tender wax of Yogananda or Brahmananda. কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারেরা মাটি দিয়ে চমৎকার মূর্তি তৈরি করে। ঠাকুরও একজন গড়নদার ছিলেন। তাঁর আঙুলগুলি ছিল আগুনের। সেই আগুনের আঙুল দিয়ে তিনি তৈরি করলেন বিবেকানন্দের কঠিন নির্মল ব্রঞ্জ-মূর্তি। একই আঙুলের স্পর্শে তৈরি হ'ল যোগানন্দের আর ব্রহ্মানন্দের করুণকোমল মোমের মতো মন। স্বভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী যাকে যেমনটি ক'রে গড়ার প্রয়োজন ছিল, ঠাকুর তাকে ঠিক তেমনি করেই গড়লেন। প্রত্যেকে যাতে নিজের স্বভাবের ধারাকে অনুসরণ ক'রে চলে, সেই দিকে ঠাকুরের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

স্বামীজীর সমস্ত বাণীর মধ্যে স্বাধীনতার অকুণ্ঠ বন্দনাগান। আর স্বাধীনতার প্রতি এই যে জ্বলন্ত অনুরাগ—এই অনুরাগের মূলে ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অপরিমেয় প্রেম। প্রেমিক ছিলেন বলেই ঠাকুরও কেবল নিজের মুক্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি নিজে মুক্তির স্বর্গলোকে বিচরণ করবেন আর পৃথিবীর অগণিত মানুষ সংসারের কারাগারে

দুঃখ ভোগ করতে থাকবে—এই সূক্ষ্ম স্বার্থপরতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি। তাঁর যতকিছু আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, যতকিছু ঈশ্বরীয় আনন্দের অনির্বচনীয়তা, যতকিছু বিচিত্র উপলব্ধি—সবই ছিল বিরাট মানবসমাজের কল্যাণের জন্যে, কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্যে নয়।

ঠাকুরের পদপ্রান্তে বসে স্বামীজী প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। স্বামীজীর জীবনে যা কিছু বরণীয়, সমস্তের পিছনে ঠাকুরের প্রেরণা। একদল সর্বত্যাগী যুবককে ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল 'যত মত তত পথ' এই বাণী দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেবার জন্যে। এই রকমের একদল সন্ন্যাসী তরুণের দল ছাড়া তাঁর জীবনব্রত ফলবান্ হ'তে পারত কেমন ক'রে? স্বামীজীকেও একই উদ্দেশ্যে ঠাকুর সযত্নে গড়ে তুললেন। আর প্রিয়তম শিষ্যকে গড়ে তুললেন মহান্ মানবপ্রেমিক ক'রে। স্বামীজী চেয়েছিলেন নির্বিকল্প সমাধির অমৃতসাগরে ডুবে থাকতে। সেই অতি সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা থেকে ঠাকুরই স্বামীজীকে রক্ষা করলেন, তাঁকে উৎসর্গ ক'রে দিলেন আর্তমানবতার সেবায়। আর প্রেমের সৌরভ যেখানে, সেখানে স্বাধীনতারও দীপ্তি। যাকে ভালবাসি তাকে আমরা ক্ষমা করি, সহ্য করি, আর এই সহনশীলতার মধ্যেই প্রেমের চরম প্রকাশ। স্বামীজীর ভাষায়: the highest expression of freedom is to forbear. স্বামীজী আরও বললেন: and love shines in freedom alone. ভালবাসা যেখানে, সেখানে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব নেই। ভালবাসার মানুষকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্যে আমরা কখন ব্যবহার করতে পারিনে। যাকে ভালবাসি, তাকে ক্রোধের দাস হয়ে কটুকথাও শোনাতে পারিনে। প্রেমের রাজ্যে আমরা ঈর্ষার শৃঙ্খল থেকেও মুক্ত। অর্থাৎ যেখানে ভালবাসা, সেখানে আমরা মুক্ত—ইন্দ্রিয়ের লালসা থেকে মুক্ত, ক্রোধের এবং ঈর্ষার শাসন থেকে মুক্ত। স্বাধীনতার প্রতি স্বামীজীর দুর্বার অনুরাগও ঠাকুরেরই প্রেরণায়।

ঠাকুর-স্বামীজীর জীবন একই সূত্রে গাঁথা। 'কথামৃত' আর স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে আমরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি ক'রব—ঠাকুর যন্ত্রী, স্বামীজী যন্ত্র। চিকাগোর মহাসভায় স্বামীজীর কণ্ঠে ঠাকুরেরই বাণীর প্রতিধ্বনি। তফাৎ কেবল দুজনের ভাষার ভঙ্গিমায়। ঠাকুর ছিলেন রাজহংসের মতো; স্বামীজী যেন মহাকাশের ঈগলপক্ষী। ঠাকুরের সমস্ত জীবন ও বাণীতে রাজহংসের সন্তরণের প্রশান্ত ছন্দ, মাধুর্যই সেই জীবনের বৈশিষ্ট্য। স্বামীজীর বৈশিষ্ট্য শক্তির প্রাচুর্যে, ক্ষাত্রতেজের তিনি যেন একটি বহ্নিশিখা। তাঁর সমস্ত জীবন একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। বেদান্তের কথা এত ক'রে প্রচার করলেন—কারণ উপনিষদে বীর্যের বাণী। একটা আধমরা জাতিকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করবার জন্যে শক্তিমন্ত্রেরই প্রয়োজন ছিল। তাই না স্বামীজীর ভাষায় বারুদের গন্ধ, তরবারির ঝলকানি।

বিশ্বকবির দৃষ্টিতে মা ও শিশু

শ্রীহিল্লোলকুমার রায়

আজকের শিশু আর কালকের মানুষ। কথা-দুটো খুব ছোট। বলতে সময় বেশী লাগে না। কিন্তু আজকের শিশু আর কালকের মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান, তা কম নয়। এ দুয়ের মাঝে আছে দুস্তর সাগরের দুই পারের দূরত্ব। তাকে পাড়ি দিতে জানা চাই। না হ'লে ভরা ডুবি হওয়ার আশঙ্কা পদে পদে।

জন্মের পর থেকেই শিশুর এই জীবন পাড়ি দেওয়ার শিক্ষা শুরু হয়; তবে তা এগিয়ে চলে খুব ধীর লয়ে। বর্তমানকে পেছনে ফেলে শিশু যতই ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলে, ততই সে কল্পনার তুলিতে মনের ক্যানভাসে নানা রঙ লাগিয়ে যায়। সে রঙ কোথাও, নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও ঘোর রক্তাভ এবং আরও কত কি! এই সব রঙ মিলিয়ে ভবিষ্যতের মানুষটির ছবি রূপ নিতে থাকে ধীরে ধীরে। রাত্রিদিন শিশুর মনে চলতে থাকে এই তুলি ও রঙ-এর খেলা। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'যে চিত্রকর অনবরত আঁকিতেছে, সে যে কেন আঁকিতেছে, তাহার আঁকা যখন শেষ হইবে তখন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালায় টাঙাইয়া রাখা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?'...'তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে—সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে-রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে।'

—জীবনস্মৃতি

কিন্তু 'সে-রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের' হলেও পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকরের তুলির আঁচড় যে সে-ছবিকে স্পর্শ করিয়াছে, সে-কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু শিশু প্রধানতঃ কল্পনাশ্রয়ী। আর এই কল্পনার অবলম্বন হ'ল তার পরিবেশ। এই পরিবেশের মধ্যে আবার মায়ের প্রভাব শিশুর উপর সবচেয়ে বেশী। শিশুর কল্পনা এই মাকেই আশ্রয় ক'রে ডানা মেলে অনন্তের দিকে ছুটে চলে। মায়ের কাছে তার কোন দ্বিধা নেই, কোন লজ্জাও নেই। তাই মায়ের কাছে অপকটে সে সব উজাড় ক'রে দেয় স্বতঃস্ফূর্ত ঝরনার মতো। বাইরের কোন বাধা সে স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। শিশুর সহজ সরল মনে যখনই যে কৌতূহলের—যে প্রশ্নের উদয় হয়, তখনই তার মাকে তা সে জিজ্ঞাসা ক'রে বসে, বলে—

'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'

—জন্মকথা

মা এই অতর্কিত প্রশ্নের যে উত্তরই দেন না কেন, তা যদি মনগড়াও হয়, তা নিয়ে খোকার মনে কোন সন্দেহেরই উদ্রেক হয় না।

কিন্তু এই বিশ্বাস খোকা পেল কোথায়? এই বিশ্বাসের ঋণ দিনে দিনে জমে উঠেছে মায়ের স্নেহ-ভালবাসার কাছে। সে জানে তার চোখের একটুখানি জলও মাকে চিন্তিত ক'রে তোলে—

'বাছারে, তোর চক্ষে কেন জল?
কে তোরে যে কী বলেছে
আমায় খুলে বল্॥'

—অপযশ

মায়ের এই ভালবাসার উৎস হ'ল মনের অতলান্ত গভীরে। সেখানে বাইরের লোকের প্রবেশের পাসপোর্ট নেই। দূর থেকে এই শান্ত সৌম্য মণিদীপের ভাস্বর দীপ্তি দর্শন ক'রে তারা নির্বাক্ হয়ে যায়। মায়ের দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা—

'বিচার করি শাসন করি,
করি তারে দুখী,
আমার যাহা খুশী।
তোমার শাসন আমরা মানিনে গো।
শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো॥'

শুনে তারা ফিরে আসে। তারা জানে মায়ের ভালবাসার রূপ—

'খোকা বলেই ভালবাসি,
ভালো বলেই নয়॥'

সেখানে মায়ের ভালবাসার রূপ আর বাইরের লোকের বিচারের রূপ ভিন্ন।

মায়ের এই অনাবিল স্নেহের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে জেগে উঠতে থাকে ছোট্ট শিশুর মন। যতদিন পর্যন্ত না বাইরের জগতের হাতছানি শিশুর মনকে আকর্ষণ করে, ততদিন পর্যন্ত এই মায়ের মধ্যেই শিশুর বিশ্বরূপ-দর্শন ঘটে। 'খেলার গৃহ হয়ে ওঠে বিশ্বজগৎ।'

'খোকা থাকে জগৎ-মায়ের অন্তঃপুরে।' ধীরে ধীরে শিশুর পৃথিবীর সকল শাস্ত্র-পাঠের বর্ণপরিচয় ঘটে মায়ের কাছে। মায়ের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিশুর বল্‌গা-ছাড়া সব মন ছুটে যায় চন্দ্র-সূর্য-তারকার দেশে। কল্পনা-রাজ্যের রাজপুত্রের আসনে বসে শিশুর তখন জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বড় বড় তথ্যকে অস্বীকার করতে এতটুকু বাধে না। তাই দাদার কাছে 'চাঁদ যে থাকে অনেক দূরে' শুনে তার মন সায় দিতে চায় না। সে দাদার ওপর খবরদারি ক'রে ব'লে বসে—

'…দাদা, তুমি
জাননা কিছুই
মা আমাদের হাসে যখন
ঐ জানালার ফাঁকে
তখন তুমি বলবে কি, মা
অনেক দূরে থাকে!'

—জ্যোতিষশাস্ত্র

এমনি ক'রে সে জগতের অনেক তথ্যকেই উড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যা সে উড়িয়ে দিতে পারে না, সে হ'ল তার মা ও তাঁর কথা। দুষ্টুমির জন্য মা তাকে বকেছেন; মা তাকে দুষ্টুমি ছেড়ে চুপটি ক'রে পড়ার কথা বলেছেন। মায়ের সে মৃদু ভর্ৎসনাও খোকার মনে দাগ কেটেছে। সে তাই মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—

'দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হবো
বড়ো হয়ে বাবার মতো হ'লে।'

শুধু তাই নয়, সন্তানের যত বীরত্ব, যত ভাব-ভাবনা সবই তার মাকে ঘিরে। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে খোকার ভাবনার গতি যেখানে রুদ্ধ হয়েছে 'হারে রে-রে রে-রে' চীৎকারে, মায়ের পাল্কির বেয়ারা-রা যখন গেছে পালিয়ে, মা যখন স্মরণ করছেন ঠাকুর-দেবতার নাম, তখন খোকা মাকে আশ্বাস দিতে থাকে—

'আমি আছি, ভয় কেন মা করো!'

—বীরপুরুষ

রবীন্দ্রনাথ কী সুন্দরভাবে মা ও শিশুর সম্বন্ধকে, একাত্মতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন! তিনি উপলব্ধি করেছেন শিশুকে উপেক্ষা করলে সাহিত্য-রচনায় পবিত্র 'মানুষ'টিকে উপেক্ষা করা হয়—উপেক্ষা করা হয় ভাবীকালের মানুষটিকে। ফলে মানব-বন্দনার গুরুতর অংশই বাদ পড়ে যায় সাহিত্য থেকে। শিশু-সাহিত্যিকদের কথা বাদ দিলে এবং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্য কবি বা সাহিত্যিক যাঁরা বিশ্ব-বন্দন লাভ করেছেন, তাঁদের কাব্য বা সাহিত্য বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁদের রচনায় কোথাও হয়তো শিশুর প্রসঙ্গ একেবারেই বাদ পড়ে গেছে, আবার কোথাও বা এ-প্রসঙ্গ তাঁদের রচনায় নিতান্তই ক্লান্তভাবে উপস্থিত।

মানসযাত্রী

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

গভীর অরণ্য-মন,
অন্তরের অধিত্যকা-স্তরে
মায়ার হরিণ হর্ষে বিচরণ করে অনুক্ষণ।
মনের মানুষ তরে
চলিয়াছি ধ্যানালোকে আমি।
শ্বাপদসঙ্কুল পথে কামনার কীটপতঙ্গেরা
করে খেলা, ভুজঙ্গেরা যেথা দিবাযামী
মরম-বিবরে রহে। তীক্ষ্ণ তৃণগুল্ম-কণ্টকেরা
করেছে আবৃত চিত্ত।
বিচিত্র বর্ণের সমারোহ, দেয় গাঢ় আলিঙ্গন
বল্লুলতা তরু-পাদপেরে ;
বাহিরে যা দেখা যায়, ভিতরে তা নিত্য রাজে
নিবিড় বসতি মাঝে, পরানের মাধবেরে
করি হেথা ধেয়ানে সন্ধান।
সাধন-আশ্রমে শুনি অনাহত-চক্রে স্তবগান,
খুঁজি সেই মহাগায়কেরে।

হিংসাচ্ছন্ন পরিবেশে
যেথা সদা জান্তব উল্লাস
ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় দাবানল জ্বলে ওঠে শেষে
সেথা মোর শ্রীনিবাস
হৃদয়গুহাতে মহামৌন জ্যোতির্ময়।
তপোবন-উপকণ্ঠে দেখেছিনু যারে
তারি অধিষ্ঠান হেরি, সে কি মোর পরম আশ্রয় ?
আমারে সে ডাকে ভালবেসে !

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[সীতাহরণ]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।' অর্থাৎ এই জগতে দেবস্বভাব ও অসুরস্বভাব এই দুই প্রকার মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে।

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের ধর্মবিষয়ে প্রবৃত্তির ও অধর্মবিষয়ে নিবৃত্তির অভাব। তাহারা শৌচ-, সদাচার- ও সত্য- বিরহিত। জগৎ তাহাদের মতে সত্যশূন্য। কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাহারা অবিশ্বাসী। এই লোকায়ত মত আশ্রয়পূর্বক পারলৌকিক সাধনচ্যুত ক্রূরকর্মা অনিষ্টকারী ও অল্পবুদ্ধি আসুর ব্যক্তিগণ যেন জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

রাক্ষসবৃন্দের অধিপতি রাবণ ছিল উক্ত স্বভাববিশিষ্ট মূর্তিমান্ অসুর। রাবণের হৃদয় দুষ্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ- দম্ভ, অভিমান ও মহতের প্রতি অবজ্ঞা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সে পবিত্র যজ্ঞের হন্তা, ক্রূরস্বভাব, ব্রাহ্মণঘাতী, নির্দয়, ধর্মের উচ্ছেদকারী এবং সর্বপ্রাণীর অনিষ্ট-সাধনে রত। কঠোর তপস্যার দ্বারা রাবণ প্রভূত যোগ-শক্তির অধিকারী। বলা বাহুল্য, উহার উদ্দেশ্য পার্থিব সুখসম্পদ্ লাভ।

রাবণের রাজধানী ছিল ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত লঙ্কাদ্বীপে। লঙ্কার ঐশ্বর্য ও সভ্যতার পরিচয় যথাসময়ে পাওয়া যাইবে। লক্ষ্মণের হস্তে লাঞ্ছিত শূর্পণখা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে সংবাদ দিল, রাম নামক জনৈক মানব খর, দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষস নিধন-পূর্বক দণ্ডকারণ্য বিঘ্নশূন্য করিয়া ঋষিগণকে অভয় প্রদান করিয়াছেন এবং এই রামের পত্নীর ন্যায় অপরূপ সৌন্দর্যশালিনী নারী ইতিপূর্বে তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই নারীকে বলপূর্বক লাভ করাই রাবণের যোগ্য কাজ। উভয় সংবাদই রাবণকে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট। রামকর্তৃক দণ্ডকারণ্যে তাহার আধিপত্য ক্ষুণ্ণ ও রাম-পত্নীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যের সংবাদ রাবণের হৃদয়ে যুগপৎ ক্রোধ ও বাসনানল প্রজ্বলিত করিল। কর্তব্য স্থির করিতে বিলম্ব হইল না। সীতা-হরণের সঙ্কল্প লইয়া অচিরাৎ রাবণ সমুদ্রের অপরপারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাবণ রথে করিয়া আকাশপথে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল ও সীতাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল—বাল্মীকি-রামায়ণে এইরূপ আছে। আকাশপথে যাতায়াতের বিবরণ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, তখন বিমানজাতীয় রথ আকাশপথে গমনাগমন করিত। সমগ্র রামায়ণে আর্য ও অনার্য উভয় সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে উহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য অনেকেই বিমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে রাবণ জলপথেই সমুদ্র পারাপার করিয়াছিল। এ বিষয়ে যথাসময়ে আলোচিত হইবে।

অতঃপর রাবণের পরিকল্পনা-অনুসারে মায়ামৃগের অনুসরণরত রামের বিপদাশঙ্কায় সীতাকর্তৃক প্রথমে অনুরুদ্ধ, পরে ভর্ৎসিত হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহার অন্বেষণে গমন করিলে সুযোগ বুঝিয়া রাবণ ধীরে ধীরে পর্ণশালায়

সীতার সমীপে উপস্থিত হইল। রাবণের আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বাল্মীকি বলিয়াছেন: প্রশস্তললাট, রক্তনেত্র, বিশালবক্ষ, মহাভুজ, সিংহদংষ্ট্রা, বিশালস্কন্ধ, বিচিত্রদেহ, উজ্জ্বলকেশ, কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী, তপ্তকাঞ্চনময় কুণ্ডলবিশিষ্ট ও ঘোরদর্শন। যদিও রাবণ সূক্ষ্মকাষায় বস্ত্র-পরিহিত, শিখা ও সূত্রযুক্ত, পাদুকাধারী, বামস্কন্ধে কুশাদি বহন করিয়া কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ডধারী পরিব্রাজকের বেশে বেদধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে সীতার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তথাপি সেই নির্জন অরণ্যপ্রান্তরে সহসা এই ভয়ঙ্কর আকৃতি-দর্শনে সীতা প্রথমে ভয়ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে পরিব্রাজক-জ্ঞানে আশ্বস্ত হইয়া তিনি রাবণের অভ্যর্থনায় উদ্যোগী হন। যথোচিত সৎকারান্তে তিনি রাবণের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামচন্দ্রের গুণ বর্ণনা করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন।

সীতা-চরিত্র বাস্তবিক অতি সুন্দর। একটিও প্রশ্ন না করিয়া সীতা স্বেচ্ছায় রামের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। সানন্দে তিনি বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন। অনিন্দিতা, সুহাসিনী সীতা কখন ঋষিপত্নীগণের সমীপে বিনীতা, কখন জনসঙ্গ-বিরহিত অরণ্যে প্রকৃতির সহিত ক্রীড়ায় উৎফুল্লা। অতি আনন্দে বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইয়াছিল। বনবাস তাঁহার নিকট কোনদিনই ক্লেশকর হয় নাই শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে ছিলেন বলিয়া। মৃগের অনুসরণরত সেই রামচন্দ্রের কাতর কণ্ঠস্বর শ্রবণে সীতা মুহূর্তমধ্যে আত্মবিস্মৃত হইলেন। বহুযুক্তি প্রদর্শন করিয়াও লক্ষ্মণ তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না। রামের সাহায্যার্থে সীতা লক্ষ্মণকে প্রথমে অনুরোধ, পরে কটূক্তি করেন। এমন কি তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধেও কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সীতা-চরিত্রে ঐ সকল উক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত কি না ভাবিবার বিষয়। অথবা যে পরিস্থিতিতে তিনি ধৈর্যহারা হইয়াছিলেন, তাহা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, ভয়ব্যাকুলা হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে পাঠাইবার শেষ উপায়-হিসাবেই কি অসঙ্গত উক্তিসকল করিয়াছিলেন? রাজকন্যা, রাজবধূ হইয়া ঐরূপ অবস্থায় আর কেহ পড়িয়াছেন কি? সীতা সারল্যের প্রতিমূর্তি। ভীষণাকার রাবণকে দেখিয়া প্রথমে ভীত হইলেও পরিব্রাজক-জ্ঞানে তাহার সৎকার করেন। রাবণ সীতার সহিত বাক্যালাপের প্রথমেই তাঁহার রূপ-যৌবনের অশেষ প্রশংসা করেন। প্রকৃত পরিব্রাজক হইলে রাবণ তাঁহার রূপ-যৌবনের প্রশংসা করিতে পারে না, এই চিন্তা একবারও সীতার মনে উদয় হইল না।

অরণ্যকাণ্ডের প্রথম অংশে ছিল অরণ্যের পরিচয়, বনমধ্যস্থিত কুটীরে তপস্বিগণের শান্ত সংযত জীবনের আলেখ্য, বিচিত্র সৌন্দর্যময়ী প্রকৃতির মাধুর্য। অরণ্যের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, স্বভাব-সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া সহসা আবির্ভাব বলশালী ও কামোন্মত্ত মহাসুর রাবণের। এই ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় সংঘাত থাকিলেও কাব্যের স্বাভাবিক গতি ও সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয় নাই।

রাবণকর্তৃক সীতা-হরণ রামায়ণের প্রধান ঘটনা বলা যাইতে পারে। সীতা-হরণের ফলেই রাক্ষসাধিপতি রাবণের সহিত রামচন্দ্রের সংগ্রাম ও রাবণ-বিনাশে জনস্থানে শান্তি-স্থাপন। সীতাকে বশীভূত করিবার ব্যর্থ

চেষ্টা করিয়া অবশেষে রাবণ বলপূর্বক তাঁহাকে লইয়া রথে আরোহণ করিল।

অর্ধরাত্রার্ধদিবসে অর্ধচন্দ্রেঽর্ধভাস্করে।
রক্ষো জগ্রাহ বৈদেহীং শূদ্রো বেদশ্রুতিমিব॥

অর্থাৎ জলবিষুব সংক্রান্তির দিন (আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি) অষ্টমী তিথিতে পূর্ণ মধ্যাহ্নকালে, শূদ্রের বেদশ্রবণের ন্যায়, রাবণ সীতাকে হরণ করিল।

জগতের ইতিহাসে এরূপ দুর্দিন কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়াছে। সেই নির্জন অরণ্যে রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক ধৃত হইয়া ভয় ও দুঃখে বিহ্বলা মনস্বিনী সীতা আর্তকণ্ঠে রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সমগ্র প্রকৃতি বেদনায় স্তব্ধ। জনমানবশূন্য অরণ্যে কে তাঁহার রক্ষার্থ অগ্রসর হইবে? তখন একান্তচিত্তে সীতা সেই জনস্থান, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ, শিখরবিশিষ্ট প্রস্রবণ-পর্বত, কুসুমিত বনরাজি, হংসসারসসমূহে মুখরিত গোদাবরী, অরণ্যের অধিবাসী সমুদয় জীবজন্তু ও পক্ষিবৃন্দকে আহ্বান করিয়া কাতরকণ্ঠে অনুনয়-পূর্বক বলিলেন :

আপনাদের আমি বন্দনা করিতেছি, নমস্কার জানাইতেছি, আমি আপনাদের শরণাগত। আপনারা শীঘ্র রামের সমীপে গিয়া বলুন— সীতাকে রাবণ হরণ করিতেছে। প্রাণাপেক্ষাও গরীয়সী আমাকে এই রাক্ষস অপহরণ করিতেছে জানিলে সেই মহাবাহু রাম বিক্রম প্রকাশ-পূর্বক আমাকে যমালয় হইতেও আনয়ন করিবেন—

আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
টঙ্কবন্তং শিখরিণং বন্দে প্রস্রবণং গিরিম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
সুখগন্ধাশ্চ বন্দেঽহং বনরাজীঃ সুপুষ্পিতাঃ।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
যানি কানিচিদপ্যস্মিন্ নিবসন্তি মহাবনে।
সর্বাণি শরণং যামি সত্ত্বানি বিবিধান্যহম্॥
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
বিবশাং রক্ষসানেন শংসধ্বং রাঘবায় মাম্॥
মাং বিদিত্বা মহাবাহুর্হৃতেতি স মহামনাঃ।
আনয়িষ্যতি বিক্রম্য যমস্য বিষয়াদপি॥

সীতার সেই আর্ত কণ্ঠস্বর বন হইতে বনান্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সুপ্তোত্থিত জটায়ু পক্ষী তাহার সমগ্র শক্তি লইয়া পলাতক দুর্বৃত্ত রাবণের গতিরোধ করিল। জটায়ুর সহিত সংগ্রামের জন্য রাবণকে রথ হইতে অবতরণ করিতে হইল। রাবণকর্তৃক জটায়ু পরাজিত ও মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উদ্ধারলাভের ক্ষীণ আশাও সীতার হৃদয় হইতে নির্বাপিত হইল। সীতাকে রথ হইতে অবতীর্ণা দেখিয়া ক্রুদ্ধ রাবণ পুনরায় সীতার কেশাকর্ষণ করিলে সীতা নিকটস্থ বিশাল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বাধা দিতে লাগিলেন। কিন্তু সীতার পক্ষে রাবণকে বাধাপ্রদান অসম্ভব। রাবণ পুনরায় বলপূর্বক সীতাকে লইয়া রথে আরোহণ করিল। মহাকবি সীতার দুঃখে অভিভূতা প্রকৃতির একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রাবণকর্তৃক সীতা এইরূপে অবমানিতা হইলে চরাচর সমগ্র জগৎ মর্যাদা-বিহীন ও নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইল। নানাপক্ষিকুল-সমাবৃত বৃক্ষরাজি যেন শিরোদেশ সঞ্চালন করিয়া সীতাকে বলিতে লাগিল, 'মা ভৈষীঃ'—ভয় করিও না। সরোবরসমূহে পদ্মসকল ম্লান হইয়া গেল, মীন ও জলচর জন্তুগণ ভীত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং উদ্গত-বাষ্প সরসীসমূহ সখীর ন্যায় জনকাত্মজার উদ্দেশে শোক প্রকাশ করিতে

লাগিল। উন্নতশিখরবিশিষ্ট পর্বতসমূহ যেন শৃঙ্গরূপ বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া জলপ্রপাত-শব্দে রাবণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। [illegible] দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন, আর আকাশস্থ সমুদয় প্রাণী করুণস্বরে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল, যে-যুগে রামপত্নী যশস্বিনী সীতাকে রাবণ হরণ করিতেছে, সে-যুগে ধর্ম আর নাই, সত্যই বা কিরূপে থাকিতে পারে?

জটায়ুকে নিহত করিয়া ভ্রান্তচিত্ত রাবণও ভ্রমবশতঃ পূর্বদিকে পম্পা সরোবর অভিমুখে গমন করিয়া ক্রমে ঋষ্যমূক-পর্বতের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। ঋষ্যমূক-পর্বতের উপর দিয়া চলিবার সময় ক্রন্দনরতা সীতা সহসা গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট পাঁচটি বানর দেখিতে পাইলেন। তখন রাবণের অজ্ঞাতসারে সীতা তাহাদের নিকট নিজের আভরণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। বানরগণও বিস্মিত হইয়া অনিমেষ নয়নে সীতাকে দর্শন করিতে লাগিল।

পম্পা-সরোবর ও ঋষ্যমূক-পর্বত দর্শনে নিজের ভ্রম উপলব্ধি করিয়া রাবণ পুনরায় দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করিয়া অচিরেই সমুদ্র অতিক্রম-পূর্বক লঙ্কাপুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

লঙ্কায় আগমনের পর রাবণ সীতাকে নিভৃত স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া বলবান্ রাক্ষসদিগকে জনস্থানে পাঠাইয়া দিল রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে। অতঃপর সে সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় মনোনিবেশ করিল। সীতাকে সঙ্গে করিয়া রাবণ নিজের সুরম্য প্রাসাদ ঐশ্বর্যসম্ভার ও ভোগের বিবিধ আয়োজন দর্শন করাইয়া অনুনয়, আবেদন ও ও ভয়প্রদর্শনের দ্বারা তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিল। সীতা এতক্ষণ ভয় ও দুঃখে বিহ্বলা ছিলেন। রাবণের সেই সুরক্ষিত পুরীতে অবরুদ্ধ হইয়া উদ্ধারের সকল আশা তিরোহিত হইল দেখিয়া সীতা ভয় পরিত্যাগ করিলেন। একগাছি তৃণ নিজের ও রাবণের মধ্যে স্থাপন করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন: তাঁহাকে অপহরণই রাবণের ধ্বংসের কারণ হইল। রামচন্দ্র নিশ্চিত তাঁহাকে রাবণের হাত হইতে উদ্ধার করিবেন।

অবশেষে সীতা বলিলেন, 'হে রাক্ষসরাজ, নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র দূরস্থ-নিবন্ধন আমার এই শরীর রক্ষা করিতে পারিতেছেন না; যেহেতু বর্তমানে আমি তোমার আয়ত্তাধীনা, তুমি আমার এই অচেতন শরীর পীড়ন অথবা ভক্ষণ করিতে পারো। আমার এই শরীর অথবা জীবন আমার রক্ষণীয় নহে।'

কি কারণে বলা যায় না, সীতাকে হরণ করিবার সময় রাবণ আশ্বাস দিয়াছিল, 'লঙ্কাপুরী গমনের পর এক বৎসর পর্যন্ত তোমাকে আমি অপ্রিয় বাক্য বলিব না—যাবৎ তোমার চিত্তে রাম-সম্বন্ধে বৈরাগ্য উপস্থিত না হয়।' মূঢ় রাবণ হয়তো আশা করিয়াছিল, রামের অনুপস্থিতিতে রাবণের ঐশ্বর্য ও বল দর্শনে সীতা প্রলুব্ধ ও ভীত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিবেন।

সীতার দৃঢ় বাক্যশ্রবণে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাসাদের বাহিরে নির্জন অশোকবনে রাখিবার ব্যবস্থা করিল। বিকটাকার রাক্ষসীবৃন্দকে আদেশ দেওয়া হইল: তাহারা দিবারাত্র সীতাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে এবং ক্রমান্বয়ে তর্জন, গর্জন ও প্রলোভন বাক্যের দ্বারা তাঁহার চিত্ত যাহাতে রাবণের অনুগামিনী হয়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত 'শিক্ষাষ্টকে'র রূপায়ণ

শ্রীমতী সুধা সেন

বিচ্ছিন্ন এক একটি ইষ্টকখণ্ড, কিন্তু যিনি শিল্পী, যিনি রূপকার, তিনি সেই খণ্ডাংশগুলি লইয়াই রচনা করেন একটি সুন্দর অখণ্ড বিচিত্র সৌধ! মানুষ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখে—বিচ্ছিন্ন খণ্ড ইষ্টকগুলির মধ্যে কোথায় ছিল এই সম্ভাবনা? মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের শ্লোক-গুলিও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তিনি সুদক্ষ জীবনশিল্পী; সেই শিক্ষাষ্টকের দ্বারা যে নব রূপায়ণ করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—ক্ষুরধার দুর্গম পথের মাঝে মাঝে রচনা করিয়াছেন এক একটি শান্ত শীতল পান্থশালা। কাল তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে নাই, একটি ইষ্টকও খসিয়া পড়ে নাই। সেই স্নিগ্ধ শীতল পান্থশালায় আজও আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন কত শত শত সংসার-দাবদগ্ধ অসহায় পান্থ!

নীলাচলে গম্ভীরার ভিত্তিতলে গৌরদেহ-খানি লুণ্ঠিত হইতেছে, বিরহ-দহনে সুকুমার তনু ক্ষীণ শীর্ণ, লীলা অবসানপ্রায়।

জগৎকে যাহা দিবার ছিল, দেওয়া হইযাছে, তবু বুঝি কিছু আছে বাকি!

স্বরূপ ও রামরায় দুই অন্তরঙ্গের সঙ্গে দিব্যোন্মাদের প্রলাপ কহিতে কহিতেই যেন একদিন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল, জগতের দিকে তাকাইলেন করুণাঘন শ্রীমন্মহাপ্রভু। কলিহত আর্তজীবের ব্যথার ছোঁওয়া বুঝি আঘাত করিল অন্তরে, যেন এই ব্যথার শান্তি, মৃত্যুর অন্ধকারে অমৃতের আলোক সহসা অন্তরে লাভ করিলেন, তাহাই জগৎকে দুই হাত ভরিয়া বিলাইবার বাসনা জাগিল মনে। তাই—

'হর্ষে প্রভু কহে শুন! স্বরূপ রামরায়,
নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।'

বলিতে বলিতেই একে একে আটটি শ্লোক রচনা করিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—বৃদ্ধা শোকাতুরা জরাতুরা মাতা, কিশোরী কমলকলিকা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, সোনার নবদ্বীপ, নবদ্বীপের আনন্দমুখর কীর্তন, প্রিয়তম ভক্ত, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য—সমস্তই তো ত্যাগ করিয়াছেন জগতের জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য। দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া গম্ভীরার রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে চলিয়াছে সুতীব্র কৃষ্ণ-বিরহের দহন!

'এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্রে মিলন।' (চৈঃ চঃ)

বিষের জ্বালায় কৃষ্ণ-বিরহের আর্তিতে দেহ ইন্দ্রিয় ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তবু বিরহ-ক্রন্দনের বিরাম নাই, ইহাও তো জগতেরই শিক্ষার জন্য! তবু জীব শিখিল না—জানিল না ব্যথা কোথায়! কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে বিরহের ব্যথা জাগিল না, তাই আজ বুঝি আবার নিরুপায় জীবের দিকে তাকাইলেন প্রভু—'শোন স্বরূপ! শোন রামরায়! নাম-সঙ্কীর্তনই হইল কলির জীবের পরম উপায়।' বলিলেন:

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥

(মহাপ্রভু-রচিত প্রথম শ্লোক)

—যাহা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, যাহা সংসার-তাপরূপ মহাদাবানলকে নির্বাপিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কুমুদকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যাহা বিদ্যারূপ বধূর জীবন-স্বরূপ, যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বর্ধিত করে, যাহার প্রতি পদে-পদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন, অবগাহন-স্নানের মতো যাহা সর্বাত্মারতৃপ্তিজনক, সেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন। পূর্বেও বহুবার নারদীয় ভক্তি-সূত্রের উল্লেখ করিয়া নিজে প্রণালী দেখাইয়া দিয়া জীবকে

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

এই শ্লোক কীর্তন করাইয়াছেন, কণ্ঠস্থ করাইয়াছেন। কলিতে ভক্তি তথা নাম-সাধন ছাড়া যে জীবের গতি নাই, তাহা তিনি বারবার বলিয়াছেন। শুধু পুরাণ বা ভক্তি-শাস্ত্রই যে নামের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নয়, বেদ-বেদান্ত-শ্রুতিতেও সাধনা বা উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে নামকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন :

'ওম্ ইতি ব্রহ্ম, ওম্ ইতি ইদং সর্বম্'

কঠ-উপনিষদ্ বলেন :

'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ'

অর্থাৎ এই প্রণবের অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন। আত্মতত্ত্ব- অথবা ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদানের সময়ে ধর্মরাজ বলিলেন, হে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মহান্ নচিকেতা শ্রবণ কর :

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

—এই ওঙ্কার তথা প্রণবই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। এই শ্রুতি-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন : যত এবম্, অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যবলম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্।—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে, ব্রহ্মের বাচক নামের আশ্রয়-গ্রহণই তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রশস্ততম। যেমন ব্রহ্ম ও তাঁহার বাচক 'ওম্' তেমনই রসঘন-সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই সাধন—নাম। নাম ও নামী অভেদ। 'একোঽহং বহু স্যাম্'—একই ব্রহ্মের বহু বিচিত্র প্রকাশ ও বহু নাম—সমস্তই অভিন্ন। নামীর সমগ্র শক্তি, মাধুর্য, করুণা—সমস্তই নামে ন্যস্ত। তথাপি নামী হইতেও নামের করুণা যেন অধিক! নামীর দর্শন বা অনুভূতি লাভ সাধকের ইচ্ছাধীন নয়; বহু আয়াস, বহু নিষ্ঠা ও বহু যত্নসাপেক্ষ; কিন্তু ইচ্ছামাত্র 'নামে'র স্পর্শ ও করুণা অনুভব করা আয়াসসাধ্য নয়। অপ্রাকৃত চিন্ময় নাম কৃপা করিয়াই প্রাকৃত জড় জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে অমৃতের প্লাবন বহাইয়া দেন; দেহ, মন, প্রাণ সেই অমৃত-সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া অমৃতময় হইয়া উঠে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাবতার, নামময় বিগ্রহ, জগতে নামের মাধুর্য ও করুণা প্রচার করাও তাঁহার অবতরণের অন্যতম হেতু। শুধুমাত্র পরমধন এই নাম অবলম্বন করিয়া কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত পরম তীর্থপথে যাত্রা করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং আজও হইতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক। শ্রীপাদ হরিদাস তো নামসাধনার এক জীবন্ত বিগ্রহ, কিন্তু 'নাম' কেমন করিয়া 'ভবমহাদাবাগ্নি'কে নির্বাপিত করিয়া, যুগযুগ-সঞ্চিত গ্লানি ও মলিনতা মুক্ত

করিয়া চিত্ত-দর্পণকে স্বচ্ছ নির্মল করিয়া ব্রহ্মের চিদ্‌ঘন আনন্দসুন্দরের প্রতিফলনযোগ্য করিয়া তুলে, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজিতে গেলে আমাদের একবার যাইতে হইবে নবদ্বীপে।

সুদক্ষ জীবন-শিল্পীর সূক্ষ্মতম মধুরতম রূপায়ণে কেমন করিয়া দুইটি কঠিন শিলার রূপান্তর ঘটিল সুন্দর প্রাণময় প্রতিমাতে, তাহার দৃষ্টান্ত জগন্নাথ আর মাধব—নবদ্বীপের কুখ্যাত দুই ভাই 'জগাই আর মাধাই'। হেন পাপ নাই, যে তাহারা করে নাই—পরধন-হরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নরনারী-নির্যাতন—কি নহে? দুই মহা মত্তপ সারাদিন নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন পরস্পরে গলাগলি, কখন বা কদর্য কুৎসিত ভাষায় গালাগালি, নবদ্বীপের লোক সন্ত্রস্ত, ভীত; যে পথে জগাই-মাধাই, সে পথে জনপ্রাণী নাই।

প্রভুর আদেশ—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আর বৃদ্ধ হরিদাসকে নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষার প্রার্থনা অন্ন নহে, কৃষ্ণনাম, 'কহ কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম,' এই আমাদের ভিক্ষা। দয়াল নিতাইচাঁদ দ্বারে গিয়া দাঁড়ান; সকরুণ গৃহস্থ দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া ভিক্ষার সামগ্রী আনেন, নিতাই বলেন, 'ওগো, তোমার এই দান ফিরাইয়া লও, আমাকে কৃষ্ণনাম-দান দাও। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ—এই শুধু আমার ভিক্ষা'। সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিমান্ কেহ বা এই ভিক্ষা দান করেন, নয়নে অশ্রু আসে, সুগঠিত সুন্দর গৌর তরুণ সন্ন্যাসীর কেন এই আকূতি? কেহ বা করেন বিদ্রূপ, সুতীক্ষ্ণ হাস্যবাণে বিঁধিতে থাকেন এই নবীন ভিক্ষাপ্রার্থীর নূতন ভিক্ষা-প্রণালীকে, অবহেলায় কেহ বা রুদ্ধ করেন গৃহদ্বার। কিন্তু 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়ে'র ক্রোধ নাই, বিরতি নাই!

সেদিন দূরে দেখিলেন, বলবান্ দুই মত্তপ পরস্পর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া টলিতে টলিতে চলিতেছে; কি বলে, কি করে—কিছুরই স্থিরতা নাই। পার্শ্ববর্তী লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তাহাদের পরিচয় জানিলেন, তখন ঘৃণায় নহে, করুণায় নিত্যানন্দের বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'হরিদাস! আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে নাম বিতরণ করিতে, যদি নাম বিতরণ করিতেই হয়, তবে এই তো শ্রেষ্ঠ স্থান, চলো যাই।' 'হায় হায়' করিয়া বলিয়া উঠিলেন নিত্যানন্দ: সদ্‌ব্রাহ্মণ-কুলজাত দুইটি মানুষ, কি ইহাদের পরিণতি! যদি ইহাদের মন ফিরাইতে না পারিলাম, তবে কিসের প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর, কতটুকুই বা তাঁহার ক্ষমতা?

'পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
... ...
তবে হঙ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইরে করোঁ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে,
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥' চৈঃ ভাঃ)

—যাঁহারা এখন ইহাদের দেখিয়া শুচি হইবার জন্য গঙ্গাস্নান করেন, এমন যদি হয় যে, ইহাদের দর্শনে লোকে গঙ্গাস্নানের মতোই পবিত্রতা ও পুণ্য লাভ করেন, তবেই সার্থক হইবে আমাদের সকল প্রয়াস, সফল হইবে আমার চৈতন্যের দাসত্ব, আমার নিত্য আনন্দ! হরিদাস! তুমি ইহাদের প্রতি সদয় হও, শুভ সঙ্কল্প করো, তবেই ইহারা উদ্ধার পাইবে।

হরিদাস বুঝিলেন, নিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টি যখন দুই পতিতের উপরে পতিত হইয়াছে, তখন উদ্ধারের আর দেরি নাই।

উপস্থিত ভব্য লোকগণ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কেহ করিতে লাগিলেন বিদ্রূপ— —'তোমাদের নবীন সন্ন্যাসের ভড়ং ওখানে খাটিবে না। বাপু হে, প্রাণটি লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও।'

নিত্যানন্দ অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে হরিদাস।

'সভারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভারমাত্র আমরা দুই-র।
বলিলে না লয়, তবে সেই মহাবীর॥'
(চৈঃ ভাঃ)

—কৃষ্ণনাম বিলাইবার ভার মাত্র আমাদের; নাম লয় কি, না লয়—তাহার দায় আমাদের নয়। যিনি ভার দিয়াছেন, সে দায় তাঁহার।

নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই-এর কাছে গেলেন, বলিলেন, 'বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম' —শুনিবামাত্র নেশা যেন ছুটিয়া গেল; মহাক্রোধে দুই নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, দুই মদ্যপ পরম আক্রোশে দুই প্রভুর দিকে ধাবিত হইল। চারিদিকে লোকে আতঙ্কে বিহ্বল, কেহ কেহ আর্তস্বরে বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দ্রুত ধাবিত হইলেন; বৃদ্ধ বলহীন হরিদাসও যথাসাধ্য নিত্যানন্দের অনুসরণ করিলেন। নিরাপদ দূরত্বে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া হরিদাস সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, 'চঞ্চল এক পাগলের সঙ্গে আসিয়া আজ আমার এই দশা, বৃদ্ধ বয়সে মার খাইয়া প্রাণ যায় আর কি!' নিত্যানন্দ যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, 'কে চঞ্চল, আমি না তোমার প্রভু গৌরাঙ্গচন্দ্র? জন্মিয়াছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া, কিন্তু আদেশ করেন যেন মহারাজাধিরাজ! অদেশ হইল—নাম বিলাও, এখন দোষ হইল আমার?'

দুইজনে পৌঁছিলেন আসিয়া প্রভুর দরজায়। শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্যকে দেখিয়া হরিদাস গেলেন তাঁহার কাছে। একমন একপ্রাণ অদ্বৈত-হরিদাস! আজিকার সঙ্কটের কথা হরিদাস বলিলেন আচার্যের কাছে। আচার্য বলিয়া উঠিলেন, 'এক মাতাল নিত্যানন্দ, জুটিল আরও দুই মাতাল—হইল ভালো, তিন মাতালকে আরও মাতাল করিয়া তোমাদের গৌরাঙ্গ গোঁসাই নাচিবেন—তাহাও দেখিব চোখে? চলো চলো হরিদাস? জাতি লইয়া আমরা পালাই। হাসিয়া হরিদাস নিবৃত্ত হইলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যপট দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলেন আচার্য আর হরিদাস।

প্রভুব কাছে নিবেদিত হইল, আজিকার দুর্দৈবের কথা। নিতাই বলিলেন, 'গৌর! কিসের তোমার করুণার বড়াই, আমাকে উদ্ধার করিয়াছ তাই? এই দুই মহাপতিতকে ত্রাণ কর, তবে তো জানিব তোমার মহিমা!'

পরম নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় গৌর বলিলেন, 'শ্রীপাদ! আপনি যখন ইহাদের ভাবনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাহাদের ভয় কি?'

বৈষ্ণব-সমাজ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, জগাই-মাধাই-এর ত্রাণ বুঝি হইয়াই গেল!

নাম ভবমহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করেন, ঘনঘোর মহাদাবানলে ঘিরিয়া ধরিয়াছে জগাই আর মাধাই-এর দেহ মন, কিন্তু আর ভয় নাই! ঐ যে আকাশ আবৃত করিয়াছে কৃষ্ণ মেঘে, এখনই নামিবে অমৃত-রসধারা, সিক্ত হইবে জগন্নাথ আর মাধব, নির্বাপিত হইবে অগ্নি।

প্রভু যে ঘাটে স্নান করেন, সেই ঘাটের কাছে স্নান লইল দুই ভাই—জগাই-মাধাই। বৈষ্ণবগণ এমন কি স্বয়ং প্রভু পর্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া চলিলেন অন্য ঘাটে—অপর পথে।

রাত্রিতে রুদ্ধদ্বার গৃহে আরম্ভ হয় ভক্ত-সঙ্গে প্রভুর নামসঙ্কীর্তন, বাহির হইতে দুই মদ্যপ তাহা শোনে, মৃদঙ্গ মন্দিরা ও সঙ্গীতের তালে তালে টলমল পদভারে মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। 'চেতোদর্পণমার্জনং'—চিত্ত-দর্পণে যুগযুগ-সঞ্চিত মলিনতার মার্জন আরম্ভ হইল—শ্রবণে প্রবেশ করিল কীর্তনের আনন্দধ্বনি।

পরদিন প্রভুকে পথে দেখিয়া জগাই-মাধাই প্রসন্নহাস্যে বলিয়া উঠিল, 'নিমাই পণ্ডিত, কাল রাত্রে তোমার বাড়ীতে মঙ্গল-চণ্ডীর গীত খুব ভাল হইয়াছে। আমাদের এখানে একদিন গান কর না? গায়ক বাদক সব নিয়া আসিও, তোমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্তই আমরা দিব।'

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া দূরে সরিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি অন্তর্যামী, তাই প্রার্থনা স্বীকার করিলেন মনে মনে; যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি চাহিয়াই লইবেন।

এক রাত্রিতে পথে পড়িয়া আছে দুই ভাই, দূর হইতে দেখিলেন নিত্যানন্দ—আনন্দ নাই তাঁহার, নাই শান্তি; পাতকী-উদ্ধারের ব্রত লইয়াছেন, কিন্তু ব্রত তো আজও রহিল অসম্পূর্ণ।

নির্ভীক নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দুই মদ্যপ কঠোরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, রে?'

'অবধূত!'

শুনিবামাত্র মাধাই রুষ্ট হইয়া এক ইষ্টকখণ্ড (মুটকী) লইয়া শ্রীনিত্যানন্দের ললাটে ভীষণ আঘাত করিল। সেই পূত দেহ হইতে অজস্র রুধিরধারা পড়িতে লাগিল, হস্তে ললাট চাপিয়া ধরিয়া পরম দয়াল নিত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, 'ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দ-নাম রে।' মাধাই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় আঘাত করিতে উদ্যত হইলে জগাই-এর মনে জাগিল করুণার এক বিন্দু প্রকাশ, জগাই মাধাই-এর হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কেন ভাই, নিরপরাধ সাধুকে আঘাত করিতেছ?'

প্রভুর কাছে এই খবর পৌছিতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না; প্রেমঘন গৌরাঙ্গসুন্দর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, ক্রোধে দুই নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, মুহূর্তে বিস্মৃত হইলেন নিজের প্রতিজ্ঞার কথা 'কাঁদিয়া জগৎকে কাঁদাইব'—সে কথা মনে রহিল না গৌর ছুটিয়া আসিলেন নিত্যানন্দের কাছে; দেখিলেন তাঁহার আঘাত, দুই অরুণ নয়নের প্রজ্বলিত ক্রোধ-বহ্নি বুঝি এখনই ঘটাইবে প্রলয়, ঘটাইবে চরম সর্বনাশ, নিত্যানন্দের পুণ্যদেহ হইতে রক্তপাত! আকুল নিত্যানন্দ প্রভুর দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, কণ্ঠে ব্যগ্র মিনতি—'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো ইহারা অজ্ঞান, তোমার ক্রোধের অযোগ্য। দৈবে আমি ব্যথা পাইয়াছি, ইহারা আমাকে আঘাত করে নাই। তুমি ক্ষমাসুন্দর নেত্র মেলিয়া একবার ইহাদের দিকে তাকাও ভাই। আর জগন্নাথ তো কোন দোষ করে নাই, বরং বাধা দিয়াছে মাধবকে, তাহার প্রতি তোমার রোষ কেন? ধীরে প্রলয়-বহ্নি যেন নির্বাপিত স্তিমিত হইয়া আসিল; প্রশান্তি আসিল গৌর-বদনে। 'জগন্নাথ, তুমি আমার নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছ? কোন্ ধনে, কোন্ প্রতিদানে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব? এই বক্ষ পাতিয়া দিলাম, তুমি এসো আমার বক্ষে।'

বিস্মিত মুগ্ধ জগন্নাথ সে অপরূপ জ্যোতির্ময় দেবতার দুই শীতল চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন—বহুদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানির ভার অশ্রু হইয়া

ঝরিতে লাগিল প্রভুর পায়ে। প্রভু বলিলেন, 'জগন্নাথ! আজ তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে, বলো, কি তোমার প্রার্থনা?'

কি প্রার্থনা, কেমন করিয়া তাহা চাহিতে হয়? বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন জগন্নাথ প্রভুর মুখে।

প্রভু বলিলেন, আজ হইতে প্রেম ভক্তি লাভ করিয়া তুমি ধন্য হও, তোমার কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হোক। জগন্নাথ চাহিয়া দেখিলেন সেই গৌর তনুখানি কখন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অপরূপ শ্যামতনু!

আনন্দে ভক্তিতে জগন্নাথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিস্মিত বাক্যহত মাধব নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন, একি বিস্ময়, কি এই মহৎ উদার ক্ষমা?

একই আত্মা, একই কার্য, একই পাপ দুই দেহ ধারণ করিয়া জগাই আর মাধাই। জগাই-এর প্রতি যখন প্রভুর কৃপা হইল, তখন মাধবের চিত্তেও শুভবুদ্ধি জাগিল, বলিলেন—

'দুই জনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ!
অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ?'
(চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর চরণে মাধব পতিত হইলেন। কঠোর হইল প্রভুর স্বর, বলিলেন, 'মাধব, তোমার অপরাধ অপরিমেয়, আমার ক্ষমার অযোগ্য। যে নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেহকে আমি পূজা করি, যিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে তুমি আঘাত করিয়াছ! আমি, তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।' 'ভবমহাদাবাগ্নি'-জ্বালার অনুভূতি এতদিন ছিল না, এখন তীব্র দাহে প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিল, ব্যাকুল অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মাধব মিনতি করিতে লাগিলেন, 'ওগো পতিতপাবন! উপায় বলো, তুমি বৈদ্যশিরোমণি, আমার ভব-ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া তুমি যদি আমাকে নিরাময় না কর, তবে কে আর করিবে? দয়া কর, তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক কর, প্রভু!'

প্রভু যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া কহিলেন, 'ক্ষমা করিতে হয়, তুমি কর নিতাই; এই কঠিন অপরাধের ক্ষমা আমার কাছে নাই।'

শ্রীনিত্যানন্দের চোখ হইতে করুণার সুরধুনী-ধারা বহিয়া মাধবকে স্নাত করিয়া দিল। 'সর্বাঘমর্ষণং' দেহ-মন ইন্দ্রিয়-প্রাণ স্নিগ্ধ স্নাত হইতেছে, মাধবের অন্তর ভরিয়া উঠিতেছে অমৃতরসে!

নিতাই বলিলেন, 'গৌর! কৃপা করিবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছ—তুমিই কৃপা করিবে, কিন্তু আমাকে উপলক্ষ্য করিতে চাও? বেশ তাই হোক। আমার জন্ম-জন্মান্তরের যদি কোন সুকৃতি থাকিয়া থাকে, সবই আমি মাধবকে দিলাম, তাহার সকল দুষ্কৃতির ভার গ্রহণ করিলাম আমি। এবার মায়া ছাড়, তুমি তাহাকে গ্রহণ করো।'

ধন্য দয়াল নিতাইচাঁদ, ধন্য তোমার মহতী ক্ষমা, সার্থক তোমার পতিতোদ্ধারণ ব্রত! হর্ষ, আনন্দ, বেদনার বিচিত্র প্রকাশে প্রভুর মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'শ্রীপাদ! যদি ক্ষমাই করিয়াছ, তবে মাধবকে একবার তোমার করুণাবিশাল বক্ষে স্থান দাও, তাহার জন্ম সার্থক হোক।'

সার্থক হইলেন মাধব, পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয় মিলিল নিতাই-চাঁদের বক্ষে।

প্রভুর আদেশে দুই ভাইকে প্রভুর গৃহে তুলিয়া লইয়া গেলেন ভক্তগণ, আজ ইঁহাদের লইয়াই হইবে নাম-সঙ্কীর্তন আর মহানৃত্য!

আচার্য অদ্বৈত হাসিতেছেন, 'হরিদাস। কি বলিয়াছিলাম, মনে আছে? ঐ দেখ সব মাতাল একত্র জুটিয়াছে, এখনই আরম্ভ হইবে নেশার কোলাহল আর নৃত্য; চলো, এই বেলা আমরা পালাই।' হরিদাসও হাসিলেন, পালাইবেন কোথায়, কেমন করিয়া? চোখে তো নেশা লাগিয়াই আছে, সবই গৌরময়, সমস্ত ভুবনেই যে গৌর-ফাঁদ পাতা!

নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ হইল, মঙ্গলচণ্ডীর গীত নয়, পরম সুমঙ্গল নাম। নূতন উষার অরুণোদয়ে রাঙা হইয়া উঠিল জগন্নাথ-মাধবের চিত্ত, এ কি নব অভ্যুদয়! ক্রমে পূর্ণ সূর্য প্রকাশিত হইতে লাগিলেন জগন্নাথ-মাধবের চিত্তদর্পণে। 'চেতোদর্পণমার্জনং'—আজ চিত্ত-দর্পণ মার্জিত, স্বচ্ছসূর্য প্রকাশযোগ্য হইয়াছে।

দুই ভাই অনুতাপের অশ্রুজলে প্রভুর চরণ ধুইয়া দিলেন। প্রভু তাঁহাদের লইয়া চলিলেন জাহ্নবী-সলিলে। কলুষ-নাশিনীর বক্ষে নামিয়া দাঁড়াইলেন প্রভু, দুইপাশে দুইভাই জগন্নাথ আর মাধব। দিব্যানন্দ-স্মিতমুখে প্রভু দুইভাই-এর দিকে তাকাইলেন। সুগম্ভীর দূরাগত ধ্বনির মতো তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন বাণী বাহির হইল, বলিলেন, 'শোন জগন্নাথ, শোন মাধব! তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যত পাপভার সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম, আর পাপ করিও না। আজ হইতে তোমরা আমার হইলে।'

'তো সভার মুখে মুক্তি করিব আহার,
তোর দেহ হইবেক মোর অবতার।'

(চৈঃ ভাঃ)

আজন্ম কলুষিত-জিহ্বায় যে জড়তা আসিয়াছিল, আজ কোথায় সে জড়তা? ব্রহ্মবিদ্যা যেন আবির্ভূতা হইলেন দুইভাই-এর জিহ্বায়, বিহ্বল ব্যাকুল চিত্তে অদ্ভুত স্তুতি করিতে লাগিলেন প্রভুকে। নূতন এক অপূর্ব দৃশ্যপটের যেন একটির পর একটি পরম বিস্ময়, পরম রহস্য, পরম আনন্দ খুলিয়া ধরিতেছেন চোখের সম্মুখে কোন অদৃশ্য শিল্পী, আর তাহারই সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিবিড়তর আবেশে মগ্ন হইয়া যাইতেছে দেহ-মন-প্রাণ।

সকল বৈষ্ণবকে প্রভু বলিলেন, 'তোমরা ইঁহাদের অনুগ্রহ করো, কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ করো, আজ হইতেই যেন ইঁহারা কৃষ্ণদাস হন, ইঁহাদের প্রাণকমল আজই অর্ঘ্য হইয়া নিবেদিত হোক কৃষ্ণের চরণে।'

হরিধ্বনি করিয়া বৈষ্ণব-মণ্ডলীর প্রত্যেকেই আলিঙ্গন করিলেন সেই দুই দুরাচার মদ্যপকে, যাহাদের ভয়ে নবদ্বীপে বাস করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন দুই ভাই। 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং'—হৃদয়-কুমুদটি গৌরচন্দ্রের করুণা-জ্যোৎস্নাধারায় অভিষিক্ত হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিল জীবননাথের পদতলে। (ক্রমশঃ)

বাঁশির ডাকে

[ইন্দিরা দেবীর হিন্দী গানের অনুবাদ]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শোনেনি যে, জানে কি সে—কী গুণ জানে তার বাঁশরী—
একটি ছোট মধুর সুরে ডাকে যখন শ্যামল হরি ?
গুণ করে কি বেণু, না সে বেণুগোপাল পাগল করে ?
জাদু জানে বাঁশিই কি, সই, না তার সুরেই আবেশ ঝরে—
যার টানে যায় জীবন ভেসে—সংসার হয় ছায়া, মরি
একটি ছোট মধুর সুরে ডাকে যখন শ্যামল হরি !

শোনেনি যে, জানে কি সে—কী গুণ জানে তার বাঁশরী—
একবার হেসে স্বপনে সে আসে বেয়ে তরী ?
কুল মান সব মজে তখন, কিছুই কি আর মনে থাকে ?
বিশ্বভুবন রইল কি বা গেল, করে সে চিন্তা কে ?
সব কিছু যায় ভুল হয়ে—সে এমনি বাজায় সুর নিঝরি'—
একটি ছোট মধুর সুরে ডাকে যখন শ্যামল হরি !

শোনেনি যে, জানে কি সে—কী গুণ জানে তার বাঁশরী—
মনোমোহন বনমালী গায় যবে, সই, কলস্বরি' ?
শোনেনি যে—কেমন ক'রে জানবে—বাঁশির লয়ে
সহজ মানুষ হাসে কাঁদে কেন সখী অধীর হয়ে ?
পর হয়ে যায় সবাই তার হায়—যাকে সে লয় আপন করি'
একটি ছোট মধুর সুরে ডাকে যখন শ্যামল হরি !

শোনেনি যে, জানে কি সে—কী গুণ জানে তার বাঁশরী—
যখন সে তার উছল তানে ডাকে মনপ্রাণ শিহরি' ?
গায় মীরা : যে শোনেনি সে বাঁশি সখী, সে কি বোঝে ?
হৃদয়-ব্যথার কী জানে সে—পায়নি ব্যথা কখনো যে ?
নয় সুর, আগুন এ, বাঁশিতে আনে যে সে আগুন ভরি'
একটি ছোট মধুর সুরে ডাকে যখন শ্যামল হরি ।

সমালোচনা

দেশ-বিদেশের শিক্ষা—শ্রীজ্ঞানান্বেষী ; দাশগুপ্ত এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫৪-৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; পৃষ্ঠা ১৮০ ; মূল্য চার টাকা (সাধারণ সংস্করণ), পাঁচ টাকা (বিশেষ সংস্করণ)।

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার ক্রম ইত্যাদি অতি সহজভাবে আলোচিত হইয়াছে। ছদ্মনামী লেখক (শ্রীজ্ঞানান্বেষী) স্বয়ং একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ উপলক্ষে যখন তিনি আমেরিকায় ছিলেন, তখন সেখানে নানা দেশীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া গ্রীস, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সিরিয়া, হল্যাণ্ড, ব্রিটেন, পেরু, পশ্চিম জার্মানি, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের শিক্ষাপদ্ধতি-সম্পর্কে তিনি যে-সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তাহা পত্রাকারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বা হিতৈষীদের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাঁহার সেই সব লেখাই নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ ১৬টি রচনা গ্রন্থের অন্তর্গত দেখা যায়। বইখানি শিক্ষাসেবীদের নিকট খুবই হৃদয়গ্রাহী হইবে, সন্দেহ নাই। তবে কেবলমাত্র বিদেশের শিক্ষার কথাই লেখক তাঁহার এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন—দেশের কোন কথা ইহাতে নাই। এই দিক দিয়া গ্রন্থটির 'দেশ-বিদেশের শিক্ষা' নামকরণের সার্থকতা বুঝা গেল না।

মূল্য অনুপাতে পুস্তকের কাগজ ও বাঁধাই আরও উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিছু কিছু ছাপার ভুলও চোখে পড়ে। যাহা হউক, পুস্তকখানি শিক্ষানুরাগীদের অভিনন্দনযোগ্য।

—অজ্ঞানানন্দ

পরিব্রাজক : অজিতা দেবী ও কানাইলাল ঘোষ সঙ্কলিত। পৃঃ ২৯৩ ; মূল্য পাঁচ টাকা। প্রকাশিকা : ছবি ঘোষ। সুসাহিত্য-সংসদ, ২৬।২ বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩। প্রাপ্তিস্থান : অ্যাকাডেমিকা। ৫নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী প্রচারের শুভ সঙ্কল্প নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। বিবেকানন্দ জীবনের রূপরেখার মধ্য দিয়ে তাঁর বাণীসঙ্কলনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে সঙ্কলয়িতাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হয়েছে, সন্দেহ নেই।

কিন্তু গ্রন্থের নামকরণের দ্বারা পাঠকেরা কিছুটা বিভ্রান্ত হবেন। 'পরিব্রাজক' নামে স্বামীজীর যে গ্রন্থটি জনসাধারণের সুপরিচিত, তার সঙ্গে এ গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ নেই। 'পরিব্রাজক' নামকরণের দ্বারা সঙ্কলয়িতাদ্বয় কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা বোঝা গেল না ; তবে এ ধরনের নাম-বিভ্রাট না ঘটানোই ভালো।

ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন, 'এখন ব্যক্তিজীবনকে উপন্যাসের মত স্বাদনীয় করলে তবেই সাধারণ পাঠকের মন অধিকার করা সম্ভব হয়। এই গ্রন্থখানি সেই কাজই করেছে……।' এ গ্রন্থখানিতে জীবনীর উপাদান অতি সংক্ষিপ্ত, সে তুলনায় বাণীসঙ্কলনের প্রচেষ্টাই বেশী। তাই জীবনীসাহিত্য-হিসাবে এ গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেওয়া কঠিন। অপরপক্ষে, আধুনিক কালে উপন্যাসের মতো ক'রে জীবনীলেখার যে মনোভাব দেখা দিয়েছে, তার দ্বারা জীবনী-সাহিত্য কতটা সার্থকতা লাভ করছে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। 'পরমপুরুষ' বা

'বীরেশ্বরে'র জীবনী-উপন্যাস সমসাময়িক কালে যতই আদৃত হোক, জীবনী-হিসাবে তারা কখনই স্বীকার্য নয়। এ গ্রন্থের লেখিকা ও লেখক যে-সব অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিকে আরও নিপুণ তথ্য সমাবেশের দ্বারা ভবিষ্যৎ সংস্করণে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী (উপন্যাস নয়) গড়ে তুলবেন, এমন আশা করা অসঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে দু-একটি তথ্যবিভ্রমের প্রতি সঙ্কলয়িতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

পৃ: ২৬ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম-ধর্মগ্রহণপ্রসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে বিপিনচন্দ্র পালের নাম করা হয়েছে। বিপিনচন্দ্র পরবর্তী যুগের মানুষ এবং এ ঘটনার বহু পরে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। সে-সমাজ মহর্ষির আদি-ব্রাহ্মসমাজ নয়—পরবর্তী ভারতবর্ষীয় বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। পৃ: ১৬১ 'রাজযোগ বইখানি স্বামীজী এক শিষ্যকে দিয়ে লিখিয়ে-ছিলেন।' স্বামীজীর বক্তব্য একজন লিখে নিয়েছিলেন এবং স্বামীজী অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন—এ দুটো ঠিক এক কথা নয়। রাজযোগ স্বামীজীর নিজেরই রচনা। স্বামীজীর একমাত্র এই বইটির ভূমিকার শেষে 'গ্রন্থকার' (ইংরেজীতে Author) কথাটি লেখা আছে।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ঘরে চলো—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক : স্বামী অপর্ণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কুটীর, চিল্কাপেটা, আলমোড়া। পরিবেশক : মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ১৮৩; মূল্য টাকা ৪·৫০।

মানুষ স্বভাবতই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ; কিন্তু সে স্ব-স্বরূপকে ভুলিয়া, ক্ষুদ্র আমিত্বকে লইয়া সর্বদা 'আমি' ও 'আমার' করিতে করিতে কি মোহেই না পতিত হয়! মোহগ্রস্ত স্বার্থান্ধ মানুষ নিজেকে কখন সুখী, কখন বা দুঃখী ভাবিয়া কাল কাটাইতে থাকে; কিন্তু প্রকৃত আনন্দ পায় না। স্বার্থের সংঘাত হইলেই সে রিপুর অধীন হইয়া পড়ে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া নানা অনর্থ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এই দুর্লভ মানব-জীবনের উদ্দেশ্য স্ব-স্বরূপকে উপলব্ধি করা। স্বরূপের উপলব্ধি হইলে সকল সংশয়, শোক, মোহ, ভয় চলিয়া যায় এবং অনন্ত জ্ঞান ও অপার আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিতে পারিলে প্রাণে স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং ক্রমশঃ নির্ভীক, তেজস্বী, কুসংস্কারমুক্ত ও সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারা যায়। বর্তমানে আত্মবিজ্ঞানচর্চা বাঙালীর বিশেষ প্রয়োজন।

'ঘরে চলো' অর্থাৎ স্ব-স্বরূপকে উপলব্ধি করো। আপন স্বরূপের আহ্বানকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আত্মা কিভাবে সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে উদ্ঘাটিত করিতেছেন, তাহাই জানিতে হইবে; ঘরে ফিরিবার জন্য যে অবিশ্রান্ত ব্যাকুল আহ্বান আসিতেছে, তাহাই শুনিতে হইবে। আলোচ্য পুস্তকে সাহিত্যিকের অনবদ্য ভাষায় উপনিষদ বা বেদান্তে উপদিষ্ট আত্মজ্ঞানবিষয়ক ভাবগুলি নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে এই আহ্বান শুধু শোনা যায় না, অন্তর স্পর্শ করে :

ঘরে চলো, 'ত্রিপাদূর্ধ্বঃ', মানুষ তুমি কে? সে ও আমি, শব ও শিব, সত্য ও মিথ্যা, অস্তি ভাতি প্রিয়, 'শস্যমিব মর্ত্যঃ—', 'লাগ্ ভেলকি লাগ্', জীবন ও মুক্তি, বাস্তব মুক্তি, আমার আমি, মন ও আমি, দেহ ও বিদেহ, স্বপ্ন ও জাগরণ, দেবজন্ম, মায়া, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়,

এক, আনন্দ, জীবন ও মৃত্যু, দুই আমি, সাধনা, বনের বেদান্ত ঘরে।

ইহাদের অনেকগুলি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও পুনর্লিখিত হইয়াছে।

বইটি পড়িয়া সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরও বেদান্তে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা হইবে এবং দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, তাহারও একটা নির্দেশ এই গ্রন্থে রহিয়াছে।

কল্যাণ : (হিন্দী) ৩৬তম বর্ষের ১ম সংখ্যা সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণ-অঙ্ক। সম্পাদক —শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০৪; মূল্য টাকা ৭·৫০।

হিন্দী ভাষায় সনাতন ধর্মপ্রচারে 'কল্যাণ' পত্রিকার স্থান অতি উচ্চে। কল্যাণের পরিচালকমণ্ডলী প্রতি বৎসর একখানি করিয়া বিশেষ অঙ্ক প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইতিপূর্বে হিন্দুসংস্কৃতি-অঙ্ক, বিষ্ণুপুরাণ-অঙ্ক, সন্তবাণী-অঙ্ক, ভক্তি-অঙ্ক, মানবতা-অঙ্ক, দেবীভাগবত-অঙ্ক, তীর্থ-অঙ্ক যোগবাশিষ্ঠ-অঙ্ক প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

এই বর্ষে সংক্ষিপ্ত শিবপুরাণ-অঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছে। শিবপুরাণ শিবভক্তগণের অতি প্রিয় গ্রন্থ এবং ভক্তমাত্রেরই আদরণীয়। ইহাতে শিবস্বরূপ পরাৎপর ব্রহ্মের মহত্ত্বপূর্ণ বর্ণনা আছে। শিবপুরাণে ২৪ হাজার শ্লোকে ভগবান শিবের মহিমা, ভক্তবাৎসল্য, অবতার-কথা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের অভিন্নতা, যোগ-ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর আখ্যায়িকার মাধ্যমে বর্ণিত।

আলোচ্য বিশেষ-অঙ্কটিতে সম্পূর্ণ শিবপুরাণের বিষয় সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট হিন্দী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৩৮ খানি রেখাচিত্র এবং বহু রঙের ১৭টি চিত্র এই গ্রন্থের অলঙ্কার। পূর্ব-পূর্ব বর্ষের ন্যায় এই বিশেষ অঙ্কটিও সুন্দর ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ; ইহা গ্রন্থাগারের একটি অলঙ্কার বিশেষ।

মঞ্জরী (১৩৬৮): প্রকাশক—স্বামী সুখদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা ৬০ + ১২।

সারগাছি আশ্রমের বহুমুখী বিদ্যালয়ের 'মঞ্জরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সুনির্বাচিত ২৪টি বাংলা ও ৫টি ইংরেজী লেখায় এবং ৭টি চিত্রে সম্বলিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, পত্রিকাটি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ: সংস্কৃত-চর্চার প্রয়োজনীয়তা, মানবজীবনে প্রকৃতির প্রভাব, রসায়নগুরু প্রফুল্লচন্দ্র, Economic thoughts of Rabindranath, A straight line.

আমরা 'মঞ্জরী'র সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৬৮): প্রকাশক — শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৫৬।

কেবলমাত্র ছাত্রদের প্রবন্ধ ও কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। পঞ্চম হইতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণের রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইয়া পাঠকের মনে বিদ্যালয়ের সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ধারণা হইবে। পত্রিকাটি পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড়ঃ গত ২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) বৃহস্পতিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৭তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর কর্মসূচী সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। উপনিষদ্-আবৃত্তি, ঊষাকীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ-পূজা, হোম, দশাবতারের পূজা, ভোগারতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত'-পাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

অপরাহ্ণে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য ও স্বামী অজজানন্দ। সভাপতির ভাষণে স্বামী পুণ্যানন্দ বলেন: বর্তমানে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত-বাণীর যতটুকু অনুশীলন করিতে পারি, ততটুকুই মঙ্গল। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করার যে মহান্ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় নিহিত আছে, তাহাই অশান্ত বিশ্বের বিক্ষুব্ধচিত্ত মানুষের অন্তরে শান্তির সন্ধান দিতে পারে। উপনিষদের মধ্যে যে অমূল্য সম্পদ রহিয়াছে, তাহা আহরণ করিয়া মানব-কল্যাণে নিয়োগ করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও বাণীর সার্থক রূপায়ণই ব্যষ্টি-ও সমষ্টিজীবনে কল্যাণের প্রকৃষ্ট পথ।

সকাল হইতে অগণিত নরনারী মঠে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রায় ১০,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয়।

পরবর্তী রবিবার ১১ই মার্চ মহোৎসব-দিনে বেলুড় মঠ প্রাতঃকাল হইতেই এক অপরূপ মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন এবং সন্ধ্যায় বাজিপোড়ানো প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে দুই লক্ষের অধিক নরনারীর সমাবেশ হয়, তন্মধ্যে সহস্র সহস্র নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজ গত ১৩ই জানুআরি মহাসমাধি লাভ করায় তাঁহার স্থলে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গত ৭ই মার্চ তিনি বারাণসী হইতে বেলুড় মঠে আসিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ-জন্মোৎসব

ভুবনেশ্বর: গত ৬ই ফেব্রুআরি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শততম জন্মোৎসব সারাদিন-ব্যাপী একটি সুষ্ঠু কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়।

প্রত্যুষে শঙ্খধ্বনি ও শ্রীমন্দিরে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। তারপর কয়েকটি ভজন-সঙ্গীতের পর শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজাদি আরম্ভ হয়। পূজান্তে ভোগারতি ও হোম সম্পন্ন হয়। নীচে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরেও বিশেষ পূজা এবং ভোগাদি নিবেদিত হয়। হলঘরে প্রাতঃকাল হইতেই ভজন চলিতে থাকে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্যাণ্ডেলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গ সঙ্গীত-সহযোগে কথকতা করেন। ওড়িশ্যার রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত সুখঠঙ্কর উৎসব দর্শন করিতে মঠে আসেন।

দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রসাদ-বিতরণ হয়। প্রায় ৭,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ওড়িশ্যার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীরাধানাথ রথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বক্তৃতা করেন। সভান্তে কথকতা হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনের দ্বারা উৎসবের সমাপ্তি হয়। এই উপলক্ষে ওড়িশ্যার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বর: গত ২৮শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীসারদা মঠে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও কঠোপনিষৎপাঠ হয়। প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে নারী-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী নলিনী দাসের নেতৃত্বে একটি মহিলা-সভা হইয়াছিল। 'স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা 'আচার্য বিবেকানন্দ—যুগাচার্য' এই বিষয়টি শাস্ত্রীয় যুক্তি-সহকারে আলোচনা করেন। শ্রীমতী নলিনী দাস স্বামীজীর স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃত রূপটি কি ও আমাদের জীবন সেই নিঃস্বার্থ প্রেমের ভাবে উদ্দীপিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন।

কার্যবিবরণী

জামসেদপুর: বিবেকানন্দ সোসাইটির ৪০তম বর্ষের (জানু. '৬০—মার্চ '৬১) কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ: এই কেন্দ্র কর্তৃক ৫টি হাই স্কুল (২টি বালিকাদের), ৫টি মিডল স্কুল, ২টি উচ্চ প্রাথমিক, ১টি নিম্ন প্রাথমিক—মোট ১৩টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে। ১৯৬০ খৃঃ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ৪,০৪৩ ছাত্র ও ৩,২৯৮ ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে।

ছাত্রাবাস দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে ৩৪ জন বিদ্যার্থী ছিল। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,১০৮; পাঠাগারে ৩টি দৈনিক, ৪টি সাপ্তাহিক ও ১৭টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হইয়াছে। ১১টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৬,৪৬৫।

ক্লাস ও সভার মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শনবিষয়ে আলোচনা ও বক্তৃতা এবং শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, শ্রীশ্রীকালীপূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সেবাপ্রতিষ্ঠান (৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ২৬): এই কেন্দ্রের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬০—মার্চ '৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩২ খৃঃ শিশুমঙ্গল

প্রতিষ্ঠান নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ খৃঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতায় প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই কয়টি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে: স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, পরিচর্যা ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা-কেন্দ্র (Nurses' Training Centre) আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যাণ্ট, বৈদ্যুতিক লন্‌ড্রি, সার্জিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি এখানে আছে।

বর্তমানে হাসপাতালের মোট শয্যাসংখ্যা ২১০; আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে মোট ৫,৮৪৪ রোগী ভরতি হয়, তাহার মধ্যে ৪৮% ফ্রি চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগে নূতন ১৬,৩৮২ এবং পুরাতন ২২,৭২৫ রোগী ফ্রি চিকিৎসা লাভ করে।

আলোচ্য বর্ষে ৪২ জন ছাত্রী ধাত্রীবিদ্যা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫ জন উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়াছে। মোট শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ৯৪। শিক্ষাপ্রাপ্তা সকলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হইয়াছে।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের একটি নূতন পাঁচতলা ভবন নির্মাণের কার্য চলিতেছে, এখানে ১৫০টি শয্যার ব্যবস্থা থাকিবে এবং চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান ফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ১৫ই নভেম্বর বুধবার স্বামী অশেষানন্দ এবং স্বামী সৎপ্রকাশানন্দও বেদান্ত-সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

অক্টোবর: ইন্দ্রিয়াতুগ জীবন, কৃষ্টি ও শাশ্বত শক্তি; ঈশ্বর, মানুষ ও বিশ্ব; শ্রীকৃষ্ণের দুই জীবন; স্বামী বিবেকানন্দ যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; কর্মরূপে ধ্যান ও ধ্যানরূপে কর্ম; নূতন মন্দিরের স্মৃতি-বার্ষিকী; প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অদৃশ্য জগতের সংযোগ; অন্তরের শান্তি; ধর্ম ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি।

নভেম্বর: অতীন্দ্রিয় অনুভূতি; কর্ম ও পুনর্জন্ম; শক্তি—যা জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করে; আধ্যাত্মিকতার বিবিধ অনুষ্ঠান: তাহাদের আপেক্ষিক মূল্য; আমাদের দর্শন ও ধর্ম; 'আত্মা'-রূপে জীবনধারণ কর, মন বা দেহ-রূপে নয়; গার্হস্থ্য-জীবনের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানসমূহ; মৃত্যুর পরে কি? স্বামী বিবেকানন্দের কার্যক্রম: ইহা কি ফলপ্রসূ হইয়াছে?

ডিসেম্বর: ঈশ্বরকে ভালবাসিতে কিভাবে শিখিতে পারি? কর্ম ও অদৃষ্ট; আমার দর্শন ও আমার ধর্ম; শব্দ-প্রতীকের মাধ্যমে ধ্যান; একজন ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ হইতে যাহা শিখিয়াছি; ঈশ্বর কি সত্যই মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন? কেন আমরা খৃষ্টের উপাসনা করি?

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে সজনীকান্ত দাস

স্বনামখ্যাত কবি সমালোচক ও সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস গত ৯ই ফেব্রুআরি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিলাম। সজনীকান্তের সাহিত্যপ্রতিভা সর্বজনবিদিত। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক-রূপেই বাংলা সাহিত্যজগতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য সংযোজন; আজীবন ইহার সম্পাদনার মাধ্যমেই তিনি বঙ্গভারতীর যে সেবা করিয়াছেন, তাহা বাঙালী চিরদিন মনে রাখিবে। অনুসন্ধান, গবেষণা এবং সমালোচনা সাহিত্যে তিনি যে প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গভাষায় এক নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই বলিষ্ঠ সমালোচকের জীবনাবসানে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার দেহমুক্ত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি, তাঁহার ও ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি।

পরলোকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

স্বনামধন্য সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ গত ১৫ই ফেব্রুআরি তাঁহার কলিকাতায় বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। সাংবাদিকতার বাহিরেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার রচনা যথেষ্ট মূল্যবান্। তাঁহার বাংলা ও ইংরেজী উভয় রচনাতেই বলিষ্ঠতা ছিল। জাতীয় জীবনের বহু আন্দোলনের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের অর্ধশতাব্দীর জাতীয় জীবনের ঘটনা ও ইতিহাসের প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা ছিলেন, তাঁহার লেখায় ও বক্তৃতায় বিশেষজ্ঞ গবেষকের চিন্তাভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত হইত। দীর্ঘকাল তিনি 'বসুমতী'র সহিত সংযুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার তিনি একজন চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

উৎসব-সংবাদ

শিকড়া-কুলীনগ্রাম: স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শততম জন্মোৎসব তদীয় পুণ্য জন্মস্থান শিকড়া-কুলীনগ্রাম-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে গত ৬ই হইতে ১১ই ফেব্রুআরি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষপূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, কীর্তন, রামনাম, গীতাব্যাখ্যা, 'কথামৃত' পাঠ, তুলসীদাসী-রামায়ণ-গান, শ্রীশ্রীমহারাজের উপদেশ-পাঠ, তীর্থপরিক্রমা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

উৎসবের শেষদিন মধ্যাহ্নে প্রায় ৪,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ-প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। রাত্রে যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। বহু সাধু ও ভক্তের সমাগমে পল্লীগ্রামটি আনন্দমুখর হইয়া উঠে।

বারাসত : গত ২৮শে জানুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পূজাপাঠ ভজন ও বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা হয়।

জব্বলপুর : গত ২৯শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মোৎসব পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, নাম-সংকীর্তন, 'কথামৃত'-পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ২৮শে জানুআরি স্বামীজীর শততম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রম কর্তৃক দুইটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং পুস্তকালয় পরিচালিত হয়। প্রতি বর্ষে চিকিৎসিতের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০।

তেজপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে চণ্ডী ও গীতাপাঠ, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবনী ও কথা আলোচিত হয়।

ভিত্তিস্থাপন

কলিকাতা : গত ২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথিতে প্রাতঃ ৯-৩০ মি. ১৫১নং বিবেকানন্দ রোডে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ কর্তৃক **বিবেকানন্দ সোসাইটির** বিবেকানন্দ-স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পূজা ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু সাধু ও ভক্ত এবং সোসাইটির প্রাচীন সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাবুগঞ্জ : বিগত ১৪ই ফেব্রুআরি বুধবার হুগলি-চুঁচুড়া শহরের কেন্দ্রস্থল বাবুগঞ্জ রথতলায় যথারীতি ধর্মানুষ্ঠানের সহিত বিশিষ্ট সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে পণ্ডিত সতীনাথ বিদ্যাভূষণ পঞ্চতীর্থ হুগলি জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে 'বিবেকানন্দ-ভবন'-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নির্বাচন-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য

সমগ্র ভারতে	লোকসভা	বিধানসভা
আসন	৫০৭	৩,১২৬
প্রতিদ্বন্দ্বিতা	৪৯৪	২,৮৮৪
প্রার্থী	১৯৮০	১২,৭৬৪
লোকসংখ্যা	৪৩,৮০,০০০০০	
ভোটদাতার সংখ্যা	২১,০০,০০০০০	
নারী " "	১০,০০,০০০০০	

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন··· ৩৩,৯২৮ বর্গমাইল

জনসংখ্যা ···	৩৪,৯৬৭,৬৩৪
ভোটসংখ্যা ···	১ কোটি ৭৮ লক্ষ
বিধানসভার আসনসংখ্যা	২৫২
প্রার্থী-সংখ্যা ···	৯৬০
লোকসভার আসনসংখ্যা	৩৬
প্রার্থী সংখ্যা ···	১১২
ভোটগ্রহণ-কেন্দ্র ···	২১,৫০০
নির্বাচন-পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কর্মচারী-সংখ্যা	৭০,০০০
নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা	১৮

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবনির্বাচিত বর্তমান অধ্যক্ষ

বুদ্ধ

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

একটি হৃদয়,
শতদল হয়ে ওঠে
ব্যাপ্ত বিশ্বময়।

এক তরু থেকে
সমস্ত পৃথিবী-ভরা
ছায়া গেছে রেখে।

একটি পূর্ণিমা,
জীবন-মৃত্যুর পারে
অমর মহিমা!

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

(সংক্ষিপ্ত পরিচিতি)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ১৮৮২ খৃঃ জুলাই মাসে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুরুপ গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার অবুঝহাটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত সিংহ-রায় পরিবার তাঁহার পৈতৃক বংশ। পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ। বাল্যকালেই পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় তিনি ধর্মপ্রাণা মাতামহীর স্নেহযত্নে বর্ধিত হন। আশৈশব দেবদ্বিজে ভক্তি, গুরুজনদের প্রতি বিনয়-নম্র শ্রদ্ধা, ছোট-বড় সকলের সহিত প্রীতি-মধুর ব্যবহার এবং সর্বোপরি তাঁহার অন্তর্মুখীন শান্ত প্রকৃতি—তাঁহাকে শুধু যে সকলের প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা নহে, তাঁহার অসাধারণ ভবিষ্যতেরও ইঙ্গিত দিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ শহরে নবাব বাহাদুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় (বর্তমান ৮ম) শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ শেষ করিয়া তিনি হাওড়া জেলার বাঁ্যাটরা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। বিধাতার অলক্ষ্য নির্দেশে—১৯০১ খৃঃ প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষার পরই তাঁহার জীবনের গতি এক নূতন পথে ধাবিত হয়। অন্তরের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল—বৈরাগ্যের আকুল আহ্বান মনকে এতই আলোড়িত করিতেছিল যে, সংসারের মায়িক রূপ বা অর্থকরী বিদ্যার চাকচিক্য তাঁহার চিত্তকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারিল না। মানবজীবনের চরম সার্থকতা কোন্ পথে, এই জিজ্ঞাসা লইয়া তাঁহার তরুণ মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল।

এইকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে (তখন মেটকাফ্ হলে অবস্থিত) গিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে স্বীয় জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধানে বহু সময় তিনি কাটাইতেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তদানীন্তন অধ্যক্ষ জন্ ম্যাকফারলেন (John Macfarlane) জিজ্ঞাসু বালকের অনুসন্ধিৎসা মিটাইতে তখন যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মের এক দ্বিপ্রহরে—ক্লান্ত দেহে অস্থির মনে একদিন যখন এই লাইব্রেরী-কক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা দৈবক্রমে একখানি গ্রন্থের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, ম্যাক্সমুলার-রচিত 'Ramakrishna—His Life and Sayings'। বইটির দুই-একপাতা উল্টাইতেই আনন্দে বিস্ময়ে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। পুস্তকের একটি পঙ্ক্তি—'Dakshineswar is situated four miles to the north of Calcutta' তাঁহাকে পথের সন্ধান দিয়াছিল। এইভাবে ম্যাক্সমুলারই সর্বপ্রথম অধ্যাত্ম-পথের এই তরুণ যাত্রীকে তাঁহার লক্ষ্য-স্থলের ঠিকানা জানাইয়াছিলেন। ইহা ১৯০৩ খৃঃ কথা।

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু হইল—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-তীর্থ পঞ্চবটীতলে সংসার-বিরাগী তরুণ সাধক তাঁহার বহুবাঞ্ছিত সত্য-লাভের জন্য ধ্যান-ধারণা করিতে লাগিলেন; সপ্তাহে কয়েকদিন করিয়া দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতে থাকিলেন। ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরিচয় হইলে তাঁহার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাকথা শুনিয়া ভক্তিমান্ বালকের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় বা 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-কার 'শ্রীম'র

(শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের) সাহচর্যও তিনি এইকালে লাভ করিয়াছিলেন। বালকের ঐকান্তিকতা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ও সস্নেহে তাঁহার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের অনুপ্রেরণা জোগাইতে থাকিলেন। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত ক্রমে পরিচয় হওয়ায় তাঁহার মুখে স্বামীজীর অলৌকিক জীবন-কাহিনী শুনিয়া বালকের মন-প্রাণ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল।

১৯০৬ খৃঃ পর্যন্ত এইভাবে চলিয়াছিল। একটি ঘটনা তরুণের হৃদয়তন্ত্রীতে এক অশ্রুত-পূর্ব সুরের ঝঙ্কার তুলিল। শরৎবাবু শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন—'মা কেমন আছেন?' শরৎবাবুর মুখে এই 'মা' শব্দটি শোনামাত্র বালক উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছিল—কত জন্মের আকাঙ্ক্ষিত একাক্ষর এই শব্দটি তাঁহার সমগ্র সত্তাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। যেন তিনি নূতন এক জীবন লাভ করিলেন। কে এই মা? কোথায় সেই মা? শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাসঙ্গিনী জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ঠিকানা অবশেষে মিলিয়াছিল—শ্রীরামলাল চট্টোপাধ্যায়ই শ্রীধাম জয়রামবাটীর পথের নিশানা বালককে বলিয়া দিয়াছিলেন।

মাতৃনামের দুর্নিবার আকর্ষণে ব্যাকুল হইয়া অবশেষে একদিন তিনি পথে নামিয়া পড়িলেন। তখন ১৯০৬ খৃঃ ডিসেম্বর। বর্ধমানের পথে যাত্রা করিয়া তথা হইতে শ্রীধাম কামারপুকুর পরিক্রমান্তে জয়রাম-বাটীতে তিনি মাতৃচরণে উপনীত হইলেন।

'কেমন আছ, বাবা? এতটা পথ আসতে কষ্ট হয়নি তো?'—সহজ সরল মাতৃকণ্ঠের এমন মাধুর্য ও এত আকর্ষণ বুঝি পূর্বে কখনও অনুভূত হয় নাই। সন্তানবৎসলা প্রতীক্ষমাণা জননীর হৃদয়-উৎসারিত এই দুইটিমাত্র কথাতেই সন্তানের দেহ-মনে নূতন এক বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিয়া গেল। জন্ম-জন্মান্তরের এমন মা কেন এতদিন ধরা দেন নাই, মায়ের অপার্থিব করুণার স্পর্শে পথশ্রান্ত সন্তানের সকল সংশয়, শঙ্কা ও সঙ্কোচের চির অবসান হইল। আলোক-অন্ধকারময় সংসারের নানা কুটিল-বন্ধুর পথ পার হইয়া কত উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে কাল কাটাইয়া মাতৃহারা বালক আজ মাতৃ-সন্নিধি লাভে ধন্য হইলেন। শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়া তাঁহাকে মহামন্ত্র প্রদান করেন। সে-বার প্রায় এক সপ্তাহ মাতৃ-সান্নিধ্যে বাস করিয়া কয়েক-মাস পরেই তিনি আবার জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তরুণ তাপসের অন্তরে বৈরাগ্যের বহ্নি তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গৃহত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল বন্ধনকে পশ্চাতে ফেলিয়া, কলিকাতা হইতে পদব্রজেই তিনি মাতৃসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সমভাবের ভাবুক দুই-জন গুরুভ্রাতাও সহযাত্রী ছিলেন। বৈরাগ্যদৃপ্ত যুবকের মুখে-চোখে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতিচ্ছবি—শ্রীশ্রীমায়ের আশিস্ মাথায় লইয়া পরিব্রাজক-রূপে ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিবেন এবং কোন মঠ বা আশ্রমে বাস না করিয়া কোন একান্ত স্থানে ভগবদ্‌ভজনে জীবনপাত করিবেন—সন্তানের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় পাইয়া জননী-হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল—এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া দেহপাত করিতে মা নিষেধ করিলেন। কিন্তু ভাবী পরিব্রাজকের তীব্র বৈরাগ্যে প্রসন্না হইয়া শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী দুইজনকে সন্ন্যাসীর পরমবাঞ্ছিত গৈরিক প্রদান করিয়া করুণাসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—'ঠাকুর, এদের সন্ন্যাস রক্ষা ক'রো। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, যেখানেই থাকুক না কেন, এদের তুমি দেখো।' কাশীতে মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দ-জীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নির্দেশে সন্ন্যাস-জীবন গড়িয়া

তুলিবার আদেশও মা দিয়া দিলেন। ইহা ১৯০৭ খৃঃ জুলাই মাসের ঘটনা।

শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয়ে মাসাধিক কাল কাটাইয়া নবীন সন্ন্যাসিত্রয় কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন—জননীও অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে সন্তানদের যাত্রাপথে অমোঘ আশীর্বাদ সিঞ্চন করিয়াছিলেন।

মাধুকরী ভিক্ষা মাত্র সম্বল করিয়া তিনমাস কাল পদব্রজে চলিয়া তাঁহারা কাশীধামে উপনীত হইলেন এবং তথায় স্বামী শিবানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈতাশ্রমে প্রায় এক বৎসরকাল সাধন-ভজনে কাটাইলেন। ১৯০৮ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যখন বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে তথায় গমন করেন, তখন তিনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দকে মাদ্রাজ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর নিকট কর্মী-রূপে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নির্দেশেই বাঙ্গালোর আশ্রমে ১৯০৯ হইতে ১৯১৫ খৃঃ পর্যন্ত সেবা-কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া সাধন-ভজনার্থে পুনরায় কাশীধামে আসিয়া এক বৎসর অবস্থান করেন।

পরে ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করিয়া স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী-রূপে হিমালয়ে গমন করেন। এই আশ্রম আলমোড়া জেলায় হিমালয়ের বক্ষে অবস্থিত। বলাবাহুল্য তুষার-মৌলি হিমাদ্রির ধ্যানগম্ভীর অপূর্ব শোভা স্বভাবতই তাঁহার মনকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া তোলে। এইরূপ নির্জন তপস্যানুকূল স্থানে তিনি প্রায় চার বৎসর সাধন-ভজনে ও আশ্রমবিহিত নানাবিধ কার্যে নিযুক্ত থাকেন।

অতঃপর তিনি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পুণ্য সান্নিধ্যে কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে কিছুকাল থাকিবার সুযোগ লাভ করেন। ১৯২২ খৃঃ হইতে তিনি সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম পরিচালক (Trustee and member of the Governing Body)-রূপে মনোনীত হন। ব্রহ্মানন্দজীর মহাসমাধির পর তিনি পুনরায় দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন এবং ১৯২৬ খৃঃ অধ্যক্ষরূপে কিছুকাল ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থান করেন।

পরে তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশানুযায়ী রাঁচি মোরাবাদী পাহাড়ের জনবিরল পাদদেশে একটি নূতন আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন এবং তথায় ১৯২৭ হইতে ১৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজন ও লোককল্যাণকর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারই প্রেরণায় ও প্রভাবে কালক্রমে মোরাবাদীর সুন্দর আশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইতিমধ্যে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজীর অধ্যক্ষতা কালে ১৯৪৭ খৃঃ স্বামী অচলানন্দজীর দেহত্যাগ হইলে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ (Vice-President) নিযুক্ত হন। ১৯৫১ খৃঃ হইতে কয়েকবার তিনি বাংলা, বিহার, আসাম, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ, নাগপুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাব ও বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে অবিরাম পরিভ্রমণ করেন। নিষ্কাম কর্ম ও নিরবচ্ছিন্ন উপাসনার সমন্বয়ে গঠিত তাঁহার জীবন নানাদেশের অগণিত ধর্মপিপাসুর প্রাণে আনন্দ ও শান্তি দিতেছে। এইরূপ পরিভ্রমণকালে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণাবলী সঙ্কলিত হইয়া 'সৎপ্রসঙ্গ' নামে পুস্তকাকারে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও অক্লান্তভাবে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধনে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর তিরোধানের পর, স্বামী বিশুদ্ধা-নন্দজী প্রায় অশীতিবর্ষ বয়সে গত ৬ই মার্চ হইতে সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে বৃত হইয়াছেন।

লোককল্যাণব্রতী এই মহনীয় সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ তথা দেশবাসী যথার্থ কল্যাণের পথে অনুপ্রাণিত হউক এবং তাঁহার সাধনপূত দেহ মানবকল্যাণে আরও দীর্ঘকাল নিয়োজিত থাকুক—ইহাই সকলের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

কথাপ্রসঙ্গে

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষা হইবে, এ বিষয়ে পৃথিবীর কোথাও কোন দেশে দ্বিমত নাই, তথাপি অত্যন্ত দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয় যে আজকাল আমাদের দেশে বহু পিতা-মাতা (বিশেষভাবে পিতারাই) সগৌরবে ঘোষণা করেন, তাঁহাদের ছোটছোট ছেলে-মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে ইওরোপীয়ান স্কুলে শিক্ষিত হইতেছে। কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, 'ছেলেমেয়েরা ওখানে ডিসিপ্লিন, স্মার্টনেস, ইংরেজী কনভারসেশন শিখিবে। বর্তমান যুগে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য ঐগুলি একান্ত দরকার। দেশীয় ভাষার মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয় পরিচালিত হয়, সেগুলিতে নিয়মিত পড়া দেওয়া-নেওয়াই হয় না, সৎশিক্ষা তো দূরের কথা।' এরূপ সমালোচনার সত্যাসত্য আমরা বিচার করিব না, শুধু দেশবাসীকে চিন্তা করিতে বলিব, ইহা যদি সত্যই হয়, তবে আমাদের করণীয় কী? ঐ সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধন, অথবা ঐগুলি বর্জন করিয়া, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্মগত অধিকার হইতে সন্তানগণকে বঞ্চিত করিয়া ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে তাহাদিগকে প্রেরণ করা? পৃথিবীতে আর কোন স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ আছে কি, যেখানে আত্মসম্মানসম্পন্ন দেশবাসী এরূপ ব্যবস্থা সমর্থন করেন?

প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম কি, এই প্রবন্ধে তাহা আলোচ্য বিষয় নহে, কারণ তর্কের অতীত রূপে নির্ণীত হইয়াছে —সংবিধানেও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে, মাতৃভাষাই উহার মাধ্যম; তথাপি ইহার শোচনীয় ব্যতিক্রম যে দেশের ভবিষ্যতের ভিত্তি শিথিল করিতেছে, ভাবী নাগরিকগণের জাতীয় জীবনাদর্শ দুর্বল করিতেছে—এ বিষয়ে অনেকেই অবহিত নহেন বলিয়া বিষয়টি উত্থাপিত হইল। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম এখনও তর্কের বিষয়বস্তু হইয়া রহিয়াছে, এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইংরেজীর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রায় সমতুল্য বলিয়া ব্যাপারটি এখনও স্থিতাবস্থ হইয়া রহিয়াছে। তথাপি এইবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (Convocation) সমস্যাটি সহসা আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

উৎসবের প্রথম দিনে (২৪শে মার্চ) জাতীয় অধ্যাপক (National Professor) শ্রীসত্যেন্দ্র-নাথ বসু যাহা বলেন তাহার মর্মার্থ: উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্রীয় ব্যাপার, অতএব একই প্রকার মান (Standard) রক্ষার জন্য একই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হওয়ায় এখনও ইংরেজী চলিতেছে; কিন্তু এরূপ চলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে বাধা। ইহাতে না বুঝিয়া মুখস্থ করাকেই উৎসাহিত করা হয়; স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনীশক্তি দমাইয়া দেওয়া হয়। যদি আধুনিক ভাবধারা দেশে ছড়াইতেই হয়, যদি শিল্পের উন্নতি করিতেই হয়, তবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই উহা শীঘ্র এবং সহজে হইবে, নতুবা আমাদিগকে বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইবে। এই সকল যুক্তি ও তথ্য সহায়ে তিনি সাহসের সহিত বলেন, শিক্ষার সর্বস্তরে আঞ্চলিক মাতৃভাষাকেই মাধ্যম করা উচিত।

পরদিনের (২৫শে মার্চ) উৎসবে যেন

ইহারই উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (Vice-Chancellor) শ্রীসুরজিৎ লাহিড়ী সমান জোরের সহিত বলেন: বর্তমান অবস্থায় ইংরেজীর স্থানে হিন্দী বাংলা বা অন্য কোন ভাষা বসাইলে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হইবে। তিনি তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলেন, বিশেষত আইনের ক্ষেত্রে তিনি তো ভাবিতেই পারেন না, হিন্দী বা বাংলা কি করিয়া ইংরেজীর স্থান অধিকার করিবে!

এই দুই বিপরীত মন্তব্যের ফলে বিষয়টি নূতন করিয়া বিতর্কের আবর্তে পতিত হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনের উৎসবে মাননীয়া প্রধান অতিথি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ যাহা বলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য: এখনও কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী চালু থাকা দরকার। এই বিজ্ঞানের যুগে পৃথিবী আমাদের ঘরে আসিয়া পড়িতেছে, নিকট প্রতিবেশীকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে দূরের প্রতিবেশী বিদেশীকেও ভালবাসিতে হইবে; তাহাদের ভাষাও শিখিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশেও ছাত্রদের দুইটি অতিরিক্ত ভাষা শিখিতে হয়। আন্তর্জাতিক ভাষা-হিসাবে ইংরেজী রাখিয়া দিলে ক্ষতি কি? এই ভাষা-সহায়ে পৃথিবীর আলো আমাদের দেশে আসিতেছে। যন্ত্রবিজ্ঞানেও উচ্চশিক্ষার চাবিকাঠি ইংরেজী ভাষা। প্রাথমিক স্তরে অবশ্য মাতৃভাষাই মাধ্যম।

ভাষাদ্বন্দ্বের পর যে বিষয়টির প্রতি শ্রীমতী পণ্ডিত শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, সেটি আরও মনোযোগ দাবি করে। স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে দেশে শিক্ষাবিস্তারের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে সংখ্যাগত দিকটা দেখাইতে আমরা যতটা উৎসুক—গুণগত উন্নতির জন্য ততটা আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়িতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বছর বছর বাড়িতেছে; ছাত্রসংখ্যাও বাড়িতেছে। কিন্তু শিক্ষার উৎকর্ষ কমিতেছে, 'দরদী শিক্ষক' আজ অতীতের স্মৃতিকথায় পর্যবসিত হইতে বসিয়াছেন।

শ্রীমতী পণ্ডিত তাঁহার আর একটি মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা পরিবেশন করিয়াছেন: বিদেশে, বিশেষত ইংলণ্ডে যে ভারতীয়েরা যায়, তাহারা যে-ইংরেজী ভাষায় কথা বলে, তাহা দুর্বোধ্য, শুধু উচ্চারণের জন্যই নয়—ভাষা-হিসাবেও তাহা না ইংরেজী, না অন্য কিছু। মাতৃভাষা ও নিজস্ব কৃষ্টি আয়ত্ত করিয়া বিদেশে গেলে তবেই ছাত্রেরা লাভবান্ হইতে পারে, নতুবা নয়!

দেশে আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনই অবস্থা হইয়াছে, সামান্য (এবং ভুল) ইংরেজী যে বলিতে বা লিখিতে পারে, তাহাকেও আমরা একজন সংস্কৃতভাষায় যথার্থ পণ্ডিত অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত মনে করি! ইহা কি স্বাধীন জাতির মনোভাব, না দাসমনোভাব, না কালের প্রভাব!! কালের প্রভাবের অর্থ কি আর্থনীতিক কার্যকারিতা? তবে তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন এম.এ-পাস শিক্ষক অপেক্ষা একজন নিরক্ষর মিস্ত্রি বা মেকানিক বেশি অর্থ উপার্জন করিতেছে! শিক্ষার মান ও মূল্য নির্ধারণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। একদা সংস্কৃতই ছিল শিক্ষিতের মান ও মর্যাদা। পরবর্তী যুগে পারসী সে মর্যাদা ভোগ করিয়াছে। ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত ইংরেজী সেই মর্যাদার অধিকারী ছিল; কিন্তু আজ ইংরেজীর পক্ষে যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের মনোভাব নিরপেক্ষভাবে বিচার

করা উচিত। ইংরেজীর বিপক্ষে যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের মনোভাব অতি সহজ ও সরল: ইংরেজী বিদেশী ভাষা, ইংরেজী আমাদের প্রাক্তন শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষা—জোর করিয়া আমাদের উপর চাপানো হইয়াছিল, অতএব প্রথম সুযোগেই আমাদের কর্তব্য ঐ ভাষাকে বর্জন ও বিসর্জন করা। এইরূপ মনোভাব খুব স্বাভাবিক; কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়াই সুচিন্তিত নয়।

অন্যদিকে দেখা যায়, যাঁহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরেজ চলিয়া গেলেও ইংরেজীকে যাইতে দিতে রাজী নন; তাহার একাধিক কারণ আছে। তাঁহারা সযত্নে ইংরেজী শিখিয়াছেন এবং ইংরেজীতে অভ্যস্ত বলিয়াই যে তাঁহারা ইংরেজীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চান, তাহা নহে। ইংরেজী যে আমাদের শাসক ইংরেজদের ভাষা ছিল বলিয়াই উহা বর্জনীয়—ইহা কোন যুক্তি নয়, কারণ ইংরেজী শুধু ইংরেজেরই ভাষা নয়, উত্তর আমেরিকার এবং অস্ট্রেলিয়ারও ভাষা। ইংরেজী মাধ্যম আফ্রিকা-এশিয়ার হাটে বাজারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ সচল। ইওরোপেও ক্রমশঃ ইংরেজীর ব্যবহার বাড়িতেছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পক্ষে ইংরেজী বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না—এইরূপই মনে করেন ইংরেজীর সমর্থকগণ।

ইহার উত্তরে বলা যায়—যন্ত্র বা বিজ্ঞান এ যুগের একটা বিশ্বজনীন ব্যাপার, ইহা কোন জাতির, দেশের বা ভাষার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইওরোপের সকল জাতি ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করে না। নিজ নিজ ভাষাতেই উহা করিয়া থাকে, এশিয়ায় জাপানও ঐরূপ করিয়াই বিজ্ঞানে এত উন্নতি করিয়াছে; আমরাই বা করিব না এবং পারিব না কেন?

বলা হয়, বিজ্ঞানের সকল শব্দের অনুবাদ সম্ভব নয়, এবং অনূদিত শব্দগুলির উচ্চারণ দুরূহ এবং অনেক স্থলে ঐগুলি কোন অর্থই বহন করে না। তাহার সহজ উত্তর—সকল পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন, মোটর, ডায়নামো, ইঞ্জিন, ইলেক্ট্রন—এগুলি সকল ভাষাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইংরেজীতেও এগুলি সৃষ্ট শব্দ (coined words)।

মিডিয়াম বা মাধ্যম বলিতে বুঝি, কোন্ ভাষায় শিক্ষক ছাত্রদের বিষয়টি বুঝাইয়া দিবেন, এবং ছাত্রই বা কোন্ ভাষায় পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিবে, নিশ্চয়ই মাতৃভাষায়। গণিতের কথাই ধরা যাক্: বিজ্ঞানের জগতে গণিত একটি বিশ্বজনীন ভাষা, উহা না ইংরেজী না জার্মান, না ল্যাটিন না গ্রীক; উহার নিজস্ব রীতিনীতি, ব্যাকরণ, বাক্যগঠন-পদ্ধতি, যুক্তি সিদ্ধান্ত—সবই রহিয়াছে। কিন্তু বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝিবার জন্য—মাতৃভাষা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। নতুবা অধিকাংশ স্থলে ছাত্রকে মনে মনে তর্জমা করিয়া লইতে হয়। তাহাতে সময় এবং মানসিক শক্তি—দুয়েরই অপব্যবহার হইয়া থাকে।

অবশ্য সহসা কিছুই করা উচিত নহে, উত্তরপ্রদেশের দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ পরিবর্তন করিয়া সুফল লাভ করে নাই। তাহাদের আবার ইংরেজী-মাধ্যমে ফিরিয়া আসিতে হইতেছে। এ বিষয়ে প্রধান অভাব পাঠ্য-পুস্তকের। দেশীয় ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক রচিত হইলে ঐ সকল ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইবে, না—ঐ সকল ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলে পাঠ্য-পুস্তকও রচিত হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর—সেই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরের মতো—

বীজ আগে, না বৃক্ষ আগে? ধীরে ধীরে মাতৃভাষা মাধ্যম হইলে উচ্চতর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে পাঠ্য-পুস্তকও রচিত হইবে; তবে পরীক্ষামূলক ভাবে অগ্রসর এবং পরিণত ভাষাগুলিতে এখনই এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন, নতুবা এ কাজ ক্রমশঃ স্থগিত হইয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য পরিভাষা কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানে এখনই প্রস্তুত করা কর্তব্য। সারা ভারতে বিভিন্ন ভাষায় পারিভাষিক শব্দগুলি যথাসম্ভব একই হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

যাঁহারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চ শিক্ষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিলে জাতীয় সংহতি ব্যাহত হইবে এবং বহির্জগতের সহিত আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য—জাতীয় সংহতি যদি ইংরেজী ভাষার উপরই নির্ভর করে (যদিও অনেকে তাহা মনে করেন না), তবে ইংরেজী অবশ্য শিক্ষণীয় দ্বিতীয় ভাষারূপে থাক্। আর দেশ-বিদেশের সহিত রাজনৈতিক বা কৃষ্টিগত সম্পর্ক যাঁহারা স্থাপন করিবেন—তাঁহারা ইংরেজী অবশ্যই শিখিবেন, কিন্তু সে কয়জন? ঐ কারণে জনসাধারণ ও শিশুগণকে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কখনই ঠিক হইবে না। ভাষাশিক্ষার জন্য যাহারা পিছাইয়া পড়িল, ইংরেজী ভাষা যাহারা শিখিতে পারিল না, তাহাদের নিকট উচ্চ শিক্ষার দ্বার চিরতরে বন্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা কোন স্বাধীন এবং আত্মসম্মানশীল রাষ্ট্রে অকল্পনীয় ব্যাপার।

ইওরোপে দেখা যায়, ১৬শ শতাব্দীতে যখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু হইল, তাহার পর হইতেই শিক্ষাবিস্তার ও স্বাধীন চিন্তা শুরু হয়, সৃজনীপ্রতিভা উদ্বুদ্ধ হয়,—এই যুগ ইওরোপের 'নবজন্মের যুগ' বলিয়া কথিত, প্রাচীনকে ভুলিয়া নয়, অন্য দেশ ও তাহার ভাষাকে অস্বীকার করিয়া নয়, পরন্তু গ্রীস রোমের সাহিত্য স্বচ্ছন্দভাবে অনুবাদ করিয়া, প্রাচীন কৃষ্টি পরিপাক করিয়া ইওরোপ উন্নত হইয়াছে। জার্মান ইংরেজী ফরাসী ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইতেছে। আজ রাশিয়ান ভাষাও এই অনুবাদের প্রতি-যোগিতায় যোগ দিয়াছে, আর ভারতে? আমরা কয়জন নিকটতম প্রতিবেশীর ভাষা শিক্ষা করি, ভারতীয় ভাষায় পরস্পরের পুস্তক অনুবাদ করি? মনে হয়, ইংরেজীর প্রতি অনাবশ্যক মোহ কাটিয়া গেলে আমরা মাতৃ-ভাষাকেও ভালবাসিতে শিখিব, এবং ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে অন্ততঃ দু-একটি শিখিবার সময় ও সুযোগ লাভ করিব; ইহা অবশ্যই জাতীয় সংহতির সহায়ক।

ইংরেজী ভাষা আমরা অবশ্যই ব্যবহার করিব, কিন্তু প্রয়োজনের যন্ত্র-হিসাবে, যেমন ব্যবহার করি ইওরোপ-আমেরিকায় প্রস্তুত নানা যন্ত্রপাতি। ইংরেজীতে চিন্তা করিবার, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিবার উনবিংশ শতাব্দীর মোহ কাটাইতে না পারিলে আমাদের প্রত্যেকটি জাতীয় ভাষার উন্নতি পিছাইয়া থাকিবে। ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ও স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টা বাস্তবে রূপায়ণের জন্য জনগণ আগামী দিনের কোন শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাবের অপেক্ষায় দিন গণিবে।

গীতা—দ্বিতীয় বক্তৃতা

স্বামী বিবেকানন্দ

(১৯০০ খৃঃ ২৮শে মে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ)

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আধিপত্য লাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা—কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পাণ্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এতদিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতেও রাজী হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুরা—এক পক্ষে কৌরব ভ্রাতৃগণ, অপর পক্ষে পাণ্ডবেরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে জ্ঞাতি বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া তাহাদিগকে বধ করিবার কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্র ত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুতঃ এইখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি, আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

'হে ভারত (অর্জুন) ওঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।'[১]—এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার সূচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেন: প্রতিরোধ করা অপেক্ষা প্রতিরোধ না করা কত ভাল—ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান্। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না।

অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্য আর মায়ার দ্বন্দ্ব। আমরা যতই পক্ষিসুলভ মমতার নিকটবর্তী হই, ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই। ইহাকে আমরা 'ভালবাসা' বলি। আসলে ইহা আত্মসম্মোহন। জীবজন্তুর মতো আমরাও আবেগের অধীন। বৎসের জন্য গাভী প্রাণ দিতে পারে—প্রত্যেকটি জীবই পারে। তাহাতে কি? অন্ধ পক্ষিসুলভ ভাবাবেগ পূর্ণত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্ত চৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই; সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে দণ্ডায়মান।

১ গীতা—২।৩

অর্জুন এখন আবেগের অধীন। তাঁহার যাহা হওয়া উচিত, তিনি তাহা নন। প্রজ্ঞার অনন্ত আলোকের মধ্যে কর্মরত সম্যক্‌-আত্ম-নিয়ন্ত্রিত, আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানী ঋষি হইতে হইবে। হৃদয়ের তাড়নায় মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া, নিজেকে ভ্রান্ত করিয়া, 'মমতা' প্রভৃতি সুন্দর আখ্যায় নিজের দুর্বলতাকে আবরিত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি শিশুর মতো হইয়াছেন, পশুর মতো হইয়াছেন। কৃষ্ণ তাহা দেখিতেছেন। অর্জুন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতো কথা বলিতেছেন, বহু যুক্তির অবতারণা করিতেছেন; কিন্তু যাহা বলিতেছেন, তাহা অজ্ঞের কথা।

'জ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত বা মৃত—কাহারও জন্যই শোক প্রকাশ করেন না।'[২] তুমি মরিতে পার না; আমিও না। এমন সময় কখনও ছিল না, যখন আমরা ছিলাম না। এমন সময় কখনও আসিবে না, যখন আমরা থাকিব না। ইহজীবনে মানুষ যেমন শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যৌবন ও বার্ধক্য অতিক্রম করে, তেমনি মৃত্যুতে সে দেহান্তর গ্রহণ করে মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাতে মুহ্যমান হইবে কেন?[৩] এই যে আবেগ-প্রবণতা তোমায় পাইয়া বসিয়াছে, ইহার মূল কোথায়?—ইন্দ্রিয়গ্রামে। 'শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সব কিছুর অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়স্পর্শ হইতেই অনুভূত হয়। তাহারা আসে এবং যায়।'[৪] এইক্ষণে মানুষ দুঃখী, আবার পরক্ষণেই সুখী। এরূপ অবস্থায় সে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

'যাহা চিরকাল আছে (সৎ), তাহা নাই—এরূপ হইতে পারে না; আবার যাহা কখনও নাই (অসৎ), তাহা আছে—এরূপও হইতে পারে না! সুতরাং যাহা এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা আদি-অন্তহীন অবিনাশী বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বে এমন কিছুই নাই, যাহা অপরিবর্তনীয় আত্মাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন, তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর।'[৫]

ইহা জানিয়া মোহ ত্যাগ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎপদ হইও না,—ইহাই আদর্শ। ফল যাহাই হউক, কর্ম করিয়া যাও। নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মৃত্যু তো শুধু দেহান্তর-প্রাপ্তি মাত্র! যুদ্ধ করিতে হইবে। ভীরুতা ও কাপুরুষতার দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। পশ্চাদপসরণের দ্বারা কোন বিপদ দূর করা যায় না। দেবতাদের নিকট তোমরা অহরহ আকুল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে কি তোমাদের দুঃখ দূর হইয়াছে? ভারতের জনসাধারণ ষাটকোটি দেবতার কাছে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও কুকুর-বিড়ালের মতো দলে দলে মরিতেছে। দেবতারা কোথায়? তাঁহারা তখনই আগাইয়া আসেন, যখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারো। দেবতাদের কি প্রয়োজন? কুসংস্কারের কাছে এই নতি স্বীকার করা, নিজের মনের খেয়ালের কাছে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া তোমার শোভা পায় না।

হে পার্থ! তুমি অনন্ত, অবিনশ্বর, তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; অনন্তশক্তিশালী আত্মা তুমি; ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার তোমার শোভা পায় না। ওঠ, জাগো, দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। যদি মৃত্যু হয়

২ গীতা—২।১১ ৩ ঐ—২।১২-১৩ ৪ ঐ—২।১৪

৫ ঐ—২।১৬

হউক। অপরের সাহায্যে তোমার প্রয়োজন নাই—সমস্ত পৃথিবী তোমার অধীন—তুমি কাহার মুখাপেক্ষী? 'জীবগণের অস্তিত্ব শরীর উৎপত্তির পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে অব্যক্ত থাকে। শুধু মাঝখানের স্থিতিকালটুকু ব্যক্ত। কাজেই তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই'।[৬]

'কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, আবার অনেকে শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না।'[৭]

কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনকে বধ করা যে পাপ —এ কথা বলার তোমার অধিকার নাই; কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং বর্ণাশ্রম অনুযায়ী যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম।...'সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।'[৮]

এখানে গীতার অন্য একটি বিশেষ মতবাদের সূচনা করা হইতেছে—অনাসক্তির উপদেশ। অর্থাৎ আমরা কার্যে আসক্ত হই বলিয়া আমাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয়।...'কেবল যোগযুক্ত হইয়া কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।'[৯] সমস্ত বিপদ তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে। 'এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিয়া মানব জন্মমরণরূপ সংসারের ভীষণ আবর্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।'[১০]

'হে অর্জুন, কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি সফলকাম হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের মন সহস্র বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ায় শক্তির অপচয় ঘটে। অবিবেক ব্যক্তিরা বেদোক্ত কর্মে অনুরক্ত; স্বর্গাদি ফলের জনক বেদের কর্মকাণ্ডের বাহিরে কিছু আছে, এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে ভোগসুখ ও স্বর্গলাভ করিতে চান এবং সেজন্য যজ্ঞাদি করেন।'[১১] 'এই সকল লোক যতক্ষণ না বৈষয়িক ভোগসুখের প্রত্যাশা ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্য আসিতে পারে না।'

ইহাও গীতার আর একটি মহান্ উপদেশ। বিষয়ের ভোগসুখ যতক্ষণ না পরিত্যক্ত হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। মানুষ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকেও একজোড়া চক্ষু ও একটি নাসিকা কামনা করে। অনেকের কল্পনা—এ জগতে যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, স্বর্গে গিয়া তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক ইন্দ্রিয় পাওয়া যাইবে। অনন্ত কাল ধরিয়া সিংহাসনে আসীন ভগবান্‌কে —ভগবানের পার্থিব দেহকে তাঁহারা দেখিতে চান। এই সকল লোকের বাসনা—শরীরের জন্য, শরীরের ভোগসুখের জন্য, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য। স্বর্গ তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের বিস্তারমাত্র। মানুষ ইহ-জীবনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করিতে পারে না। এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের জীবনের সবকিছু। 'মুক্তিপ্রদ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই শ্রেণীর মানবের নিকট একান্ত দুর্লভ।'[১২]

'বেদ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়।' বেদ কেবল প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে যাহা দেখা যায় না, লোকে তাহা ভাবিতে পারে না। স্বর্গ লইয়া কথা বলিতে গেলে তাহাদের মনে জাগে—সিংহাসনে একজন রাজা বসিয়া আছেন, আর লোকে তাঁহার

৬ গীতা—২।২৮ ৭ ঐ —২।২৯ ৮ ঐ —২।৩৮
৯ ঐ—২।৩৯ ১০ ঐ —২।৪০
১১ ঐ—২।৪৩ ১২ ঐ—২।৪৪

নিকট ধূপ জ্বালাইতেছে। সবই প্রকৃতি; প্রকৃতির বাহিরে কিছুই নাই। কাজেই বেদ প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না। 'এই প্রকৃতির পারে যাও; অস্তিত্বের এই দ্বৈত-ভাবের পারে যাও; তোমার ব্যক্তিগত চেতনার পারে যাও; কোন কিছুকে গ্রাহ্য করিও না, মঙ্গল বা অমঙ্গলের দিকে তাকাইও না।'[১৩]

আমরা নিজেদিগকে দেহের সহিত অভিন্ন-ভাবে দেখিতেছি। আমরা দেহমাত্র, অথবা দেহটি আমাদের। আমার দেহে চিমটি কাটিলে আমি চীৎকার করি। এ-সকলই অর্থশূন্য, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। দেহকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্যই এই দুঃখ-শোক কল্পনা, প্রাণী দেবতা দানব, এই বিশ্বজগৎ—প্রত্যেকটি জিনিস আসিয়া পড়িয়াছে। আমি চৈতন্য-স্বরূপ। তুমি আমায় চিমটি কাটিলে আমি কেন লাফাইয়া উঠিব?...এই দাসত্ব লক্ষ্য কর। তুমি লজ্জিত হইতেছ না? আমরা নাকি ধার্মিক! আমরা নাকি দার্শনিক! আমরা নাকি ঋষি! ভগবান্ মঙ্গল করুন! আমরা কী—? জীবন্ত নরক বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। পাগল বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই।

আমরা আমাদের শরীরের 'ধারণা' ছাড়িতে পারি না। আমরা পৃথিবীতেই বদ্ধ আছি। এই সংস্কারগুলিই আমাদের বন্ধন। যখন আমরা শরীর ছাড়িয়া যাই, তখন এই জাতীয় সহস্র সংস্কারের বন্ধনে বাঁধা পড়ি।

একেবারে আসক্তিশূন্য হইয়া কে কাজ করিতে পারে? ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন। ঐরূপ (আসক্তিশূন্য) ব্যক্তির নিকট কর্মের সফলতা ও বিফলতা সমান কথা। যদি সারা জীবনের কর্ম একমুহূর্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড একবারের জন্য বৃথা স্পন্দিত হয় না। 'ফলের কথা চিন্তা না করিয়া যিনি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া যান, তিনিই যোগী। এইভাবে তিনি জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেন; এইভাবে তিনি মুক্ত হন।'[১৪] তখন তিনি দেখিতে পান যে, সকল প্রকার আসক্তিই মিথ্যা মায়া। 'আত্মা কখনও আসক্ত হইতে পারেন না।...তারপর তিনি সকল শাস্ত্র ও দর্শনের পারে গমন করেন।'

গ্রন্থ ও শাস্ত্রের দ্বারা যদি মন বিভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে এইসব শাস্ত্রের সার্থকতা কি? কোন শাস্ত্র এই প্রকার বলে, অন্যটি আর এক প্রকার বলে। কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিবে? একাকী দণ্ডায়মান হও। নিজের আত্মার মহিমা দেখ! দেখ—তোমায় কর্ম করিতে হইবে, তবেই তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে?' 'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমনকি এই জীবনও নয়, স্বাধীনতা নয়, দেবতা নয়, কর্ম নয়, কোন কিছুই নয়; যখন তিনি পরিতৃপ্ত, তখন আর অধিক কিছু চাহিবার তাঁহার নাই।'[১৫] তিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মধ্যে সংসার দেবতা স্বর্গ—সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন দেবতারা আর দেবতা থাকেন না, মৃত্যু আর মৃত্যু থাকে না, জীবন আর জীবন থাকে না। প্রত্যেকটি জিনিসই পরিবর্তিত হইয়া যায়। 'যদি কাহারও ইচ্ছা দৃঢ় হয়, তাঁহার মন যদি দুঃখে বিচলিত না হয়, যদি তিনি কোন প্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা না করেন, যদি তিনি সকল প্রকার আসক্তি, সকল প্রকার ভয়, সকল প্রকার ক্রোধ

১৩ গীতা—২।৪৫

১৪ ঐ—২।৫১

১৫ ঐ—২।৫৫

হইতে মুক্ত হন, তবে তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'[১৬]

'কচ্ছপ যেমন করিয়া তাহার পাগুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লয়, তাহাকে আঘাত করিলে একটি পা-ও বাহিরে আসে না, ঠিক তেমনি যোগী তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে পারেন।'[১৭] কোন কিছুই ঐ (ইন্দ্রিয়)-গুলিকে জোর করিয়া বাহিরে আনিতে পারে না। কোন প্রলোভন বা কোন কিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারে না। সারা বিশ্ব তাঁহার চতুর্দিকে চূর্ণ হইয়া যাক, উহা তাঁহার মনে একটি তরঙ্গও সৃষ্টি করিবে না।

অতঃপর একটি অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অনেক সময় লোকে বহুদিন ধরিয়া উপবাস করে; ···কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি কুড়ি দিন উপবাস করিলে বেশ শান্তও হইয়া উঠে। এই উপবাস আর আত্মপীড়ন—সারা পৃথিবীর লোক করিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণের ধারণায় এইসব অর্থশূন্য। তিনি বলেন: যে মানুষ নিজের উপর উৎপীড়ন করে, তাহার নিকট হইতে ইন্দ্রিয়গুলি কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশগুণ অধিক শক্তি লইয়া পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন তুমি কি করিবে? ভাবখানা এই যে, স্বাভাবিক হইতে হইবে। কৃচ্ছ্রসাধন নহে। অগ্রসর হও, কর্ম কর, কেবল দৃষ্টি রাখিও যেন আসক্ত হইয়া না পড়। যে ব্যক্তি অনাসক্তির কৌশল জানে না বা তাহার সাধনা করে না, তাহার প্রজ্ঞা কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আমি বাহিরে গিয়া চোখ মেলিলাম, যদি কিছু থাকে, আমি অবশ্যই দেখিতে পাইব, না দেখিয়া পারি না। মন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এখন ইন্দ্রিয়গুলিকে যে-কোন প্রকার প্রকৃতি-জাত প্রতিক্রিয়া বর্জন করিতে হইবে।

'যাহা সংসারের নিকট অন্ধকার রাত্রি, সংযমী পুরুষ তাহাতে জাগরিত থাকেন। ইহা তাঁহার নিকট দিবালোক। আর যে বিষয়ে সারা সংসার জাগ্রত, তাহাতে সংযমী নিদ্রিত।'[১৮] এই সংসার কোথায় জাগ্রত?—ইন্দ্রিয়ে। মানুষ চায় ভোজন, পান আর সন্তান; তারপর কুকুরের মতো মরে।··· কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই তাহারা সর্বদা জাগ্রত। তাহাদের ধর্মও ঐজন্যই। তাহারা আরও কামিনী, আরও কাঞ্চন, আরও সন্তান লাভের জন্য একটি ভগবান্ আবিষ্কার করিয়াছে। অধিকতর দেবত্বলাভে সাহায্য করিবার জন্য তাহারা ভগবান্‌কে চায় নাই।

'যেখানে সারা জগৎ জাগ্রত, যেখানে যোগী নিদ্রিত, যেখানে অজ্ঞেরা নিদ্রিত, যোগী সেখানে জাগ্রত;' সেই আলোকের রাজ্যে—যেখানে মানুষ নিজেকে পাখির মতো শরীর মাত্র বলিয়া দেখে না,—দেখে অনন্ত মৃত্যুহীন অমর আত্মারূপে। এখানে অজ্ঞেরা সুপ্ত; তাহাদের বুঝিবার সময় নাই, বুদ্ধি নাই, সাধ্য নাই। সেখানে কেবল যোগীই জাগ্রত থাকেন, তাহাই তাঁহার নিকট দিবালোক।

'পৃথিবীর নদীগুলি অবিরত তাহাদের জলরাশি সমুদ্রে ঢালিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি অবিচলিত, অপরিবর্তিতই থাকে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে প্রকৃতির সকল সংবেদন আনিলেও জ্ঞানীর হৃদয় কোন-প্রকার বিক্ষেপ বা ভয়ের কথা ভাবিতে পারে না।'[১৯] লক্ষ লক্ষ স্রোতে দুঃখ আসুক, শত শত স্রোতে সুখ আসুক! আমি দুঃখের অধীন নই—আমি সুখেরও ক্রীতদাস নই।

১৬ গীতা—২।৫৬ ১৭ ঐ—২।৫৮ ১৮ ঐ—২।৬৯ ১৯ ঐ—২।৭০

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

মৃগরূপী রাক্ষসকে নিহত করিয়া দ্রুত প্রত্যাবর্তনের পথে লক্ষ্মণকে দেখিয়া রামচন্দ্র উদ্বিগ্ন হইলেন। অতঃপর উভয়ে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সীতা-বিরহে পর্ণকুটীর হেমন্তকালের পদ্মিনীর ন্যায় শ্রীহীন। উন্মত্তপ্রায় রামচন্দ্র অরণ্যের সর্বত্র সীতার অন্বেষণে রত হইলেন। শোক-মগ্ন রামচন্দ্র বিলাপ করিতে করিতে প্রতি বৃক্ষ, শৈল ও নদীর প্রতি ধাবিত হইলেন :

বৃক্ষাৎ বৃক্ষং ধাবতি চ গিরীংশ্চাপি নদীন্ নদান্।
বভূব বিলপন্ রামঃ শোকপঙ্কার্ণবে প্লুতঃ॥
অস্তি কচ্চিৎ ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া মম।
কদম্ব যদি জানীষে নিঃশঙ্কঃ কথয়স্ব মে॥

রামচন্দ্র কি বিস্মৃত হইয়াছিলেন—তিনি স্বয়ং অবতার? ব্যাকুলভাবে লক্ষ্মণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে রামচন্দ্র ভূপতিত রক্তাক্ত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। জটায়ুর তখন অন্তিমকাল উপস্থিত। কোন প্রকারে সে জানাইল, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং রাবণকে বাধা দিতে গিয়াই তাহার এই অবস্থা। রাবণের পরিচয় কি? কিন্তু জটায়ু রাবণের পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পাইল না। 'দক্ষিণ-সমুদ্রে দ্বীপে বিশ্বশ্রবার পুত্র ঐশ্বর্যসম্পন্ন লঙ্কার অধিপতি' এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিতে করিতে জটায়ুর প্রাণত্যাগ হইল। মৃত জটায়ুর সৎকারান্তে রামচন্দ্র পুনরায় সীতার অন্বেষণে রত হইয়া ক্রমে পম্পা-সরোবরের পশ্চিম তীরে শবরীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতঙ্গ-ঋষির আশ্রমে কঠোর তপস্যারত শ্রবণা-নাম্নী শবর-কন্যার উপাখ্যান প্রসিদ্ধ। শবরীকে বলা হইয়াছে সিদ্ধা ও বিদিতাত্মা। তপস্যায় সিদ্ধিলাভান্তে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া শবরী তখন শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন-প্রতীক্ষারত। রামচন্দ্রের দর্শনলাভ ও যথাযথ পূজা-অর্চনান্তে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া শবরী অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করেন।

সীতার অন্বেষণে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। হেমন্তের পর শীতের অবসানে বসন্ত-সমাগমে নব কিশলয় ও পুষ্পে অরণ্য সজ্জিত হইয়া উঠিল। বন হইতে বনান্তরে চলিয়াছেন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ পদব্রজে। পম্পা-সরোবর হইতে ঋষ্যমূক-পর্বতে। পথে একস্থানে রামচন্দ্র কবন্ধ-নামক রাক্ষসকে যখন নিহত করেন, তখন সে ঋষ্যমূক-পর্বতে সুগ্রীবের অবস্থানের সংবাদ দিয়া বলিয়াছিল, রামচন্দ্রের বিপদে সুগ্রীব সাহায্য করিতে পারে।

ভারতের উত্তরাঞ্চলে তখন আর্যসভ্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্যপর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করায় দাক্ষিণাত্যে আর্যসভ্যতা প্রাধান্যলাভ করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যে তখন বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া বহু আর্যেতর বা অনার্য জাতির বাস ছিল। দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের অধিপতি ছিল মহাপরাক্রমশালী বালী। বালীর পরাক্রমের বহু কাহিনী আছে। একদা জনস্থানের অধিপতি রাবণও বালী-কর্তৃক পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়। বালী তাহার কনিষ্ঠ

ভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নীকে বলপূর্বক অধিকার করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করে। বালীর ভয়ে সুগ্রীব নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে ঋষ্যমূক-পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কোন সময়ে বালীর আচরণে ক্রুদ্ধ মতঙ্গ-ঋষি বালীকে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিলেন, ঋষ্যমূক-পর্বতে আসিলে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। আর্যদের অভিশাপ-প্রদানকে বহু অনার্য বেশ ভয় করিত। সুতরাং অভিশাপ-ভীত বালী ঋষ্যমূক-পর্বতে আগমন না করায় ঐ অঞ্চল বালীর উপদ্রব হইতে মুক্ত ছিল। সুগ্রীবের সঙ্গে যে কয়জন অন্তরঙ্গ সচিব ছিলেন, হনুমান্ বা মহাবীর তাঁহাদের অন্যতম।

দূর হইতে মহাবলশালী রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া সুগ্রীব ভীত হইলে প্রাজ্ঞ হনুমান্ তাঁহাকে আশ্বাস-প্রদানান্তে রাম-লক্ষ্মণ সমীপে আগমন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় জানিতে পারিলেন। প্রথম দর্শনেই রামচন্দ্রের অপূর্ব তেজঃপূর্ণ কান্তি হনুমানের চিত্ত আকৃষ্ট করে। তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, রামচন্দ্র সামান্য মানব নহেন। পরে রামচন্দ্রের পদে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক হনুমান্ প্রভুভক্তি ও দাস্যভাবের চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া হনুমান্ রামচন্দ্রকে জানাইলেন, সুগ্রীব তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহান্বিত। অতঃপর হনুমানের মধ্যস্থতায় প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে রামচন্দ্র ও সুগ্রীব মিত্রতা স্বীকার করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই বনমধ্যে শালবৃক্ষের ভগ্নশাখার উপর উপবেশন করিয়া তাঁহারা পরস্পরের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিলেন। রামচন্দ্রের নিকট সীতার বিবরণ শুনিয়া সুগ্রীব বলিলেন,

অনুমানেন জানামি মৈথিলী সা ন সংশয়ঃ।
হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা তদা ক্রূরেণ রক্ষসা॥
ক্রোশন্তী রাম রামেতি করুণং লক্ষ্মণেতি চ।
স্ফুরন্তী রাক্ষসস্যাঙ্কে পন্নগেন্দ্রবধূরিব॥

—অনুমানে বোধ হইতেছে, সেদিন 'রাম রাম' 'লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ' বলিয়া করুণস্বরে ক্রন্দনরতা যাঁহাকে আমি ক্রূর রাক্ষস-কর্তৃক অপহৃতা হইতে দেখিয়াছি, নিশ্চয় তিনি মৈথিলী।

অতঃপর সুগ্রীব সীতা-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত উত্তরীয় ও আভরণসমূহ গুহা হইতে আনয়ন করিয়া রামচন্দ্রকে প্রদর্শন করিলে তাঁহার শোক পুনরায় বর্ধিত হইল। সুগ্রীব তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, রামের সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি সীতা-উদ্ধারে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিবেন। বালী বধ করিয়া রামচন্দ্র কি তাঁহাকে রাজ্য ও পত্নী প্রদান করিবেন? রামচন্দ্র বালী-বধে সম্মত হইলেন। কিন্তু সুগ্রীবের আশঙ্কা বালীকে একবাণে নিহত করিতে না পারিলে, ক্রুদ্ধ বালী সকলকেই সংহার করিবে। রামের এতাদৃশ বলের প্রমাণ কি? অতএব সুগ্রীবের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ তাঁহার অনুরোধে রামচন্দ্র একবাণে সমান্তরালে অবস্থিত সপ্ত তালবৃক্ষ বিদীর্ণ করিলে সুগ্রীবের সংশয় দূর হইল। স্থির হইল, কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া সুগ্রীব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রামচন্দ্র বালীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিবেন। কিন্তু কার্যকালে সঙ্কট দেখা দিল। বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, দূর হইতে উভয়ের পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন। সুতরাং প্রথমদিন যুদ্ধে বালী-কর্তৃক প্রহৃত রুধির-সিক্ত সুগ্রীব পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয় দিবস সুগ্রীবের কণ্ঠে নাগকেশর-পুষ্প ও লতা দ্বারা রচিত মাল্য অর্পণ করিয়া

তাঁহাকে চিহ্নিত করায় রামচন্দ্র সহজেই বালী-বধে সক্ষম হইলেন।

বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বালী-বধ সঙ্গত হইয়াছিল কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। মৃত্যুর পূর্বে বালীও রামচন্দ্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন: তাঁহার ঐরূপ আচরণ অসঙ্গত। রামচন্দ্র তেজস্বী, প্রজাবৃন্দের হিতকারী, উদার ও দৃঢ়ব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ বর্তমানে প্রব্রজ্যা-বেশ ধারণ করায় কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা তাঁহার পক্ষে অশোভন। বিশেষতঃ বালী রামচন্দ্রের কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই, তবে বালীর প্রতি তাঁহার এই নিষ্ঠুর আচরণের কারণ কি? শৌর্য, আত্মসম্মানবোধ, ক্ষমা, সত্য, ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অপকারীর প্রতি দণ্ড-বিধান—ইহাই ক্ষত্রিয়ের গুণ। অতএব অন্যায়ভাবে বালীকে সংহার করা রামচন্দ্রের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কার্য হইয়াছে।

রামচন্দ্র বালীর এই তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন: কোন প্রকার অন্যায় আচরণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কারণ ধর্ম এবং অধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতিশয় পরিষ্কার। শৈল, বন ও কানন সমন্বিত এই জম্বুদ্বীপ—প্রকৃতপক্ষে উহার দক্ষিণভাগে ভারত একটি উপদ্বীপ—ইক্ষ্বাকু-বংশীয় নৃপতিবর্গের শাসনাধীন। দুষ্টজনের নিগ্রহ এবং শিষ্টজনের পালন—ইহাই এই বংশের রীতি। বর্তমানে ভরত এই দ্বীপের অধিপতি এবং এই দ্বীপের অভ্যন্তরে বিচরণকালে রামচন্দ্র তাঁহার পক্ষ হইতেই ধর্মাধর্ম পরিদর্শন-পূর্বক ধর্মাতিক্রমী জনগণের ধর্মানুসারে দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। কল্যাণকর সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক বালী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নির্বাসিত এবং সে জীবিত থাকিতেই তাহার পত্নীর প্রতি আসক্ত। সুতরাং ভ্রাতা সুগ্রীবের পত্নী ও রাজ্যের অপহারক ধর্মচ্যুত বানরস্বভাব তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড-বিধানই সমুচিত। কারণ দণ্ড ব্যতিরিক্ত পাপীর দমনের অন্য উপায় নাই।

কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত বালী মৃত্যুর পূর্বে রামচন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাঁহার শরণ লইয়াছিল। রামচন্দ্রও বীরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন।

বালী নিহত হইবার পর রামচন্দ্র সুগ্রীবকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়া অঙ্গদকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করিবার নির্দেশ দিলেন। তখন বর্ষাকাল সমাগত, সীতার অন্বেষণ সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি সুগ্রীবকে বর্ষার চারিমাস রাজধানীতেই অবস্থান করিতে বলিলেন। তারপর বর্ষান্তে দিকসকল প্রসন্ন হইলে সরোবর-সমূহ যখন প্রভুত পদ্মপুষ্পে সমাচ্ছন্ন হইবে, তখন সেই মনোরম কার্তিকী পূর্ণিমার পরে সুগ্রীব যেন রাবণবধে যত্নপর হন। রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা চৌদ্দ বৎসর গ্রাম বা নগরে প্রবেশ করিবেন না। অতএব তিনি লক্ষ্মণের সহিত রাজধানী হইতে দূরে মাল্যবান্ পর্বতে এক গুহায় আশ্রয় লইলেন।

ক্রমে বর্ষাকাল শেষ হইয়া শরৎকাল আসিল। মাল্যবান্ পর্বতে রামচন্দ্র অধীর হইয়া সুগ্রীবের প্রতীক্ষায় আছেন। সুগ্রীব কিন্তু রামের প্রসাদে স্ত্রী ও রাজ্য লাভ করিয়া ভোগে মত্ত, কৃত উপকার বিস্মৃত। স্মরণ রাখিয়াছেন হনুমান্, যিনি ইতিমধ্যেই রামচন্দ্রকে আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। সুগ্রীবকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রাজ্য ও পত্নী তিনি রামের কৃপায় লাভ করিয়াছেন এবং রামচন্দ্র মনে করিলে তাঁহাকে পুনরায় রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন,

---

জম্বুদ্বীপ কি এশিয়া?

তবে তিনি দয়ার অবতার। কিন্তু সীতা-অন্বেষণে সুগ্রীবের এই ঔদাসীন্য লক্ষ্মণ ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন না। হনুমানের কথায় সুগ্রীব সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া যাওয়ায় ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত। যাহা হউক, লক্ষ্মণকে শান্ত করিয়া তাঁহার সহিত সুগ্রীব রাম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সুগ্রীবের নির্দেশে চতুর্দিক হইতে বিরাট সৈন্যবাহিনী মাল্যবান্ পর্বতে সমবেত হইল। স্থির হইল, সর্বাগ্রে বিদেহ-রাজনন্দিনী জীবিত আছেন কিনা এবং রাবণের বাসস্থান কোথায়—তৎসম্বন্ধে অবগত হইয়া পরে যথাকর্তব্য নির্ধারণ করা হইবে।

সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে সুগ্রীব ভারতের চতুর্দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। বাল্মীকি-রামায়ণে এই প্রসঙ্গে পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত সমুদয় দেশ, রাজ্য, নদনদী ও পর্বতের অবস্থান-সহ সমগ্র ভারতের বিস্তৃত ভৌগোলিক বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় বহু অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। দেশ ও নদীগুলির অবস্থানে পারম্পর্য নাই। বহু রাজ্য এবং জাতির উল্লেখ আছে, ইতিহাসে যাহাদের অভ্যুত্থান পরবর্তী যুগে। আবার ভৌগোলিক বিপর্যয়ের ফলে এবং সুদীর্ঘ কালের ব্যবধানে বহু দেশ নদী ও পর্বতের নাম বর্তমান যুগে বিলুপ্ত। তবে ভারতের চতুঃসীমা নির্ধারণে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সুগ্রীবের সৈন্য-বাহিনী সীতার অন্বেষণে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। যাহা হউক, সমুদয় অতিশয়োক্তি বাদ দিলে দেখা যায়, বানরগণের প্রতি সুগ্রীবের নির্দেশ ছিল : তাহারা পূর্বদিকে দণ্ডকারণ্য অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গ (বর্তমান ওড়িষ্যা) দেশ হইয়া উদয়-গিরি বা উদয়াচল পর্যন্ত (হিমালয়-পর্বতের পূর্বপ্রান্ত) গমন করিবে, যে উদয়াচলের তুষার-মণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ প্রতিদিন সূর্যোদয়ে অপূর্ব কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করে। দক্ষিণে নর্মদা-নদী হইতে আরম্ভ করিয়া ভোজ ও পাণ্ড্য দেশ, দ্রাবিড়, পুণ্ড্র, চোল ও কেরল দেশ হইয়া সমুদ্রের সহিত কাবেরী-নদীর সঙ্গমস্থলে বিশেষ-ভাবে অন্বেষণ করিবে। পশ্চিমে বাহ্লীক সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি জনপদসমূহ, প্রভাস-তীর্থ এবং দ্বারবতী (দ্বারকা) নগরী হইয়া সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম পর্যন্ত। পরে অরণ্য ও পর্বতমালা পরি-বেষ্টিত দুর্গম পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া সমস্ত পঞ্চনদ অতিক্রম-পূর্বক কাশ্মীর পর্যন্ত গমন করিবে। আর উত্তরে তাহাদের গন্তব্যস্থল মৎস্য, কুরু, গান্ধার প্রভৃতি দেশসমূহ অতিক্রম করিয়া বিশাল দেবদারু, শাল, তাল ও ভূর্জ বৃক্ষসমূহে সমাচ্ছন্ন ও বিবিধ প্রাণীর আবাসস্থল, সমগ্র উত্তর দিক অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থিত হিমালয়-পর্বত পর্যন্ত। যেখানে সমুন্নত শুভ্র কৈলাস-পর্বত, যেখানে গঙ্গার শুক্লবর্ণ জলধারা সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল প্রচণ্ড শব্দে পূর্ণ করিয়া, পর্বত-কানন বিদীর্ণ করিয়া মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে—গন্ধর্ব, কিন্নর, যোগী ও ঋষিগণের আবাসভূমি সেই হিমালয়-পর্বতের অভ্যন্তরে সর্বত্র তাহারা সন্ধান করিবে।

বিনত, সুষেণ, শতবলি ও অঙ্গদ যথাক্রমে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সেনানায়ক-রূপে মনোনীত হইল। সীতার সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য একমাস সময় দেওয়া হইল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করিলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে বলিয়া সুগ্রীব ঘোষণা করিলেন।

বানর-সৈন্যগণ মহা উৎসাহের সহিত নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল। তাহাদের ধারণা, সীতার সংবাদ আনয়ন করা বিশেষ কঠিন হইবে না। দুর্গম পথে বিচরণে অভ্যস্ত সৈন্যগণ পর্বত, অরণ্য ও জনপদসমূহের সর্বত্র সীতার অন্বেষণে ব্যর্থকাম হইয়া মাসান্তে নির্দিষ্ট সময়ে মাল্যবান্ পর্বতে ফিরিয়া আসিল। কেবল নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও অঙ্গদ প্রত্যাবর্তন করিল না। সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরগণ প্রতীক্ষারত রামচন্দ্রকে আশ্বাস দিয়া বলিল, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অঙ্গদের সহিত গিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতা যেদিকে অপহৃতা হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে, হনুমান্ সেই দিকেই যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিশ্চয় সীতার বিষয় অবগত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবেন।

স্বামীজী ও খেতড়িরাজ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মচারী বরুণ

আমেরিকায় অত্যধিক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও দেখা যায়, স্বামীজী কয়েকবার রাজাকে তাঁহার ফটো পাঠাইয়াছেন। স্নেহের দান পাইয়া রাজা পরম আহ্লাদিত। তিনি ছবি ছাপাইয়া গর্বমিশ্রিত শ্রদ্ধার সহিত গুরুদেবের চিত্র অনেককে বিতরণ করেন। আরও দেখা যায়, স্বামীজী রাজার পরিতৃপ্তির জন্য মেরী হেলকে দিয়া তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বিবিধ paper-cuttings (সংবাদপত্রের অংশ) রাজাকে পাঠাইতেছেন। তিনি রাজাকে একটি ফনোগ্রাফ পাঠাইয়া দেন। একটি রেকর্ডে রাজার উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র ভাষণে স্বামীজী বলিতেছেন :

'আপনার প্রজাদের মধ্যে নির্বিশেষে বিদ্যা প্রচার করুন, গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করুন। রোগীর চিকিৎসার জন্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করুন। প্রজার উন্নতিতেই আপনার উন্নতি। সেইজন্য আপনার কর্তব্য প্রজাগণকে সন্তানবৎ পালন করা।'

দেশী-বিদেশী বন্ধুবান্ধব কেহ খেতড়ি-দরবারে আসিলে রাজা এই রেকর্ড শুনাইতেন ও পঞ্চমুখে স্বামীজীর প্রশংসা করিতেন। তখনও ফনোগ্রাফের তেমন প্রচলন হয় নাই, সেইজন্য উহা পাইয়া রাজার আনন্দ আর ধরে না। প্রায় বছর-দেড়েক হইল স্বামীজী আমেরিকাতে আছেন। তাঁহার অনেক অনুরাগী বন্ধু ও ভক্ত; তাঁহাদের অনেকে স্বামীজীকে নানাভাবে সেবা করিতে ব্যগ্র, কেহ কেহ নিজের পছন্দমত জিনিসপত্র কিনিয়া স্বামীজীকে উপহার দিয়াছেন। স্বামীজীর ইচ্ছা হইল, ইঁহাদের কয়েকজনকে তিনি কিছু ভারতীয় জিনিস উপহার দেন। তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া রাজা শাল কিংখাব ও ছোটখাট সুন্দর কিছু জিনিসের বড় একটা প্যাকেট পাঠাইয়া দিলেন। জনৈক আমেরিকান শুনিয়াছেন, কুষ্টব্যাধি-নিবারণের জন্য ভারত-বর্ষে কি তৈল পাওয়া যায়। স্বামীজীর আদেশে রাজা ঐ তৈল ও ব্যবহারের নির্দেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে স্বামীজীর ছোটবড় আদেশ পালন করিয়া রাজা দূর হইতেও গুরুদেবকে কথঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিতেছেন ভাবিয়া আনন্দ বোধ করিতেন।

বেদান্তকেশরীর বজ্রনির্ঘোষ পাশ্চাত্যে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত ভারতবাসীর সম্বিৎ যেন ফিরাইয়া আনিল। হর্ষোৎফুল্ল ভারতবাসিগণ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সনাতন ধর্মের উদ্গাতাকে অভিনন্দন জানাইল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ খেতড়ি-রাজদরবারে যুগাচার্যকে স্বাগত জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহা প্রেরণ করিয়া রাজা একটি পত্রে লিখিলেন :

'It is certainly applicable to the pride of India that it has been fortunate in possessing the privilege of having secured so able a representative as yourself.'

অভিনন্দনের উত্তর দিতে আচার্যের হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষের বেদান্তভিত্তিক সভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া আচার্য রাজাজীকে তথা ভারতবাসীকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিলেন :

'Follow, therefore, noble Prince, the teachings of the Vedanta, not as explained by this or that commentator, but as the Lord within you understands them. Above all, follow this great doctrine of sameness in all things, through all beings, seeing the same God in all.'

ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণ নির্ভর করিতেছে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজজীবনে ধর্মকে স্বমহিমায় পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার উপর। শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবে জাগরণের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। নবজাগরণের পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ অভ্যুদয়-মহাযজ্ঞে ভারতসন্তান-গণকে আহ্বান করিতেছেন। বাস্তব কর্ম-সূচীতে রাজাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য আচার্য লিখিতেছেন :

'And you, my beloved Prince—you, the scion of a race, who are the living pillars, upon which rest the religion eternal, its sworn defenders and helpers, the descendants of Rama and Krishna, will you remain outside? I know, this cannot be. Yours, I am sure, will be the first hand that will be stretched forth to help religion once more.'

গুণগ্রাহী স্বামীজী রাজার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্দীপিত করিতে উন্মুখ, পত্রের শেষাংশে লিখিতেছেন :

'And when I think of you, Raja Ajit Singh, one in whom the well-known scientific attainments of your house have been joined to a purity of character of which a saint ought to be proud, to an unbounded love for humanity. I cannot help believing in the glorious renaissance of the religion eternal, when such hands are willing to rebuild it again.'

যুগ-অভ্যুদয়ের মহাযজ্ঞে মহারাজা অজিত সিংহের জন্য সুনির্দিষ্ট ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা। শিকাগো ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরে স্বামীজী যে তেজবীর্যপূর্ণ পত্রখানি আলাসিঙ্গাকে লিখেন, তাহাতে নব অভ্যু-দয়ের কর্মসূচীতে রাজাজী, আলাসিঙ্গা প্রভৃতি কয়েকজনের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিতেছেন :

'আমি দিন দিন বুঝিতেছি প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এই পত্রখানি খেতড়ির মহারাজকে পাঠাইয়া দিও, আর ইহা প্রকাশ করিও না। আমরা জগতের জন্য মহৎ মহৎ কর্ম করিব, আর উহা নিঃস্বার্থ-ভাবে করিব—নামযশের জন্য নহে।'

স্বামীজী মানসচক্ষে তাঁহার এই কর্মীটির মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহনলালকে লিখিতেছেন :

'He is determined to be a great leader of our race. Have faith in this. You do not know yet, what is in that man—with all his faults. The Lord has shown it to me, and you will see it by and by.'

তদানীন্তন ইংরেজী সভ্যতার প্লাবনে দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে সকল দোষত্রুটি দেখা যাইত, তাহার কোন কিছু লক্ষ্য করিয়া হয়তো জগমোহনলাল স্বামীজীর নিকট ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। মহৎ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা অপরের সামান্য দোষত্রুটি অগ্রাহ্য করিয়া সদ্গুণাবলীর দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বামীজীও রাজার জ্ঞাত ও প্রকাশোন্মুখ সদ্গুণাবলী সর্বদা উঁচু করিয়া ধরিতেন, যাহাতে ঐগুলি সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে। রাজার চরিত্রের মহৎ উপাদান-গুলির সমন্বয়ে স্বামীজী তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মীকে গড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ ২৩শে জুলাই স্বামীজী রাজাকে তাঁহার অন্যতম প্রধান সহকর্মীরূপে পরিচয় দিয়া ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিয়াছেন, 'আমার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কর্মী খেতড়ির রাজা এখন ইংলণ্ডে আছেন, তিনি শীঘ্র ভারতে ফিরে আসবেন ব'লে আশা করি এবং তিনি অবশ্যই আমার বিশেষ সহায়ক হবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্ত-ভিত্তিক জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের যে গুরু-দায়িত্ব স্বামীজী কয়েক বৎসর পরে নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহার প্রস্তুতিস্বরূপ তাঁহার নির্বাচিত কর্মীদের এক্ষণে পত্রযোগে শিক্ষা চলিতে থাকিল। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নবজাগরণের এই অগ্নিমন্ত্র বহন করিয়া যুগাচার্যের বিদ্যুদ্‌বাহী ভাবরাশি তাঁহার নির্বাচিত কর্মীদের উৎসাহ প্রদীপ্ত করিল,—সংঘবদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত করিল। ১৮৯৪ খৃঃ স্বামীজী মঠের ভ্রাতৃবৃন্দকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, 'এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit আসবে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে! আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে! Onward, হরে হরে!'

এইকালে খেতড়িরাজকে লেখা পত্রগুলি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। স্বামীজী স্বয়ং ১৮৯৮ খৃঃ ১৫ই এপ্রিল দার্জিলিং হইতে জগমোহনলালকে লিখিয়াছেন, 'আমি বিদেশ যাইবার পথে জাপান, ইওরোপ ও আমেরিকা থাকাকালীন যে চিঠিগুলি মান্যবর মহারাজাকে লিখিয়াছিলাম, সেগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে সাবধানে প্যাকেট করিয়া রেজিস্টার্ড পোস্টে মঠের ঠিকানায় আমাকে যথাশীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিবেন।' মনে হয় স্বামীজীর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, খরস্রোত ভাবরাশির বাহক ঐ পত্রগুলি মঠে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ও নবাগত সাধু-ব্রহ্মচারিগণ পড়েন।

পত্রযোগে রাজার শিক্ষানবিশী চলিতেছিল। ১৮৯৪ খৃঃ প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বামীজীর সহিত বোম্বাই হইতে আবুরোডে আসিবার পথে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত জগমোহনলালের পরিচয় হয়। প্রায় চার মাস পরে ১১ই জুলাই তারিখে জয়পুর হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দ জগমোহনলালকে এক পত্র লিখিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দকে তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য খেতড়িতে প্রেরণ করেন। খেতড়ি-রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ 'গরীব প্রজাদের দুঃখের অবস্থা এবং রাজা ও সর্দারদের বিলাসিতা ও উদাসীন ভাব' দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে ইতিকর্তব্য নির্ণয়ের জন্য স্বামীজীকে এক পত্র লিখেন। মাস-দুই পরে নেতার আদেশ আসিল: রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে।...খেতড়ি শহরের গরীব নীচজাতির ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে।...পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর—ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।

নেতার নির্দেশ পাইয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ রাজার সহায়তায় খেতড়িতে সেবাকার্য আরম্ভ করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই খেতড়ি-রাজসরকার-পরিচালিত এণ্ট্রান্স স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা আশি হইতে দুইশত হইল, যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল এবং চির-অবহেলিত 'গোলা' বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। একটি স্থায়ী শিক্ষাবিভাগ গঠন করিয়া তিনটি গ্রামে বিদ্যালয় ও খেতড়িতে একটি বৈদিক

বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। দুই বৎসরাধিককাল এই অঞ্চলে থাকিয়া রাজার সাহায্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ অবহেলিত প্রজাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র-গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামীজীর গুরুভ্রাতার প্রতি রাজার ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি। স্বামী অখণ্ডানন্দের পবিত্র সাহচর্যে রাজা একদিকে রাজ্যমধ্যে নানাবিধ উন্নয়ন-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন, অপর দিকে তাঁহার নিকট বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করিতে থাকেন। ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ মিশনের 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' নীতির প্রথম সামাজিক প্রয়োগ হইল খেতড়ি-রাজ্যে। ইহার ফলে রাজার ব্যক্তিগত জীবনও অধিক বিকশিত হইল, রাজ্যে স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইল এবং রাজা-প্রজার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইল।

পাশ্চাত্যে স্বামীজীর অপ্রত্যাশিত সাফল্যের সংবাদ সাগর-পার হইতে পত্রিকা-পত্রাদি মারফত রাজার নিকট পৌঁছিতে থাকিলে গর্বে আনন্দে তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিল। স্বামীজী যে-কার্য নিষ্পন্ন করেন বা যে-কোন পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাহা যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়া অশেষ কল্যাণপ্রদ হইবে, সে বিষয়ে রাজার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল। রাজা জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী সনাতনধর্ম-সমুদ্রমথিত সুধা—অদ্বৈতামৃত পাশ্চাত্যের ধর্মপিপাসুদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য নিউ-ইয়র্কে বিশ্বমন্দির (Temple Universal) প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া রাজা তাঁহার আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন এক পত্রে। তিনি স্বামীজীকে লিখিতেছেন :

'...hope that someday it will be a household word of everyman of our pretty little earth which now-a-days is filled with so many differences of opinions.'

আবার যশের শিখরে দণ্ডায়মান স্বামীজীকে নিঃস্পৃহ স্থির প্রশান্ত দেখিতে পাইয়া শিষ্য স্তব্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম জানাইতেন।

স্বামীজীর গুরুভ্রাতা বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য ভারতীয় কর্মীদের ন্যায় রাজাও স্বামীজীকে সত্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সরাসরি তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া এক পত্র লিখিলেন। প্রত্যুত্তরে স্বামীজী ১৮৯৫ খৃঃ ৯ই জুলাই লিখিলেন, 'মহারাজ তো বেশ ভালই জানেন, আমার স্বভাবটা হচ্ছে, যে বিষয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যবসায়ের সহিত কামড়ে ধরে থাকি ; আমি এদেশে একটি বীজ পুঁতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আশা করি অতি শীঘ্রই ইহা বৃক্ষে পরিণত হবে।...খৃষ্টান পাদরীরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে।'

গুরুশিষ্যের মধ্যে ছিল সুগভীর প্রীতির সম্পর্ক। জগমোহনলালকে লেখা এক পত্রে ইহা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, স্বামীজী লিখিতেছেন :

'I could not but love him, neither can he help loving me. This is of the past birth. We are as supplement and complement.'

স্বামীজী যেন দেখিতেছেন তাঁহারা দুইজনে একই মহৎ ব্রতে ব্রতী, স্বামীজীর প্রতি শিষ্যের প্রাণঢালা ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কাহারও অবিদিত ছিল না। স্বামীজীকে লেখা শিষ্যের এক পত্রে দেখা যায়, তিনি লিখিতেছেন :

'I should close this after tendering my humble *dundwats* to your Holiness. My Guroo, I am so proud of you that it can ('better') be imagined than told. May God bestow on India some more such greatness is the heart-felt prayer of your sincere Shishya.'

তাঁহার প্রতি রাজার অশেষ শ্রদ্ধা ও অগাধ ভালবাসার বিষয় স্বামীজী স্বয়ং অনেকবার উল্লেখ করিয়াছেন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বামীজী ডা: নাঞ্জুণ্ডা রাওকে লিখিতেছেন :

'As for the Rajaji, his love for me is simply without limit.'

হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিতেছেন :

'Between the H. H. of Khetri and myself there are the closest ties of love.'

রাজা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন গুরুদেবের কল্যাণহস্ত বিপদে-সম্পদে তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে, তবুও সংসারের ঘূর্ণাবর্তে কোন সময় সংশয় দেখা দেয়, নৈরাশ্য চারিদিক অন্ধকার করিয়া ঘিরিয়া ধরে, রাজা কাতরভাবে স্বামীজীকে মনের দুঃখ জানান, সাগর-পার হইতে গুরুদেবের প্রাণপদ বাণী ছন্দোবদ্ধ আকারে শিষ্যের নিকট পৌঁছায় :

If the sun by the cloud is hidden a bit,
If the welkin shows but gloom,
Still hold on yet a while brave heart,
The victory is to sure to come.

গুরুদেবের বাক্যসুধায় সঞ্জীবিত হইয়া রাজা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইলেন, সাময়িক গ্লানি ও দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কর্মসমুদ্রে আবার ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, সংশয় তাঁহার ছিন্ন হইয়াছে, তিনি পাইয়াছেন গুরুদেবের অভয়বাণী :

With thee are those who see afar,
With thee is the Lord of might,
All blessings pour on thee great soul,
To thee may all come right.

জগৎসভায় বেদান্তের বাণী বিঘোষিত করিয়া ও পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া স্বামীজী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন,—তিনি ১৮৯৭ খৃ: ২৬শে জানুআরি পাম্বানে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র স্বামীজীকে সাদরে বরণ করিবার জন্য দেশব্যাপী প্রস্তুতি চলিতে থাকিল। তিনি মাদ্রাজ পৌঁছিয়া দেখিলেন, তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে, ৭ই ফেব্রুআরি রবিবার অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনার আয়োজন করা হইল। খেতড়িরাজের প্রতিনিধিস্বরূপ মুন্সী জগমোহনলাল রাজার শ্রদ্ধার্ঘ্য ও খেতড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার প্রেরিত অভিনন্দন-বাণী পাঠ করা হইলে বিভিন্ন সংস্থা হইতে ইংরেজী সংস্কৃত তামিল তেলুগু ভাষায় বাইশ-তেইশটি অভিনন্দন প্রদত্ত হইল। দশ সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে স্বামীজী একখানি গাড়ির কোচবাক্স হইতে গীতার শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গীতে চিত্ত-আলোড়নকারী ক্ষুদ্র একটি ভাষণ দিলেন। কলম্বো হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বক্তৃতা, কথোপকথন, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদিতে ক্লান্ত হইয়া স্বামীজী ১৫ই ফেব্রুআরি মাদ্রাজ হইতে জাহাজে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

বিদেশে কঠোর পরিশ্রম ও স্বদেশে ফিরিয়া অসংখ্য সভাসমিতিতে ক্রমাগত বক্তৃতাদি করিয়া স্বামীজীর বজ্রদৃঢ় শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। কলিকাতা হইতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি দার্জিলিং যাইলেন, তথায় পনের দিন বিশ্রামে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন। এই সময়ে প্রিয় শিষ্য অজিত সিংহের নিকট হইতে ইওরোপ গমনের এক আমন্ত্রণ আসিল। মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসবে যোগদানের জন্য বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজা-নবাবদের মতো খেতড়িরাজও ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা

স্বামীজীও সঙ্গে যান, সমুদ্রযাত্রাতে স্বামীজীর স্বাস্থ্যোন্নতি হইবারও সম্ভাবনা। স্বামীজীও একবার ইওরোপ যাইবেন, মনে করিলেন। মহারাজা অজিত সিংহ কলিকাতায় উপস্থিত হইলে সংবাদ পাইয়া স্বামীজী ১৮৯৭ খৃঃ ২১শে মার্চ কলিকাতায় পৌঁছিলেন। খেতড়িরাজ শিয়ালদহ স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া বড়বাজারে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গেলেন। সেই দিনই স্বামীজী রাজা ও জগমোহনলালকে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে লইয়া যান। রাজা মুগ্ধবিস্ময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থান দর্শন করিলেন ও স্বামীজীর মুখে যুগাবতারের অপূর্ব লীলামাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেন। সেখান হইতে আলবাজার মঠে সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া তাঁহারা খেতড়িরাজের বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মত লইয়া জানা গেল, স্বামীজীর বর্তমান স্বাস্থ্যে ইওরোপ যাওয়া সঙ্গত হইবে না। রাজা ব্যর্থমনোরথ হইলেন, স্বামীজীও দুঃখিত হইলেন। অতঃপর স্বামীজী দার্জিলিং ফিরিয়া গেলেন। শিশুর মতো সরল স্বামীজী ইওরোপ যাইতে না পারায় জোসেফিন ম্যাকলাউড, মেরী হেল প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবগণকে দুঃখ করিয়া কয়েকটি চিঠি লিখিলেন। রাজা গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক বোম্বাই হইতে ১লা মে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভ্রমণে কূপমণ্ডূকতা প্রভৃতি দোষ দূর হয় ও বহুবিধ মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাই প্রিয় শিষ্য ও কর্মী খেতড়িরাজ ইওরোপ যাওয়াতে স্বামীজী আনন্দিত হইলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে রাজার জন্য পরিচয়পত্র প্রেরণ করিলেন। স্বামীজীর অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মিলিত হইয়া রাজা খুবই আনন্দিত হইলেন। ইংলণ্ডে জুবিলী উৎসব সভা ও বিভিন্ন পার্টিতে যোগদান করিয়া এবং স্কটল্যাণ্ড, জার্মানি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারলণ্ডে বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া রাজা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, স্বামীজী কেন বিদেশভ্রমণের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। জার্মানির সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী, ইটালির মহারানী, বেলজিয়ামের রাজা ও ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তবংশীয়দের আদর-আপ্যায়নে রাজা স্বদেশের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন। বিদেশে রাজার সাফল্যের সংবাদ পাইয়া স্বামীজী খুশী হইলেন। মরী হইতে তিনি জগমোহনলালকে লিখিলেন :

'I need not say how proud I feel of the Raja's success. I told him years ago that he and I are both born to do great things and this is only the beginning .....He was rather diffident of his powers, now he will have to believe in himself. Lord be thanked and out of this—great things will come.'

রাজা সম্বন্ধে স্বামীজী একবার বিদেশ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও লিখিয়াছিলেন, 'কার বাপের সাধ্য খেতড়ির রাজাকে দাবায়? মা জগদম্বা তার শিয়রে!' বিদেশ-প্রত্যাগত রাজাকে যথোপযুক্ত অভিনন্দন দেওয়ার জন্য স্বামীজী মাদ্রাজে রামকৃষ্ণানন্দকে ও কলিকাতায় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নির্দেশ পাঠাইলেন, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কয়েক-দিন পর তিনি নিজে একটি অভিনন্দন-বাণীর খসড়া লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দকে নির্দেশ দিলেন :

'উহা সোনালী রঙে ছাপাইয়া একটি সভায় প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক সকলেই সহি করিবে, কেবল আমার নামের জায়গাটা খালি রাখিবে—আমি খেতড়ি যাইয়া সহি করিব, এবিষয়ে কোন ত্রুটি না হয়।...'

জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে বোম্বাই হইতেও একটি অভিনন্দন প্রদানের ব্যবস্থা

হইল। ২২শে অক্টোবর মহারাজা অজিত সিংহ বোম্বাই পৌঁছাইলে পরদিন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারক মহাদেব রানাড়ের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় রাজাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়।

দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাজা স্বামীজীকে একবার খেতড়ি আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ জানাইলেন। উদ্দেশ্য গুরুদেবকে দর্শন ও সেবা করিবেন এবং প্রজাদের মধ্যে স্বামীজীর ভাব প্রচার করিবেন। স্বামীজীও একবার খেতড়ি যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। রাজা সাগ্রহে স্বামীজীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী সদলবলে দিল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া আলোয়ার অভিমুখে যাইতেছিলেন, পথে রেওয়াড়ি স্টেশনে দেখিলেন, খেতড়িরাজের লোকজন পালকি উট ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত। স্বামীজীর তথায় অবতরণ করা সম্ভব হইল না, তিনি পূর্ব ব্যবস্থানুসারে আলোয়ার চলিয়া গেলেন।

সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তিনি জয়পুর উপস্থিত হইলেন ও তথায় 'খেতড়ি হাউসে'বিশ্রাম লইলেন, জয়পুর হইতে খেতড়ি নব্বই মাইল মরুভূমির মধ্য দিয়া পথ। অভ্যর্থনা করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি করিয়া রাজা নিজে ১৮ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর চরণ বন্দনা করিলেন। ক্ষুদ্র খেতড়ি-রাজ্য আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল। চতুর্দিকে দীপসজ্জা, আতসবাজী, ভোজ, আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সমারোহে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পূর্বে রাজা ইওরোপ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছেন, এখন রাজাপ্রজা সকলেরই প্রিয় স্বামীজী দেশে-বিদেশে বেদান্তের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া দীর্ঘকাল পরে খেতড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন, এই উৎসব যেন রাজগুরু ও রাজার বিজয়োৎসব। জয়োল্লাসে জায়গীরদার ও প্রজাগণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে স্বামীজী ও মহারাজাকে স্বাগত জানাইতে প্রস্তুত হইল। ১২ই ডিসেম্বর সাধারণের পক্ষ হইতে জায়গীদারগণ রাজগুরু ও রাজা—উভয়কে অভিনন্দিত করিলে তাঁহারাও উপযুক্ত উত্তর দিলেন।

১৭ই ডিসেম্বর স্বামীজী ও খেতড়িরাজকে মহাসমারোহে অভিনন্দনের জন্য ও বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের জন্য খেতড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে মহতী সভার আয়োজন হইল। মহারাজের অনুরোধে স্বামীজী ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিলেন, বিভিন্ন সমিতি হইতে মহারাজা ও স্বামীজীকে অভিনন্দন প্রদত্ত হইল; স্বামীজী স্বয়ং রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে মহারাজাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন। তদুত্তরে মহারাজা সঙ্ঘের সকলকে, বিশেষতঃ স্বামীজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, স্বামীজীর উপদেশানুসারে রাজ্যে জনসাধারণের শিক্ষাব্যবস্থার প্রভূত উন্নতিসাধন করা হইয়াছে, বর্তমানে ঔষধালয় স্থাপন ও চিকিৎসাবিদ্যা-শিক্ষার উন্নয়নের দ্বারা প্রজাগণের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। বিভিন্ন উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় 'রাজ-উদ্যোগের সহিত প্রজাগণের সহযোগিতা' প্রার্থনা করিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ভাষণ সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার ভাষণে মহারাজা ও প্রজাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন:

'What little have I done for the improvement of India, would not have been done, if Rajaji had not met me.'

তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাদর্শের তুলনামূলক আলোচনাপূর্বক ভারতীয়

পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকাশের চেষ্টা করিতে ও বালকেরা যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে উদ্যোগী হইতে বলিলেন। অভ্যর্থনা-সভায় রাজকর্মচারিবৃন্দ ও সর্দারগণ এবং উপস্থিত নগরবাসিগণ পূর্বপ্রচলিত প্রথানুযায়ী পাঁচটি বৃহৎ পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া মহারাজাকে নজরানা দিলে মহারাজা ঐ অর্থের অধিকাংশ শিক্ষার উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে আদেশ দিলেন। স্বামীজীর খেতড়ি-পরিত্যাগকালে মহারাজা তিন সহস্র মুদ্রা কলিকাতার মঠে প্রেরণ করিলেন।

পাহাড়ের উপর মনোরম একটি বাংলোতে স্বামীজী ও তাঁহার সঙ্গিগণ অবস্থান করিতে-ছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর ঐ বাংলোর হলঘরে মহারাজার সভাপতিত্বে জনকয়েক ইওরোপীয় ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বামীজী বেদান্ত-সম্বন্ধে দেড়ঘণ্টা মনোজ্ঞ একটি ভাষণ দেন। বেদান্তের নব-ব্যাখ্যাতা স্বামীজী ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমগ্র বেদান্ত-দর্শনের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করিয়া, দ্বৈত-বাদ- বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ- ও অদ্বৈতবাদ-প্রচারক আচার্যগণের একদেশদৃষ্টির ভ্রম নির্দেশ করিয়া সর্বশেষে উপনিষদের মহান্ ও উদার ভাব দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান করিলেন। অসুস্থ শরীরে স্বামীজী বক্তৃতা দিতেছিলেন, বক্তৃতা-কালে অত্যধিক দুর্বলতা-বশতঃ ক্লান্ত হইয়া আধঘণ্টা বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলেন। পরে অপেক্ষমাণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তিনি আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা করেন। সর্বশেষে তিনি মহারাজাকে তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত গুণাবলীর ... পাশ্চাত্যে সনাতন ধর্মপ্রচারে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

যে কয়েকদিন স্বামীজী খেতড়িতে ছিলেন, রাজা তাঁহার পূত সঙ্গ লাভ করিয়া এবং গুরুদেবকে যথাসাধ্য সেবা করিয়া প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছিলেন। একদিন স্বামীজী অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, পার্শ্বে অনুগত শিষ্যও চলিয়াছেন। কণ্টকপূর্ণ একটি বৃক্ষশাখা স্বামীজীর গমনপথে বাধা দিতেছে দেখিয়া রাজা উহা একপার্শ্বে সরাইতে চেষ্টা করিলে রাজার হাত কাটিয়া প্রচুর রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বামীজী ইহা দেখিয়া শিষ্যকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলে শিষ্য বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'স্বামীজী, ধর্মের রক্ষাই কি আমাদের চিরকালের কর্তব্য নহে?' খেতড়িতে রাজাকে কয়েকদিনের জন্য আনন্দ দান করিয়া স্বামীজী পুনরায় জয়পুরে আসিলেন। রাজাও সঙ্গে আসিলেন। তথায় স্থানীয় অধিবাসীদের বিশেষ অনুরোধে একটি সভায় রাজার সভাপতিত্বে স্বামীজী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর স্বামীজী কিষেণগড়, আজমীঢ় প্রভৃতি কয়েকটি স্থান ঘুরিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে স্বামীজী কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া আলমোড়া যাইবার পথে ১৩ই মে নাইনিতালে উপনীত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে আছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ, মিসেস বুল, মিসেস প্যাটারসন, ভগিনী নিবেদিতা ও মিস্ ম্যাকলাউড। নাইনিতালে খেতড়ির রাজা অবস্থান করিতেছিলেন। স্বামীজীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার সঙ্গীদের সহিত রাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন। সেখানে বিশ্রাম করিয়া স্বামীজী সদলবলে আলমোড়া চলিয়া গেলেন।

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে

যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন—তিনি ছিলেন 'বজ্রাদপি' কঠোর এবং 'কুসুমাদপি' মৃদু —এই আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। যাঁহার অনুপম ব্যক্তিত্বের প্রতিভায় পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রকম্পিত হইয়াছিল, তিনি আবার শিশুর মতো সহজ সরল। আলমোড়া হইতে জনকয়েক পাশ্চাত্য শিষ্য সমভিব্যাহারে তিনি কাশ্মীরে গিয়া কিছুদিনের জন্য অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সান্নিধ্য প্রতি মুহূর্তে নূতন তত্ত্বালোক উদ্ঘাটিত করে। মুগ্ধ পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সর্বদাই স্বামীজীকে সেবা করিতে উন্মুখ। তবুও বিদেশী শিষ্যদের অতি আপনজনের মতো সকল কথা কি বলা যায়? স্বামীজীর স্বাস্থ্য এতই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিলেন। হাতে অর্থ নাই, অথচ অসুখে খরচপত্রও বেশি। তিনি ১৮৯৮ খৃঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর বেলগাঁওয়ে তাঁহার শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখিলেন :

'যদি তোমার সুবিধা হয় ৫০৲ টাকা টেলিগ্রাম করিয়া C/o ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চীফ জজ্, কাশ্মীর স্টেট্, শ্রীনগর—এই নামে পাঠাইলে উপকার হইবে।'

সেই সঙ্গে প্রিয় শিষ্য রাজার কথাও স্বামীজীর মনে উদিত হইল, ঐ তারিখেই তিনি রাজাকে লিখিলেন :

'অর্থের বড় টানাটানি যাইতেছে, যদিও আমেরিকান বন্ধুগণ আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। সর্বদা তাঁহাদের নিকট চাহিতে লজ্জা করে। বিশেষতঃ ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে। এই জগতে এক ব্যক্তির নিকট চাহিতে আমার কোন লজ্জা নাই, সেই ব্যক্তি আপনি। আপনি কিছু দেন বা প্রত্যাখ্যান করেন, উভয়ই আমার কাছে সমান।' ধন্য রাজা অজিত সিংহ যাঁহার উপর স্বামীজী এরূপ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে স্বামীজী অনেকটা সুস্থ বোধ করিলে মঠে দুর্গাপূজায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। হৃৎপিণ্ডে নতুন এক উপসর্গ ধরা পড়িয়াছে। সেই হেতু প্রত্যাগমনের পথে প্রিয় শিষ্যকে একবার দেখিবার ইচ্ছা হইলেও তথায় যাওয়া সম্ভব হইল না। মঠে পৌঁছিয়াই তিনি রাজাকে লিখিলেন যে, এতৎসত্ত্বেও রাজা যদি চান, তিনি খেতড়ি যাইয়া রাজাকে একবার দেখিয়া আসিতে পারেন। রাজা নিজে কিছুদিনের জন্য অসুখে ভুগিতেছিলেন। প্রাণঢালা আশীর্বাদ জানাইয়া স্বামীজী তাঁহাকে লিখিলেন, 'আপনার কল্যাণের জন্য দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছি। বিপদে নিরাশ হইবেন না, কারণ জগজ্জননী আপনাকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন।'

১৮৯৮ খৃঃ শেষভাগে লেখা এক পত্রে স্বামীজী নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার সারাংশ যেন শিষ্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন ; তিনি লিখিতেছেন :

The one great lesson I was taught is that life is misery, nothing but misery. Mother knows what is best. Each one of us is in the hands of karma, it works itself out—and no nay. There is only one element in life which is worth having at any cost, and it is love. Love immense and infinite, broad as the sky and deep as the ocean—this is the one great gain in life. Blessed is he who gets it.

এই অমূল্য অভিজ্ঞতা-বারি সিঞ্চনে শিষ্যের জীবনে মহৎ ভাবরাশি মুকুলিত হইয়াছে। রাজার ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন পরিবর্তিত হইয়া এক্ষণে গুরুদেবকে কেন্দ্র করিয়া দেশ ও দশের সেবায় অভিমুখী হইয়াছে।

স্বামীজী রাজার জীবনে ভরকেন্দ্রস্বরূপ। স্বামীজীও তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর; কদাচিৎ তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে উহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়। প্রিয় শিষ্য স্বামীজীর হৃদয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া যে কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা স্বামীজীর একটি পত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। দেশ-বিদেশে স্বামীজীর বহু অনুগত শিষ্য ও অনুরাগী বন্ধু তাঁহাকে নানাভাবে সেবা করিতে, সাহায্য করিতে ব্যগ্র হইলেও ইঁহারা সকলে রাজা অজিত সিংহের মতো অন্তরঙ্গ ছিলেন না। কঠোর সাধন-ভজনে ও দীর্ঘকাল প্রচারকার্যে অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ায় শরীরে নানা ব্যাধির উপসর্গ দেখা দিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি বেলুড় মঠে। মঠের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে এবং তাঁহার জন্য মঠের অর্থ ব্যয় হয়, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না।

১৮৯৮ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর তিনি রাজাকে লিখিতেছেন যে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাধির দরুন তাঁহার খরচপত্র অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আর সামান্য কয়েক বৎসর বাঁচিবেন বলিয়া আশা করেন। সেই কয়েক বৎসর তাঁহার খরচপত্রের জন্য প্রতিমাসে একশত টাকা রাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে তিনি খুবই সুখী হইবেন। পত্র পাইয়া রাজা কলিকাতার ব্যবসায়ী ফুলিচাঁদ মারফত একটি হাত-চিঠাতে পাঁচ শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। মনে হয়, রাজাকে অধিককাল অর্থ পাঠাইতে হয় নাই, কারণ মাসছয়েক পরে স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইওরোপ গমন করেন। গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে দাবিদাওয়ার প্রশ্ন উঠে না, সেখানে আছে প্রেমের মাধুর্য। প্রেমঘন স্বামীজীর আত্মৈকত্বদর্শনরূপ পরম প্রেমে যে-কেহ নির্মলচিত্তে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সমীপবর্তী হইয়াছে, সে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছে। প্রেমের ধর্মই প্রেমাস্পদের গুণাবলী বড় করিয়া দেখা। উল্লিখিত পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছেন :

> As for me, what shall I say—whatever I am in the world have been almost all through your help. You made it possible for me to get rid of a terrible anxiety and face the world and do some work. It may be that you are destined by the Lord to be the instrument again of helping yet grander work, by taking this load off my mind once more.

আপাতদৃষ্টিতে যাহা শুধুমাত্র পিতা-পুত্রোচিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মনে হইয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ—সর্বত্যাগী প্রেমিক সন্ন্যাসীর নির্বিঘ্ন রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে :

> But whether you do this or not 'once loved is always loved', let all my love and blessings and prayers follow you and yours day and night for what I owe you already, and may the Mother whose play is the universe and in whose hands we are mere instruments always protect you from all evil.

গুরুদেবের সতত কল্যাণ-প্রার্থনা শিষ্যের চতুর্দিকে মঙ্গলময়ী বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সংসারের ঝঞ্ঝাবাত্যা হইতে রক্ষা করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র-লীলায় ক্ষুদ্র কাঠবেরালি কর্তব্য করিয়া ধন্য হইয়াছিল, সেইরূপ অজ্ঞাতপ্রায় ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ধনপ্রাণ সর্বস্ব গুরুচরণে অর্পণ করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলা যেন মাধুর্যময় করিয়া তুলিয়াছেন।

স্বামীজীর স্বাস্থ্য অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া পড়াতে চিকিৎসকগণের পরামর্শে এবং গুরুভ্রাতা ও ভক্তদের অনুরোধে ১৮৯৯ খৃঃ ২০শে জুন স্বামীজী পুনরায় পাশ্চাত্য দেশে

গমন করিলেন এবং তথায় অল্পসময়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলে তিনি প্রচারকার্য শুরু করেন। 'Cyclonic Hindu'র উপস্থিতিতে পাশ্চাত্যে পুনরায় আধ্যাত্মিক চিন্তাস্রোত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। প্রায় দেড় বৎসর পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বামীজী ১৯০০ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে হঠাৎ মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পতিবিয়োগসন্তপ্তা সেভিয়ার-গৃহিণীকে সান্ত্বনাদানের জন্য স্বামীজী মায়াবতী গেলেন। মায়াবতীতে ৩রা হইতে ১৮ই জানুআরি পর্যন্ত থাকিয়া তিনি ২৪শে জানুআরি মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইতিমধ্যে ১৮ই জানুআরি প্রাতঃকালে খেতড়ির মহারাজা আকস্মিক দুর্ঘটনায় ইহলীলা সংবরণ করেন। রাজার উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে সেকেন্দ্রায় মহামতি আকবরের সমাধিক্ষেত্রে মেরামতি-কার্য চলিতেছিল। ঐ কার্য পর্যবেক্ষণকালে ৮৬ ফুট উচ্চ একটি মিনার হইতে পদস্খলন হওয়ায় তৎক্ষণাৎ রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ৪০ বৎসর। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলোদ্যানে সুন্দর একটি পুষ্প সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবার পূর্বেই যেন অকালে ঝরিয়া গেল। রাজার মৃত্যুসংবাদ তারযোগে খেতড়ি পৌঁছিলে আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাগণ শোকে মুহ্যমান হইল। দুঃসংবাদ স্বামীজীর নিকটও পৌঁছিল। প্রিয়শিষ্যের মৃত্যুসংবাদ প্রেমিক সন্ন্যাসী নীরবে সহ্য করিলেন। কয়েকমাস পরে ৫ই জুলাই স্বামীজীর মেরী হেলকে লেখা একটি পত্রে এই দুঃখের একটি স্ফুট যেন ভাসিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজী লিখিতেছেন, 'আমার পুরাতন বন্ধু প্রায় সবাই ইহলোক পরিত্যাগ করিতেছে, এমন কি খেতড়ির রাজাও চলিয়া গিয়াছে।'

প্রায় দশবৎসরব্যাপী গুরুশিষ্যের যে অপূর্ব লীলা চলিয়াছিল, সেই অধ্যায়ের যবনিকা পড়িল; কিন্তু বাপ্পা-রাবল-প্রতাপসিংহের শৌর্যবীর্যের স্মৃতিবিজড়িত বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার উত্তরাধিকারীকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ আবাহনের জন্য যুগাচার্য বজ্রকণ্ঠে 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত' মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা আজও রাজপুতানা তথা ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অন্তরে হোক্ তোমার অভ্যুদয়

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

তুমি তো রয়েছ বিশ্ব-ভুবনে ছড়ায়ে
যা কিছু সকলি দেয় তব পরিচয়
তবু ঘুরে মরি তোমায় খুঁজিয়া প্রভু !
কাতর কণ্ঠে ডাকি—কোথা দয়াময় ?
তুমি কি শুধুই মন্দিরে আছ লুকায়ে
পূজার মন্ত্রে জপের মালার মাঝে
যজ্ঞ না হ'লে তুমি কি তৃপ্ত নও ?

তোমা ছাড়া আর বল কী বা কোথা আছে ?
সকলের মাঝে তোমারে চিনিতে দাও
অন্তরে হোক্ তোমার অভ্যুদয়
সদা কাছে আছ—এ কথা যেন না ভুলি
তোমারি মধ্যে আমার হউক লয়—
এই কর দয়াময় ॥

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থারম্ভ-প্রতিজ্ঞা

গণেশং গাঙ্গেয়ং গিরমথ গুরুং বোধজনকম্
গিরীশং গোবিন্দং প্রণতজন-তাপোপশমকম্।
রমাং গৌরীং গঙ্গাং সপদি হৃদি নত্বা স্বমতয়ে
শ্রুতিপ্রোক্তাঃ সংজ্ঞাঃ পরমতিদাশ্চোপকলয়ে ॥ ১ ॥

— ০ —

অদ্বৈত-বেদান্তের গ্রন্থে পারিভাষিক শব্দ বা সংজ্ঞাসমূহের সংকলন নিষ্প্রয়োজন ও ব্যর্থ, কারণ 'সংজ্ঞা, সংজ্ঞী' এরূপ ব্যবহার ভেদমূলক এবং অদ্বৈতবাদে পারমার্থিক কোন ভেদ স্বীকৃত হয় না—এই শঙ্কার উত্তরে বলা হইতেছে :

'অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।'
ইতি বৃদ্ধবচো মত্বা সংজ্ঞাগ্রন্থঃ প্রবর্তিতঃ ॥ ২ ॥

'সর্ববেদান্ত-প্রতিপাদ্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম-বিষয়ক ব্যাখ্যানাদি' অধ্যারোপ ও অপবাদরূপ উপায়-সহায়েই করা হইয়া থাকে'—জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্যগণের এইরূপ উক্তিসকল অনুসরণ করত বেদান্তসংজ্ঞা-বিষয়ক এই গ্রন্থখানি রচিত হইতেছে।

১. অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপের ন্যায় বস্তুতে অবস্তু আরোপকে **অধ্যারোপ** বলে। বস্তুতঃ এক অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহাতে কল্পিত। রজ্জুজ্ঞান-সহায়ে ভ্রান্তি নষ্ট হইলে রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুমাত্ররূপে অবশিষ্ট থাকে, তেমনি অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে জগদ্‌ভ্রম বিনষ্ট হইলে অধিষ্ঠান নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন—ইহাই **অপবাদ**। অধ্যারোপ-সহায়েই সমগ্র গ্রন্থে সংজ্ঞাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে ও অবশেষে অপবাদ কথনপূর্বক গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

অধ্যারোপ ও অপবাদ

পূর্বশ্লোকোক্ত অধ্যারোপ ও অপবাদ শ্লোকাকারে বর্ণিত হইতেছে :

অবস্তুবিষয়া বুদ্ধিরধ্যারোপণমুচ্যতে।
যথার্থবিষয়া বুদ্ধিরপবাদোঽভিধীয়তে ॥ ৩ ॥

(কোনও অধিষ্ঠানে) ভ্রান্তিদ্বারা আরোপিত মিথ্যাবস্তুবিষয়ক জ্ঞান 'অধ্যারোপ' শব্দে কথিত হইয়া থাকে এবং সত্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান 'অপবাদ' নামে প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মে বস্তুতঃ জগৎ না থাকিলেও আকাশে নীলিমার ন্যায় আরোপিত জগৎ প্রতীত হয়। আরোপিত বস্তুমাত্রই মিথ্যা হইয়া থাকে। ব্রহ্মে আরোপিত মিথ্যাভূত জগৎ **অধ্যারোপের** দৃষ্টান্ত। যেমন 'তালপুকুর' এই শব্দে তালবৃক্ষের সাহায্যে পুকুরকে দেখানো হয়, সেইরূপ গুরু জগৎ-দর্শনকারী অজ্ঞ শিষ্যকে সৃষ্টি-আদি বর্ণন করত অর্থাৎ অধ্যারোপ দ্বারা জগতের মূলে যে ব্রহ্ম আছেন, তাহারই ইঙ্গিত করেন।

অপবাদ অর্থাৎ 'নেতি,' 'নেতি'-রীতিতে বিচার। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে এই জগদ্‌ভ্রম হইয়াছে। যে বিচার দ্বারা এই জগৎ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া ব্রহ্মই অবাধিতরূপে থাকিয়া যান, তাহাকেই **অপবাদ** বলে।

দ্বিবিধ সংজ্ঞা

অতঃপর অধ্যারোপ আশ্রয় করত বেদান্তোক্ত সংজ্ঞাসমূহ প্রদর্শিত হইতেছে [যেগুলির দ্বিবিধ সংজ্ঞা আছে, বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সেইগুলি বলা হইতেছে]:

প্রপঞ্চো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো হ্যজ্ঞানং দ্বিবিধং স্মৃতম্।
শরীরং দ্বিবিধং সূক্ষ্মং স্থূলং প্রোক্তং দ্বিধৈব হি ॥ ৪ ॥

(বেদান্তে) জগৎ[১] দুই প্রকার বলা হয়। অজ্ঞানও[২] দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরও[৩] দুই প্রকার কথিত হইয়া থাকে।

১. স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ প্রপঞ্চের (জগতের) সমষ্টি এক মহাপ্রপঞ্চ কথিত হইয়া থাকে। উহাই বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। আকাশাদি পঞ্চভূত, পঞ্চভূতকার্য ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডভূত ভূরাদি পাতালান্ত চতুর্দশ ভুবন এবং ভুবনমধ্যস্থ জরায়ুজাদি চতুর্বিধ ভূতগ্রাম—এই সমস্তই **বাহ্য প্রপঞ্চ**। দেহাভ্যন্তরে বিদ্যমান জগৎই আন্তরপ্রপঞ্চরূপে প্রসিদ্ধ। অন্নময়াদি পঞ্চকোষ, জন্ম-স্থিতিবৃদ্ধ্যাদি ষড়্‌ভাববিকার, ত্বঙ্‌-মাংসাদি ষট্‌কৌষিক, অশনাপিপাসাদি ষট্‌ ঊর্মি, কামক্রোধাদি ষট্‌ অরি, বিবেকাদি সাধনচতুষ্টয় ইত্যাদি সকলই* **আন্তর প্রপঞ্চ**।

২. সমষ্টি- ও ব্যষ্টিভেদে অজ্ঞানের দুই ভেদ। সমষ্টিদৃষ্টিতে যেরূপ এক বন ও ব্যষ্টিদৃষ্টিতে বহু বৃক্ষ বলা হইয়া থাকে, তদ্রূপ সমষ্টি-অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি এবং ব্যষ্টি-অজ্ঞান জীবের উপাধি।

'কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ'—এই প্রসিদ্ধ বচনে অজ্ঞানকার্য অন্তঃকরণ জীবের উপাধি ও মূল কারণ সমষ্টি-অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি—এইরূপ বুঝিতে হইবে। অজ্ঞান কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে আচার্যগণ-কথিত বিবিধ **লক্ষণ**: (ক) 'কার্যমাত্রোপাদানত্বে সতি সদসত্ত্যামনির্বচনীয়ত্বম্'—যাহা কার্যমাত্রের উপাদান এবং সৎ (আছে) বা অসৎ (নাই) কোন রূপেই নির্বচন করা যায় না, তাহাই **অজ্ঞান**। পুনঃ—(খ) 'মিথ্যাত্বে সতি সাক্ষাজ্‌জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্'—যাহা বস্তুতঃ মিথ্যা ও অধিষ্ঠানের অপরোক্ষজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তির যোগ্য, তাহা **অজ্ঞান**। অথবা (গ) 'অনাদ্যুপাদানত্বে সতি মিথ্যাত্বম্'—অনাদি উপাদানরূপ মিথ্যা বস্তুই **অজ্ঞান**।

মূলকারণরূপ ও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপ বলিয়া এই অজ্ঞানকে **মূলপ্রকৃতি** বা **প্রধান** বলা হয়। অচিন্ত্যশক্তিমান্ এবং অঘটনঘটনপটু বলিয়া অজ্ঞান **'মায়া'** নামেও প্রসিদ্ধ। বিদ্যাদ্বারা নিরস্ত হইয়া যায় বলিয়া ইহার নাম **অবিদ্যা**। সর্বপ্রপঞ্চ ইহাতে লীন হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা **প্রলয়** নামে খ্যাত। ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ত্বহেতু **অব্যক্ত**, আকার-

* পঞ্চকোষ : অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।
ষট্‌ বিকার : জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ।
ষট্‌কৌষিক : ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি।
ষট্‌ ঊর্মি : জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক ও মোহ।
ষট্‌ অরি : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য।
সাধনচতুষ্টয় : নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমাদি (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান,) ষট্‌সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব।

শূন্য বলিয়া **অব্যাকৃত**, ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নাশ হয় না বলিয়া **অক্ষর**, অস্বাতন্ত্র্যহেতু **শক্তি** এবং কূটের (নেহাই) ন্যায় নির্বিকার ব্রহ্মে আশ্রিত বলিয়া **কূটস্থ**—অজ্ঞান এই সকল বিভিন্ন নামেও কথিত হইয়া থাকে।

৩. সমষ্টি- ও ব্যষ্টিভেদে স্থূল শরীর দুই প্রকার এবং সূক্ষ্ম শরীরও তদ্রূপ সমষ্টি- ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ।

শক্তিদ্বয়ং চ বিখ্যাতং তথা নিঃশ্রেয়সদ্বয়ম্।

সংশয়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তো দ্বিধাঽসম্ভাবনা তথা ॥ ৫ ॥

(বেদান্তশাস্ত্রে) শক্তি[১] ও মোক্ষ[২] দ্বিবিধরূপে প্রসিদ্ধ, সংশয়[৩] এবং অসম্ভাবনাও[৪] দ্বিবিধরূপে কথিত হইয়া থাকে।

১. আবরণ ও বিক্ষেপ—অজ্ঞানের এই দুইটি শক্তি।

'অন্তর্দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদং বহিশ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ। স্বরূপং চাবৃণোত্যেষাবরণশক্তিরুচ্যতে ॥'

—অর্থাৎ অন্তরে দ্রষ্টৃ-দৃশ্য ভেদ, বাহিরে ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ভেদ, আত্মস্বরূপাবগাহিনী বুদ্ধি এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম—এই সকলকে যে শক্তি আবৃত করিয়া রাখে, তাহাই অজ্ঞানের **আবরণশক্তি**। স্বল্পপরিমাণে মেঘ যে প্রকার দর্শকের চক্ষুর আবরকরূপে উপস্থিত হইয়া বহুযোজন-বিস্তীর্ণ সূর্যমণ্ডলকে যেন আবরণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার যে শক্তিপ্রভাবে পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান দ্রষ্টার বুদ্ধির আবরকরূপে প্রকট হইয়া অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে যেন আচ্ছাদন করিয়া থাকে বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে **আবরণশক্তি** বলে।

'বিবিধরূপতাভানং বিক্ষেপঃ সমুদাহৃতঃ'—অর্থাৎ যে শক্তিপ্রভাবে অজ্ঞান বিবিধ কার্যাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয়, তাহাই উহার **বিক্ষেপশক্তি** নামে প্রসিদ্ধ।

২. 'দুঃখনিবৃত্তিরানন্দপ্রাপ্তির্নিঃশ্রেয়সদ্বয়ম্'—অর্থাৎ আত্যন্তিক অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি—ইহাই মোক্ষের দুই রূপ।

৩. প্রমাণগত ও প্রমেয়গতরূপে সংশয় দুই প্রকার।

শ্রুতিভির্বোধ্যতে ব্রহ্ম কর্ম বা প্রতিপাদ্যতে। ইতি যা মানসী বৃত্তিঃ প্রমাণগতসংশয়ঃ॥

—শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয় 'কর্ম অথবা শুদ্ধ ব্রহ্ম'?—এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে **প্রমাণগতসংশয়** বলে।

'জগতঃ কারণং ব্রহ্ম যদ্বা প্রকৃতিরুচ্যতে। ইতি যা মানসী বৃত্তিঃ প্রমেয়গতসংশয়ঃ॥

—জগৎকারণ কি বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম অথবা সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত অচেতন প্রধানাদি, এই প্রকার চিত্তবৃত্তি **প্রমেয়গতসংশয়** নামে কথিত হয়।

৪. প্রমাণগত অসম্ভাবনা ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনা ভেদে অসম্ভাবনাও দুই প্রকার। প্রসিদ্ধ বস্তু বলিয়া ব্রহ্মও অবশ্যই প্রসিদ্ধ পৃথিব্যাদির ন্যায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরগ্রাহ্য হইবেন। অতএব শ্রুতি এইরূপ সিদ্ধবস্তুর প্রতিপাদন করিতে পারে না, কারণ অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপনেই শ্রুতির সার্থকতা। জ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপনে শ্রুতির ব্যর্থতা-প্রাপ্তি হয়। সুতরাং শ্রুতি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক নহে—এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তির নাম **প্রমাণগত অসম্ভাবনা**।

ব্রহ্ম জগৎ হইতে বিলক্ষণ পৃথক্, সুতরাং উহা কি প্রকারে জগৎকারণ হইবে? অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন—এই প্রকার নিশ্চয়জ্ঞানের নামই **প্রমেয়গত অসম্ভাবনা**।

অন্যথাভাবনা প্রোক্তা দ্বিধা বেদান্তদর্শিভিঃ।
প্রজ্ঞাদ্বয়ং সমাখ্যাতং সমাধিদ্বয়মেব হি ॥ ৬ ॥

অন্যথাভাবনা[১], প্রজ্ঞা[২] এবং সমাধি[৩]—এই সকলই বেদান্ততত্ত্বপারদর্শিগণ কর্তৃক দ্বিবিধরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১. অন্যথাভাবনা অর্থাৎ বিপরীতভাবনা প্রমাণগত ও প্রমেয়গতরূপে দুই প্রকার।

'শ্রুত্যা ন বোধ্যতে ব্রহ্ম কর্মৈব প্রতিপাদ্যতে। ইত্যেবং নিশ্চয়শ্চিত্তে প্রমাণে হি বিপর্যয়ঃ॥'
—অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ বস্তু হইলে প্রমাণান্তরগ্রাহ্য হইবেন এবং তাহা হইলে তৎপ্রতিপাদনে শ্রুতির ব্যর্থতাপত্তি হইবে, অতএব সমগ্র শ্রুতিই কর্মপ্রতিপাদক, ব্রহ্মপ্রতিপাদক নহে,—এইরূপ নিশ্চয়কে **প্রমাণগত বিপরীতভাবনা** বলে।

'ব্রহ্ম ন জগতো হেতুঃ কিন্তু প্রকৃতিরুচ্যতে। ইতি বিনিশ্চয়ো বিজ্ঞৈর্মেয়বিভ্রম উচ্যতে॥'
—কার্য ও কারণরূপে প্রসিদ্ধ পট ও তন্তুর সমানরূপতা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ হন, তবে কার্য-জগৎ ও কারণ-ব্রহ্মের সারূপ্য অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু সেরূপ কোন সারূপ্য দেখা যায় না, অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, সাংখ্যোক্ত প্রধান (মূলপ্রকৃতি)-আদিই জগৎ-কারণ—এই জ্ঞানের নামই বিজ্ঞগণ **প্রমেয়গত বিপরীতভাবনা** বলিয়া থাকেন। এই প্রমেয়গত বিপরীতভাবনা-বলেই দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে।

(সংশয়, অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সংশয়ে 'ইহা এইরূপ বা অন্যরূপ', এইপ্রকার ভাবনামাত্র হইয়া থাকে। অসম্ভাবনায় 'ইহা এইরূপ নহে' এবম্বিধ নিশ্চয়মাত্র হয়, কিন্তু কিরূপ তাহা নির্ণীত হয় না। বিপরীতভাবনাতে এক পক্ষ নিষিদ্ধ হইয়া তদ্বিপরীত রূপটি নিশ্চিতরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।)

২. স্থিতপ্রজ্ঞা ও অস্থিতপ্রজ্ঞা ভেদে অপরোক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞান ভেদে প্রজ্ঞা দ্বিবিধ।

৩. সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে সমাধি দুইপ্রকার। জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়াদি ত্রিপুটিরূপ বিকল্পের অপ্রতীতি-সহকারে আত্মাতে চিত্তসমাধানের নাম **নির্বিকল্প সমাধি**। পূর্বোক্ত ত্রিপুটিরূপ বিকল্পের স্ফুরণপূর্বক আত্মাতে চিত্ত সমাহিত হইলে ঐ অবস্থাকে **সবিকল্প সমাধি** বলা হইয়া থাকে।

অথো পরমহংসানাং সংন্যাসো দ্বিবিধো মতঃ।
তত্রাপি দ্বিবিধো বিদ্বৎসংন্যাসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

পরমহংসাদির সন্ন্যাস[১] দ্বিবিধ প্রসিদ্ধ। উহার মধ্যেও আবার বিদ্বৎ সন্ন্যাস[২] দ্বিবিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. বিবিদিষা সন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাসভেদে পরমহংস সন্ন্যাস দ্বিবিধ। পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষই পরমহংস সন্ন্যাসের অধিকারী। প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ বিবেকবৈরাগ্যাদি চতুষ্টয় সাধনসম্পন্ন পরবৈরাগ্যবান্ পুরুষ যে সর্বকর্মসন্ন্যাস করিয়া থাকেন, তাহা **বিবিদিষা সন্ন্যাস**। ইহা প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দণ্ডধারণাদিক আশ্রমরূপ।

ইহ ও পূর্বজন্মানুষ্ঠিত সাধনপ্রভাবে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থাশ্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ বাসনাক্ষয়-মনোনাশ-তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস-সহায়ে চিত্তবিক্ষেপের নিবৃত্তিরূপ

জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দলাভার্থ নিবৃত্তিপ্রধান হইয়া যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা যে সন্ন্যাস তাঁহার স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার নাম বিদ্বৎসন্ন্যাস। জীবন্মুক্তিসুখলাভই এই সন্ন্যাসের ফল।

২. 'জাতরূপধরশ্চৈকঃ কমণ্ডলুধরোঽপরঃ'—অর্থাৎ **জাতরূপধর** বা **দিগম্বর** এবং **কমণ্ডলুধারী**—বিদ্বৎসন্ন্যাসী এই দুই প্রকার হইয়া থাকেন।

নিগ্রহো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ ক্রমেণ চ হঠেন চ।
সামান্যশ্চ বিশেষশ্চ দ্বিধাহংকার উচ্যতে ॥ ৮ ॥

ক্রমনিগ্রহ[১] ও হঠনিগ্রহ[২]রূপে মনোনিগ্রহ দ্বিবিধ জ্ঞাতব্য। সামান্য[৩] ও বিশেষ[৪]রূপে অহংকারও দ্বিবিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. যমনিয়মাদি অভ্যাস, আত্মবিচার বা আরাধ্য দেবতা-বিশেষে নিষ্ঠা ভক্তি ইত্যাদি উপায় অবলম্বনে ক্রমশঃ মনের নিরোধ—**ক্রমনিগ্রহ**।

২. প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণ নিরোধপূর্বক মনের হঠাৎ নিগ্রহ—**হঠনিগ্রহ**।

৩. 'অহমস্মি'—এইরূপ অহংকার, ইহাই মহত্তত্ত্ব, ইহাকে **সামান্যরূপ-সমষ্টি-অহংকার** বলে। হিরণ্যগর্ভও ইহারই নাম।

৪. আমি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, সুখী দুঃখী, কর্তা ভোক্তা, স্থূল কৃশ ইত্যাদি **বিশেষ অহংকার**।

পরোক্ষঞ্চাপরোক্ষঞ্চ দ্বিবিধং জ্ঞানমুচ্যতে।
বৈদিকং লৌকিকং চেতি তদপি দ্বিবিধং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

পরোক্ষ[১] ও অপরোক্ষ[২] ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার বলা হয়। বৈদিক[৩] ও লৌকিক[৪] ভেদে উক্ত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পুনঃ দ্বিবিধ হইয়া থাকে।

১. সাক্ষাৎকার না হইয়া বস্তুর কেবল অস্তিত্বমাত্র জ্ঞান।

২. সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

৩. বৈদিক পরোক্ষ জ্ঞান : 'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গকামী যাগ করিবেন, এইরূপ বাক্যে স্বর্গাদিবিষয়ক এবং 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে। 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ নিশ্চিত বোধকেই ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। বৈদিক অপরোক্ষ জ্ঞান : ইহা একমাত্র 'মহাবাক্য' হইতেই উৎপন্ন হয়। 'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্য শ্রবণজাত 'আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চিত বোধকেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান বলে।

৪. অনুমানাদি-সহায়ে লৌকিক পরোক্ষ জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়সংযুক্ত ঘটাদিতে লৌকিক অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তত্রাপি দ্বিবিধং প্রোক্তং দৃঢ়ং চাপ্যদৃঢ়ং তথা।
অপরোক্ষং দৃঢ়ং জ্ঞানমলং নিঃশ্রেয়সায় হি ॥ ১০ ॥

দৃঢ় ও অদৃঢ়[১] ভেদে অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানও দ্বিবিধ বলা হয়। দৃঢ় অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানই নিশ্চিতরূপে মোক্ষহেতু।

১ আপাত জ্ঞান, সংশয়াদি সহিত জ্ঞান বা অবিচারিত বাক্যজন্য জ্ঞান।

শারীরো মানসশ্চেতি তাপ আধ্যাত্মিকো দ্বিধা।
বর্ণধ্বন্যাত্মভেদেন শব্দো দ্বিবিধ উচ্যতে।
দুর্গন্ধশ্চ সুগন্ধশ্চ দ্বিবিধো গন্ধ ঈরিতঃ ॥ ১১ ॥

শারীরিক ও মানসিকভেদে আধ্যাত্মিক ক্লেশ[১] দুই প্রকার। বর্ণ ও ধ্বনিভেদে শব্দ[২] দুই প্রকার এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধভেদে গন্ধও দুই প্রকার কথিত হয়।

১. বাতপিত্তশ্লেষ্মাদির বৈষম্যজনিত জ্বর, গুল্ম (যকৃৎবৃদ্ধি), শূলবেদনাদি-প্রযুক্ত তাপাদি **শারীর তাপ** নামে খ্যাত এবং অপর কর্তৃক অপকারাদি-নিবন্ধন ক্রোধ ও অসূয়াদি সম্পাদিত চিত্তব্যাকুলতাই **মানস তাপ** নামে কথিত হয়।

২. 'ক'-কারাদি বর্ণরূপ ও মন্দ-তারত্বাদি ধ্বনিভেদে শব্দ দ্বিবিধ।

প্রতিবিম্বোঽবচ্ছেদশ্চ বাদো দ্বিবিধ উচ্যতে।
অবান্তর-মহাবাক্যভেদাদ্ বাক্যং দ্বিধেরিতম্ ॥ ১২ ॥

বেদান্তে প্রতিবিম্ববাদ[১] ও অবচ্ছেদবাদ, এই দুই প্রকার বাদ স্বীকৃত। অবান্তরবাক্য[২] ও মহাবাক্য[৩] ভেদে বাক্যও দ্বিবিধ কথিত হয়।

১. অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ কথিত হইয়াছে। পুনঃ প্রতিবিম্বসত্যত্ববাদ ও প্রতিবিম্বমিথ্যাত্ববাদ (= আভাসবাদ) ভেদে প্রতিবিম্ব-বাদও দ্বিবিধ স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রতিবিম্বসত্যত্ববাদী বিবরণ-কার প্রভৃতি আচার্যগণ বলেন: শুদ্ধচৈতন্য ও অজ্ঞানের অনাদি সম্বন্ধবশতঃ শুদ্ধচৈতন্যে অজ্ঞাননিষ্ঠতারূপ ভ্রম হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞানস্থ চৈতন্য-প্রতিবিম্বই 'জীবচৈতন্য' এবং অজ্ঞানোপহিত শুদ্ধচৈতন্যই বিম্ব 'ঈশ্বরচৈতন্য'। প্রতিবিম্ববাদে বলা হয় যে, দর্পণে মুখ-দর্শনকালে নেত্রদ্বারা বহির্গত অন্তঃকরণবৃত্তি দর্পণাদি উপাধিতে প্রতিহত হইয়া গ্রীবাস্থ মুখকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করে। উপাধি সন্নিধানে একই মুখ প্রভৃতি পদার্থে বিম্বত্ব ও প্রতিবিম্বত্বরূপ ধর্মদ্বয় প্রতীত হয় মাত্র। অভিপ্রায় এই যে, অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুরশ্মির সহিত দর্পণ স্পর্শ করিয়াই মুখ স্পর্শ করে বলিয়া দর্পণ ও মুখের মধ্যে দেশগত ব্যবধান অনুভব করে না। এজন্য মুখটিকে দর্পণস্থ বলিয়া অনুভব করে। মুখের দর্পণস্থতাই বা দর্পণধর্মযুক্ততার ভান হওয়াই প্রতিবিম্বতার ভান। প্রতিবিম্বকে মুখ হইতে পৃথক্ মনে করাই ভ্রম। অতএব বিম্ব-প্রতিবিম্বের অভেদ-বশতঃ প্রতিবিম্বও সত্য। প্রত্যঙ্মুখত্ব, দর্পণাদি উপাধিস্থত্ব ও বিম্বভিন্নত্ব ভ্রম হইয়া থাকে মাত্র। প্রতিবিম্ব স্বরূপতঃ সত্য বলিয়া তাহাকে সত্য বলা হয়। আভাসের স্বরূপকে ছায়া বলা হয়। এজন্য উহা মিথ্যা। ইহাই আভাস ও প্রতিবিম্ববাদের মধ্যে ভেদ। প্রতিবিম্ববাদে ধর্মী সত্য, ধর্ম মিথ্যা। আভাসবাদে উভয়ই মিথ্যা।

প্রতিবিম্বমিথ্যাত্ববাদী অর্থাৎ **আভাসবাদী** বিদ্যারণ্যস্বামী প্রভৃতি আচার্যগণ বলেন: সাধিষ্ঠান শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়াতে প্রতিবিম্বই **ঈশ্বরচৈতন্য** ও সাধিষ্ঠান মলিনসত্ত্বপ্রধান অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বই **জীবচৈতন্য**। অনির্বচনীয় অনাদি অজ্ঞান-কল্পিত বলিয়া ঈশ্বর ও জীব—এই উভয়ই অনির্বচনীয় মিথ্যা।

অবচ্ছেদবাদী বাচস্পতি মিশ্র বলেন: রূপবিশিষ্ট মুখেরই রূপবিশিষ্ট দর্পণে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। নীরূপ শুদ্ধচৈতন্যের নীরূপ অজ্ঞানে বা নীরূপ অন্তঃকরণাদিতে প্রতিবিম্ব হওয়া অসম্ভব বলিয়া অবচ্ছেদবাদই স্বীকার্য। অতএব স্বচ্ছকাচকুম্ভাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই **ঈশ্বর** ও মলিন মৃদ্ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় অবিদ্যাবচ্ছিন্ন অথবা অবিদ্যা-পরিণামরূপ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব, এইরূপ স্বীকার্য।

২. পরমাত্মা ও জীবের স্বরূপাববোধক অর্থাৎ 'তৎ' বা 'ত্বম্' পদার্থের বোধক বাক্যগুলি **অবান্তরবাক্য**। যথা, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...' ইহা 'তৎ' পদের বাচ্যার্থের বোধক-মাত্র এবং' সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্য 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থের বোধকমাত্র হইয়া থাকে। পুনঃ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি শ্রুতিবাক্য 'তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কূলে...' 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থের বোধকমাত্র এবং 'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ' ইত্যাদি বাক্য 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থের বোধকমাত্র হইয়া থাকে।

এই অবান্তর বাক্যগুলি হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

৩. জীব ও পরমাত্মার অভেদবোধক অর্থাৎ 'ত্বম্' ও 'তৎ' পদার্থের অভেদবোধক বাক্যগুলি **মহাবাক্য**। যথা, ঋগ্বেদের মহাবাক্য 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', যজুর্বেদের মহাবাক্য 'অহংব্রহ্মাস্মি', সামবেদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' এবং অথর্ববেদের মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

তটস্থং স্বরূপং চ লক্ষণং ব্রহ্মণো দ্বিধা।
দৈবাসুরী চ গীতায়াং সম্পদ্ ভগবতেরিতা ॥ ১৩ ॥

তটস্থলক্ষণ[১] ও স্বরূপলক্ষণ[২] ভেদে ব্রহ্মের লক্ষণ দুই প্রকার। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈবী[৩] ও আসুরী[৪] ভেদে সম্পদ্ (গুণোৎকর্ষ বা প্রকৃতি) দ্বিবিধ উল্লেখ করিয়াছেন।

১. 'কাদাচিৎকত্বে সতি ব্যাবর্তকত্বং তটস্থলক্ষণত্বম্'—যাহা লক্ষ্যে কদাচিৎ বিদ্যমান থাকিয়া অন্য পদার্থের ব্যাবর্তক বা নিষেধক হয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ। যথা, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে...' এই বাক্যের জগৎকর্তৃত্বাদি গুণ নির্গুণ ব্রহ্মে নাই ও সগুণ ব্রহ্মে আছে বলিয়া উহা কাদাচিৎক হইল এবং প্রধানাদি কারণবাদের নিষেধক হওয়ায় ব্যাবর্তকও হইল, অতএব এই বাক্য ব্রহ্মের **তটস্থ লক্ষণ**।

২. 'স্বরূপং সদ্ ব্যাবর্তকং স্বরূপলক্ষণম্'—যাহা স্বরূপে সদা বিদ্যমান থাকিয়া অন্য বস্তুর নিষেধক হয়, তাহা **স্বরূপলক্ষণ**। যথা, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই বাক্যের সত্যজ্ঞানাদি ব্রহ্মস্বরূপে সদা বিদ্যমান থাকিয়া, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অসৎ জড় দুঃখরূপ জগৎকে নিষেধ করে বলিয়া ঐ সত্যজ্ঞানাদি পদগুলি ব্রহ্মের **স্বরূপলক্ষণ**।

৩. অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে স্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ ইত্যাদি দৈবী **সম্পদ্** (গীতা ১৬।১—৩)। শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় কর্মদ্বারা বিকশিত মানবপ্রকৃতিই দৈবীগুণে বিভূষিত হইয়া থাকে। এই দৈবী **প্রকৃতিই** মোক্ষের সহায়ক।

৪. কাম, দম্ভ, দর্প, অভিমান ইত্যাদির নাম **আসুরী সম্পদ্** (গীতা ১৬।৪)। যে ভোগবাসনা, বিষয়াসক্তি ও দম্ভাদি মানুষকে পুনঃপুনঃ জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্তি করায়, তাহাই **আসুরী সম্পদ্**। ইহাই সংসার-বন্ধনের কারণ।

জ্ঞানাধ্যাসোঽর্থাধ্যাসশ্চ দ্বিবিধোঽধ্যাস উচ্যতে।
সগুণনির্গুণভেদাত্নুপাসনা দ্বিধেরিতা ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানাধ্যাস ও অর্থাধ্যাস ভেদে অধ্যাস[১] দ্বিবিধ এবং **সগুণ** উপাসনা ও **নির্গুণ** উপাসনা ভেদে উপাসনাও[২] দ্বিবিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. 'পরত্র পরাবভাসঃ অধ্যাসঃ'—এক বস্তুতে অপর বস্তুর আরোপের নাম **অধ্যাস**। উহা ভ্রান্তিজ্ঞান ও তদ্বিষয় মিথ্যাবস্তু—এই উভয়বিষয়ক হইয়া থাকে। 'অবভাসতে ইতি অবভাসঃ'—এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অবভাস শব্দ **অর্থাধ্যাসপর** অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুবিষয়ক হয় এবং 'অবভাসতে অর্থঃ অনেন'—এই ব্যুৎপত্তি-সহায়ে অবভাস পদ **জ্ঞানাধ্যাসপর** অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুর মিথ্যাজ্ঞান-বিষয়ক হইয়া থাকে। পুনঃ অর্থাধ্যাস **স্বরূপাধ্যাস** ও **সংসর্গাধ্যাস** ভেদে দ্বিবিধ। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস ও আত্মাতে অনাত্মার অধ্যাস—স্বরূপাধ্যাসের দৃষ্টান্ত। কারণ মিথ্যাবস্তু স্বরূপতই অধ্যস্ত হইয়া থাকে। পুনঃ অনাত্মাতে আত্মা ও তদ্‌ধর্মের অধ্যাস—সংসর্গাধ্যাসের দৃষ্টান্ত। কারণ পারমার্থিক সত্য আত্মার স্বরূপতঃ অধ্যাস হইতে পারে না। অধ্যস্ত বস্তু মিথ্যা হইয়া থাকে। অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুর স্বরূপাধ্যাস ও সত্যবস্তুর সংসর্গাধ্যাস হয়। সংসর্গাধ্যাসে আত্মা স্বরূপতঃ অধ্যস্ত হন না, কিন্তু আত্মা-ও অনাত্মার মধ্যে একটি মিথ্যা সম্বন্ধমাত্র ভান হয়।

অথবা সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে অধ্যাস দ্বিবিধ। এই দুইটিই বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে পুনরায় দুই দুই প্রকার হইয়া থাকে। লোহিত স্ফটিকাদি বাহ্য সোপাধিক অধ্যাস, কারণ জবাকুসুমাদি এখানে উপাধি। রজ্জু-সর্পাদি বাহ্যনিরুপাধিক অধ্যাস। 'আমি অজ্ঞ, ব্রহ্মবস্তু জানি না'—ইহা **আভ্যন্তর নিরুপাধিক অধ্যাস** এবং 'আমি কর্তা, ভোক্তা'—ইহা **আভ্যন্তর সোপাধিক অধ্যাস,** কারণ এখানে অন্তঃকরণাদি উপাধি বিদ্যমান।

অথবা সাদি ও অনাদি ভেদে অধ্যাস দ্বিবিধ। অহংকারাদি—সাদি অধ্যাস এবং অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধাদি **অনাদি অধ্যাস**। অধ্যাস-বিষয়ে বিস্তৃত পরিচয় গুরুমুখে জ্ঞাতব্য।

২. বস্তুস্বরূপের অপেক্ষা না রাখিয়া পুরুষেচ্ছাপ্রযত্নমাত্রসাধ্য এবং পুরুষ স্বীয় ইচ্ছানুসারে যাহা করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ এরূপ চিত্তবৃত্তিপ্রবাহকে উপাসনা বলে। পুরুষের প্রবর্তক বিধিবাক্য এবং উপাসনার কারণ শ্রদ্ধা। অতএব উপাসনাবৃত্তি একটি মানস-ক্রিয়া, উহা প্রমাজ্ঞান নহে। প্রমাজ্ঞান নির্দোষ প্রমাণ ও বিষয়ের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথাপি সংবাদিভ্রমের (পঞ্চদশী—ধ্যানদীপ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য) ন্যায় জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা সত্যফলের কারণ হয় বলিয়া উপাসনা ফল-উৎপত্তিকালে প্রমারূপে পর্যবসিত হয়। বেদান্ত-বিচারে অসমর্থ মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর জন্যই উপাসনা বিহিত। উপাসনা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন দ্বারা পরম্পরাক্রমে জ্ঞানে বা মোক্ষে উপযোগী হইয়া থাকে বলিয়া বেদান্তদর্শনেও ভগবান্ সূত্রকার এবং ভাষ্যকার ইহার বিচার করিয়াছেন। জ্ঞান—প্রমাণ ও প্রমেয়ের অধীন, বিধি বা পুরুষেচ্ছার অধীন নহে। ধ্যান বা উপাসনা—বিধি, পুরুষেচ্ছা, বিশ্বাস এবং হঠের অর্থাৎ প্রযত্ন বা জিদের অধীন, ঘট ও নেত্রের সম্বন্ধ থাকিলে পুরুষেচ্ছা ছাড়াও ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবেই। ধ্যান জিদ (হঠ)-বশতঃ হয়। জ্ঞানে হঠের অপেক্ষা নাই। নিরন্তর ধ্যেয়াকার চিত্তবৃত্তিকে ধ্যান বলে। ঐ চিত্তবৃত্তিতে বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে হঠ (অর্থাৎ জিদ বা বল) দ্বারা বৃত্তিকে স্থির করিতে হয়। জ্ঞানরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি দ্বারা আবরণ ভঙ্গপূর্বক স্ব-স্বরূপানুভব হইলে ঐ বৃত্তির স্থিরতার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এইজন্য জ্ঞানে হঠের আবশ্যকতাও নাই। ধ্যান বা উপাসনা এবং জ্ঞানে এইরূপে মহান্ ভেদ বিদ্যমান।

প্রতীকোপাসনা, অহংগ্রহ-উপাসনাদি ভেদে বহুবিধ উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। সগুণ অর্থাৎ কারণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের ও কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাকেই **সগুণোপাসনা** বলে। নির্গুণ অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্মের উপাসনা **নির্গুণোপাসনা** নামে কথিত হয়। নির্গুণোপাসনা বিষয়ে বিস্তৃত বিচার—'পঞ্চদশী' গ্রন্থে ধ্যানদীপ-প্রকরণে দ্রষ্টব্য। (দ্বিবিধ সংজ্ঞা সমাপ্ত)

বিশ্বগুরু বুদ্ধ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

'কে ও? থামাও, থামাও।'

শ্বেতাশ্বযুক্ত সুন্দর রথ থামলো। তখনও সূর্যের শেষ রশ্মি মেলায়নি। দূরে বনানীর শিরে তার রক্তিম ম্লান রেখা স্পষ্ট। পরিচ্ছন্ন রাজপথের অনুপম শোভাকে যেন উপহাস ক'রে একটি কঙ্কালসার দেহ লাঠি ভর ক'রে অতিকষ্টে চলছে সম্মুখপানে। তার চোখ দুটি কোটরগত, চামড়া কোঁচকানো, চুলদাড়ি শনের মতো সাদা, পিঠ ধনুকের মতো বাঁকা। তার জীর্ণ ভগ্ন দেহ যেন আর বইতে পারছে না দেহভার! শীর্ণ মলিন মুখ শ্রান্তি-ক্লান্তিতে ভরা। সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন—'ছন্ন, কে ও?'

'যুবরাজ, লোকটি বৃদ্ধ—বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে তার দেহ, একদিন ঐ দেহেও ছিল শক্তি সৌন্দর্য, সব আজ নিশ্চিহ্ন।'

'ছন্ন, সবাই কি বৃদ্ধ হয়?'

'হাঁ যুবরাজ, বয়স হ'লে, যৌবন ভেঙে গেলে সবাই বৃদ্ধ হয়। তখন দেহের কমনীয়তা সৌন্দর্য কিছুই থাকে না, দেহ হয় দুর্বল—নিস্তেজ এবং লাঠি ভর ক'রে চলতে হয়।'

সিদ্ধার্থ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সারথির কথা, স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন বৃদ্ধের পানে। সে মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টির একটি পর্দা যেন খসে প'ড়ল। তাঁর অনাবৃত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হ'ল যৌবনের পরিণতি—তাঁর সুন্দর সুঠাম দেহ ছিন্ন কুসুমের মতো দেখতে দেখতে হবে শ্রীহীন জরার কঠিন আঘাতে, শক্তি-সামর্থ্য যাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে; তখন পথের ধারের ঐ বৃদ্ধ এবং তাঁর মধ্যে থাকবে না কোন তফাৎ। সেদিনের সন্ধ্যার কাকলি, ফোয়ারার অবিশ্রান্ত শব্দ এবং দূরের জনকোলাহল—সমস্তই তাঁর কাছে করুণ বিষণ্ণ মনে হ'ল। তিনি চিন্তামগ্নভাবে ফিরলেন প্রাসাদে।

সেকালের রাজারাজড়ারা হেমন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা—এ তিন ঋতুর উপযুক্ত তিনটি প্রাসাদ গড়তেন নিজেদের থাকার জন্য। যখন যে প্রাসাদে থাকতেন, তখন সে প্রাসাদকে বহুমূল্য আসবাবপত্রে ও মণিমাণিক্যে সাজানো হ'ত ইন্দ্রপুরীর মতো। সেখানে তাঁদের পার্শ্বচারিণী হয়ে আসত রূপসী তরুণীর দল। তাদের সংখ্যা যত বেশি হ'ত, ততই বাড়ত রাজমর্যাদা। হাস্য-পরিহাসে নৃত্য-গীতে মুখর হয়ে থাকত প্রাসাদ। রাজারাজড়াদের ছেলেরা যখন বড় হ'ত, তাদের জন্যও তাঁরা ক'রে দিতেন পুরুষহীন প্রমোদাগারে সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা। সিদ্ধার্থও যৌবনোদ্‌গমের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলেন তিন ঋতুর তিনটি প্রাসাদ। সুন্দরীর দল তাঁকে ঘিরে রচনা করেছিল সুখস্বর্গ। সেই থেকে উনত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আনন্দের একটানা স্রোতে জীবন বয়ে চলেছিল তাঁর। সেই স্রোতঃপথ এক নিমেষে রুদ্ধ হয়ে গেল জরার দৃশ্য-দর্শনে। জীবনের স্রোত বইতে শুরু ক'রল উলটো দিকে। পথের দেখা সেই কঙ্কালসার জীর্ণ দেহ ভেসে ওঠে তাঁর সামনে, কানে কানে যেন ব'লে দেয়—ঐ সুন্দর সুঠাম দেহের পরিণতিও ওই, জরার হাত থেকে রেহাই নেই। সিদ্ধার্থ উন্মনা হয়ে বসে থাকেন। প্রমোদাগারের নর্মসহচরীদের রসচক্র জাগায়

না আবেশ। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় তাঁর মন। তাঁর ভাবান্তরের কথা গেল রাজা শুদ্ধোদনের কানে। তিনি সারথিকে ডেকে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনলেন, শঙ্কিত হলেন দৈবজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ ক'রে। সিদ্ধার্থের জন্মদিনে দৈবজ্ঞেরা বলেছিলেন, 'মহারাজ, এ শিশু বড় হয়ে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসের চারিটি দৃশ্য দেখে সংসার ত্যাগ করবে।' সেদিন রাজা ভেবেছিলেন মনে মনে—এ চারিটি দৃশ্য এমন কি! তাঁর রাজাজ্ঞার কাছে কোথায় দাঁড়াবে এগুলো? তাই তিনি পুত্রের যৌবনারম্ভের পূর্বেই রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন, সিদ্ধার্থের সম্মুখে যেন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, রোগাতুর শীর্ণদেহ, প্রাণহীন মৃত এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী না আসে। যে পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ চলতেন, সে পথে রাজাদেশে এ চারটি দৃশ্যের কোনটির আবির্ভাবের অবকাশ ছিল না। অন্যদিকে রাজা করেছিলেন পুত্রের জন্য সুখসম্ভোগের বিরাট আয়োজন, যাতে বৈরাগ্যের চিন্তাও মনে স্থান না পায়। রাজার গর্ব ছিল—কোথায় সে পালিয়ে যাবে, কঠিন নিগড় দিয়ে বেঁধেছি তাকে। পুত্রের ভাবান্তরের কথা তাঁর সে গর্ব চূর্ণ ক'রে দিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, কি ক'রে সম্ভব হ'ল এ দৃশ্য—সবার চোখে ধুলো দিয়ে; আরও দৃঢ়তর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; না না, সম্ভব হ'তে দেব না দৈবজ্ঞের সে কথা।

নিয়তিকে কে ঠেকাতে পারে? সিদ্ধার্থ আবার বের হলেন বেড়াতে। কিছুদূর অগ্রসর হ'তে না হ'তে তাঁর কানে ভেসে এল করুণ আর্তনাদ। সেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে তিনি দেখলেন,—এক শীর্ণকায় দুর্বল ব্যক্তি নিজের মলমূত্রের মধ্যেই পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল। তিনি সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছন্ন, কি হয়েছে ওর?'

'যুবরাজ, লোকটি কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে।'

'ছন্ন, কেন এ ব্যাধি হয়?'

'যুবরাজ, শরীর থাকলে ব্যাধি হয়, ব্যাধি শরীরের ধর্ম; এর আক্রমণে শরীর ভেঙে যায়, মন অবসন্ন হয়, শক্তি-সামর্থ্য কিছুই থাকে না।' সিদ্ধার্থ শুনে তন্ময় হয়ে ভাবেন—তাঁর দেহও ব্যাধির অধীন অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তে তাঁকে ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে, ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে তাঁর শরীর এমনি ভেঙে যাবে, লুপ্ত হবে সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত শক্তি; তখন কোথায় থাকবে আমোদ-প্রমোদের অবকাশ, দৃপ্ত যৌবনের আড়ম্বর? যতই তিনি ভাবেন, ততই সুখসম্ভোগের প্রতি রাজ্য-সম্পদের প্রতি আসে তাঁর বিতৃষ্ণা। যে দেহ জরাব্যাধির আধার, তাকে নিয়ে মেতে থাকা তাঁর মনে হয় নিছক অজ্ঞতা।

দুই

সিদ্ধার্থ উন্মনা হয়ে বসে থাকেন। কোন দিকে খেয়াল নেই তাঁর। সুন্দরীর দল তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আনন্দের ফোয়ারা সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বহুদূরে পড়ে থাকে তাঁর মন। আসন্নপ্রসবা যশোধরা স্বামীর উন্মনা-ভাব লক্ষ্য ক'রে অমঙ্গল আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন। কারণ তিনি ছিলেন পতিপ্রাণা—স্বামীর সুখেই তাঁর সুখ, স্বামীর দুঃখে তাঁর দুঃখ। স্বামীর বিষণ্ণ চেহারা দেখে মোটেই তিনি স্বস্তি পান না। যশোধরার প্রতি সিদ্ধার্থের ছিল গভীর অনুরাগ। তিনি কখনও এমন আচরণ করতেন না, যাতে পত্নীর প্রাণে ব্যথা লাগে। পরস্পরের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ছিল স্বচ্ছ, গভীর। কিন্তু পর পর দুইটি দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থ যেন কেমন হয়ে গেলেন। তিনি কত

চেষ্টা করেন মনের ভাব গোপন ক'রে পত্নীর সঙ্গে সহজভাবে বাক্যালাপ করতে। তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। যেখানে মন নেই, সেখানে বাক্য অর্থহীন প্রলাপ-মাত্র। তা তাঁর কানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মতো বাজে। স্বামীর ভাবগতিক লক্ষ্য ক'রে উদ্বিগ্না হলেন যশোধরা। অজানা ভয়ে অভিভূত হ'ল তাঁর মন।

আসন্ন সন্ধ্যায় রথ এসে দাঁড়ালো প্রাসাদের দ্বারে। সারথি ব'লল, 'যুবরাজ, রথ প্রস্তুত।' সিদ্ধার্থ এতক্ষণ বসেছিলেন চিন্তামগ্ন হয়ে। সারথির ডাকে তিনি সুপ্তোত্থিতের মতো একবার তার পানে তাকালেন, বললেন, 'চলো।' প্রাসাদের ফটক পেরিয়ে রথ চলতে লাগলো। কিছুদূর অগ্রসর হ'তে না হ'তে একদল লোক গেল তাঁর সামনে দিয়ে। তারা কাঁধে বহন করছিল একটি নিস্পন্দ দেহ। তার পেছনে চলছিল এক শোকাতুরা নারী। তার করুণ বিলাপ যেন সমস্ত পরিবেশকে শোকাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে। এ দৃশ্য সিদ্ধার্থকে অত্যন্ত অভিভূত ক'রল। তিনি অভিভূত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মনে হ'ল, সংসার যেন একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি। সংসারের আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সম্মুখের এ দৃশ্যের সামঞ্জস্য খুঁজে পেল না তাঁর মন।

সারথি ব'লে উঠল, 'যুবরাজ, ও মরে গেছে, শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' সিদ্ধার্থ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আবার তাকালেন মৃতদেহের প্রতি, ভাবলেন—এই তো জীবনের পরিণতি! মানুষ জন্মায়, মরে; জন্মালে মরতেই হবে, রেহাই নেই মৃত্যুর হাত থেকে, মৃত্যুতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে সকল রঙ্গরস, সকল সুখসম্ভোগ, সকল রাজৈশ্বর্য। ভাবতে ভাবতে স্পষ্ট হয়ে উঠল মৃত্যুর ছবি তাঁর মনে—মৃত্যু যেন সমগ্র বিশ্ব-সংসারকে বেষ্টন ক'রে ভয়ঙ্কর রবে গর্জন করছে। অস্ফুট স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন, 'উঃ!' রথ ফিরে যায় প্রাসাদের দিকে।

সিদ্ধার্থকে ঘিরে বসে নৃত্যগীতের আসর নির্দিষ্ট নিয়মে। চলতে থাকে নাচগান। কিন্তু তাঁর বিরাগী মন সে-আসরের সীমা ছেড়ে পড়ে থাকে বহু দূরে। নর্মসহচরীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে আসর জমিয়ে তুলতে। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে ভেঙে যায় আসর। পর পর যে তিনটি দৃশ্য দেখেছিলেন সিদ্ধার্থ, সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর মন। আসর জমবে কি ক'রে? উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে তাঁর মনের মধ্যে বইতে লাগল চিন্তার ঝড়। জরা! ব্যাধি! মৃত্যু! তিনি যে দেখেছেন স্বচক্ষে জরার স্পর্শ কত নির্মম, ব্যাধির আঘাত কত কঠিন, মৃত্যুর আলিঙ্গন কত ভয়ঙ্কর! এগুলো ছিন্নভিন্ন করে দেয় যৌবন, ভেঙে চুরে দেয় ভোগবিলাসের সুখনীড়, শূন্যে মিলিয়ে দেয় রাজ্যসম্পদ্। অনন্তকালের তুলনায় জীবনের দিনগুলো কত সামান্য, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে, স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যাবে এ দিনগুলো। ঘুম ভাঙলে যেমন স্বপ্নের আবেশ কেটে যায়, তেমনি কেটে যেতে লাগলো সিদ্ধার্থের রাজৈশ্বর্যের সকল মোহ।—দুদিনের জন্য কেন পৃথিবীতে আসা, জীবন কি অর্থহীন, কোন কর্তব্য কি নেই? নানারকম প্রশ্ন জাগলো তাঁর মনে, কিন্তু কোন সমাধান মিলল না। মূর্ছারোগগ্রস্ত যেমন বার বার মূর্ছাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি সিদ্ধার্থ অনবরত চিন্তামগ্ন হ'তে লাগলেন।

রাজা শুনলেন সমস্ত বৃত্তান্ত। শিউরে উঠল তাঁর মন। দৈবজ্ঞের সে কথা বার বার তাঁর মনে প'ড়ল। ভবিতব্যের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর উদ্বেগ-অশান্তির সীমা রইল না।

পুত্রকে সংসারে ধরে রাখার জন্য কি না তিনি করেছেন! তাঁর সকল চেষ্টা যে ব্যর্থ হ'তে চলেছে, তা বুঝতে আর বিলম্ব হ'ল না। পুত্র সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাবে, ছিন্ন কন্থা পরে পথের ভিক্ষুক হবে—এ কথা ভাবতেই তাঁর মন মুশড়ে পড়ে, চারিদিক অন্ধকার মনে হয়।

রাজার হুকুমে সিদ্ধার্থের ভ্রমণের পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হ'ল, যাতে তাঁর চোখে না পড়ে কোন অনমুকুল দৃশ্য। প্রহরীরা তাঁর ভ্রমণের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পথে লোক চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তাই প্রায়-জনহীন পথ দিয়ে সেদিন সিদ্ধার্থ চলেছিলেন বেড়াতে। এ পাহারার ব্যবস্থা তাঁর চোখেও অদ্ভুত ঠেকল। রথ চলতে চলতে যখন উদ্যানে এসে প'ড়ল, তখন এক শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসী সম্মুখ দিয়ে চলেছেন মন্থর গতিতে। তাঁর দৃষ্টি শান্ত, মুখ উজ্জ্বল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সংযমের সৌন্দর্য। তাঁর কোথাও বেশভূষার পারিপাট্য নেই, অথচ দীপ্ত সৌন্দর্য যেন তাঁকে ঘিরে আছে। সিদ্ধার্থ নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলেন। যতই তিনি দেখেন, ততই দেখতে ইচ্ছা হয়—দেখার সাধ যেন মেটে না। তিনি আপন মনে বললেন, 'ইনি কে, কেন এঁকে এত ভাল লাগে? কারও সঙ্গে যে এঁর মিল নেই, একেবারে নির্বিকার নিস্পৃহ পুরুষ, শান্তিতে ভরে আছে এঁর মন, উদ্বেগ-অশান্তির চিহ্ন নেই এঁর কোথাও।'

সারথি ব'লল, 'যুবরাজ, ইনি সংসারত্যাগী যোগী পুরুষ, এঁর কোথাও কোন বন্ধন নেই।'

'বন্ধনহীন মুক্তপুরুষ?'

'হাঁ যুবরাজ, তাই।'

সিদ্ধার্থ তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন, আহা, এ অবস্থা কবে আমার আসবে, কবে আমি এঁর মতো সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে প'ড়ব বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে; যেখানে জরা নেই, ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই, সেই অজর অব্যাধি অমৃত লোকের সন্ধান ক'রব?

তিন

সিদ্ধার্থ যখন দেখেছিলেন জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, শীর্ণকায় রোগাতুর এবং প্রাণহীন মৃতদেহ, তাঁর মন সংসারের প্রতি তিক্ত-বিরক্ত হয়েছিল, অস্বস্তিতে হাঁফিয়ে উঠেছিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শুধু চিন্তামগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর উদ্বেগ-অশান্তির সীমা ছিল না। কিন্তু চতুর্থ দৃশ্য দেখে—সন্ন্যাসীকে দেখার পর থেকে সে উদ্বেগ-অশান্তির অবসান ঘ'টল। তাঁর মনে হ'ল—যেমনি দুঃখ রয়েছে, তেমনি আছে দুঃখ-মুক্তির পথ; খুঁজে বের করতে হবে সেই পথ, নিবাতে হবে দুঃখজ্বালা। যখন এমনিভাবে তিনি চিন্তামগ্ন হলেন, তখন অন্তঃপুর হ'তে সংবাদ এল—তাঁর পত্নী যশোধরা নির্বিঘ্নে পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন।

পুত্রের জন্মসংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল দুটি কথা—রাহু জন্মেছে, বন্ধন বেড়েছে। তাঁর কথার মর্ম বুঝতে পারল না সংবাদ-বাহক। জিজ্ঞাসু নয়নে সে চেয়ে রইল কতক্ষণ যুবরাজের মুখের পানে। তারপর সে ধীরে ধীরে প্রস্থান ক'রল।

রাজার মনে প'ড়ল সে অতীত দিনের কথা, যেদিন তাঁর অগ্রমহিষী মায়াদেবী লুম্বিনী উদ্যানে শালতরুর ছায়ায় পুত্রসন্তান প্রসব করেছিলেন। এ সংবাদ যখন তাঁর কানে এসেছিল, আনন্দের সীমা ছিল না। রাজার মনে হ'ল—আজও তেমনি পুত্রের জন্মসংবাদ পেয়ে সিদ্ধার্থের আনন্দের সীমা থাকবে না, পুত্রের মুখ দেখে

আবার তার মন বসবে সংসারে, ব্যর্থ হবে দৈবজ্ঞের কথা। রাজা উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে ওঠেন সিদ্ধার্থের মনের পরিবর্তনের কথা ভেবে। দূতকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যুবরাজ খুশী হয়েছে তো, কি ব'লল সংবাদ পেয়ে?'

'মহারাজ, তিনি শুধু বললেন—রাহুল।'

যুবরাজের উচ্চারিত 'রাহু' শব্দ দূতের কানে বেজেছিল 'রাহুল'। তাই ঐ কথাটিই ব'লল দূত। এ কথার মধ্যে রাজা খুঁজে পেলেন না সিদ্ধার্থের মনের ঠিকানা। তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যা হোক, নবজাতকের নাম রাখা হোক—রাহুল।'

পুত্রমুখ দর্শন করেই সিদ্ধার্থ অনুভব করলেন অজানা এক আকর্ষণ। কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল তাঁকে সংসারের পানে। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর মনের সম্মুখে ভেসে উঠল সেই চারিটি দৃশ্য। তাঁর মনের মধ্যে চ'লল ভাবের দ্বন্দ্ব। পতিপ্রাণা পত্নী, নিরপরাধ শিশুপুত্র ও পুত্র-বৎসল পিতার চিন্তা যেমন একদিকে তাঁর সম্মুখে অনন্ত মায়াজাল বিস্তার করে, তেমনি অন্যদিকে বন্ধনহীন সন্ন্যাসীর শুদ্ধ শান্ত জীবনের আদর্শ তাঁকে আহ্বান করে বিশ্বের মুক্ত প্রাঙ্গণে। দুই বিরুদ্ধ চিন্তার স্রোত বইতে লাগলো তাঁর মনে। শান্ত সন্ধ্যায় তিনি অভ্যস্ত ভ্রমণে বের হলেন। তখন কিসা গৌতমী প্রাসাদের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশান্ত সুন্দর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন :

> নির্বৃত সে পিতা এ ধরায়
> 　　যাহার এহেন সন্তান,
> সে জননী পেয়েছে তাহাতে
> 　　বিপুল শান্তির সন্ধান।
> ধন্য ধন্য আজি এ বিশ্বভুবনে
> 　　সেই গরীয়সী নারী,
> 　　পতি এহেন যাহারি
> নিঃসীম আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া
> 　　আহা, সে পেয়েছে নির্বাণ!

সঙ্গীত থেমে গেল। সিদ্ধার্থ চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। 'নির্বাণ' শব্দটি তাঁর কানে যেন সুধা ঢেলে দিল, প্রাণ উতলা হয়ে উঠল! তাঁর অভীপ্সিত লক্ষ্য যেন তাতেই মূর্ত হয়ে তাঁকে আহ্বান ক'রল। গায়িকার প্রতি তাঁর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। তিনি তার উদ্দেশে বহুমূল্য মণিহার পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। 'নির্বাণ' কথাটি বার বার তাঁর কানে বাজতে লাগলো। তার অপূর্ব মাধুর্য মনপ্রাণকে অভিষিক্ত ক'রে দিল। সে রাতের নাচ-গানের আসরে যোগ দেবার মতো অবস্থা তাঁর হ'ল না। তাঁর উন্মনাভাবের জন্য আসরও জ'মল না। তিনি আসর ত্যাগ ক'রে শয়নঘরে প্রবেশ করলেন। মনে হ'ল যেন নির্বাণের আলো তাঁর চারিদিকে নেমেছে। মরুমায়ার মতো সংসার শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তারই আলোয় তাঁর যাত্রাপথ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর মন কোন বাধা মানতে চাইল না। মমতার নাগপাশ শিথিল হয়ে এল।

রাত্রি তখন গভীর। চারিদিক নিস্তব্ধ। তাঁর জীবন-সঙ্গিনী নবজাত শিশুটিকে বুকে নিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শিয়রের কাছে একটি নির্বাণোন্মুখ দীপ নিবে নিবে জ্বলে উঠছিল। সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে দাঁড়ালেন। আপনার অজ্ঞাতে তাঁর দৃষ্টি স্ত্রী-পুত্রের ওপর গিয়ে প'ড়ল। মনে হ'ল, যেন তাঁদের ঘুমন্ত মুখ আসন্ন বিপদের ছায়ায় ম্লান, সমস্ত আবেষ্টনী যেন বিদায়ের সুরে করুণ! মুহূর্তের জন্য তাঁর হৃদয় অভিভূত হ'ল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে অন্তরের ব্যথা ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

[ক্রমশঃ]

শিক্ষা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রয়েছে। হে পূষন্, তুমি সেই আবরণ অপসারিত কর, আমি সত্যকে প্রত্যক্ষ ক'রব, ধর্মকে উপলব্ধি ক'রব।

* * *

রবীন্দ্রনাথের মূল পরিচয় তিনি কবি, মহাকবি, সাহিত্যের অতুলনীয় রসস্রষ্টা।...

'আমি পৃথিবীর কবি,
যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি,
আমার বাঁশীর সুরে
সাড়া তার জাগিবে তখনি।'

—এই তাঁর স্বকীয় পরিচয়। কিন্তু এ-কথাও সমভাবে অনস্বীকার্য যে শিক্ষা, ধর্ম, শিল্প, জাতীয়তা প্রভৃতি সংস্কৃতির বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্রেও তাঁর যে অবদান, তাঁর যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক-সম্পাত তাও অতুলনীয়, তাও অনন্যসাধারণ।

সে-সকল বলিষ্ঠ এবং অমূল্য রচনা আমরা, পরবর্তী যুগের নরনারীগণ, উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। তাদের মধ্যে যে আনন্দ-সম্পদ, যে শক্তি ও সমন্বয়ের সন্ধান রয়েছে, তাঁর শততম জন্মজয়ন্তী উৎসবে সেইগুলিরই বহুল আলোচনা এবং অনুধ্যানের প্রয়োজন ছিল।

দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শিক্ষা-সম্পর্কে তাঁর যে মতামত ছিল, তিন লক্ষেরও অধিক শব্দ-সম্বলিত শতাধিক প্রবন্ধে এবং বহু পত্রে ও ভাষণে—শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য, আশু ও দূর-প্রয়োজনের স্বরূপ—প্রভৃতি নানাবিষয়ে যে-সকল বহু-বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে—যাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আজ আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য—সেগুলির অধিকাংশই আমাদের উৎসব-সূচীর বাইরে পড়েছিল। অনুরূপ অন্যান্য গুরুতর বিষয়-সম্পর্কেও সেই একই কথা।

রবীন্দ্রনাথ একদা যেমন বলেছিলেন, 'গল্প, কবিতা, নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।' আমাদের দেশের অধিকাংশ জয়ন্তী-উৎসবও ঠিক তেমনি ধরনের রূপ নিয়েছিল। সেখানে মুখ্যতঃ শুধু ভোজেরই আয়োজন ছিল, শক্তি-উৎস সন্ধানের নয়।

সেই হেতু শিক্ষা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে অমূল্য অবদান, যে সুস্পষ্ট নির্দেশ—তারই একটি স্বল্পায়তন চিত্র শিক্ষানুরাগী সুধীবৃন্দের সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধে করেছি। আশা করি, রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর ব্যাপক উৎসব-সমারোহের শেষে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক উৎসুক পাঠকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে।...

* * *

উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর অতিদ্রুত-গতিশীল যুগকে শিক্ষার নবযুগ বা শিশুশতাব্দী ব'লে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন ক'রে এ-যুগ শিক্ষা-ক্ষেত্রে যে নূতন পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইল, তার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত হলেন 'শিশুদেবতা'। শিক্ষক নয়, পাঠ্যপুস্তক নয়,

সিলেবাস-কারিকুলাম নয়, শুধু যার বিকাশের জন্য শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন, সেই শিশুই সেখানে সর্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য এ-যুগের শিক্ষা 'শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা' বলেও অভিহিত হয়েছে।

শিশু-মনস্তত্ত্বের গহন-গভীরে প্রবেশ করতে চাইলেন এ-যুগের মনস্তাত্ত্বিকগণ। আনন্দের অনুকুল পরিবেশে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে স্বকীয় পূর্ণতার দিকে শিশু শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হবে—এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হলেন শিক্ষাব্রতিগণ। বিশ্ব-প্রকৃতির প্রসারিত দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদে তার যাত্রাপথ ঋজু হবে, প্রাণবন্ত হবে—এ-যুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় এ-আকাঙ্ক্ষাই পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হ'ল।

পাশ্চাত্যের শিক্ষাজগতে রুসো, পেস্টালজি, ফ্রোবেল প্রমুখ মনীষিগণ এই যুগ-চিন্তার উদ্বোধক। তারপর জন ডিউই, মাদাম মণ্টেসরী প্রমুখ বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ এরই বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। এ-যুগের শিক্ষা-ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু একই কালে, ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের বহুসমস্যা-কণ্টকিত শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে দূরদৃষ্টি ও কল্পনা প্রয়োগ করেছিলেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক রূপায়ণে যে অসামান্য কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন—তা নিয়ে বিশদ কোন আলোচনা আজ পর্যন্ত এদেশেও হয়নি, অথবা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। অথচ এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নব ভাবধারা আনয়নের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ, অন্যতম ভগীরথ।...

*　*　*

এ-কথা এখন সকলেই জানেন যে, আজ থেকে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে ১৮৯২ খৃঃ 'শিক্ষার হেরফের' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রাজসাহীর এক শিক্ষা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। শিক্ষা-বিষয়ে সেই তাঁর প্রথম প্রবন্ধ। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর। কিন্তু সেই দূর অতীতে একটি মাত্র প্রবন্ধে শিক্ষার অন্তর্নিহিত সুর ও সেই ব্যবস্থার আদর্শগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে যে নিখুঁত চিত্র রবীন্দ্রনাথ সেদিন অঙ্কিত করেছিলেন, আজও তার সম্যক্‌ উপলব্ধি বা নিঃশেষ নিরসন আমরা ক'রে উঠতে পারিনি। সে প্রবন্ধটিতে একদিকে বিদ্যার্থীর প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে-বিষয়েও যেমন ইঙ্গিত ছিল—অন্যদিকে ভারতী দেবীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ঘিরে যে-সব বিষবৃক্ষের অঙ্কুর উদ্গত হয়েছে এবং যে-সকল বিধিব্যবস্থা ভারতীয় আদর্শের প্রতিকুল এবং বাস্তব-জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, তাদের বিরুদ্ধেও তীক্ষ্ণ অভিমত তেমনি অতি নিপুণতার সঙ্গে প্রকাশিত ছিল।

শিক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে তিনি তখন বলেছিলেন যে, শিশুকাল থেকেই কেবল স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর না ক'রে—চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। 'যখন নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে—যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে—তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিদানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই

তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল, সরস এবং পরিণত হইতে পারে।'

আবার, জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গতি এবং তার ব্যবস্থাপনায় আদর্শচ্যুতি নিয়েও দীর্ঘ মন্তব্য সে প্রবন্ধটিতে ছিল। সেদিন শাসনকর্তৃত্ব হাতে নিয়ে এদেশের বুকে অধিষ্ঠিত ছিলেন ইংরেজ। ইওরোপীয় সভ্যতার প্রচণ্ডতা ও সম্মোহন-শক্তির কাছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, রুচি-অনুরাগ প্রভৃতি একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই অতিশয় শঙ্কিতচিত্তে দেশবাসীকে সতর্ক করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সেদিন গম্ভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন:

'যখন আমরা একবার ভালো করিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন নির্বাহ করিব, আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব, সে গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে, সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন-শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতামাতা, আমাদের সুহৃৎবন্ধু, আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না,...তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই।' আবার, যে শিক্ষায় কর্ম-বুদ্ধির অত্যন্ত বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযত, মানবজগতের ঊর্ধ্বলোককে নির্মল রাখা যার সাধনার অঙ্গীভূতই নয়, সেই আত্মহননোন্মত্ত তথাকথিত সভ্যতার গৌরব-ঘোষণারও কোন হেতু তিনি খুঁজে পাননি; বরং তাকে ধিক্কৃতই করেছেন পুনঃপুনঃ এবং অতি কঠিন ভাষায়।

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের এ-সব মূল-সূত্রই যেন উত্তরকালে তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কিত নানা রচনায় সম্প্রসারিত হয়েছিল, ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে কালোপযোগী ভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছিল। সে-প্রবন্ধটিই যেন তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রচনাবলীর সার্থক পটভূমি। সেজন্যই প্রবন্ধের মুখে এটির কথা একটু বিশদভাবে আমরা উল্লেখ করলাম।

শিক্ষার লক্ষ্য ও পরিবেশ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক লেখাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের অধিকাংশই শিক্ষার লক্ষ্য এবং আদর্শ নিয়ে রচিত। 'জীবনে শিক্ষা আছে, আদর্শ নাই'—এটা তাঁর কাছে এক অতি অসম্ভব উক্তি ছিল, নানাভাবে ও নানাপ্রবন্ধে সেই বিস্মৃতপ্রায় লক্ষ্য ও আদর্শের দিকেই বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। 'লক্ষ্য ও শিক্ষা', 'তপোবন', 'ধর্মশিক্ষা', 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধে তার স্বাক্ষর রয়েছে।

'তপোবন'-শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—এই মন্ত্রটিকেই আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র ব'লে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছিলেন। বলেছিলেন: 'প্রাচীন ভারতের তপোবন-নির্জনতায় যে মহাসাধনা ফলপ্রসূ হয়েছিল—সেটিই আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সে সাধনায় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা মানুষ বিক্রমশালী হয় না, পরন্তু মিলনের দ্বারা সে পূর্ণ হয়ে ওঠে, সার্থক হয়ে ওঠে।..... ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত ক'রে সে স্ফীত হয় না, আত্মার উপলব্ধিতে আনন্দময় হয়ে ওঠে।'

আর এই আদর্শটিকে জীবনের প্রতিকর্মে ও ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলাই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য বস্তু। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা বা জ্ঞানের

শিক্ষা নয়,—বোধের শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষার মাপকাঠি। বিদ্যালাভ এবং জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনই তার নিগূঢ় সাধনা।......

'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।' ..

কিন্তু এ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হ'লে একটি অনুকূল শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন। শহরে বা শহরতলীর ধূম-ধূলি-সমাচ্ছন্ন আকাশের নীচে এবং স্বার্থসঙ্কীর্ণ মানবমনের নীচ লোলুপতার মধ্যে সে পরিবেশ গড়ে ওঠে না। তার জন্য এমন একটি ক্ষেত্রের প্রয়োজন, যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে একেবারে জড়পিণ্ডে পরিণত হবে না। 'যেখানে গাছপালা, নদী-সরোবর মানুষের সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তায় অবস্থান করবার অবকাশ পাবে এবং জগৎপ্রকৃতির শত বৈচিত্র্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে গড়ে উঠবে।'......

বনভূমি তাদের ছায়া দেবে, মৌন গাম্ভীর্যের নিবিড়তা দেবে, ফল দেবে, ফুল দেবে—এক কথায় আদান-প্রদানের সম্বন্ধসূত্রে একেবারে জীবনময় হয়ে উঠবে। সেথাকার বনমর্মরে, আকাশে, বায়ুতে নিয়ত স্পন্দিত হবে এই মন্ত্র :

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো,
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

বস্তুতঃ 'যেখানে সাধনা চলবে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে সকল বিরোধ-বুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে'—সেই স্থান, প্রকৃতির সেই মুক্ত অঙ্গনতলই—ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে 'বিদ্যা' ব'লে অভিহিত করেছে—সেই বস্তুলাভের প্রশস্ত ও অনুকূল ভূমি। এবং সেইজন্যই এখন থেকে কতকাল পূর্বে, যখন ইওরোপের কোনও স্থানে আধুনিক মতবাদের বাস্তব রূপায়ণে কোন শিক্ষাবিদ্ অগ্রসর হননি—তখন বীরভূমের এক দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ছাতিম-তলায়, শালবীথিতে আর নিবিড় আম্রকুঞ্জের ছায়ায় তদীয় অধুনা-বহুবিশ্রুত 'শান্তি-নিকেতন' প্রমুখ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন তিনি করেছিলেন।

তখন দেশ স্বাধীন ছিল না এবং দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও দেশবাসীর তেমন কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে কোন দূরপ্রসারী ও নূতন পরিবর্তন সেদিন কারও পক্ষেই খুব সহজসাধ্য ছিল না। তথাপি সে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-চিন্তার বাস্তব-রূপায়ণে ব্রতী হয়েছিলেন—অন্য কোন দেশের অন্ধ অনুকরণে নয়, বাইরের প্রয়োজনের তাগিদেও নয়, পরন্তু 'শিক্ষায় পরধর্মই সকল পরাশ্রয়তার মধ্যে ভয়াবহ'—এই বাক্যটি স্মরণ ক'রে তিনি নিজ দেশের আদর্শানুগ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আর সেইজন্যই পাঠ্যবিষয়, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষার মাধ্যম, জীবন ও শিক্ষার সঙ্গতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানবার সুযোগ দেশের পক্ষে সহজ হয়েছিল।

পাঠ্যপুস্তক ও মাতৃভাষা

শিশুর বিদ্যারম্ভের প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্য পুস্তকের অপরিমেয় গুরুভার একান্ত অবাঞ্ছনীয় ও ক্ষতিকর—এই ছিল রবীন্দ্রনাথের মত। যে বালকের ঋজু মেরুদণ্ডটি শুধু বৃহদাকৃতি কেতাবের গুরুভারে বক্রাকৃতি হয়ে গেল, তার পক্ষে যথার্থ জ্ঞানলাভ আর সম্ভব নয়।

জ্ঞানের যে অনন্ত বৈভব—তার প্রবেশপথ চিরদিনের মতোই বোধ হয় তাদের সম্মুখে রুদ্ধ হয়ে গেল। এরা অধ্যাপক বা শিক্ষকের সচল নোটবুকে হয়তো বা পরিণত হ'ল, কিন্তু কোন দিন জীবন্ত গ্রন্থে আর পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হ'ল না। এদের অবস্থা হ'ল অনেকটা যেন—

'ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।'

দেশী ও বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ-অরণ্য, আর দুর্বোধ্য ও অপাঠ্য পাঠমালা এবং অভিধানের ভয়াবহতার মধ্যেই তাদের শৈশব এবং কিশোর জীবনের আনন্দময় দিনগুলি একান্ত নিরানন্দে যাপিত হ'ল। যে 'কঠিন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে জীবন নেই, নবীনতা নেই,—নেই বলতে পুষ্টিকর কিছুই নেই'—তারই মধ্যে তাদের জীবনারম্ভের মহামূল্য দিনগুলি ব্যর্থ হয়ে অনন্তে মিলিয়ে গেল। ফলে 'তাদের মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার বা চরিত্রের বলিষ্ঠতা' কোনটাই আয়ত্ত হ'ল না এবং পরিণত বয়সে—'স্বাভাবিক তেজে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার শক্তি'ও তারা লাভ করতে পারল না। হায়, সরস্বতীর জ্ঞান-সাম্রাজ্যে এরা দুর্ভাগা দিনমজুর। দিন-মজুরির উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া আর কোন কাজ করবার যোগ্যতাই এদের হয় না। অর্থাৎ পাঠ্য পুস্তকের অযৌক্তিক কঠিন নিগড়-বন্ধন এদের যেন একেবারে পরাস্ত ক'রে দিল।…

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'অন্যদেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চের উপর কোঁচা-সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্বচরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত-হজম করিতেছে। ফলে, আমরা যতই বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বলিষ্ঠ ও পরিপক্ক হইতেছে না।…ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি।'

অথচ সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, সে মানুষকে বিমূঢ় করবে না, অভিভূত করবে না—আনন্দময় ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলবে, জ্ঞানের অনন্ত সম্পদের সিংহদ্বারে তাকে উত্তীর্ণ ক'রে দেবে।…

এ-প্রসঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবেই শিক্ষার মাধ্যমের কথাও এসে পড়ে। আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে ভাষাসমস্যা এক ভয়াবহ মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও সে-সমস্যার জটিলতা কম দুরূহ নয়। শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষণীয় ভাষার সংখ্যা, বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর সঙ্গত-অসঙ্গত দাবি,—সবই সে-সমস্যার অন্তর্গত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে, আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ততঃ ভাষা-সমস্যা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেনি।

তখন শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরেই ইংরেজীর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত (আজও অবশ্য বহুলাংশে তাই আছে), আর মাতৃভাষা এবং সংস্কৃত, অথবা একটি তৃতীয় ভাষা, শিক্ষাক্ষেত্রের একপ্রান্তে দুয়োরানীর অনাদরে বিরাজ ক'রত। বাংলা সাহিত্যের পূর্ণ গৌরবকাল তখন পর্যন্ত আসেনি। তখন গৌরবের ক্ষুরধার পথে, রবীন্দ্রনাথেরই অসাধারণ প্রতিভা এবং স্যর আশুতোষের দুর্লভ নেতৃত্বে সবেমাত্র সে যাত্রা শুরু করেছে। তথাপি সে-কালেই শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষার অবিসম্বাদী স্থান নির্ধারণের জন্য এই দুই মনীষীর কুণ্ঠাহীন ও বলিষ্ঠ নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছিল।

'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'—এই ছিল

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব উক্তি। মাতৃদুগ্ধের স্থান যেমন অন্য কোন প্রকার দুগ্ধ গ্রহণ করতে পারে না, মাতৃভাষার স্থানও তেমনি অন্য কোন ভাষা গ্রহণ করতে পারে না। জোর ক'রে সেটা করতে গেলে তার ফল কখন শুভ হয় না, কল্যাণপ্রসূ হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি,—

'স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে না, এ-কথা কে না বোঝে?...দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সে-শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর গতি নাই, এ-কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।'

নিজের শিক্ষা-জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে অতি আনন্দ ও আত্মপ্রসাদের সঙ্গে এ-কথা তিনি বলেছেন, পুনঃ পুনঃ বলেছেন যে, তাঁর নিজ বাল্যকালে শুধু মাতৃভাষায় তিনি শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। সেখানে বিদেশী ভাষার পীড়ন ছিল না এবং প্রায় বারো বৎসর পর্যন্ত ইংরেজী-বর্জিত সেই শিক্ষাই তাঁর জীবনে ক্রিয়াশীল ছিল। 'সেকালের স্মৃতিকথা'য় তিনি লিখেছেন:

'আমরা পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই।' ইত্যাদি...

অন্যত্র বলেছেন: 'বিদ্যালয়ের কাজে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজী ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনমতে এন্ট্রান্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, তার পক্ষে ইংরেজী ভাষার মতো বালাই আর নাই।...তারপর গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে, ভালো নিয়মে ইংরেজী শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়।...ফলে, ভাষাশিক্ষার নামে বই মুখস্থই করা হয়, সেটা আয়ত্ত করা হয় না।...অথচ ভালোমত বিদেশী ভাষা শিখিতে পারিল না—এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে দেশে থাকে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকে আটক ক'রে দেশের কি বিপুল অপচয়ই না করা হয়।'...

সুতরাং বিদ্যালয়ের স্তরে ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই ছিল যে—বাল্যকালে একমাত্র মাতৃভাষা দিয়ে বিদ্যারম্ভ হবে। অবশ্য সে সঙ্গে তারই আনুষঙ্গিকরূপে অতি অল্প অল্প ক'রে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা হবে গৌণ। তা হলেই বাংলাশিক্ষা ইংরেজীশিক্ষার সহায়ক হবে, পরিপূরক হবে। শিখবার ধাপটি যদি মাতৃভাষার সাহায্যে একবার আয়ত্ত হয়ে আসে, মনটা যদি শেখবার জন্য প্রস্তুত ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, তবে বহু অনাবশ্যক শ্রম ও অবসাদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং খুব কম সময়েও স্থায়িভাবে বহু নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

আবার বিদ্যালয়ের পরবর্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে মাতৃভাষার স্বীকৃতি কতটা হওয়া সঙ্গত সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজ মত প্রকাশ করেছিলেন। একাধিকস্থানে তাদের বিস্তৃত উল্লেখ রয়েছে।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার থেকেই বাংলা ভাষার জন্য একটি প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করা হোক। দেশের মনকে মানুষ করা যখন কোনমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নয়—তখন সাহসের সঙ্গে একথা বলা হোক—বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলেই তবে বিদ্যার ফসল দেশ জুড়ে ফলবে।'—এই তাঁর উক্তি ছিল।

প্রশ্ন উঠেছিল এবং সে প্রশ্ন এখনও চলছে যে—বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দেবার মতো উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ আমাদের দেশে নেই। এর উত্তরে কবি বলেছিলেন : 'নেই সে-কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা-গ্রন্থ হয় কি উপায়ে? বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না—এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষার প্রচলন করা।—দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাকশাল চলিতে থাকিবে, এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?' ক্ষুদ্রায়তন জাপান যদি তার অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষার আধারেই আধুনিক শিক্ষার বিবিধ সামগ্রীকে ধারণ করতে পেরে থাকে এবং 'লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর বরমাল্যও লাভ করতে পেরে থাকে' তবে বাংলাভাষার পক্ষে সে প্রয়াস ব্যর্থ হবে কোন্ কারণে, তা তিনি বুঝতে পারতেন না। (ক্রমশঃ)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আমাদের কাছে তাঁর প্রথম পরিচয় বৈজ্ঞানিকরূপে, বিদগ্ধ বিজ্ঞানী আর রসায়নের রাজা। আধুনিক ভারতের একজন গোড়াকার বিজ্ঞান গবেষক ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাঁর প্রতিষ্ঠা শুধু ভারতের চার প্রাকারে আবদ্ধ ছিল না, তার বাইরেও ছড়িয়ে গেছে তাঁর যশোজ্যোতি। আন্তর্জাতিক রসায়নের ক্ষেত্রেও আজ তাই দেখতে পাই তাঁর নিজস্ব অবদানের স্বাক্ষর। তাঁর অবদানের চেয়ে অসাধারণ তাঁর সাধনা। সে সাধনা আজ একটা দৃষ্টান্ত হ'য়ে রয়েছে বিজ্ঞানের সাধকদের কাছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন আচার্য—সত্যিকারের আচার্য। শুধু তাই নয়, তাঁর আচার্যের সাফল্য আজ ছাপিয়ে গেছে তাঁর বিজ্ঞানীর পরিচয়-সীমাকে। শিক্ষকের বড় কৃতিত্বের পরিমাপ হ'ল, কত কৃতী ছাত্র বা শিষ্য তাঁর ছায়াতলে গড়ে ওঠে তাই দিয়ে। সেদিক থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভারতে অদ্বিতীয়। বর্তমান ভারতের নামজাদা বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠীই তাঁর সৃষ্টি। সে দলে আছেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, সত্যেন বসু, জ্ঞান মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

আধুনিক বিজ্ঞানী হয়েও তিনি কিন্তু শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ভারতের ঐতিহ্যে। যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি খুঁজেছিলেন অতীত ভারতের মধ্যে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস। তার ফলেই লিপিবদ্ধ হ'ল 'হিন্দু রসায়নের' কীর্তিগাথা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ধৈর্য, পরিশ্রম

ও অনুসন্ধিৎসার ফল আমাদের শুধু আত্ম-গৌরবে গরীয়ান্ করেনি, প্রতীচ্যেও জানিয়ে দিয়েছে প্রাচীন ভারতের অগ্রগতির খতিয়ান।

আর একটি জিনিস প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানী-জীবনকে সার্থক করেছে, সম্পূর্ণতা দিয়েছে তাঁর বিজ্ঞানসাধনাকে—সে হ'ল শিল্পসংগঠন গড়ে তুলে বিজ্ঞানকে এদেশে ব্যাবহারিক প্রতিষ্ঠা দান। বাংলার 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' এ-কথার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। শুধু তাই নয়, যখনই যেখানে বিজ্ঞানে শিল্পের প্রয়োগ হয়েছে, প্রফুল্লচন্দ্র তখনই জানিয়েছেন উৎফুল্ল উৎসাহ। আর উদ্দীপনা জুগিয়েছেন বিজ্ঞানী-দের বিজ্ঞানকে জনশিল্পে রূপায়ণের প্রয়াসে।

বিজ্ঞানসম্পর্ক ছাড়িয়েও প্রফুল্লচন্দ্র দীপ্যমান ছিলেন আর এক ক্ষেত্রে—সে হ'ল 'বাঙালী'র প্রতিষ্ঠায়, 'বাঙালী'র উজ্জীবনে। জীবনক্ষেত্রে বাঙালীর পরাজয় তাঁকে যেমন ব্যথিত করেছিল, এমন আর কাউকে করেনি। তাই তাঁর প্রতিটি বক্তৃতায়, প্রতিটি প্রবন্ধে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন বাঙালীর পশ্চাদপসরণের কাহিনী ; বার বার সন্ধান দিয়েছেন—কোথায় তার উত্থানের, তার প্রতিষ্ঠার পথনিশান। বাঙালীকে করতে হবে পরিশ্রম, হ'তে হবে স্বাস্থ্যবান্, বিসর্জন দিতে হবে ভুয়া মর্যাদাবোধ। এই কথা বার বার বিঘোষিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে, তাঁর লেখনীতে। সমসাময়িক কালে প্রফুল্লচন্দ্র তাই প্রতিভাত হয়েছিলেন বাঙালীর 'উত্তিষ্ঠত' বাণীর অন্যতম উদ্গাতার ভূমিকায়। এজন্য কেউ কেউ ভুল ক'রে তাঁকে প্রাদেশিকও মনে করেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা-আন্দোলনের অন্যতম নেতা। স্বাধীনতা-আন্দোলনের বহু কাজে ও সভাসমিতিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকল নেতার শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর আহ্বান সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিল। দেশের চরম প্রয়োজন যে পরাধীনতা থেকে মুক্তি, ব্যস্ত বিজ্ঞানসাধক হয়েও তিনি এটি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন এবং সেই পথে যথাসাধ্য কাজ ক'রে গেছেন।

আর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন দীনের বন্ধু, দুর্গতের সেবক। কত ছাত্র তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্য পেয়ে জীবনে দাঁড়িয়ে গেছে, তার অন্ত নেই। প্রফুল্লচন্দ্র শুধু আচার্য ছিলেন না, ছিলেন সত্যিকারের ছাত্রবন্ধু।

সব শেষের কথা—প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন সরল জীবন, মহৎ চিন্তনের বাস্তব বিগ্রহ। অর্থ উপার্জন করেছিলেন, কিন্তু সে অর্থ ব্যবহার করেননি নিজের ভোগের জন্য। আর কৌমার্যকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন ব্রত ব'লে। সরল আহার, সহজ পরিধেয় ; কিন্তু মহৎ প্রতিভা, বৃহৎ সাধনা। আর ছিল স্বজাতির কল্যাণের জন্য অফুরন্ত চিন্তা।

এই স্বদেশব্রতী বিজ্ঞানাচার্যের এখন জন্ম-শতবর্ষ চলেছে। আচার্যদেব যে সময় বাঙালীকে উঠবার কথা ব'লে ব'লে বেড়াতেন, বাঙালীর অবস্থা আজ তার চেয়েও শোচনীয়। এই একটি কারণেই আচার্যের জন্মশতবর্ষ-উদ্‌যাপনে বাঙালীর উৎসাহ আসা প্রয়োজন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা ও বাণী আজকের তরুণদের জীবনসাধনাকে সক্রিয় করুক, তাঁর সরল জীবন আর একবার ভারতের চিরন্তন আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনুক। আর সর্বোপরি বাঙালীকে জাগতে ও উঠতে সহায়তা করুক—আচার্যদেবের জন্ম-শতবর্ষে এই আমাদের প্রার্থনা।

সমালোচনা

Panchikaranam of Sankaracharya with Sri Sureswaracharya's Varttika—Published by Swami Kripananda, Ramakrishna Mission Sevashrama, Vrindaban (U. P.). Pp. 74 + 6 + xviii. Price Re 1·00.

'পঞ্চীকরণ' আচার্য শঙ্করের সংক্ষিপ্ত একটি প্রকরণ গ্রন্থ, বেদান্তের সার তত্ত্ব ইহাতে অতি অল্প কথায় বলা হইয়াছে। বিষয়বস্তু প্রায় মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতো—ওঁকারের চিন্তন সহায়ে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগৎ তুরীয়ে লয় করিয়া সমাধি বা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় নির্দেশ। এই প্রকরণ গ্রন্থের অপর নাম 'পরমহংসানাং সমাধিবিধিঃ'; বোধ হয় এই শেষের নামটিই যথার্থ। তবে 'পঞ্চীকরণ' প্রচলিত নাম; কারণ বহির্দৃষ্টি মানুষের অনুভূত স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ পঞ্চভূতেরই ব্যাপার। জ্ঞান-সাধনায় এই প্রপঞ্চ কি ভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্বে লীন হয়, তাহারই ইঙ্গিত এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।

গুরুশিষ্য-পরম্পরাভাবে এবং মনে রাখিবার জন্য সূত্রাকারে প্রদত্ত বলিয়া সাধারণের নিকট ইহা আপাতদৃষ্টিতে সুবোধ্য নয়। আচার্য শঙ্করের সুযোগ্য শিষ্য বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য ৬৪টি শ্লোকে এই ক্ষুদ্র অথচ অতি প্রয়োজনীয় প্রকরণ-গ্রন্থটির একটি বার্তিক (ব্যাখ্যা, বিস্তার) রচনা করিয়া জিজ্ঞাসুর তৃষ্ণা মিটাইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্বামী জগদানন্দ বেদান্তের প্রাথমিক ছাত্রগণকে অতি যত্নে এই গ্রন্থ দুইখানি (মূল ও বার্তিক) পাঠ করাইতেন। তাই এই অনুবাদ-পুস্তকটি তাঁহারই স্মৃতির উদ্দেশে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ-লিখিত ভূমিকা (Foreword) এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের শ্রীরাঘবাচার-লিখিত প্রবন্ধটি বিষয়-প্রবেশে সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থের একটি বঙ্গানুবাদের অপেক্ষায় রহিলাম।

শিবানন্দ-পত্রসংগ্রহ : স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম। পোঃ বারাসত, চব্বিশ পরগনা। পৃষ্ঠা ৪০০; মূল্য : চার টাকা।

এই পত্রসংগ্রহখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দজী-লিখিত পত্রাবলীর প্রকাশনায় নূতন সংযোজন। এর আগে 'মহাপুরুষজীর পত্র' নামে স্বামী শিবানন্দজীর একটি পত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জীবনী ও বাণী-সংগ্রহ প্রকাশ ক'রে স্বামী অপূর্বানন্দজী পাঠকমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। মহাপুরুষ-মহারাজের এ যাবৎ অপ্রকাশিত পত্রাবলীর এই সংকলনটি শিবানন্দ-বাণী ও জীবনীর পরিপূরকরূপে আমাদের আনন্দবর্ধন করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহীদের কাছে লেখা এই চিঠিগুলি পড়তে পড়তে যে অধ্যাত্মপরিমণ্ডল মনের মধ্যে আপনি গড়ে ওঠে সেইটিই এ-জাতীয় পত্রসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ দান। তার উপর আলোচ্য এই সংগ্রহটির সঙ্গে জড়িত রয়েছে মহাপুরুষ-মহারাজের সরল, অনাড়ম্বর, ত্যাগপূত, রামকৃষ্ণ-তন্ময় জীবনাদর্শ। দৈনন্দিন জীবনের

অতি সাধারণ কর্তব্যপালন থেকে সর্বস্বত্যাগের মহিমময় আদর্শ অবধি সর্বব্যাপী ভগবৎস্মরণের আন্তরিক প্রকাশ—এই পত্র-সংগ্রহটিকে ভক্তজনের কাছে পরম আশীর্বাদস্বরূপ ক'রে তুলেছে।

এই জাতীয় সংকলন-গ্রন্থে লেখকের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তা না হ'লে পত্র-রচনার পটভূমি অস্পষ্ট থেকে যায় এবং পাঠকের পক্ষে পত্রগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসম্বদ্ধ মনে হ'তে পারে।

পত্র-সংগ্রহ প্রকাশে প্রকাশকের যত্ন ও শিল্পরুচির পরিচয় মেলে। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত ও সুশোভন প্রচ্ছদে মণ্ডিত।

—**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

ফলন (ত্রৈমাসিক পত্রিকা): সাধারণ সম্পাদক—শ্রীযামিনীকান্ত মাইতি। ১৫৭, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৪০; মূল্য ৩১ ন. প.।

ত্রৈমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'ফলন'-এর চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি 'বিবেকানন্দ-সংখ্যা' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যার সব কটি লেখাই স্বামীজী-সম্বন্ধে। লেখাগুলিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়: বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন, বিবেকানন্দ-স্মরণে, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী, কলারসিক বিবেকানন্দ, দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ, নারী-সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রার্থনা ও সঙ্গীত—স্বামী তেজসানন্দ-সংকলিত (পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ)। প্রকাশক: স্বামী বিমুক্তানন্দ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা ১২৮; মূল্য এক টাকা।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের জন্য সংকলিত 'প্রার্থনা ও সঙ্গীত' পুস্তকের তিনটি সংস্করণ অল্পকালের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বইটি ছোট হইলেও ইহাতে বিদ্যার্থিগণের উপযোগী প্রসিদ্ধ স্তব ও সঙ্গীতগুলি বাদ পড়ে নাই। এই সংস্করণে বিদ্যার্থি-হোমবিধিমূলক মন্ত্রাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশা করি ইহা আরও সমাদৃত হইবে ও সমাজের কল্যাণ-সাধনে সহায়তা করিবে। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইলেও সর্বসাধারণের সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মূল্য পূর্ববৎ রাখা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

পাটনা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ ১২৭তম জন্মোৎসব গত ৮ই মার্চ হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐদিন উষাকালে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের আরম্ভ হয়। পরে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ হইতে নির্বাচিত অংশ পাঠ করা হয়। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। ৯ই ও ১০ই কীর্তনাচার্য পণ্ডিত সূর্যনারায়ণ ঠাকুর কথকতার মাধ্যমে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী কীর্তন করেন। ১১ই বিহার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি শ্রীরামন্-এর সভাপতিত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের ছাত্রেরা বেদ গান করেন। তৎপরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দী ঔপন্যাসিক শ্রীফণীশ্বর নাথ 'রেণু' স্বামীজীর তিনটি পত্রের নিজকৃত অনুবাদ পাঠ করেন।

প্রথম বক্তা প্রখ্যাত হিন্দী কবি ও সমালোচক অধ্যাপক কেশরী কুমার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন চিন্তাধারার প্রকৃত মর্মটি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এই দুই মহাপুরুষের কর্ম ও বাণীর নিরলস অনুসরণেই বর্তমান ভারতে বিচ্ছিন্ন জাতীয় জীবন সংহতি লাভ করিতে পারিবে। পরবর্তী বক্তা স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন-কাহিনী আলোচনা-প্রসঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সামগ্রিক একতা ও উহার যুগ-প্রয়োজনীয়তা প্রাণস্পর্শী ভাষায় উদ্ঘাটিত করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীরামন্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় মহান্ পথপ্রদর্শক পুরুষদের জন্মোৎসব-পালনের অনিবার্য সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান আণবিক যুগে সভ্যতার যে বিপর্যয় ঘটিতেছে, উহার শোচনীয় পরিণাম হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে হইলে এই দুই মহাপুরুষের বাণী জগৎকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সভান্তে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা বিবেকানন্দ-প্রশস্তি গান করেন। ১২ই ও ১৩ই মার্চ বারাণসীর শ্রীমোহনলাল ব্যাস 'রামচরিত-মানস' কীর্তন করেন। উৎসব-সূচীর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল মূক, বধির ও অন্ধ ছাত্রদের ভূরি ভোজন করানো এবং হাসপাতালে শিশুবিভাগের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ।

রহড়া: গত ১৪ই হইতে ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪ই মার্চ মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভ উদ্বোধন হইলে পর উপনিষৎ ও গীতাপাঠ এবং পূজা ও হোম হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভা এবং সন্ধ্যায় 'রূপাভিসার' পালা কীর্তন হয়।

১৫ই প্রাতে ভাগবত-পাঠ, অপরাহ্নে 'তরজা' গান ও ধর্মসভা এবং রাত্রে যাত্রাভিনয় হয়। ১৬ই ভজন-সঙ্গীত, পুতুলনাচ এবং চলচ্চিত্র-প্রদর্শন। ১৭ই ভাগবত-পাঠ ও রামায়ণ হয়। রাত্রে আশ্রম-বালকগণের 'প্রহ্লাদ' যাত্রাভিনয় শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ১৮ই শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন ও যাত্রাভিনয় হয়।

নরেন্দ্রপুর : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৫শে মার্চ যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান চলে। মঙ্গলারতি, পূজা, হোম এবং অপরাহ্ণে জনসভায় স্বামীজীর পবিত্র জীবন-কথা আলোচনা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

আশ্রমের ছায়ানিবিড় আম্রকুঞ্জে অপরাহ্ণে যে সভা হয়, দূর-দূরান্ত হইতে নরনারী আসিয়া তাহাতে যোগদান করেন। আশ্রমের বিদ্যার্থীদের কণ্ঠে প্রার্থনা-গীতি ও স্বামীজীর রচনা হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তির পর সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্ত-শাসনমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য স্বামীজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

ফরিদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৮শে জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রাতে ভজন, আরাত্রিক, মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ভক্তগণের সমাগমে ভজন, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি গীত হয়। অতঃপর সমাগত সর্বশ্রেণীর নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

১৮ই ফেব্রুআরি রবিবার অপরাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে অনুমান দেড় সহস্র হিন্দুমুসলমান নরনারীর উপস্থিতিতে স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীবৃন্দের গুরুস্তব দ্বারা সভার উদ্বোধন করা হয়। অতঃপর স্বামীজী-স্তোত্র, সঙ্গীত, আবৃত্তি প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়। ফরিদপুরের সদর মুন্সেফ স্বামীজী-সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলে প্রধান অতিথি ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী স্বামীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অলৌকিক জীবনের বহুমুখী প্রতিভার কথা মনোজ্ঞ ভাষায় পরিবেশন করেন।

সভাপতির অভিভাষণে ক্যাপ্টেন আবদুর রব সাহেব বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বাণী ও রচনার মাধ্যমে যে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষই স্বীয় ধর্মে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়াও জগতের তথা আত্মকল্যাণের নিমিত্ত নিঃস্বার্থভাবে কার্য করিয়া অমৃতত্বলাভে সমর্থ হইতে পারে।

২৬শে জানুআরি স্থানীয় মহিলাগণের উদ্যোগে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন প্রাতে ভজন ও মাতৃসঙ্গীত গীত হয়। মধ্যাহ্নে পূজা ও ভোগ নিবেদিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্তা উমা দাসের সভানেতৃত্বে আনুমানিক ১,৫০০ মহিলার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-দর্শন আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ, মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণের দ্বারা স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত ও আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়।

কাটিহার (পূর্ণিয়া) : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই হইতে ১৯শে মার্চ রামায়ণ-গান, রামায়ণ-পুতুল-প্রদর্শনী, নরনারায়ণ-সেবা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, ক্রীড়ানুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই ও ১৬ই মার্চ স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন অবলম্বনে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিল সরকারের দৈনিক ভক্তিমূলক গান ও কীর্তন এবং শ্রীপ্রেমানন্দ দে সরকারের চারদিনব্যাপী রামায়ণ-গান শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ

করে। তৃতীয় দিবসে স্বামী পরশিবানন্দ স্বামীজীর জীবনাদর্শ-সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। চতুর্থ দিবসে প্রায় ২,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১২শে মার্চ বিদ্যামন্দিরের পুরস্কার-বিতরণী সভায় ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী মিত্র পুরস্কার বিতরণ করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত সোসাইটি: কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ।

রবিবারের বক্তৃতা:

নভেম্বর '৬১: শান্তি, বিশ্বাস ও যুক্তি, ঈশ্বর ও আত্মা, ভক্তি ও কর্ম।

জানু. '৬২: ধর্মপ্রসঙ্গ, অবচেতন মন ও ইহার সংযম, আনন্দময়তা দেবত্বের প্রতীক, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে শ্রীমদ্ভাগবত ও বৃহস্পতিবারে নারদীয় ভক্তিসূত্রের ক্লাস হয়।

সাণ্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে:

রবিবারের বক্তৃতা:

নভেম্বর '৬১: প্রার্থনা, শান্তি, ধর্ম ও বর্তমান জীবন, ঈশ্বর ও আত্মা।

জানু. '৬২: শ্রীশ্রীমা, মন ও ইহার রহস্য, অবচেতন মনের সংযম, যোগ-সমন্বয়।

এতদ্ব্যতীত সপ্তাহ-অন্তর মঙ্গলবারে গীতা-ক্লাস হয়।

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ গত ডিসেম্বরে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বক্তৃতা দেন: দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, কুলটি, রানীগঞ্জ, বর্ধমান রাজকলেজ, দুর্গাপুর বহুমুখী বিদ্যালয়, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া টাউন-হল, আগড়পাড়া নয়া সংস্কৃতি-কেন্দ্র, কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রম।

গত মাসে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বক্তৃতা দিয়া তিনি বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য শক্তিশালী কমিটি গঠন করিয়াছেন:—

মহারাষ্ট্রে: বোম্বাই, পুনা, নাসিক, অমরাবতী, সোলাপুর, পণ্ঢরপুর, পাঞ্জিম, মাড়গাঁও।

গুজরাটে: ভুজ, কচ্ছ, রাজকোট, আমেদাবাদ, বরোদা।

মধ্যপ্রদেশে: জব্বলপুর।

উত্তরপ্রদেশে: এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মুকুন্দবিহারী সাহা

গত ১৪ই মার্চ বেলা ৯টা ৪০ মিঃ সময়ে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রায়সাহেব মুকুন্দবিহারী সাহা ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন, এবং তাঁহারই আদেশে আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিয়া শিক্ষা-বিস্তার-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রথমে প্রধান শিক্ষক ও পরে রেক্টররূপে তিনি রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের সহিত দীর্ঘ ৩৬ বৎসর যুক্ত ছিলেন। রামপুরহাট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবেও তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শেষ বয়সে তিনি শ্যামপাহাড়ীতে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ষায়তন নামে একটি আবাসিক বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক ও নিঃস্বার্থ সমাজ-সেবক মুকুন্দবাবু সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ামাত্র শত শত ছাত্র ও অনুরাগী বন্ধুবর্গ তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার বাসভবন 'মায়ের বাড়ি'তে সমবেত হন, সঙ্গে সঙ্গে রামপুরহাটের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপীঠের ছুটি দেওয়া হয়। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমা করিয়া ৬ মাইল দূরে অবস্থিত শ্যামপাহাড়ীতে তাঁহার নশ্বরদেহ লইয়া যাওয়া হয় এবং জঙ্গীপুরে গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। এই শিক্ষাবিদ্ ভক্তের দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!

উৎসব-সংবাদ

কলিকাতা ঃ বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক গত ১৮ই মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শতবর্ষের প্রতীকস্বরূপ সভামঞ্চে এক শত প্রদীপ জ্বালানো হয়। 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী' সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, ডক্টর রমা চৌধুরী এবং সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন: সব মানুষই সমান, সকলের অন্তরেই ব্রহ্মশক্তি বিরাজিত—এই ছিল স্বামীজীর মূলমন্ত্র এবং ধর্মের জাগরণ, সমাজের উন্নতি অথবা দেশের প্রগতি—যাহা কিছু তিনি করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইহারই ভিত্তিতে।

সোসাইটির সম্পাদক বলেন, স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫১, বিবেকানন্দ রোডে যে স্মৃতিভবন-নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে, উহাতে গ্রন্থাগার পাঠাগার এবং ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে মুক্তহস্তে দানের জন্য তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান।

আজমীর (রাজস্থান) **ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২৪শে ফাল্গুন মঙ্গলারতি, ভজন, বিশেষ পূজা ও ভোগ-রাগাদির অনুষ্ঠান হয়। অপরাহ্নে আশ্রম-নাটমন্দিরে এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বচনামৃত-ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও ভজনান্তে সন্ধ্যারাত্রিক হয়। ৪ঠা চৈত্র অপরাহ্নে রাজস্থান সরকার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অধ্যক্ষ শ্রীবিষ্ণু বাসুদেব নারলেকর মহোদয়ের সভাপতিত্বে আজমীর টাউন-হলে এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-বেদ আলোচিত হয়।

কুমিল্লা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মতিথি-পূজা ও আশ্রমের সাধারণ বার্ষিক উৎসব গত ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ফাল্গুন দিবসত্রয়ব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৪শে বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' পাঠ এবং সন্ধ্যারতির পর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন হয়। ২৫শে প্রাতে ভজন, কীর্তন, মধ্যাহ্নে পূজা, অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ, পরে অধ্যাপক অজিতকুমার গুহের সভাপতিত্বে সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। পরে পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। রাত্রে রামায়ণ-গান হয়। ২৬শে উষাকীর্তন, ভজনগান, বিশেষ পূজা, হোম, রামায়ণ-গান ও প্রসাদ-বিতরণ হয়।

নাটশাল (মেদিনীপুর) **ঃ** রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা, পূজা পাঠ, হোম, ভজনাদি

অনুষ্ঠিত হয়। ৭,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী অমলানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ এবং বর্তমান সমাজে তাঁহাদের পন্থানুসরণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

নানাস্থানে উৎসব

নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব-সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি :

যাদবপুর কাটজুনগর কলোনি, **খেপুত** (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, **খাঁটোরা** (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসঙ্ঘ।

চীনদেশে সিমেণ্টের নৌকা

দেশের ভিতরে পরিবহণের সুবন্দোবস্তের জন্য চীনেরা বহুসংখ্যক সিমেণ্টের নৌকা নির্মাণ করিয়াছে। গত বৎসর সাংহাই-সমেত চীনের বারোটি শহরে দশ হাজার টন মাল ধারণের উপযোগী সিমেণ্ট-নৌকা নির্মিত হইয়াছে। এই নৌকাগুলি যন্ত্র বা পাল দ্বারা চালিত হয়। এই ধরনের সিমেণ্টের নৌকা প্রথম নির্মিত হয় ১৯৫৮ খৃঃ। ইহা প্রস্তুত করিতে সমান মাপের কাঠের নৌকা অপেক্ষা ১০% বেশী খরচ পড়িলেও ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় এবং ইহার সংরক্ষণ-খরচ অপেক্ষাকৃত কম। (সংকলিত)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার মৃত্যুহারকে অতিক্রম করিয়াছে, জন্ম ও মৃত্যুর অনুপাত ৩ : ১। একই সময়ের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ৪·০৯ ও ১·৫৬ কোটি। ইহাতে বুঝা যায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ২·৫৩ কোটি। বিদেশ হইতে আগত ব্যক্তি অপেক্ষা প্রবাসীর সংখ্যা ২·৭% বেশি হইয়াছে, ফলে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ২·৮০ কোটি। (সংকলিত)

বিশ্ব-ঐক্য ও ধর্ম

গত ২রা এপ্রিল পাটনায় এক রোটারি সভায় ভারতে সিংহলের হাই কমিশনার স্যর অলবিহারে (Sir Richard Alwihare) বলেন : বিশ্ব-ঐক্যের পথে ধর্ম বাধাস্বরূপ প্রমাণিত হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। প্রত্যেক ধর্মেই এমন সব মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা সর্বসাধারণের উপযোগী আদর্শ ও নীতি কমবেশি প্রচার করিয়াছেন। সমস্ত বিশ্বাসের মিলন-ভূমি হইবে ঐক্য। ধর্মের ভবিষ্যৎ সমস্যাগুলি বাস্তব মূল্যে বিচারিত হইবে, শুধু তত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। ঠিকভাবে ধর্মাচরণ করিলে মানুষ বিশ্ব-ঐক্যে দৃঢ়বিশ্বাসী হইবে। এই ভাব যদি প্রচারিত হয়, তবে জগতের মিলন-ক্ষেত্রে ধর্মের দান হইবে অতি মহৎ। সুশিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রই বিশ্ব-ঐক্য কামনা করে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, খুব ধীরে ধীরে হইলেও বিশ্ব-ঐক্য একটি রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। (P.T.I.)

জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

ধর্ম জিনিসটা কেবল আনুষ্ঠানিক নয়, ধর্ম একটা আস্বাদনের বিষয়। এই আস্বাদনই আমাদের শ্রীভগবানের পথে আকর্ষণ করে। অনুভূতি না থাকলে ধর্ম শুষ্ক হ'ত। যদি সাধন না থাকে, তবে শুধু চতুর্বেদ ও শাস্ত্র-রাশি পাঠের দ্বারা ধর্ম কিছুই বোঝা যায় না।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এই অনুভূতির একটা বড় দৃষ্টান্ত। সত্যের যত দিক আছে, তিনি সব দেখেছেন। ঈশ্বরের ভাব অনন্ত; কাজেই তাঁর সাধনা অনন্ত, ঈশ্বরলাভের পথও অনন্ত। ঠাকুরের সাধনার শেষে সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁর কাছে ছুটে এসে তাঁর অনুভূতির বিষয় শুনত, আর অবাক্ হয়ে যেত! সত্য এক, কিন্তু তাকে ঠাকুরের মতো এত বিভিন্নভাবে দর্শন ও অনুভূতি আর কেউ করেননি। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা, তাঁর সঙ্গে কথা বলা ও ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার কথা অন্য কারও কাছে এত বেশি শোনা যায়নি। খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের সাধনও ঠাকুর নিজে করেছেন। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ত্রৈলোক্য-বিজয়াদি ব্রাহ্ম ভক্তদের তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।'

ব্রাহ্মরা সনাতন হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, অবতারবাদ এবং গুরুবাদ মানতেন না; এ সমস্তের বিরুদ্ধে তাঁরা কত আন্দোলন করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁদেরই নেতারা আবার ভবতারিণীর পূজারীর কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে উপদেশ শুনতেন। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিদের কথা শুনে সে-সময় অনেকেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যেও কয়েকজন প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম সই করেছিলেন। যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হলেও ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের সংশয়-নিরসনের জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার?' ঠাকুর বলতেন, 'ঈশ্বরের ইতি করা যায় না। তিনি সাকার, নিরাকার, আরও কত কি!' ঈশ্বর স্বরূপতঃ কি, তা নিয়ে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই একটা দ্বন্দ্ব চলেছিল। খৃষ্টান মিশনরীরা ও পরে ব্রাহ্ম প্রচারকগণ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

---

* মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৪-৪-৫৪ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ। শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক শ্রুতলিখিত।

হিন্দুধর্মের অবস্থা তখন শোচনীয়, শিক্ষিত মহলে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কোন রকমে ধারাটা বজায় রেখেছিলেন মাত্র। তখন প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করছিল, তাদের ভাবটিই সত্য আর সব মিথ্যা। বিদ্বান্ মিশনরীরা সুন্দর সুন্দর বক্তৃতায় শিক্ষা দিচ্ছিলেন, হিন্দুরা যা করে সবই ভুল। এই সমস্ত কারণে হিন্দু যুবকদের মধ্যে স্বধর্মে অনাস্থা এসে পড়েছিল। সেই দুর্দিনে ঠাকুরের আবির্ভাব। তিনি আবার সনাতন হিন্দুধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। বললেন, 'যত মত তত পথ'। তাঁর সাধনা ও উপদেশে এই একটা বড় কলহ চিরদিনের মতো মিটে গেছে। এটি তাঁর একটি বড় অবদান। ইদানীং ধর্মজগতে ভাবের যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে ঠাকুরের সাধনা ও অনুভূতি।

ঠাকুর হাতীর দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। কতকগুলো অন্ধ একটা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। কেউ তাদের ব'লে দিলে, 'এর নাম হাতী'। কানারা তখন হাতীর গা স্পর্শ ক'রে দেখলে। তাদের মধ্যে একজন বললে, 'হাতী থামের মতো।' সে কেবল হাতীর পা ছুঁয়েছিল। আর একজন কানা বললে, 'হাতীটা কুলোর মতো।' সে কেবল হাতীর একটা কানে হাত দিয়ে দেখেছিল। আর আর যারা কেবল শুঁড় কিংবা পেটে হাত দিয়েছিল, তারা অন্যান্য প্রকার বলতে লাগলো। ঈশ্বর-সম্বন্ধে তেমনি যে যতটুকু অনুভূতি করেছে সে মনে করে, 'ঈশ্বর এমনি, আর কিছু নয়।'

ঠাকুর সমস্ত হাতীটাকে দেখেছেন,—সব জিনিসটা প্রত্যক্ষ করেছেন, অনুভূতি করেছেন। ব্রাহ্মকে তিনি ব্রাহ্মভাবে রাঙিয়ে দিয়েছেন, শাক্তকে শাক্তভাবে, বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবভাবে। যে-কোন ধর্মমতেরই লোক তাঁর কাছে আসুক না কেন, ঠাকুর তাকে তারই ভাবে রাঙিয়ে দিতেন। তাই তিনি হয়েছেন জগদ্গুরু।

একবার মাদ্রাজের এক বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, 'ঠাকুরের বাণী যেন মস্তিষ্ক ডিঙিয়ে একেবারে হৃদয়ে প্রবেশ করে। তাই তাঁর কথা মাথা পেতে মেনে নিতে হয়, বিচার ক'রে বুঝতে হয় না।'

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। তিনি নিজে কম সাধক ছিলেন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। মহর্ষির কত অনুভূতি হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে নরেন্দ্রনাথ (স্বামীজী) যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ঈশ্বরকে দর্শন করেছেন কি?' সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন মহর্ষি। কেবল ঠাকুরই তাঁকে (স্বামীজীকে) বলতে পেরেছিলেন, 'হাঁ, এই এই তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়ে আরও স্পষ্টভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছি।'

ঠাকুর দেখেছিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব জগতে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে। এই দর্শনের পর তিনি জগদম্বার বাণী শুনলেন, 'তোর কত ভক্ত আসবে।' তাই আরতির সময় কুঠির উপর থেকে ঠাকুর চীৎকার ক'রে কেঁদে কেঁদে ডাকতেন, 'ওরে, কে কোথায় ভক্ত আছিস, আয়!' তাঁর সে-ডাক এখনও বন্ধ হয়নি। কত দেশ থেকে কত লোক আসছে তাঁর ডাক শুনে। কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাতেন, গোপীরা তা শুনে ছুটে আসত—ভাগবতে আছে; এবং

'অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

ঠাকুর বলেছেন, 'যাদের শেষ জন্ম, যারা মনমুখ এক ক'রে তাঁকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডেকেছে, তারা এখানে আসবে।' জগদম্বা ঠাকুরকে

বলেছিলেন, 'তুই ভাবমুখে থাক।' 'ভাবমুখ'-এর অর্থ—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতের মাঝামাঝি জায়গায়। ঠাকুরের জীবন যেন ঘড়ির দোলক; নিত্য থেকে লীলা, আবার লীলা থেকে নিত্যে তাঁর আনাগোনা।

ঠাকুর তন্ত্র-সাধনের প্রথম অবস্থায় ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ও বেদান্ত-সাধনের সময় তোতাপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বেদান্তের চরম সাধন তিন দিনে শেষ করলেন তিনি, যা করতে গুরু তোতাপুরীর লেগেছিল সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর। তোতাপুরী অরূপের ধ্যান করতেন, অরূপেরই অনুভূতি ছিল তাঁর। ভৈরবী অদ্বৈতবাদ মানতেন না। ভৈরবী ও তোতাপুরীর মধ্যে যেটুকু অসম্পূর্ণতা ছিল, তা পূরণ ক'রে ঠাকুর তাঁদের জীবনও ধন্য ক'রে দিয়েছিলেন। ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শনের কাছে সবাই চুপ হয়ে যেত। যারা কাশীর কথা বইয়ে পড়েছে আর যারা কাশী দর্শন করেছে, তাদের মধ্যে ঢের তফাৎ।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'দয়া নয়, পরোপকার নয়। সর্বভূতে হরি আছেন, এইভাবে সেবা। এই সেবার মূলে যদি নামযশ ও প্রত্যুপকারের আশা অথবা স্বর্গকামনা না থাকে, তা হ'লে তাই হবে গীতার নিষ্কাম কর্ম।' বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'জীবে দয়া'র কথা আছে। ঠাকুর দয়ার কথা উড়িয়ে দিলেন। তারও উপর থেকে তিনি দেখেছেন।

ঠাকুরের জীবনে আমরা আর একটি অপূর্ব জিনিস দেখতে পাই, সেটি তাঁর বিবাহ। ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন। ঠাকুর তা করেননি। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে পাঁচ-ছ বছর ধরে সব রকমে বাজিয়ে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁর শয্যার নীচে স্বামীজী একটি টাকা রেখে দিয়েছিলেন। সেই শয্যায় বসবা-মাত্র ঠাকুর বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। স্বামীজী তখন তাঁর পা-দুটি জড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পঞ্চবটীর তলায় গঙ্গার ধারে বসে ঠাকুর 'মাটি টাকা, টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি' ব'লে দুই-ই গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন। টাকাটা ফেলে দেওয়ার অর্থ সব বিষয়-ভোগবাসনা ত্যাগ করা, নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করা। ভোগ-সুখের বাসনাই তো মানুষকে সংসারে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে।

উপনিষদের যুগে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, ভোগের ভিতর দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না। ঠাকুর-স্বামীজীও আবার সেই অমৃতত্বের পথ দেখিয়ে গেছেন। ত্যাগই হচ্ছে আমাদের পথ। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।' আমরা খাপ খাওয়ানোর, Compromise-এর চেষ্টা করি; সেটি হয় না। ঊনবিংশ শতকে ভবতারিণীর পাগল পূজারী গঙ্গার ধারে এক হাতে টাকা অন্য হাতে মাটি নিয়ে বিচার ক'রে এই ত্যাগের মহিমাই দেখিয়ে গেছেন। গীতা বাইবেল কোরানের ধর্মবিশ্বাসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। ভোগের পথ বর্জন করেই নচিকেতা মানবকল্যাণের জন্য সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব জেনেছিলেন। ঠাকুর ত্যাগীশ্বর, আর তাঁর শিষ্যগণও প্রত্যেকেই ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ঈশ্বরের সত্তায় আমরা টিকে আছি। তিনি আমাদের এত কাছে—এত নিকটে! আর আমাদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সবই আমরা অন্যত্র বিলিয়ে রেখেছি। ছড়ানো প্রেম, প্রীতি, ভালবাসাকে সেই সব জায়গা থেকে গুটিয়ে আনতে হবে, অন্তর্মুখী করতে হবে, ঈশ্বরমুখী করতে হবে। জগদ্‌গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন ও সাধনা দিয়ে এ যুগে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে

'দরিদ্রদেবো ভব'

'উপনিষদে পড়েছ—পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব। আমি বলি—দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।'—চিকাগো হইতে এই কথাগুলি স্বামীজী লিখিতেছেন তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতাকে ১৮৯৪ খৃঃ মে-জুন মাসে। রাজপুতানার গরীব প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া সেই গুরুভ্রাতা জানিতে চাহিয়াছিলেন—'দরিদ্রের দুঃখ-কষ্টে আমাদের কর্তব্য কি?' জগৎ মিথ্যা, অতএব জগতের অন্তর্গত অবশ্যম্ভাবী দুঃখে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর আর কি কর্তব্য থাকিতে পারে? সুখ-দুঃখের পারে যাওয়ার সাধনা করাই তাহার কর্তব্য! বৈদান্তিক বিবেকানন্দ তো এই উত্তরই দিতে পারিতেন! কিন্তু এই নব-বৈদান্তিকের জীবন যিনি গঠিত করিয়াছিলেন, তিনি কি তাঁহাকে এ-বিষয়ে বীজমন্ত্র দিয়া যান নাই—'জীবে দয়া নয়, শিব-জ্ঞানে জীবসেবা'? সেইদিন হইতেই ভাবী বিবেকানন্দের মনে দুঃখী দরিদ্র আর্ত মানব দেবতায় রূপান্তরিত হইতে শুরু করিয়াছিল!

তারপর দীর্ঘ ছয়বৎসরকাল পরিব্রাজক-রূপে নানাস্থানে ভ্রমণের ফলে স্বচক্ষে তিনি দেখিয়াছেন ভারতের দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্য, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন দরিদ্র মূর্খ ভারতবাসীর ব্যথা বেদনা, শেষে উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন কিভাবে এই যুগযুগব্যাপী দুর্দশা দূরীভূত করা যায়! কুমারিকা অন্তরীপে ধ্যানমগ্ন বিবেকানন্দের ব্যথিত হৃদয় মথিত করিয়া ভারতের পুনর্জাগরণের অমৃতমন্ত্র উত্থিত হইল। তাহাই পরবর্তীকালে পত্রে পত্রে ছন্দে ছন্দে বক্তৃতায় কাব্যে কথায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে! 'দরিদ্রদেবো ভব' সেইরূপই একটি মহামন্ত্র! দরিদ্র ঘৃণার পাত্র নহে, দয়ার পাত্র নহে, আরাধনার পাত্র, সেবার পাত্র, দরিদ্র নারায়ণ! 'ঐ যে কতকগুলি আর্ত দরিদ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেন? না, তুমি আমি তাহাদের সেবা করিয়া জ্ঞান লাভ করিব, মুক্তিলাভ করিব বলিয়া—' এই প্রকার উক্তিও স্বামীজী করিয়াছেন!

'দরিদ্রনারায়ণ' কথাটি দ্বিবিধ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে, সেগুলির সহিত আমরা পরিচিত। ধর্মপ্রবণ প্রাচীন দল বলেন, নারায়ণ কি করিয়া দরিদ্র হইবেন? তিনি চিরদিন লক্ষ্মী-সমলঙ্কৃত! —অতএব 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটি অর্থহীন প্রলাপমাত্র! ধর্মবিশ্বাসহীন প্রগতিশীল নবীন দলের সমালোচনা অন্য প্রকার! তাহারা বলেন, শীঘ্রই নূতনতর রাষ্ট্রে দরিদ্র আর কেহ থাকিবে না, তখন এই দরিদ্রদেবতার সেবকদের কি দশা হইবে?

প্রথম সমালোচনার উত্তরে এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে: নারায়ণকে দরিদ্র বলা হয় নাই, দরিদ্রকে নারায়ণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ নারায়ণ-বোধে তাহার সেবা করিতে বলা হইয়াছে—ইহা নরনারায়ণ-বাদেরই অনুসিদ্ধান্ত; মানুষের মধ্যে যে দেবতা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, আবৃত রহিয়াছে—সেবায় তাহারই স্ফুরণ!

দ্বিতীয় সমালোচনার উত্তরে আর বিশেষ কিছু বলা সম্ভব নহে। শুধু এইটুকু বলিয়াই মৌন অবলম্বন করিতে হইবে, 'আহা, সেই শুভদিন আসুক—অতি শীঘ্রই আসুক, যেদিন দেশে দরিদ্র বলিয়া আর কেহ থাকিবে না।

তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে একটি দেবতা কমিয়া গেলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। দেবতার সেবকেরা আবার নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়া লইবে। দরিদ্র ও মূর্খ দেবতা অন্তর্হিত হইলেও আর্ত পীড়িত—শোকার্ত রোগপীড়িত সবই কি অন্তর্হিত হইবে এই 'দুঃখের আগার-স্বরূপ' মায়াময় জগৎ হইতে? স্বামীজীর দেবতাতত্ত্ব আরও গভীর, আরও ব্যাপক! তিনি বলিতেছেন: গঙ্গাতীরে কূপ খনন করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে? দেবতার সন্ধানে কোথায় যাইবে? আর্তপীড়িত, সকল জাতির দুঃখী হতভাগ্য, এমনকি দুষ্ট বদমাস—ইহারাও কি তোমার দেবতা নহেন! —'Are not the wicked, the miserable, the wretched of all nations your gods?' —ইহাদের সেবা করিলে মানুষের হৃদয়ের বিস্তার হইবে, অনুভূতি-শক্তি বাড়িবে, মানুষ উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিবে।

দারিদ্র্য—শুধু একটা আর্থনীতিক ব্যাপার নয়; মানসিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য সমভাবে মানুষের দুঃখের কারণ! দারিদ্র্য তমোগুণের লক্ষণ, জীর্ণ মলিনতা, অন্ধকার নিদ্রা আলস্য প্রমাদ—এই সকল ভাবই দারিদ্র্যের সহিত জড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তের বাড়িতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালা হয় নাই দেখিয়া বলিতেছেন: এটি তমোগুণ, আলো জ্বালো। আলো শুধু গৃহে জ্বলিবে না—দেহেও জ্বলিবে—মনেও জ্বলিবে। আলো সত্ত্বগুণের প্রতীক—জ্ঞানের প্রতীক।

তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ বাহির হইতে একই প্রকার দেখায়। তাই দেখা যায় শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সাধনা করিতে করিতে সাধারণ সাধক তমোগুণে ডুবিয়া যায়, ধ্যান নিদ্রায় পরিণত হয়। ভারতে এক সময় এই প্রকারই হইয়াছিল; তাই স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, প্রবল কর্মযোগের সাধনা প্রবর্তিত করিতে; উদ্দেশ্য রজোগুণদ্বারা তমোগুণ জয় করিয়া দেশবাসীকে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করা!

ভারতের দারিদ্র্য সর্বাংশে আর্থনীতিক নহে—এ-কথা বুঝাইতে গিয়া স্বামীজী বলিতেছেন: ভারতে দারিদ্র্য পাপ নহে, ভারতে মানুষ দারিদ্র্য বরণ করে ব্রত বলিয়া। ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ ভিক্ষা করা গৌরব বলিয়া মনে করেন। ভারতে দরিদ্র হইলেই মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হয় না, মিথ্যাবাদী হয় না, ভারতের মানুষ নিরক্ষর হইলেই অশিক্ষিত হয় না। ভারতের এই সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াও স্বামীজী আধুনিক যুগের পদ্ধতি-সহায়ে ভারতবাসীর ঐহিক উন্নতিরও পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কার্যে রূপায়িত করিবার সূত্রপাতও করিয়া গিয়াছেন।

* * *

এখন দেখা যাউক ভারতের দর্শনে ইতিহাসে কাব্যে দারিদ্র্য কিভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তারপর দেখিব পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় দারিদ্র্য কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে ও কিভাবে ঐ সমস্যার সমাধান হইতেছে।

সর্বত্রই দেখা যায় বৈশ্য ও শূদ্র ধনসম্পদ উৎপন্ন করে, ক্ষত্রিয় দেশরক্ষার জন্য কর গ্রহণ করিয়া সামরিক ও রাজশক্তি নিজের আয়ত্তে রাখে, ব্রাহ্মণশক্তি বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করিয়া সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক মন্ত্রণা দিয়া সকলকে সাহায্য করে। ভারতের বর্ণবিভাগ শ্রমবিভাগেরই একটি ব্যবস্থা, বর্তমানে ইহা বিসদৃশ মনে হইলেও একদিন ইহা সমাজের কর্ম-সমস্যার সমাধান করিয়াছে। এবং সমাজে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়িত্ব আনয়নে সক্ষম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণশ্রেণীকে পরের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয় বলিয়া তাহাকে দরিদ্র জীবনই যাপন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ-রচিত দর্শনে কাব্যে দুঃখ-দারিদ্র্য তাই এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দারিদ্র্যের বহু দার্শনিক ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর চিরবিবাদ এদেশে প্রবাদ-বাক্য, ধন ও জ্ঞান যেন রাত ও দিন। তারপর জ্ঞানের সাধকগণ সন্তোষের সাধনায় অগ্রসর হইয়া বুঝিয়াছেন ও ঘোষণা করিয়াছেন ভোগ করিয়া কখন ভোগ শেষ করা যায় না, অতএব ভোগকে সংযত করাই উন্নত জীবন লাভ করিবার প্রথম সোপান। এইরূপ সাধকদের হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে সত্যানুভূতি—এই আলো: 'স তু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা।' ধনহীন ব্যক্তি দরিদ্র নয়—যাহার তৃষ্ণা বিশাল—অপূরণীয়, সেই দরিদ্র।

পাশ্চাত্য জগতেও বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত ক্রিশ্চানিটির মধ্যযুগে দারিদ্র্য ব্রত বলিয়া গৃহীত হইত, উহা কখনও ইওরোপের স্বধর্ম বলিয়া আচরিত হয় নাই। তাই দেখা যায় রেনাসাঁর পর মধ্যযুগীয় জড়তা (তমোভাব) কাটিয়া গেলে প্রবল রজোগুণের চর্চা শুরু হইয়াছে, দিকে দিকে স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম, প্রাচীন স্বধর্ম আবিষ্কার-চেষ্টা এবং আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি!

পশ্চিমে দারিদ্র্যকে অভিশাপ বলিয়াই মনে করা হইয়াছে। শিল্প ও শিক্ষা-সহায়ে দারিদ্র্য ও মূর্খতা দূর করিয়া আজ পাশ্চাত্য পৃথিবীর নিয়ামক, ঐহিক জীবনে সে অবশ্যই ভারতের গুরুস্থানীয়, অনুকরণীয়।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ দারিদ্র্যকে কি দৃষ্টিতে দেখেন জানিলে আমরাও আমাদের দেশের দারিদ্র্যের প্রকৃত রূপ বুঝিতে পারিব। ইহার সবখানি দার্শনিক নয় বা অদৃষ্ট নয়, ইহার অনেকখানিই আর্থনীতিক ও সামাজিক ব্যাপার; ইহার যথার্থ কারণ জানিতে পারিলে আমরা নিশ্চয় ইহা দূর করিতে পারিব।

উনবিংশ শতাব্দী হইতেই দারিদ্র্যের সমস্যা ধনবিজ্ঞান বা অর্থনীতির সমস্যা-রূপেই আলোচিত হইতেছে. ধন-উৎপাদন, সমভাবে বণ্টন, কর্মসংস্থান ও স্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থাদির সহিত ইহা জড়িত। বেন্থাম, মিল, মার্কস্ প্রভৃতি এই সমস্যা লইয়া বহু চিন্তা করিয়া গিয়াছেন এবং সেগুলি তাঁহাদের নামের সহিত জড়িত। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়। গত শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক প্রুধোঁর - (Prudhon) পুস্তক 'দারিদ্র্যের দার্শনিকতা' (Philosophy of Poverty) পুস্তকের সমালোচনা করিয়া কার্ল মার্কস্ লেখেন 'দর্শনের দারিদ্র্য' (Poverty of Philosophy); তারপরই তাঁর সন্ধান শুরু হয় কয়লার খনিতে ও শিল্পাঞ্চলে। দারিদ্র্যের কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, শ্রমিকের শ্রমকে মূলধন করিয়া, তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া ধনিক নিজের উন্নতি করিতেছে। যদিও মার্কস্ বলিয়াছেন 'আমি মার্কসিস্ট নই', তথাপি তাহার ভাব অংশতঃ কার্যে পরিণত করিয়া যে-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা জানি না সেখানে দারিদ্র্য-দুঃখ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কিনা।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার দারিদ্র্য সর্বজন-বিদিত। বাহ্য সমৃদ্ধির শিখরে সমাসীন আমেরিকা দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কি চিন্তা করে, তাহাও আমাদের জ্ঞাতব্য—তাহাও আমাদের সমস্যা-সমাধানে সাহায্য করিতে পারে। হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক গ্যালব্রেথ মার্কিন রাষ্ট্রদূত-রূপে ভারতে রহিয়াছেন এবং সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সকল ভাষণ

দিয়াছেন সেগুলিতে ভারতের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার কথা নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সর্বশেষে তাঁহার একটি প্রবন্ধে (Causes of Poverty) দারিদ্র্যের কারণগুলি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে আলোচিত হইয়াছে। এখানে আমরা সেগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল অধ্যাপক দারিদ্র্যকে একপ্রকার রোগ বলিয়াই মনে করেন, অতএব রোগনির্ণয়ের যে-প্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (clinical methods) অবলম্বনীয়, তাঁহার মতে এক্ষেত্রেও তাহাই প্রয়োজন। কিন্তু তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, আজ মানুষকে মারিবার জন্য এবং চন্দ্রলোকে যাইবার জন্য যে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা হয়, যে অর্থ নিয়োগ করা হয়, তাহার শতাংশের একাংশ দারিদ্র্য-দূরীকরণে অর্থাৎ দারিদ্র্যরূপ ব্যাধি-নিরাময়ের জন্য নিয়োজিত করিতে পারিলে এই পৃথিবীই সুখের স্বর্গে পরিণত হইবে; মারণাস্ত্র বা চন্দ্রলোকের আর প্রয়োজনই হইবে না।

সর্বদা সর্বত্র প্রদর্শিত কারণগুলি উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক দৃষ্টান্ত-সহায়ে দেখাইয়াছেন গত শতাব্দীতে কোথাও কোথাও কিছু পরিমাণে সত্য হইলেও বর্তমানে বা সর্বত্র সেগুলি দারিদ্র্যের কারণ বলা যায় না।

(১) কোন দেশের লোক আরামপ্রিয় অলস ও আকাঙ্ক্ষাহীন হইলেই যে সেই দেশ দরিদ্র হয়, এ-কথা সত্য নয়; দেখা যায়—বহু আরাম প্রিয় জাতি সমৃদ্ধ, আবার বহু শ্রমশীল জাতি দরিদ্র। আর মানুষ কখনই আকাঙ্ক্ষাহীন নয়, সর্বদাই সে কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

(২) ঔপনিবেশিক শাসনকে দারিদ্র্যের কারণ বলা হয়, ঔপনিবেশিক শাসনের পরও দেশে দারিদ্র্য রহিয়াছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়; ঐ প্রকার শাসন সত্ত্বেও কোন কোন দেশ সমৃদ্ধ।

(৩) শ্রেণী সংঘর্ষ ও শোষণ দারিদ্র্যের কারণ: কিন্তু দেখা গিয়াছে স্বাধীন চাষীই অধিকতর দরিদ্র।

(৪) অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। ইহা কোন ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা যায় না।

(৫) যুদ্ধ বিপ্লব বা দাঙ্গার পর অনেক দেশে দুঃখ-দারিদ্র্যে নিমগ্ন হয়। তথাপি দেখা যায় যুদ্ধের পর অনেক দেশ উন্নতিশীল, আবার স্থায়ী শান্তিপূর্ণ দেশ দারিদ্র্যপীড়িত।

(৬) অল্প মূলধন: অধিকাংশ অনুন্নত দেশে ইহাই দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ। যে দেশে দেশবাসী অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না, সে দেশে বিদেশ হইতে সাহায্য লইলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৭) জনসংখ্যা-বৃদ্ধিকে দারিদ্র্যের কারণ বলা হয়; দরিদ্র দেশেই ইহা সমস্যা, সমৃদ্ধ দেশে নয়। পৃথিবীর পরিসংখ্যানে দেখা যায় বহু জনসংখ্যাবহুল দেশ সমৃদ্ধ, যথা হল্যাণ্ড ও দক্ষিণ ব্রেজিল, আবার বহু জনবিরল দেশ দরিদ্র, যথা আরব ও উত্তর ব্রেজিল।

(৮) অনগ্রসরতা বা আধুনিক ভাব ও যন্ত্র-পাতি গ্রহণে অনিচ্ছা: কিন্তু যন্ত্রপাতির যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে হইলে আগে শিক্ষা প্রয়োজন।

(৯) প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবই দারিদ্র্যের কারণ এ-কথাও সত্য নয়; প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও দেশ দরিদ্র; আবার প্রাকৃতিক সম্পদহীন দেশও সমৃদ্ধ।

অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপকের সংগৃহীত তথ্যে ও বিশ্লেষণে এইটুকু ধরা পড়িয়াছে—দারিদ্র্যের যথার্থ কারণ আজও নিরূপিত হয় নাই, কতক-গুলি ভাসাভাসা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা-মাত্র দেওয়া

হইয়াছে। এক এক যুগে এক এক দেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দারিদ্র্যের কারণ বিভিন্ন। তথাপি সাধারণীকরণের (generalisation) ভাব লইয়া বলা যায় দারিদ্র্য এক প্রকার রোগবিশেষ, শারীরিক মানসিক দুর্বলতা, উন্নতি বিষয়ে হতাশা, তাই ব্যাপারটি শুধু আর্থনীতিক নয়, অধিকাংশ পুরাতন রোগের মতো মনস্তাত্ত্বিকও বটে।

* * *

মানুষকে একটা আশার বাণী শুনাইতে হইবে। 'ওঠ লাজেরাস' বলিয়া যীশু পঙ্গুকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন, স্বামীজী এ যুগের পঙ্গুমনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'। তাহার মনে একটা নবজীবনের তৃষ্ণা জাগাইয়া গিয়াছেন—সে জীবনের ভিত্তি মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু তাহার ছাদ অসীম আকাশে! অভ্যুদয়ের পর নিঃশ্রেয়স!

'দরিদ্রদেবো ভব' এই মন্ত্র দ্বারা স্বামীজী দরিদ্রনামক দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই দেবতাকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিয়াছেন, এরূপ মনে করিলে তাঁহার হৃদয় ও মনীষার প্রতি বড়ই অবিচার করা হইবে। অনুভূতির কতখানি গভীরে ঐ মন্ত্র দর্শন করিয়া এ যুগের মানুষের কর্ণে উহা উচ্চারণ করিয়া, তিনি আগামী যুগের মানুষের কল্যাণের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা অনুধাবন করিবার সময় আসিয়াছে।

দরিদ্রকে দুইটা পয়সা ছুঁড়িয়া দেওয়া নয়, দয়া নয়, কৃপা নয়,—সেবা, আরাধনা বা উপাসনা। কেন? যুগপৎ ইহার দুই উদ্দেশ্য; প্রথম এবং প্রত্যক্ষ—মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে জাগাইয়া তোলা, সমাজের দিক দিয়া হয়তো এইটিই প্রধান। কারণ এই উপায়ে সমাজে সদ্‌ভাবাপন্ন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সেবা বা দেবতাবোধে অভাব দূরীকরণরূপ উপাসনা বা কর্মযোগের মাধ্যমে সেবকেরও চিত্তশুদ্ধিদ্বারে আত্মোপলব্ধি হইবে, হৃদয়ের বিস্তৃতিদ্বারে সাধক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইবে। ব্যক্তির দিক দিয়া এইখানেই সেবার সার্থকতা।

'দরিদ্রদেবো ভব' কথাটির আর একটি প্রায়োগিক দিক আছে। প্রীতিপূর্ণ সেবা দ্বারা দরিদ্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত দেবতাকে জাগাইতে না পারিলে হিংসাদ্বেষপূর্ণ দৈত্যশক্তি জাগিবে, বিচার-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতাহীন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন সংসারে ও সমাজে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে, কোথাও কোথাও এখনই করিতেছে। আগামী যুগে দরিদ্র শূদ্র জাগিবেই জাগিবে। স্বামীজীর চক্ষে বিশ্ব-ইতিহাসের বিশেষত ভারতেতিহাসের এই পরবর্তী দৃশ্য স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছিল। বৈশ্য-শূদ্রের বর্তমান সংগ্রামের শেষে শূদ্রশক্তি বা শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য অনিবার্য। সমাজ, সভ্যতা রাষ্ট্র—সব কিছুর নিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদেরই হাতে গিয়া পড়িবে, কোন কোন দেশে এখনই গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা পড়িতেছে।

এক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা যদি ভবিষ্যতের এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া যুগযুগ ধরিয়া কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করেন, এবং স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কিছু পরিমাণে চেষ্টা করেন, তবে সরলপ্রাণ দরিদ্র এই উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে; এবং সমাজে কোন হিংসাত্মক বিপ্লব ঘটিবে না, পরন্তু শান্তি-পূর্ণভাবে সমগ্র সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। অন্যথায় স্বামীজীর আর একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইবার পথ প্রশস্ত হইবে। সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী: 'উচ্চবর্ণেরা শূন্যে বিলীন হইয়া যাও। নতুন ভারত বেরুক ……।'

গীতা—তৃতীয় বক্তৃতা

স্বামী বিবেকানন্দ

(১৯০০ খৃঃ ২৯শে মে স্যান ফ্র্যান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপির অনুবাদ)

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনি আমাকে কর্মের উপদেশ দিতেছেন, অথচ ব্রহ্ম-জ্ঞানকে জীবনের উচ্চতম অবস্থা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, যদি জ্ঞানকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে কর্মের উপদেশ দিতেছেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণ: 'অতি প্রাচীনকাল হইতে দুইটি সাধনপথ প্রচলিত আছে। জ্ঞানানুরাগী দার্শনিকগণ জ্ঞানযোগের এবং নিষ্কামকর্মিগণ কর্মযোগের কথা বলেন। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া কেহ শান্তি লাভ করিতে পারে না। এ জীবনে কর্ম বন্ধ করিয়া থাকা মুহূর্তমাত্র সম্ভব নয়। প্রকৃতির গুণগুলিই মানুষকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম বন্ধ করিয়া মনে মনে কর্মের কথা চিন্তা করে, সে কিছুই লাভ করিতে পারে না। সে মিথ্যাচারী হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মনের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি কর্ম কর।

'যদি তুমি এ রহস্য বুঝিয়া থাকো যে, তোমার কোন কর্তব্য নাই—তুমি মুক্ত, তথাপি অপরের কল্যাণের জন্য তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করে।

'পরাশান্তির অধিকারী মুক্ত মহাপুরুষ যদি কর্মত্যাগ করেন, তবে যাহারা সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে নাই, তাহারা মহাপুরুষকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

'হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি মুহূর্তের জন্য কর্ম না করি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেরূপ কর্ম করে, জ্ঞানিগণকে অনাসক্ত ভাবে এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।'

আপনি যদি জ্ঞানের অধিকারীও হন, তবু অজ্ঞান ব্যক্তিদের বালসুলভ বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদের স্তরে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করুন। —ইহা একটি অতিশয় শক্তিশালী ভাব, এবং ভারতে ইহাই আদর্শ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মন্দিরে যান, প্রতিমাপূজাও করেন—ইহা কপটতা নয়।

গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: যাঁহারা ভক্তিপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ আমারই পূজা করেন। এই ভাবে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবানেরই পূজা করিতেছে। ভগবানকে ভুল নামে ডাকিলে কি তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তিনি ভগবান নন। এ কথা কি বুঝিতে পার না, মানুষের হৃদয়ে যাহা

আছে, তাহাই ভগবান্? —যদিও ভক্ত শিলা-খণ্ড পূজা করিতেছে, তাহাতে কি আসে যায়?

'ধর্ম কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি'—এই ধারণা হইতে যদি আমরা একবার মুক্ত হইতে পারি, তবেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। ধর্মের একটি ধারণা: আদি মানব আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সৃষ্টি,—আর পলাইবার পথ নাই। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন—অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে বিশ্বাস করুন! কিন্তু ভারতে ধর্মের ধারণা অন্যরূপ। সেখানে ধর্ম মানে অনুভূতি, উপলব্ধি; অন্য কিছু নয়। চার ঘোড়ার জুড়ি-গাড়িতে, বৈদ্যুতিক শকটে অথবা পদব্রজে—কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্য এক। খ্রীষ্টানদের পক্ষে সমস্যা—কিভাবে সেই ভীষণ ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। ভারতীয়দের সমস্যা—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং নিজেদের হারানো আত্মভাবকে ফিরিয়া পাওয়া।

আপনি কি উপলব্ধি করিয়াছেন—আপনি আত্মা? যদি বলেন—'হাঁ', তবে 'আত্মা' বলিতে আপনি কি বোঝেন? আত্মা কি এই দেহ-নামক মাংসপিণ্ড, অথবা অনাদি অনন্ত চিরশান্ত জ্যোতির্ময় অমৃতত্ব? আপনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি নিজেকে এই দেহ মনে করিতেছেন, ততক্ষণ আপনি আপনার পায়ের নীচে ঐ ক্ষুদ্র কীটের সমান। এ অপরাধের মার্জনা নাই, আপনার অবস্থা আরও শোচনীয়; কারণ আপনি দর্শন-শাস্ত্র সবই জানেন, অথচ দেহবোধ হইতে উর্ধ্বে উঠিতে পারিতেছেন না। শরীরই আপনার ভগবান—ইহাই আপনার পরিচয়। ইহা কি ধর্ম?

আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম। আমরা কি করিতেছি? ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মাকে জড়বস্তুরূপে অনুভব করিতেছি। অমৃতস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আমরা মৃত্যু ও জড়বস্তু নির্মাণ করি, এবং প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে চেতন আত্মা 'সৃষ্টি' করি!

উর্ধ্ববাহু ও হেটমুণ্ড হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা অথবা ত্রিমুণ্ডধারী পাঁচ হাজার দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তবে সানন্দে ঐগুলিকে গ্রহণ করুন। যে-ভাবেই হউক, আত্মজ্ঞান লাভ করুন। এ বিষয়ে কোন সমালোচনার অধিকার কাহারও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: যদি তোমার সাধন-পদ্ধতি উচ্চতর ও উন্নততর হয় এবং অপরের পদ্ধতি খুব খারাপ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি তাহার নিন্দা করিবার কোন অধিকার তোমার নাই।

ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি নয়, পরন্তু ধর্মকে ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈশ্বরদর্শন হইয়াছিল; মুশাও (Moses) দাবাগ্নির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। মুশা ঈশ্বর দর্শন করিয়া যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কি আপনাদের পরিত্রাণ হইয়াছে? অপরের ঈশ্বরদর্শনের কথা আপনাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়া ঈশ্বরদর্শন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারে, এতদ্ব্যতীত আর এতটুকু সাহায্য করিতে পারে না। পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্ত-গুলির ইহাই মূল্য, আর বেশী কিছু নয়। সাধনার পথে এগুলি নির্দেশক-স্তম্ভ মাত্র। একজন আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা দূর হয় না, তেমনি একজনের ঈশ্বরদর্শনে অপরের মুক্তি হয় না। নিজেকেই ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। ভগবানের প্রকৃতি কি, তাঁহার

একটি শরীরে তিনটি মাথা অথবা ছয়টি দেহে পাঁচটি মাথা—এইরূপ অর্থহীন কলহেই এই সকল লোক প্রবৃত্ত হয়। আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? না।...এবং লোকে বিশ্বাস করে না যে, তাহারা কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে। মর্ত্যের মানুষ আমরা কি নির্বোধ! নিশ্চয়ই;—পাগলও বটে!

ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে—যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই আপনারও ঈশ্বর, আমারও ঈশ্বর। সূর্য কাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আপনারা বলেন, স্যাম্ খুড়ো সকলেরই খুড়ো। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি তাঁহাকে দেখিতে পারেন, নতুবা সেরূপ ঈশ্বরের চিন্তাই করিবেন না।

প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভাল! কিন্তু মনে রাখিবেন—ইহা আপনার পক্ষেই ভাল হইতে পারে। একই খাদ্য—যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভাল, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়—সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সব সময় জন বা মেরীর গায়ে না-ও লাগিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, যাহারা চিন্তা করে না—এরূপ নরনারীকে জোর করিয়া এই রকম একটা ধরাবাঁধা ধর্মবিশ্বাসের ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন। বরং নাস্তিক বা জড়বাদী হওয়া ভাল, তবু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করুন! এ ব্যক্তির পদ্ধতি ভুল—এ কথা বলিবার কি অধিকার আপনার আছে? আপনার নিকট ইহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিন্দা করিবার অধিকার আপনার নাই। অর্থাৎ এই মত অবলম্বন করিলে আপনার অবনতি হইবে, কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, ঐ ব্যক্তিও অবনত হইবে। তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ: যদি তুমি জ্ঞানী হও, তবে একজনের দুর্বলতা দেখিয়া তাহাকে মন্দ বলিও না।

যদি পারো, তাহার স্তরে নামিয়া তাহাকে সাহায্য কর। ক্রমে ক্রমে তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি হয়তো তাহার মগজে পাঁচ ঝুড়ি তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহার কী ভাল হইবে? পূর্বাপেক্ষা হয়তো তাহার অবস্থা একটু খারাপই হইবে।

কর্মের এই বন্ধন কোথা হইতে আসে? আমরা আত্মাকে কর্মদ্বারা শৃঙ্খলিত করি। আমাদের ভারতীয় মতে সত্তার দুইটি দিক—একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে আত্মা। প্রকৃতি বলিতে শুধু বহির্জগতের বস্তুসমূহ বোঝায় না; আমাদের শরীর মন বুদ্ধি—এমন কি 'অহংকার' পর্যন্ত এই প্রকৃতির অন্তর্গত। অনন্ত জ্যোতির্ময় শাশ্বত আত্মা এই সকলের ঊর্ধ্বে। এই মতে আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকিবেন।... কোন সময়েই আত্মাকে মনবুদ্ধির সহিতও অভিন্নরূপে গণ্য করা যায় না...[দেহের সঙ্গে তো দূরে কথা]।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের ভুক্ত খাদ্যই চিরকাল মন সৃষ্টি করিতেছে; মন জড়পদার্থ আত্মার সহিত খাদ্যের কোন সম্পর্ক নাই খাওয়া বা না খাওয়া, চিন্তা করা বা না করা...তাহাতে আত্মার কিছু আসে যায় না। আত্মা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতি চিরকাল সমভাবে থাকে। আলোর সম্মুখে নীল বা সবুজ—যে কাঁচ দিয়াই দেখ না কেন, তাহাতে আলোর কিছু আসে যায় না; মূল আলোর রঙ অপরিবর্তনীয়। মনই বিভিন্ন পরিবর্তন আনে—নানা রঙ দেখায়। আত্মা

যখন এই দেহ ত্যাগ করে, তখন এ-সবই টুকরা টুকরা হইয়া যায়।

প্রকৃতিরও প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। সৎস্বরূপ আত্মাই জীবাত্মারূপে [আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া] চলা ফেরা করে, কথা বলে এবং সব কিছু কর্ম করে। জীবাত্মার শক্তি মন-বুদ্ধি ও প্রাণই জড়ের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হইতেছে। যদিও চেতন আত্মা আমাদের চিন্তা, শারীরিক কর্ম ও সব-কিছুর কারণ, যদিও আত্মার জ্যোতি সর্বত্র প্রতিফলিত, তথাপি ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ প্রভৃতি প্রকৃতিগত যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাব আত্মাকে স্পর্শ করে না।

'হে অর্জুন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার নিয়মানুসারে কাজ করিয়া চলিতেছে। আমরা প্রকৃতির সহিত নিজদিগকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছি—আমি এই সকল কর্মের কর্তা।' এইভাবে আমরা ভ্রান্তির কবলে পড়ি।

কোন না কোন কিছুর বাধ্য হইয়াই আমরা কর্ম করি। ক্ষুধা বাধ্য করে, তাই আমি খাই। দুঃখভোগ হীনতর দাসত্ব। প্রকৃত 'আমি' (আত্মা) চিরদিন মুক্ত। কে তাহাকে কর্মে বাধ্য করিতে পারে ? কারণ সুখদুঃখের ভোক্তা তো প্রকৃতির অন্তর্গত। যখন আমরা দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া ভাবি, তখনই বলি, 'আমি অমুক, আমি এই দুঃখভোগ করিতেছি। এইরূপ যত বাজে কথা।' কিন্তু যিনি সত্যকে জানিয়াছেন, তিনি নিজেকে সবকিছু হইতে পৃথক করিয়া রাখেন। তাঁহার শরীর কি করে বা মন কি ভাবে, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু মানব-সমাজের এক বিরাট অংশই ভ্রান্তির বশীভূত; যখনই তাহারা কোন ভাল কাজ করে, তখন নিজেদের ইহার কর্তা বলিয়া মনে করে। তাহারা এখনও উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস বিচলিত করিও না। মন্দ ছাড়িয়া তাহারা ভাল কাজ করিতেছে ; খুব ভাল, তাই করুক !…তাহারা কল্যাণকর্মী। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা আরও গৌরব আছে। তাহারা সাক্ষিমাত্র—কাজ স্বতই হইয়া যায়, ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে। যখন অসৎকর্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া কেবল সৎকর্ম করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিবে যে, তাহারা প্রকৃতির উর্ধ্বে, তাহারা কর্তা নয়, তাহারা কর্ম হইতে পৃথক, তাহারা সাক্ষিমাত্র। তাহারা শুধু দাঁড়াইয়া দেখে। প্রকৃতি হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতেছে।…তাহারা এ-সকল হইতে উপরত। 'হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং জগতের সৃষ্টি হইল।' 'জ্ঞানীও প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য করে। প্রত্যেকেই প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য করে। কেহ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে না।' অণুও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে অণুকেও নিয়ম মানিতেই হইবে। বাহিরের সংযমে কি হইবে ?

জীবনে কোন কিছুর মূল্য কিসের দ্বারা নির্ণীত হয় ? ভোগসুখ বা ধনসম্পদের দ্বারা নয়। সব জিনিস বিশ্লেষণ করুন। দেখিবেন, আমাদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুরই মূল্য নাই। অনেক সময় ভোগসুখ অপেক্ষা দুঃখকষ্টই আমাদের আরও ভাল অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক সময় সুখাস্বাদ

অপেক্ষা আঘাতগুলিই আমাদের জীবনে মহত্তর শিক্ষা দিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষেরও একটা মূল্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মতে আমরা একেবারে সদ্যোজাত নূতন জীব নই। আমাদের সত্তা পূর্বেও ছিল। আমাদের মনবুদ্ধিও একেবারে নূতন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেকটি শিশু—কেবল অতীত মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, তাহার পূর্ববর্তী উদ্ভিদ্-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিও সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার সংস্কারে অতীত অধ্যায়গুলি সব আছে—বর্তমান অধ্যায় আছে, আর আছে সম্মুখে ভবিষ্যতের অনেকগুলি অধ্যায়। প্রত্যেকের জীবনপথ পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত, মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। এই অন্ধকার সত্ত্বেও কোন ঘটনা বা অবস্থার উদ্ভব কারণ ব্যতীত হইতে পারে না।…অজ্ঞানই ইহার কারণ। কার্য-কারণের অন্তহীন শৃঙ্খলে একটির পর একটি শিকলি বাঁধা রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্য ও কারণের বিশ্বব্যাপী এই শৃঙ্খলের একটি শিকলি আপনি ধরিযাছেন, আমি আর একটি। ঐ শৃঙ্খলের সেই সেই অংশটুকু আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন: নিজের প্রকৃতিগত পথে চলিতে চলিতে মরাও ভাল। অপরের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিও না। এই আমার নিজের পথ এবং তাহাতেই আমি চলিতেছি। আপনি উপরের পথে চলিতেছেন। নিজের পথ ছাড়িয়া আমি ঐ পথে যাইতে সর্বদা প্রলুব্ধ হইতেছি এবং ভাবিতেছি আপনার সহযাত্রী হইব। যদি আমি ওখানে যাই, তবে আমি 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইব। এই সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। এ-সবই ক্রমোন্নতির কথা। উন্নতির পথ ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করুন সব পাইবেন। নতুবা পরের পন্থা অবলম্বন করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে বিপদ দেখা দিবে। ধর্ম শিক্ষা দিবার এইটি মৌলিক রহস্য।

মানুষের পরিত্রাণ বলিতে আপনারা কি বোঝেন? সকলকে একই ধর্মমতে বিশ্বাস করিতে হইবে? কখনই তাহা নয়। অবশ্য এমন কতকগুলি উপদেশ বা আদর্শ আছে, যেগুলি সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। যথার্থ আচার্য আপনার প্রকৃতি এবং কোন্ পথ আপনার পক্ষে শ্রেয়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। আপনি হয়তো নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না; আপনারা নিজদিগকে যে সাধনপথের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা ভুলও হইতে পারে। এ বিষয়ে এখনও আপনার চেতনা বিকশিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত আচার্যকে উহা জানিতে হইবে। আপনাকে একবার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিবেন, আপনি কোন্ পথের অধিকারী, এবং তিনিই আপনাকে সেই পথ ধরাইয়া দিবেন। অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া এধারে ওধারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও আমরা এতটুকু অগ্রসর হইতে পারি না। তারপর যথাসময়ে সদ্গুরুর জীবন-প্রবাহে পড়িয়া আমরা দ্রুত অগ্রসর হই। ঈশ্বর-কৃপার নিদর্শন এই যে, অনুকূল স্রোত পাইবার শুভ মুহূর্তে আমরা ভাসিয়া থাকি। তারপর আর সংগ্রাম নাই। সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা বরং ঐ পথে (চলিতে চলিতেই) মরিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ কি হয়? আমরা একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কতগুলি ধরাবাঁধা মত স্থাপন করি, মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া

যাই। সকলকে এক প্রকৃতির মনে করিয়া সেরূপ ব্যবহার করি। কিন্তু দুইটি মানুষের কখনও একই দেহ, একই মন হয় না ;…দুইটি ব্যক্তির ধর্ম বা সাধনপথ কখনও এক হইতে পারে না। যদি ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চান, তবে কোন সংগঠিত ধর্মের (organized religion) দ্বারস্থ হইবেন না। ঐগুলি দ্বারা ভাল অপেক্ষা শতগুণ মন্দই হইয়া থাকে, কারণ উহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। মনোযোগের সহিত সব কিছু দেখুন, কিন্তু নিজের পথে নিষ্ঠা রাখুন। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তবে কোন ফাঁদে পা দিবেন না। যখনই কোন সম্প্রদায় তাহাদের ফাঁস পরাইবার জন্য চেষ্টা করিবে, তখনই নিজেকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। যেমন মধুকর বহু ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, অথচ কোন ফুলে আবদ্ধ হয় না, তেমনই সংগঠিত ধর্মে প্রবেশ করুন, কিন্তু আবদ্ধ হইবেন না। ধর্ম আপনাকে ও আপনার ঈশ্বরকে লইয়া; কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসিবে না। একবার ভাবিয়া দেখুন—এই সংগঠিত ধর্মগুলি কী করিয়াছে! কোন্ নেপোলিয়নের অত্যাচার এই সকল ধর্মীয় নির্যাতন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল? যদি আমরা সংঘবদ্ধ হই, অমনি অপরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। একজনকে ভালবাসার অর্থ যদি অপরকে ঘৃণা করাই বুঝায়, তার চেয়ে ভাল না বাসাই ভাল। এ ভালবাসা নয়—নরক! যদি নিজের লোক-গুলিকে ভালবাসার অর্থ অপর সকলকে ঘৃণা করা, তবে তাহা নিছক স্বার্থপরতা ও পশুত্ব; ইহার ফলে পশুতে পরিণত হইতে হইবে। অতএব অপরের ধর্ম যতই বড় বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা অবলম্বন করা অপেক্ষা নিজের (গুণগত) ধর্ম পালন করিয়া মরাও শ্রেয়।

'অর্জুন! সাবধান, কাম ও ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। ইহারা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবেকও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই কামের অনল দুষ্পূরণীয়। ইন্দ্রিয়সমূহে এবং মনে কামের অধিষ্ঠান। আত্মা কিছুই কামনা করেন না।'

'পুরাকালে এই যোগ আমি শিখাইয়া-ছিলাম। সূর্য উহা (রাজর্ষি) মনুকে শিক্ষা দেন।…এইভাবে যোগের জ্ঞান এক রাজা হইতে অন্য রাজায় পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে যোগের মহৎ শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। তাই আজ আমি আবার তোমার নিকট তাহা বলিতেছি।'

তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি তো সেদিন জন্মিয়াছেন, এবং সূর্য আপনার বহু পূর্বে জন্মিয়াছেন—আপনি সূর্যকে এই যোগ শিখাইয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব?'

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তুমি সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন নও। আমি অনাদি জন্মরহিত সর্বভূতের অধীশ্বর। নিজ প্রকৃতিকে সহায় করিয়া আমি দেহধারণ করি। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যে যে-ভাবে আমাকে পাইতে চায়, সেই ভাবেই আমি তাহার কাছে যাই। কিন্তু হে পার্থ, জানিও কেহই আমার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে পারে না।'

কেহ কখনও হয় নাই। আমরাই বা কিরূপে হইব? কেহই ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত হয় না।

...সকল সমাজই একটা করিয়া খাড়া-করা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রুটিহীন সাধারণীকরণের উপরই (যথার্থ) নিয়ম গঠিত হইতে পারে। প্রাচীন প্রবাদ কি?—প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।...যদি উহা সত্যই নিয়ম হয়, তবে তাহা লঙ্ঘন করা যায় না। কেহই উহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপেল কি মাধ্যাকর্ষণের বিধি কখনও লঙ্ঘন করে? নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আর থাকে না। এক সময় আসিবে, যখন আপনিও নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, এবং সেই মুহূর্তে আপনার চেতনা মন ও দেহ বিলীন হইয়া যাইবে।

ঐ তো একজন চুরি করিতেছে। কেন সে চুরি করে? আপনারা তাহাকে শাস্তি দেন। কেন, আপনারা তাহার শক্তি কি কোন কাজে লাগাইতে পারেন না?...আপনারা বলিবেন, সে পাপী। অনেকেই বলিবেন, সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। বিশাল মানব-গোষ্ঠীকে জোর করিয়া (বৈচিত্র্যহীন) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেইজন্যই এত সব দুঃখযন্ত্রণা পাপ ও দুর্বলতা।... পৃথিবীকে যতটা খারাপ বলিয়া মনে করা হয়, পৃথিবী কিন্তু ততটা খারাপ নয়। মূর্খ আমরা পৃথিবীকে এতটা খারাপ করিয়াছি। আমরা নিজেরাই ভূতপ্রেত দৈত্যদানব সৃষ্টি করি, এবং পরে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাই না। আমরা নিজেদের চোখ ঢাকিয়া চিৎকার করি, 'কেহ আসিয়া আমাদিগকে আলো দেখান।'—নির্বোধ! চোখ হইতে হাত সরাইয়া লও! তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা দেবতাদের আহ্বান করি, কেহই নিজের উপর দোষারোপ করে না। বাস্তবিক ইহাই দুঃখের বিষয়। সমাজে এত মন্দ কেন? মন্দ কাহাকে বলে?—দেহসুখ ও শয়তানি ভাব। মন্দকে প্রাধান্য দাও কেন? মন্দগুলিকে এত বড় করিয়া দেখিতে কেহ তো বলে নাই। 'হে অর্জুন, আমার পথ হইতে কেহই সরিয়া যাইতে পারে না।' আমরা নির্বোধ, আমাদের পথও নির্বোধের পথ। এই সব মায়ার ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান স্বর্গই সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ নিজের জন্য নরক সৃষ্টি করিয়াছে।

'কোন কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই। যে-কেহ আমাকে এইভাবে জানে, সে কর্মকৌশল জানে এবং কর্মদ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিয়া নির্বিঘ্নে নিজেদের কর্মে নিযুক্ত করিতেন। হে অর্জুন, তুমিও সেইভাবে কর্ম কর।

'যিনি প্রচণ্ড কর্মে গভীর শান্তভাব এবং গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম দর্শন করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।' এখন প্রশ্ন এই: প্রতিটি ইন্দ্রিয়, প্রতিটি স্নায়ু কর্মপরায়ণ হইলেও আপনার মনে গভীর প্রশান্তি আছে কি?—কোন কিছু আপনার মনকে চঞ্চল করে না তো? কর্মচঞ্চল বাজারের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চারিদিকে ভিড় ঘুরপাক খাইতেছে, তাহার মধ্যে আপনার মন কি ধ্যানমগ্ন ধীর ও শান্ত? অথবা (নির্জন) গিরিগুহায় স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কি আপনি তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল? যদি এইরূপ হন, তবে আপনি যোগী—মুক্ত পুরুষ, নতুবা নন।

'যাঁহার প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলশূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্যদ্রষ্টাগণ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।' যতক্ষণ স্বার্থবোধ, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে না। নিজেদের অহঙ্কার দ্বারা আমরা সব-কিছুকে রঞ্জিত করি। বস্তুগুলি নিজস্ব রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তাহারা যে আবৃত তাহা নয়, কিছুই আবৃত থাকে না। আমরা তাহাদিগকে আবৃত করি। আমাদের মনবুদ্ধির তুলি দিয়া ভিন্নভাবে তাহাদিগকে চিত্রিত করি। যে-সকল জিনিস আমরা পছন্দ করি না, সেগুলি কাছে আসিলে আমরা সেগুলির উপর একটু তুলি বুলাইয়া দিই, তারপর সেগুলির দিকে তাকাইয়া থাকি।...আমরা কোন কিছু জানিতে চাই না। সব জিনিসকে আমরা নিজেদের রঙে রঙাইয়া লই। স্বার্থই সকল কর্মের প্রেরণা-শক্তি। বস্তুর স্বরূপ আমাদের দ্বারাই আবৃত রহিয়াছে, গুটিপোকার মতো নিজেদের চারিদিকে তন্তুর সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হই। গুটিপোকা তাহার নিজের জালেই নিজে আবদ্ধ হয়। আমরাও ঠিক তাহাই করিতেছি। যখনই 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করি, তখনই তন্তু একটি পাক খাইল। 'আমি ও আমার' বলামাত্র আর এক পাক খাইল। এইরূপ চলিতে থাকে...।

কাজ না করিয়া আমরা এক মুহূর্ত থাকিতে পারি না। কাজ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রতিবেশী যখন বলে, 'এস, সাহায্য কর', তখন মনে যে-ভাব উদিত হয়, নিজেকে সাহায্য করিবার সময়ও সেই ভাব পোষণ করিবেন। ইহার বেশী নয়। অপরের শরীর অপেক্ষা আপনার শরীর বেশী মূল্যবান্ নয়। অপরের দেহের জন্য যতটুকু করিয়া থাকেন, নিজের শরীরের জন্য তার বেশী করিবেন না। উহাই ধর্ম।

'যাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা ফলতৃষ্ণাশূন্য ও স্বার্থবুদ্ধি-রহিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মের এই সকল বন্ধন দগ্ধ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানী।' শুধু পুস্তক-পাঠের দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয় না। একটি গর্দভের পৃষ্ঠে গোটা গ্রন্থাগারটি চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সে মোটেই জ্ঞানী হইয়া উঠিবে না। কাজেই বহু পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন কি? কর্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিয়া এবং কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করেন, অথচ কর্মের উর্ধ্বে অবস্থান করেন।'

মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইব। অসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম, অসহায় অবস্থায় চলিয়া যাইব। এখনও আমি অসহায়। আমাদের গন্তব্য কোথায়, লক্ষ্য কি—এ অবস্থার কথা চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে ভয়াবহ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব আমাদের পাইয়া বসে, তাহাও আমরা জানি না। আমরা প্রেতাত্মার মিডিয়ামের কাছে যাই—ভূতপ্রেত যদি কোন সাহায্য করিতে পারে। ভাবুন, কী দুর্বলতা! ভূতপ্রেত, শয়তান, দেবতা—সব এস! পুরোহিত, ভণ্ড, হাতুড়ে—যে যেখানে আছ, সকলে এস! যে মুহূর্তে আমরা দুর্বল হই, ঠিক তখনই তাহারা আমাদের পাইয়া বসে এবং যত দেবতা আমদানি করে।

আমার দেশে দেখিয়াছি, কেহ হয়তো শক্তিমান্ ও শিক্ষিত হইয়াছেন—দার্শনিক হইয়া বলেন, 'এই সব প্রার্থনা পুণ্যস্নানাদি অর্থহীন।'...তারপর তাহার পিতা দেহত্যাগ

করিলেন, তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। হিন্দুর পক্ষে এই শোক এক প্রচণ্ড আঘাত। তখন দেখা যাইবে পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রতিটি কর্দমাক্ত কুণ্ডে স্নান করিতেছে, মন্দিরে যাইতেছে, সকলের দাসত্ব করিতেছে,—যে পারো, সাহায্য কর! কিন্তু আমরা অসহায়! কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে না। ইহাই সত্য।

মানুষের সংখ্যা হইতে দেবতার সংখ্যা বেশী, তবুও কোন সাহায্য আসে না। কুকুরের মতো আমরা মরি, তবু কোন সাহায্য নাই। সর্বত্র পশুর মতো ব্যবহার—দুর্ভিক্ষ, রোগ, দুঃখ, অসদ্‌ভাব। সকলেই সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে, কিন্তু কোন সাহায্য নাই। কোন আশা না থাকিলেও আমরা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করিয়া চলিয়াছি। কি শোচনীয় অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করুন। আমাদের এই দুঃখকষ্টের অর্ধেকের জন্য আমরা দোষী নই। মাতাপিতাই দায়ী। আমরা এই দুর্বলতা লইয়াই জন্মিয়াছি—এবং পরে আরও বেশী দুর্বলতা আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা ইহাকে অতিক্রম করি।

নিজেকে অসহায় মনে করা দারুণ ভুল। কাহারও কাছে সাহায্য চাহিও না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করি। যদি তাহা না পারি, তবে আমাদের সাহায্য করিবার কেহ নাই।...

'তুমি নিজেই তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু। আত্মা বা মন ছাড়া অন্য কোন শত্রু নাই, আত্মা বা মন ছাড়া অন্য বন্ধু নাই।' ইহাই শেষ ও ও শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কিন্তু ইহা শিখিতে কত কালই না লাগে! অনেক সময় মনে হয়, এই আদর্শ আমরা যেন ধরিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু পরমুহূর্তে পুরাতন সংস্কার আসিয়া পড়ে। আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। দুর্বল হইয়া আবার সেই ভ্রান্ত সংস্কার ও অপরের সাহায্যকেই আঁকড়াইয়া ধরি। অপরের সাহায্য পাইব, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমাদের যে বিরাট দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। পুরোহিত তাহার নিয়মমত পূজা বা প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করে। ষাট হাজার লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করে এবং প্রার্থনান্তে পুরোহিতের প্রাপ্য অর্থ দেয়। মাসের পর মাস লোকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, প্রার্থনা করে ও পুরোহিতকে টাকা দেয়; একবার ভাবিয়া দেখুন! ইহা কি পাগলামি নয়? পাগলামি ছাড়া ইহাকে আর কি বলা যায়? ইহার জন্য দায়ী কে? আপনারা ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, ইহা শুধু অপরিণত শিশুদের মন উত্তেজিত করা। ইহার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অন্তরের অন্তস্তলে আপনারা কি? যে দুর্বল চিন্তাগুলি আপনি অন্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির জন্য আপনাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ-সহ মূল্য দিতে হইবে। কর্মের নিয়ম তাহার প্রাপ্য আদায় করিবেই।

জগতে একটিমাত্র পাপ আছে, তাহা এই দুর্বলতা। বাল্যকালে যখন মহাকবি মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট' কাব্য পড়িয়াছিলাম, তখন শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি কখনও দুর্বলতার বশীভূত হন না, সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম

করেন। ওঠ, জাগো, ঐ প্রকার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও···। পাগলের সংখ্যা আর বাড়াইও না। যে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহিত আর তোমার দুর্বলতা যুক্ত করিও না। জগতের কাছে আমি এই কথাই বলিতে চাই। শক্তিমান্ হও, ভূতপ্রেত ও শয়তানের কথা তোমরা বলো;—আমরাই তো জীবন্ত শয়তান। শক্তি ও ক্রমোন্নতিই জীবনের চিহ্ন। দুর্বলতা মৃত্যুর চিহ্ন, যাহা কিছু দুর্বল, তাহাকে এড়াইয়া চলো। উহাই মৃত্যু। উহা যদি শক্তি হয়, তবে তাহার জন্য নরকেও যাও এবং তাহা লাভ কর। সাহসীরাই মুক্তির অধিকারী। 'বীরপুরুষরাই স্ত্রীরত্নলাভের যোগ্য', আর যাহারা সর্বাপেক্ষা বীর, শুধু তাহারাই মুক্তিলাভের যোগ্য। কাহার নরক? কাহার অত্যাচার? কাহার পাপ? কাহার দুর্বলতা? কাহার মৃত্যু? কাহার রোগ?

আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; যদি যথার্থই বিশ্বাস করিতেই হয়, তবে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হউন: 'তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি সবল যুবকের পদবিক্ষেপে চলিতেছ, আবার জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ দণ্ডসহায়ে চলিতেছ। তুমিই দুর্বলতা, তুমিই ভয়, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই নরক; তুমিই সর্প হইয়া দংশন কর, রোজা হইয়া বিষমুক্ত কর;—তুমিই ভয়-মৃত্যু-ও দুঃখ-রূপে উপস্থিত হও।···

সকল দুর্বলতা, সকল বন্ধনই আমাদের কল্পনা। সজোরে একটি কথা বলো, কল্পনা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। দুর্বল হইও না, ওঠ, বাহির হইবার আর অন্য কোন পথ নাই। শক্ত হইয়া দাঁড়াও, শক্তিমান্ হও, ভয় নাই। কুসংস্কার নাই। নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হও। দুঃখকষ্টের চরম—মৃত্যু যদি আসে, আসুক। প্রাণপণ সংগ্রামের জন্য আমরা কৃতসংকল্প। ধর্ম বলিতে আমি ইহাই জানি, আমি ইহা লাভ করি নাই, লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি সফল হইতে না পারি, কিন্তু তোমরা পারিবে। অগ্রসর হও।

'যেখানে একজন অপরকে দেখে এবং একজন অপরকে শোনে, যতক্ষণ দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণ ভয় থাকিবেই, এবং ভয়ই সমস্ত দুঃখের কারণ।'

যখন যেখানে একজন অপরকে দেখে না, যেখানে সবই এক,—সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই, অসুখী হওয়ারও কেহ নাই। একই আছেন, দ্বিতীয় নাই—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কাজেই ভয় করিও না; ওঠ, জাগো, যে পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না পঁহুছিতেছ, সে পর্যন্ত থামিও না।

বাংলার ব্রত-উৎসব

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

'বার মাসে তের পার্বণ' ব'লে একটি কথা প্রচলিত, কিন্তু দোল-দুর্গোৎসব, রথ-রাসযাত্রা, মহালয়া-দীপান্বিতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান পূজা-পার্বণের কথা বাদ দিলেও প্রত্যেক মাসেই ব্রত-পূজাদি ধর্মকৃত্যের বহু অনুষ্ঠান হিন্দু নরনারীর সামাজিক জীবনে প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। হিন্দু জীবন চতুরাশ্রমে বিভক্ত, সকল আশ্রমেরই মূল গার্হস্থ্যাশ্রম। গৃহী নরনারীদের দুর্লভ জীবন সর্বদা পরমার্থ-নির্ভরশীল রাখিয়া সুপথে চালিত করার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদের কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি। তদবলম্বনে মানবহিতৈষী ঋষিগণ জিজ্ঞাসু ও উপদেষ্টার প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল সরস উপাখ্যানাদি দ্বারা বৎসরের বিশেষ বিশেষ পুণ্যাহে অগণিত ধর্মকৃত্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মপ্রাণ নরনারীদের সাধনালব্ধ প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভূতিজাত নানা পুণ্যানুষ্ঠানও স্থানীয় প্রভাবপুষ্ট হইয়া ধর্মকৃত্যে সংযুক্ত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজবদ্ধ সুসভ্য মানুষ চায় অত্যাচার-উৎপীড়নহীন সুখময় জীবন, জ্ঞানে অর্থে অভাব-অনটন-বর্জিত ক্রমোন্নতিশীল সমৃদ্ধি এবং অনুতাপহীন আত্মিক শান্তি, যাহার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অর্গলাস্তবে পাওয়া যায়—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি'—এই সরল প্রার্থনায়। যিনি সর্বনিয়ন্তা তাঁহাকে বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা যেভাবে ধারণা করিয়াই হউক, বিশ্ববাসীরা সর্বদা সর্বাবস্থায় সবকিছু তাঁহার কাছে অকপটে চাহিয়া চাহিয়া লাভ করিবে। এই চাওয়া-পাওয়ার শেষ নাই! শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নির্দেশ দেন, 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥' যাগযজ্ঞ, ব্রতপূজা, ধ্যান-ধারণাদি দ্বারা দেবতার তর্পণ করিলে তাঁহারাও বিনিময়ে তর্পণকারীদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সর্বপ্রকারে পুষ্টিসাধন করেন। এইরূপে পরস্পর-নির্ভরতা দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হয়। সংসারের জীব তার সতত কর্মব্যস্ততাপূর্ণ সুখদুঃখ- ও উত্থানপতনান্দোলিত জীবনকে স্বধর্মনিষ্ঠ ভগবন্মুখী রাখার উদ্দেশ্যে বিবিধ পূজাব্রতোৎসব পুণ্যানুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ নিয়োজিত রাখিয়া দুর্লভ জীবন সার্থক করে।

১

এই সার্থকতা-সাধনের যাত্রাপথে বিশাখার বিপরীতে মেষরাশিতে সূর্যের অবস্থানে বাংলা প্রথম মাস বৈশাখ আদ্যঋতু গ্রীষ্মকে সঙ্গে লইয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত হওয়ার কালে বহু ধর্মকৃত্যের ভিতর পাওয়া যায়—অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত, গৌরীব্রত, পুণ্যিপুকুরব্রত, পৃথিবীব্রত ইত্যাদি। মহাপুণ্যময় অক্ষয়তৃতীয়া দিনে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রতি বৎসর এই দিনে হিমতুষারাচ্ছন্ন বদ্রীনারায়ণ-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। যে-সব ব্যবসায়ীরা নববর্ষ-দিনে হালখাতা করেন না, তাঁহাদের অনেকে এই পুণ্য দিনে তাহা অনুষ্ঠান করেন। এই দিনে অনুষ্ঠিত সব সৎকার্য অক্ষয় পুণ্যফল প্রদান করে বলিয়া পূর্ণকুম্ভে জলদান, ব্যজন (তালপাতার পাখা)-দান, সভোজ্য ফল-মিষ্ট-দ্রব্যাদি দান শ্রদ্ধার সহিত করা হয়। ভবিষ্য-

পুরাণে এই দানের মহিমা এরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ঐ তিথিতে তাহার সহধর্মিণীকৃত জলদানের ফলে নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

গৌরীব্রত : কুমারী মেয়েরা শিবতুল্য বর লাভের কামনায় সারা মাস প্রত্যূষে ভক্তিভরে শিবপূজা করে এবং শিবের মাথায় জল দিয়া ছড়া গায়—

শিল শিলাটন, শিলে বাটন
শিল অঝ্‌ঝর ঝরে।
কৈলাস থেকে শুধান শিব
গৌরি! কি ব্রত করে?
নড়ে আশ, নড়ে পাশ,
নড়ে সিংহাসন,
হর-গৌরী কোলে করে
গৌরী-আরাধন।

পুণ্যিপুকুর : ভাইদের এবং স্বামী-পুত্রাদির মঙ্গলার্থে মেয়েরা এই ব্রত করেন—উঠানে একটি পুকুর তৈরী করিয়া। পুকুরের মাঝে তুলসী-চারা রোপণ করা হয়। পুকুরের জল ছিটাইয়া পূজা করার ছড়া—

পুণ্যিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী,
সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।...
...এ পূজিলে কি হয়?
নির্ধনের ধন হয়,
সাবিত্রী-সমান হয়,
স্বামী-আদরিণী হয়।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে,
মরণ যেন হয় গঙ্গাজলে।*

তুলসীগাছে জল ঢালার ছড়া—

তুলসী তুলসী নারায়ণ!
তুলসী তুমি বৃন্দাবন।
তোমার মাথায় ঢালি জল,
অন্তিমে চরণে দিও স্থল।*

পৃথিবীব্রত : পরম সৌভাগ্য-লাভের কামনায় পিটুলি দিয়া পৃথিবী আঁকিয়া প্রত্যহ ফুল, দূর্বা, জল সহ পূজা করিয়া ছড়া গাওয়া হয়—

আইস পৃথিবী গো, বস পদ্মপাতে,
শঙ্খ চক্র পদ্মাক্ষ ধরি চারি হাতে।
খাওয়াইব ক্ষীর, মাখাইব ননী,
আমি যেন হই গো, রাজার পাটরানী।*

২

জ্যেষ্ঠার সম্মুখীন বৃষরাশিতে সূর্যের অবস্থিতিতে বাংলা দ্বিতীয় মাস জ্যৈষ্ঠ দারুণ নিদাঘতাপিত ধরায় প্রকটিত হইলে সাবিত্রী-ব্রত, অরণ্যষষ্ঠী-ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী-ব্রত, কর্মাদি বা সইপাতার ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

সাবিত্রী-ব্রত : প্রগাঢ় পতিপ্রেম-বলে সাবিত্রী মৃতস্বামী সত্যবান্‌কে পুনর্জীবিত করিয়া সতী-শিরোমণির গৌরব-তিলক ধারণে যেরূপ ধন্যা হইয়াছিলেন, নারীমাত্রেই সেরূপ সতীত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পুণ্য ব্রত অনুষ্ঠান করেন।

অরণ্যষষ্ঠী : নিজ সন্তানদের ও সন্তান-স্থানীয় সকলের নির্বিঘ্ন দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া মেয়েরা এই ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পুত্রবৎ জামাতারাও এই ব্রতদিনে বিশেষভাবে শুভাশিস লাভ করে বলিয়া এই ব্রত 'জামাই-ষষ্ঠী' নামেও প্রসিদ্ধ।

মঙ্গলচণ্ডী : সর্ববিধ মঙ্গলের আশায় সর্ব-মঙ্গলময়ী চণ্ডীর ব্রত ও পূজা এই মাসের প্রতি মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হয়, যদিও বারমেসে মঙ্গল-চণ্ডী, হরিষমঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী, কলুই-সঙ্কট-

* অপ্রচলিত অনুরূপ ছড়াও আছে, বাহুল্য-ভয়ে দেওয়া হইল না।

নাটাই মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বহুভাবে আরাধনা প্রচলিত আছে।

কর্মাদি : সংক্রান্তি-দিনে দৈ, খৈ, চিড়া, গুড়, আম-কাঁঠালাদি ফল ও বিবিধ মিষ্টদ্রব্য নিবেদন করিয়া কর্মপুরুষ নারায়ণের পূজা হয়। ঐদিন নবস্ত্রফলভোজ্যাদি বদল করিয়া পুরুষেরা পুরুষদের সহিত 'বন্ধু' পাতে এবং মেয়েরা মেয়েদের সহিত 'সই' পাতে। এক ভক্তিমতী কালীঘাটের মা-কালীর সহিত এইরূপ 'সই' পাতিয়া ভাবের ঘোরে গাহিয়াছিলেন,

'মনের কথা শোন মা শ্যামা !
দিয়ে তোমায় খৈ দৈ,
মায়ে ঝিয়ে পাতায় সই।
এখন বল্ দেখি মা, ওমা সই !
আমার ঘুচবে কিসে আনাগোনা ?'

৩

পূর্বাষাঢ়া-নক্ষত্রদৃষ্ট মিথুন-রাশিতে সূর্য-সংক্রমণে বাংলা তৃতীয় মাস আষাঢ় বর্ষাকে সঙ্গে লইয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত হইলে মনোরথ-দ্বিতীয়া, বিপত্তারিণী, বিবস্বৎসপ্তমী-ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয়।

মনোরথ-দ্বিতীয়া ব্রত :

জীবদেহ নিত্যরথ, আত্মা শ্রেষ্ঠ রথী,
　　লাগাম উহার মন, বুদ্ধি যে সারথি,
জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয় ঘোটক-নিচয়,
　　বিবেক-বেত্র-তাড়নে সুপথে চলয়।[১]

এই অনুধ্যান করিয়া মনোরথ-দ্বিতীয়া উদ্‌যাপিত হয়।

বিপত্তারিণী-ব্রত : সতত বিঘ্নবিপৎসঙ্কুল সংসারের পরিত্রাণের আশায় এই ব্রত নর-নারী কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

বিবস্বৎসপ্তমী-ব্রত : অটুট স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় আরোগ্যদ সূর্যদেবের ব্রতোৎসব হয়।

৪

শ্রবণা-নক্ষত্রদৃষ্ট কর্কট-রাশিতে সূর্য-সংক্রমণে বাংলা চতুর্থ মাস শ্রাবণ প্রবল বারি-ধারাপাতের সঙ্গে বর্ষচক্রে উপনীত হইলে অশূন্যশয়নাব্রত, নাগপঞ্চমী, কৃষ্ণজয়ন্তী ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

অশূন্যশয়নাব্রত : পতিপত্নীর বিরহ-মুক্তি-কামনায় মৎস্যপুরাণোক্ত এই ব্রতের প্রচলন।

নাগপঞ্চমী : সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ-মানসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান। নাগপূজা দেশ-বিদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন আচারে প্রচলিত। নাগমাতা, পদ্মা, বিষহরী, জরৎকারী বা মনসাকে অবলম্বন করিয়া একাধিক প্রাচীন কবি 'পদ্মাপুরাণ', 'পদ্মার ভাসান', 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতি গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন, যাহা হইতে চাঁদসদাগরের ইষ্ট-নিষ্ঠা, সনকার ভক্তিবিশ্বাস এবং সতীমুকুটমণি বেহুলার উজ্জ্বল চরিত্র অদ্যাপি পল্লীতে পল্লীতে শ্রাবণ মাস জুড়িয়া সগৌরবে গীত হইয়া থাকে। সংক্রান্তি-দিনে শেষ-পূজা, সাপখেলা, নৌকাবাইচাদি ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষ্ণজয়ন্তী : দ্বাপরযুগপাবন শ্রীকৃষ্ণ রোহিণী-নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতিথিতে জয়ন্তীযোগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া এই পুণ্য দিনটি কৃষ্ণজয়ন্তী নামে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সারা ভারত জুড়িয়া এই কৃষ্ণজয়ন্তী ব্রতোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া স্বধর্মরক্ষণ, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনরূপ মনুষ্যত্বের মহান্ আদর্শ নরনারীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করে। মহান্ আদর্শই মানবজীবনের ভিত্তি, কারণ 'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্ত-দনুবর্ততে'—আদর্শ মহাপুরুষের আচরণই সর্ব-

১ রথ-দ্বিতীয়ার কোন ছড়া নাই। ব্রতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রকাশার্থ তন্ত্রোক্ত সংস্কৃত মূল শ্লোকের পদ্যানুবাদ উল্লিখিত হইল।

সাধারণের অনুকরণীয়! তাই আমাদের জাতীয় আদর্শ ছিল এই পুরুষোত্তমের জীবন! জানি না, সর্বদুঃখহারী কবে দেশবাসীর চৈতন্য জাগাইয়া জাতিকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবেন!

৫

পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রদৃষ্ট সিংহরাশিতে সূর্যের অবস্থানে বাংলা পঞ্চম মাস ভাদ্র বর্ষা-ঋতু অন্তে শরৎ সূচনা করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে অঘোর-চতুর্দশী, দূর্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তচতুর্দশী, বিশ্বকর্মা-পূজা, অরন্ধনব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

অঘোর-চতুর্দশী: ঘোর নরকবাস হইতে পরিত্রাণের কামনায় এই দিনে শিবের আরাধনা করা হয়।

দূর্বাষ্টমী: বলিষ্ঠ দীর্ঘজীবী সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাধ্বী রমণীরা অষ্টগ্রন্থিযুক্ত দূর্বা বাম বাহুতে ধারণকরত অক্ষয়া দূর্বারূপা বিশ্ব-মাতৃকার আরাধনা শুক্লাষ্টমীতে করেন।

তালনবমী: শুক্লানবমীতে সুখ সৌভাগ্য ও আরোগ্য প্রার্থনা করিয়া তালের পিষ্টকাদি নিবেদনে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করা হয়।

অনন্তচতুর্দশী: এই দিনে নরনারী সর্বপাপ-ও ক্লেশনাশক এবং সকল-বাসনাপূরক মহাবিষ্ণু অনন্তদেবকে আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করেন:

অনন্তভবসাগরে মোরা নিমজ্জিত,
অনন্ত! করুণাদানে কর সমুত্থিত।

বিশ্বকর্মাপূজা:

ভাদ্র-সংক্রান্তিতে সূর্য কন্যা-রাশিসনে,
সম্মিলিত হন সুখে যেই শুভদিনে—
সর্বকর্মে ধর্মঘট রন্ধন-বর্জন,
কর্মব্যস্ত ধরা মাঝে শান্তির আসন,
সেদিন করম হ'তে বিশ্রাম তোমার,
ভক্ত কাছে পেতে চাও পূজা-উপহার।
প্রার্থনা শুধু তাই এই শুভদিনে,
খাটিয়া শ্রমের অন্ন পায় যেন দীনে!

এই বিশ্বকর্মাকে কর্মপুরুষও বলা হয়। শিল্প-রচনার বিবিধ নৈপুণ্যপূর্ণ বহু দেবদেবীর সবাহন মূর্তি গড়িয়া ব্রতধারিণী মায়েরা কর্মপুরুষ বা চলিত কথায় বুড়াই-বুড়ী পূজা সন্ধ্যাকালে সমাপন করেন।

৬

অশ্বিনী-নক্ষত্রদৃষ্ট কন্যারাশিতে সূর্যের অবস্থিতিকালে বাংলা ষষ্ঠ মাস আশ্বিন শারদোৎসবের পসরা লইয়া বর্ষচক্রে উপস্থিত হইলে দুর্গাষষ্ঠী, বীরাষ্টমী, কোজাগরী, জিতাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান হইয়া থাকে।

দুর্গাষষ্ঠী: সন্তানের মঙ্গলার্থে ষষ্ঠ্যধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আরাধনা অতীব ভক্তি সহকারে করা হয়।

বীরাষ্টমী: দীর্ঘজীবী বলিষ্ঠ বীর পুত্র লাভের কামনায় ধর্মপ্রাণা মায়েরা মহাশক্তিময়ী সমরাধিষ্ঠাত্রীর আরাধনা করেন শুক্লা মহাষ্টমীতে।

কোজাগরী: শারদীয়া পূর্ণিমায় কোন্ কোন্ ভক্ত ও ভক্তিমতী মহাসৌভাগ্য লাভের জন্য মোহনিদ্রামুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ জাগ্রদবস্থায় দেবীর আরাধনায় নিরত আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া বরদানেচ্ছু স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার পেচক-বাহিত রথে সারা বিশ্বে ঘুরিতে থাকেন; তাই ঐ নিশায় তাঁহার বিশেষ পূজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা।

জিতাষ্টমী: মরণজয়ী সুসন্তান লাভের আশায় সাধ্বী রমণীরা এই ব্রত অনুষ্ঠান করেন।

৭

কৃত্তিকা-নক্ষত্রদৃষ্ট তুলারাশিতে সূর্যের অবস্থানকালে বাংলা সপ্তম মাস কার্তিক

হৈমন্তিক আবহাওয়া লইয়া বর্ষচক্রে উপনীত হয়। এই মাসে যমপুকুর-ব্রত, ভাইফোঁটা-ব্রত, কার্ত্তিকেয়-ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

যমপুকুর-ব্রত : মা-বাপ, ভাইবোন, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, পাড়াপড়শীর মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত হয়।

ভাইফোঁটা : দীপান্বিতার পর শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভাইয়ের মঙ্গলার্থে যম-যমুনার পূজা করিয়া ভাইদের কপালে ফোঁটা দিবার কালে ছড়া বলা হয়—

ভাইয়ের কপালে দিয়ে ফোঁটা,
যম-দুয়ারে দিলাম কাঁটা।
ভাই না যেও যমের ঘর,
চিরকাল থাক সুখে ধরার উপর।

কার্ত্তিকেয়-ব্রত : মাসের শেষদিনে সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্ ও বীরপুত্র লাভের আশায় পুত্রদানে অধিকারী স্কন্দদেবের ব্রতোৎসব সায়ংকালে আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

৮

মৃগশিরা-নক্ষত্রদৃষ্ট বৃশ্চিক-রাশিতে সূর্য-সংক্রমণ-কালে বাংলা অষ্টম মাস অগ্রহায়ণ হিম বহন করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে ক্ষেত্রব্রত, নবান্ন-ব্রত, মিত্রসপ্তমী, ইতুপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষেত্রব্রত : শস্য-সঞ্চয়, দারিদ্র্য-মোচন ও অক্ষয় সৌভাগ্যলাভের কামনায় ক্ষেত্রব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

নবান্নব্রত : লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা করিয়া এবং নবান্ন শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া বন্ধু-বান্ধবাদি সহ নবান্নের পায়স-পিষ্টকাদি ভোজন খুব ধুমধামের সঙ্গে হইয়া থাকে।

ইতুপূজা : সারা মাস জুড়িয়া ইতু বা মিত্র অর্থাৎ সূর্যের উপাসনা করা হয় এবং বিশেষ করিয়া শুক্লা সপ্তমী দিনে স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত হয়। ইতু-পূজারিণীরা ইতুর পাত্রে জল ঢালিয়া বরলাভের ছড়া গাহিয়া থাকেন—

তৃণ লতা শস্যাঙ্কুরে অর্ঘ্য জল দিয়ে,
ইতুর চরণ পূজি ভকতি করিয়ে।
তুষ্ট ইতু দেখা দিয়ে দেন বর সবে,
ধন-ধান্যে সুখ-স্বাস্থ্যে নিত্য পূর্ণ রবে।

৯

পুষ্যা-নক্ষত্রদৃষ্ট ধনুরাশিতে সূর্য সংক্রমিত হইলে বাংলা নবম মাস পৌষ শীত-ঋতু সঙ্গে করিয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে তুষলী-ব্রত, পৌষপার্বণ, দধি-সংক্রান্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

তুষলীব্রত : মেয়েরা সারা মাস এই ব্রত করিয়া সংক্রান্তি-দিনে ডালি ভাসায় বা বিসর্জন দেয়। ব্রতের প্রার্থনা-ছড়া অনেক রকমের, মূল হইতেছে এইটি—

গৌরী গো মা তুষলী! তোমার কাছে মাগি বর,
স্বামী-পুত্র নিয়ে যেন সুখ-শান্তিতে করি ঘর।

পৌষপার্বণ : বিবিধ পিষ্টক-পায়সাদি নিবেদনে লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চনান্তে ভক্ত ও ভক্তিমতীদের তৃপ্তি-সহকারে ভোজন করানো হইয়া থাকে। ছেলেমেয়েদের লইয়া খুব আনন্দ ও ঘটা করিয়া এই পর্ব উদ্‌যাপিত হয়।

দধি-সংক্রান্তি : উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি-দিনে বিষ্ণুকে দধিস্নান করাইয়া পায়স, পিষ্টক, দৈ, মিষ্টি প্রচুর নিবেদন-করত বৈধব্য ও সন্তাপ মোচন-কামনায় প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠান করার সঙ্কল্প লইয়া সাধ্বী রমণীরা ব্রত গ্রহণ করেন। এই সংক্রান্তি-দিনে গঙ্গাসাগরে স্নান, ত্রিবেণীস্নান বা শুধু গঙ্গাতেই অবগাহন এক মহা পুণ্য কৃত্য; ইহা ছাড়া গঙ্গা সাক্ষী

রাখিয়া পুরুষেরা মিতালি এবং মেয়েরা গঙ্গাসই বা মকর পাতেন।

১০

মঘা-নক্ষত্রদৃষ্ট মকররাশিতে সূর্যাবস্থানে বাংলা দশম মাস মাঘ দারুণ শীত বহন করিয়া বর্ষচক্রে প্রকটিত হইলে মাঘব্রত, সূর্যব্রত, শ্রীপঞ্চমীব্রত, বাঘের ব্রত, সঙ্কটাচতুর্থী ব্রতাদি অনুষ্ঠিত হয়।

মাঘব্রত—কুমারী মেয়েরা প্রত্যুষে স্নানান্তে চন্দ্রসূর্যের পূজা করিয়া নিত্য প্রার্থনা করেন:

মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই প্রজা।
মা পাটেশ্বরী আপনি বিদ্যাধরী,
থালে ভাত, ভৃঙ্গারে পানি
জন্মে জন্মে এয়োরানী।

সূর্যব্রত: রবিবার উদয়াস্ত মুক্ত আকাশ-তলে মণ্ডলে দণ্ডায়মান থাকিয়া নির্জলা উপবাসে আরোগ্যদ সূর্যের আরাধনা নিজের বা প্রিয়জনদের রোগমুক্তি-কামনায় করা হয়। সূর্যাস্তকালে সারাদিন প্রজ্বালিত ঘৃত প্রদীপে অস্তগামী সূর্যকে আরতি করিয়া ব্রতধারিণীরা প্রার্থনা করেন—

কোথা যাও লাল ঠাকুর! কি না বর দিয়া?
ব্রতীরা সব চেয়ে আছি চরণে ধরিয়া॥

শ্রীপঞ্চমীব্রত: সৌভাগ্য ও বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্মীসরস্বতীর আরাধনা শুক্লা-পঞ্চমীতে ভক্তিভরে অনুষ্ঠিত হয়।

বাঘের ব্রত: বাঘের ভয় হইতে গৃহ-পালিত পশু এবং নিজেদের রক্ষার দৃঢ় উৎসাহ লইয়া বাঘ মারিবার জন্য সাহস ও শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে ছেলের দল গোচারণ-মাঠে পায়স-পিষ্টকাদি প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া মহাশক্তিধরের উদ্দেশ্যে নিবেদন এবং বাঘমারার অভিনয় প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সকলে আনন্দে বনভোজন সমাপন করে। এই উৎসবের জন্য ছেলের দল রাত্রে বহু ছড়াগান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করে। একটি ছড়া যথা—

পিটুর পিটুর মেঘ পড়ে, কৈ যাও রে ভাই!
রাজার পুতে কৈয়া দিছে, বাঘ মারিতে যাই।

সঙ্কটাচতুর্থী—কৃষ্ণাচতুর্থীতে সর্বসঙ্কটবিমুক্তি-কামনায় সঙ্কটনাশিনী দুর্গার পূজা হয়।

১১

পূর্বফল্গুনীর সম্মুখীন কুম্ভরাশিতে সূর্যাবস্থানে বাংলা একাদশ মাস ফাল্গুন বসন্তের আনন্দসম্ভার লইয়া কালচক্রে প্রকটিত হয়। এই মাসে শিবরাত্রিব্রত ও হোলি-উৎসব সারা ভারত জুড়িয়া অনুষ্ঠিত হয়।

১২

চিত্রানক্ষত্রদৃষ্ট মীনরাশিতে সূর্যাবস্থানে বাংলা দ্বাদশ মাস চৈত্র বসন্তের পূর্ণানন্দ দান করিয়া বর্ষকে সম্পূর্ণ করিতে প্রকটিত হয়। এই মাসে অশোকষষ্ঠী, অশোকাষ্টমী, রামনবমী, সন্ন্যাসগ্রহণে শিবব্রত, হাড়বিষু, মহাবিষু ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

অশোক-ষষ্ঠী ও অষ্টমী: শুক্লাষষ্ঠী ও অষ্টমী দিনে অশোকাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজার্চনা করিয়া শোকদুঃখ-মোচনার্থ অশোকফুল সহ জল পান করা হয়।

রামনবমী: ত্রেতাযুগপাবন রামচন্দ্রের মহৎ চরিত্রকে মানবজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ-রূপে গ্রহণের অনুধ্যানে তাঁহার পুণ্য জন্মদিনে পূজা-উৎসবের ধুম ভারতময় হইয়া থাকে।

শিবব্রত: সাময়িক সন্ন্যাস-গ্রহণে ত্যাগ-ধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুভব করত মহাত্যাগী দেবের দেব মহাদেবের আরাধনা, শিবের গাজন, চড়ক পূজা ও বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা উদ্‌যাপিত হয়।

হাড়বিষু ও মহাবিষু: চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিনকে হাড়বিষু বলা হয়। ঐ দিন নীলকণ্ঠ শিবের কৃচ্ছ্রসাধ্য উপাসনা অতীব ভক্তির সহিত করা হয়। মহাবিষুব সংক্রান্তি দিনে ভোজ্য, ছাতু, ফল, মিষ্টদ্রব্যাদিসহ জল পূর্ণ ঘট ও ব্যজন (তালপাতার পাখা) দান এবং হরি-হরের পূজা সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়া দেবাশিস-গ্রাহী ধর্মিষ্ঠ পুণ্যময় জীবনের বর্ষশেষ দিনটি সম্পূর্ণ হয়।

বিশ্বগুরু বুদ্ধ

শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী

[পূর্বানুবৃত্তি]

চার

দূরে গাছপালার আড়ালে চাঁদ ডুবে গেল। আকাশের অগণিত তারা যেন বেদনাতুরা বিরহিণীর মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সিদ্ধার্থ সারথি ছন্নকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অন্ধকারে চলতে লাগলেন। তাঁর কানে কানে কে যেন ব'লে দিল—নির্বাণ। এ নির্বাণ-মন্ত্র যেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। আকাশের তারায় আলোর অক্ষরে এ মন্ত্রই যেন লেখা রয়েছে। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আড়ালে গোপন থেকে এ মন্ত্র যেন মানুষের অন্তরের অন্তরে অনাদ্যন্ত রবে ধ্বনিত। এ ধ্বনি সঙ্গীতের মতো কানে বাজতে লাগলো।

সিদ্ধার্থ অভিভূত হয়ে ঘোড়ার ওপর বসলেন। ছন্ন ঘোড়াকে চালিয়ে নিল। উভয়ের মুখে কোন কথা নেই! গ্রাম নগর প্রান্তর ছাড়িয়ে ঘোড়া চ'লল। তার খুরের শব্দ নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতির নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগলো। সারা রাত অবিশ্রান্ত চলার পর ঘোড়া এসে থামলো অনোমার পারে। তখন আকাশের পূর্ব প্রান্তে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে, অন্ধকার হালকা হয়ে এসেছে। অনোমার বালুকাস্তৃত তীরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ একটির পর একটি অঙ্গের আভরণ খুলে ছন্নর হাতে দিলেন এবং রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। ছন্ন তাঁর পানে চেয়ে চোখের জল সংবরণ করতে পারল না। তার পর তিনি চিরসহচর ছন্ন এবং প্রিয় অশ্ব কন্থককে বিদায় দিয়ে একা পথ বেয়ে চললেন। আজ তিনি একা—নিতান্ত একা। তাঁর গন্তব্য স্থানের ঠিকানা নেই। তিনি শুধু জানলেন—তাঁকে চলতে হবে।

চলতে চলতে তিনি রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীর) এসে পৌঁছলেন। তখন আহারের সময় আসন্ন। আজ যে ভৃত্যেরা সুপাচক-রচিত খাদ্যসম্ভার নিয়ে তাঁর সম্মুখে আসবে না, তা তাঁর অজানা নয়। তিনি অনুভব করলেন—পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাঁকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে হবে। তিনি পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষায় বের হলেন। তরুণ নবীন সুন্দর সন্ন্যাসীকে দেখে কৌতূহলাক্রান্ত জনতা তাঁকে অনুসরণ ক'রল। তাঁর দেহের অপরূপ সৌন্দর্য, প্রতিভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত উজ্জ্বল বদনমণ্ডল দর্শকগণকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ ক'রে তিনি যখন গাছের ছায়ায় বসে আহারের উদ্যোগ করছিলেন, তখন ভিক্ষার অন্নব্যঞ্জন দেখে তিনি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে নিজেকে সংযত ক'রে ভাবলেন—তিনি সন্ন্যাসী, ভিক্ষান্ন তাঁর সম্বল; ভিক্ষান্নকে ঘৃণা করলে চলবে না। এই ভাবে তিনি মনের প্রতিকূল চিন্তা দমন ক'রে আহার সমাপ্ত করলেন।

তখন সমৃদ্ধ রাজগৃহ মগধরাজ্যের রাজধানী। রাজা বিম্বিসার ছিলেন সেখানকার অধীশ্বর। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি রাজা বিম্বিসারের ছিল একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ, নবীন সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের কথা শুনে রাজা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। প্রথম দর্শনেই রাজা মুগ্ধ হলেন। এমন শান্ত সৌম্য রূপবান্ পুরুষ তিনি

কোনদিন দেখেননি। সন্ন্যাসীকে রাজার অত্যন্ত আপনার জন ব'লে মনে হ'ল। রাজা তাঁকে অনুরোধ করলেন রাজগৃহে থাকার জন্য এবং তাঁর সেবার সুযোগ-দানের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সিদ্ধার্থ শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন,—'রাজন্, আমি মহাসত্যের সন্ধানে দুঃখমুক্তির পথ-দর্শনের আশায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছি। আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পূর্বে আপনার অনুরোধ পালন করতে পারব না। তবে সিদ্ধিলাভের পর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রব।'

এর পর সিদ্ধার্থ অন্তরে বিপুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নানা স্থান ঘুরে গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। অনেক সন্ধানের পর সেই যুগের প্রসিদ্ধ গুরু আড়ার কালামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। সদ্‌গুরু-রূপে এই বর্ষীয়ান্ সন্ন্যাসীর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মোপলব্ধির মণিকাঞ্চন সংযোগে তাঁর জীবন হয়ে উঠেছিল একটি বিরাট আদর্শ। সিদ্ধার্থ তাঁকে গুরু ব'লে বরণ করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে গুরুর অধ্যাপিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। কিন্তু এতে তাঁর মন তৃপ্ত হ'ল না, তিনি ভাবলেন—শুধু শাস্ত্রাধ্যয়নে কি হবে, যদি অন্তরে উপলব্ধি না হয়; গুরুর যোগসাধনেও অধিকার-লাভ একান্ত প্রয়োজন। তিনি পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে সাধনায় রত হলেন। অচিরেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হ'ল। কিন্তু সিদ্ধার্থের ঊর্ধ্বগামী মন এতেও তৃপ্ত হ'ল না। তিনি অনুভব করলেন, এখানেই সাধনার পরিসমাপ্তি নয়, আরও অগ্রসর হ'তে হবে। গুরু যখন তাঁকে সাধনায় উন্নততর স্তরের নির্দেশ দিতে অসমর্থ হলেন, গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে অন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে তিনি আবার ঘুরতে লাগলেন। অনেক ঘোরাঘুরির পর তিনি রামপুত্র উদ্রকের সন্ধান পেলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন! সেখানেও সিদ্ধার্থ অনায়াসে গুরুর শাস্ত্রে পারদর্শী হলেন। এর পর তিনি গুরুর নির্দিষ্ট সাধনায় আত্ম-নিয়োগ ক'রে তাতে অধিকার লাভ করলেন। পূর্বগুরু আড়ার কালামের চেয়ে এ গুরুর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি উন্নততর বটে, কিন্তু তাও সিদ্ধার্থের উন্নতিশীল ভাবধারাকে পরিতৃপ্ত করতে পারল না। তিনি বৃহত্তর সন্ধানের জন্য এই গুরুর নিকটও বিদায় নিতে বাধ্য হলেন।

আবার তিনি গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন। বহু সাধু-মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল; কিন্তু কেউ তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটাতে পারলেন না। অবশেষে তিনি গুরুসন্ধানের চেষ্টা পরিত্যাগ করলেন। মনের উন্নতিশীল ভাব তেমনি অটুট রইল। তাঁর মনে হতাশার স্থান নেই, সংকল্পের বিপর্যয় নেই। তাঁর অটল বিশ্বাস—সিদ্ধিলাভ হবেই, সিদ্ধির গোপন পথ সন্ধান করা তাঁর একমাত্র কর্তব্য; সন্ধানীর কাছে সে পথ অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না। তাঁর অসীম ধৈর্য ও অতুল পরাক্রম তাঁকে সম্মুখপানে এগিয়ে দিল। বিপুল আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি কঠোর সাধনায় রত হ'তে বদ্ধপরিকর হলেন।

পাঁচ

সেকালে একদিকে যেমন লোকায়তিকগণ সুখসম্ভোগে মগ্ন হয়ে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-সাধনকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করতেন এবং ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়পর হয়ে থাকার জন্য সচেষ্ট হতেন, তেমনি অন্য দিকে বিশ্বাসী পরিব্রাজকগণ আধ্যাত্মিক কল্যাণ-কামনায় ঐহিক সুখ ও আরাম দলিত ক'রে নানাভাবে ক্লেশকর কৃচ্ছ্রসাধনায় রত হতেন।

সিদ্ধার্থ আপনার অভীপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হবার আশায় কৃচ্ছ্রসাধনরত পরিব্রাজকগণের পন্থা অনুসরণ করলেন। তিনি সেকালের প্রচলিত কঠিনতম চতুরঙ্গ ব্রহ্মচর্য-সাধনা শুরু করলেন। তপস্বিতা, রুক্ষাচার, জুগুপ্সা ও প্রবিবেক—এ সাধনার চারি অঙ্গ।

তিনি আপনার পরনের বস্ত্রখণ্ড ফেলে দিয়ে নগ্ন থাকলেন। তাঁর অনাবৃত দেহ গ্রীষ্মের খর তাপে ও শীতের কনকনে হাওয়ায় অপরিমেয় ক্লেশ বরণ ক'রল। তিনি লোকালয়ের ভিক্ষান্ন গ্রহণ ত্যাগ ক'রে ফলমূল-ভোজী হলেন। কিন্তু গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া তাঁর বারণ। ফল যখন গাছ থেকে আপনা-আপনি ঝরে প'ড়ত, তখন তিনি তা কুড়িয়ে খেতেন। কখন নীবার ধান, কখন ঘাসপাতা ইত্যাদি কুড়িয়ে খেয়ে তিনি জীবন-ধারণ করতে লাগলেন। শরীরের আরাম যাতে না হয়, তাই কাঁটা হ'ল তাঁর পীড়াদায়ক শয্যা। ঊর্ধ্ববাহু ও উৎকুটিক হয়ে তিনি তপস্যারত হলেন। এই ভাবে অনেক প্রকার কায়ক্লেশ বরণ ক'রে তিনি তপস্বিতার শেষ সীমায় পৌঁছলেন। শরীরের প্রতি তাঁর কোন যত্ন রইল না। বহুবর্ষ-সঞ্চিত ধূলি-বালুকায় ঢাকা পড়ে গেল তাঁর দেহ। শরীরে হাত বুলানোও তাঁর বারণ। এমন ছিল তাঁর রুক্ষাচার! তিনি সব সময় সতর্ক ও অবহিত হয়ে রইলেন। ক্ষুদ্র জীবাণুর প্রাণবধের ভয়ে জলবিন্দুর প্রতিও তাঁর ব্যবহার ছিল সদয়। এমন ছিল জুগুপ্সা বা পাপের প্রতি ঘৃণা।

প্রবিবেক বা নির্জনবাসের জন্য তিনি জনহীন নিবিড় অরণ্যে বাস করতেন। রাখাল, কাঠুরে প্রভৃতি বনচর লোকের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তিনি বন থেকে বনে, কন্দর থেকে কন্দরে এবং উপত্যকা থেকে উপত্যকায় আত্মগোপন করতেন অর্থাৎ সর্বদাই লোকলোচনের আড়ালে থাকতেন। এ নির্জনবাসের সময় কোন কোন দিন মানুষের অখাদ্য খেয়েও ক্ষুধা নিবারণ করতে হ'ত। কোন কোন দিন তিনি নির্জন শ্মশানে শবাস্থির ওপর শুতেন। এ তপশ্চর্যার সময় এমন হ'ত যে, তিনি যখন আসন ক'রে বসতেন, রাখাল ছেলে এসে তাঁর নিশ্চল দেহের ওপর মূত্র ত্যাগ ক'রত, ধুলো ছড়িয়ে দিত, কর্ণছিদ্রে কঞ্চি ঢুকিয়ে দিত। তিনি দৈনন্দিন এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন এবং করুণাবিগলিত হৃদয়ে তাদের ক্ষমা করতেন।

'জনবাদে'র ওপর আস্থাবান্ হয়ে তিনি আহার-শুদ্ধিতে রত হলেন। একটিমাত্র কুল খেয়ে অথবা একটিমাত্র চাল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। অত্যন্ত অল্পাহারের ফলে তাঁর দেহ ভেঙে গেল, হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে প'ড়ল, চক্ষু কোটরগত হ'ল। তাঁর শীর্ণ হাত যখন পেটে প'ড়ত, তখন শিরদাঁড়া হাতে লাগত। এক কথায় সমস্ত শরীর একটি চর্মাবৃত কঙ্কালে পরিণত হ'ল। শরীরকৃত্য করতে গিয়ে তিনি কোন কোন দিন উপুড় হয়ে পড়তেন। অবশেষে তিনি উত্থানশক্তি-রহিত হলেন।

এমন কঠোর তপশ্চর্যায়ও যখন তাঁর সিদ্ধিলাভ হ'ল না, তখন তাঁর মনে হ'ল তাঁর অবলম্বিত তপশ্চর্যা সত্যের পথ নয়; এতে শুধু দেহমনের নিপীড়ন হয়েছে। তিনি যখন এ-কথা ভাবতে লাগলেন, তখন অদূর থেকে ভেসে এল তাঁর কানে বীণার মৃদু ঝঙ্কার, প্রাণে বুলিয়ে দিল শান্তির পরশ। তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন। ক্রমশঃ বীণার তন্ত্রী চড়া সুরে বেজে উঠল। সিদ্ধার্থের মন বিরক্ত হ'ল। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন—না, না, না। সেই সুর আবার অত্যন্ত ঢিলা

হয়ে গেল। তখন তিনি বিরক্তিতে ব'লে উঠলেন,—না, না, না। বীণার তন্ত্রী যখন চড়া ঢিলা দুই বাদ দিয়ে মাঝামাঝি বাঁধা হ'ল, তার মধুর রাগিণী তখন সিদ্ধার্থের মনপ্রাণ অভিষিক্ত ক'রে তুলল। তিনি চোখ মুদে বললেন, মধ্যপন্থা। সাধনার ক্ষেত্রেও বীণার মতো মধ্যপন্থার আবশ্যকতা তিনি অনুভব করলেন। এর পর তিনি কঠোর সাধনা ত্যাগ ক'রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেন। যে সহচর সন্ন্যাসীরা এতদিন তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সেবাযত্ন করতেন, তাঁরা ভাবলেন—সিদ্ধার্থ পথভ্রষ্ট। তাঁদের ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা রইল না। তাঁরা ক্ষুণ্ণমনে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ মধ্যপন্থা অনুসরণ ক'রে নতুন সাধনাপদ্ধতি আরম্ভ করলেন। তাঁর অন্তরে নতুন আলোর স্পর্শ এল। পুলকে হৃদয় ভরে উঠল। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি হৃত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। বসন্ত সমাগমে যেমন বনে বনান্তরে নতুনের সমারোহ শুরু হয়, তেমনি তাঁর মনোজগতে দেখা দিল নতুন পরিবর্তন। মনে হয়, যেন তাঁর লক্ষ্য আসন্ন। বৈশাখের শুক্ল পক্ষের চন্দ্র দিনের পর দিন যতই বাড়তে লাগলো, ততই আসন্ন অজ্ঞাত সম্ভাবনায় তাঁর মন পুলকে শিউরে উঠল। অননুভূত উদার স্পর্শে তিনি অভিভূত হ'তে লাগলেন। চতুর্দশী তিথির প্রভাতে তিনি একটি বনবৃক্ষের ছায়ায় ভাববিভোর হয়ে বসলেন। তাঁর দেহ হ'ল নিশ্চল, চোখে মুখে ফুটে উঠল অপূর্ব ধ্যানদীপ্তি। সেখানে উপস্থিত হলেন কুলবধূ সুজাতা। তিনি ভাবমগ্ন সিদ্ধার্থের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখে মনে মনে ভাবলেন—তাঁর আরাধ্য বৃক্ষদেবতা সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। সুজাতা একদিন এ বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন ক'রে বলেছিলেন—'যদি আমার প্রথম সন্তান পুত্র হয়, তা হ'লে এখানে পূজা দিয়ে যাব। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাঁর কোল আলো ক'রে এসেছে সোনার চাঁদ ছেলে। এজন্য বৃক্ষদেবতার উদ্দেশে পূজা-নিবেদনের দিন আজ। সিদ্ধার্থকে মূর্ত দেবতা মনে ক'রে আনন্দের সীমা রইল না। সুজাতা হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে ভক্তিভরে সুরচিত পায়সের স্বর্ণপাত্র তুলে দিলেন তাঁর হাতে। সেখানে বসেই তিনি সুসংযত ভাবে আহার করলেন সে পায়সান্ন। এ আহার মুছে দিল যেন তাঁর দীর্ঘ দিনের কঠোর সাধনার পুঞ্জীভূত গ্লানি। আহারান্তে তিনি মৃৎপাত্রের মতো নৈরঞ্জনার জলে ফেলে দিলেন সে স্বর্ণপাত্র। স্রোতের টানে তা তীরবেগে ছুটে চ'লল জলের ওপর—ইঙ্গিত দিল অগ্রগতির। তিনি তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন।

নৈরঞ্জনার কুলকুল-শব্দ সিদ্ধার্থের কানে নতুন ক'রে বাজতে লাগলো, প্রাণ উতলা ক'রে তুলল। তিনি আস্তে আস্তে চললেন তার তীর বেয়ে। তাঁর চোখে নৈরঞ্জনা আজ সম্পূর্ণ নতুন। সে যেন উদার আনন্দে নতুন ছন্দে অজানার পানে ছুটে চলেছে। চোখ ভরে তার অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে তিনি ভাবমগ্ন হয়ে গেলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারায় চারিদিক প্লাবিত হ'ল। তাঁর মনে জাগলো এক অপূর্ব আলোর অনুভূতি। অন্তরে বাইরে সর্বত্রই আলোর বান ডাকলো। তিনি অদূরে দেখতে পেলেন তপস্যার উপযুক্ত রমণীয় স্থান, সুন্দর বনভূমি। তাঁর কথায় বলতে গেলে, 'রমণীয়ো ভূমিভাগো পাসাদিকো চ বনসণ্ডো নদী সন্দন্তী চ সেতকা সুপতিত্থা রমণীয়া সমন্তা গোচরগামো অলং

বতিদং কুলপুত্তস্‌স পধানত্থিকস্‌স পধানাযাতি।' তিনি বুদ্ধত্বলাভের কঠিন সংকল্প নিয়ে সেখানে অশ্বত্থগাছের তলায় আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর চোখ ধ্যান-নিমীলিত হয়ে এল। মন ক্রমশঃ ধ্যানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে সুখদুঃখের অতীত সমাহৃতিযুক্ত শুদ্ধ শান্ত চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হ'ল।

তাঁর সমাহিত চিত্ত 'পূর্বনিবাসানুস্মৃতি' বা জাতিস্মর জ্ঞান লাভ ক'রল। তিনি দর্পণে প্রতিফলিত বস্তুর মতো জন্ম-জন্মান্তরের চিত্র দেখতে লাগলেন। রাত্রির প্রথম যামেই এ প্রথম বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত হ'ল। দ্বিতীয় যামে দ্বিতীয় বিদ্যা—'চ্যুতোৎপত্তি' জ্ঞান লাভ হ'ল অর্থাৎ তাঁর কাছে জন্মমৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। তিনি দিব্য দৃষ্টি মেলে প্রত্যক্ষ করলেন জীব-জগতের আসা-যাওয়ার খেলা। তৃতীয় যামে হ'ল 'আস্রবক্ষয়' জ্ঞানের উদয়—অন্তরের সমস্ত মারসৈন্য বা রিপুগুলোকে নির্মূল ক'রে তাঁর চিত্ত হ'ল মুক্ত—বন্ধনহীন। এখানেই তাঁর বুদ্ধজীবনের বিকাশ, সাধনার পরিপূর্ণতা, কর্তব্যের অবসান—'নত্থি উত্তরি করণীয়ং', এর পর আর করণীয় কিছু নেই। এ অবস্থাকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না, ভাষা এখানে মূক, মানবের চিন্তাধারা এখানে স্তব্ধ।

ছয়

'এ আসনে আমার হাড় মাংস চামড়া শুকিয়ে যাক, দেহ বিলীন হোক, তবু বুদ্ধত্ব লাভ না ক'রে এ আসন ত্যাগ ক'রব না' সিদ্ধার্থের এ কঠিন সংকল্পের জয় হ'ল। তিনি হলেন বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানের ঘন মূর্তি। বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর হৃদয় থেকে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব বাণী উদ্‌গত হ'ল। তিনি নৈরঞ্জনা-সৈকত প্রতিধ্বনিত ক'রে উচ্চারণ করলেন—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

—বহু জন্ম ব্যর্থভাবে ফিরিয়াছি তাহার সন্ধানে
এই দেহ-গৃহ মোর কে কোথায় গড়িছে গোপনে।
ওগো গৃহকার[১] আজি এইদিনে দেখিনু তোমায়,
কৃতকার্য হবে নাকো তুমি আর গৃহ-রচনায়,
যত ছিল কড়িকাঠ ভাঙিয়াছি আমি একে একে
উন্মূলিয়া গৃহকূট[২] চিরতরে চোখের পলকে।
সকল সংস্কার আজি গেছে খসি মোর চিত্ত হ'তে,
তৃষ্ণা নিঃশেষিত করি মগ্ন আমি বিপুল শান্তিতে।

বুদ্ধত্বলাভের উদ্বেল আনন্দ ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে কণ্ঠ থেমে গেল। চারিদিক আবার নিস্তব্ধ হ'ল। বুদ্ধ বিমুক্তির গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে সে আসনেই সাতদিন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর সমস্ত সত্তা এত অভিভূত হয়ে পড়ল যে, সকল শারীরিক কৃত্য তিনি কিছুদিনের জন্য একেবারেই ভুলে গেলেন। আসন ত্যাগ করেই তিনি যখন সেই গাছটির দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মনে হ'ল তাঁর বুদ্ধ-জীবনের বিকাশে এ গাছ শাখা মেলে তাঁকে ছায়াদান করেছিল। অনাবিল শ্রদ্ধায় ও গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরে উঠল। তিনি ভাবমগ্ন হয়ে পলকহীন চোখে সে গাছটির পানে চেয়ে নীরবে অশ্রুপাতে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। এর ছায়ায় তাঁর বোধি অর্থাৎ মহাজ্ঞানের উদয় হয়েছিল ব'লে একে

১ সংসারের প্রতি তৃষ্ণা বা আসক্তিকে এখানে গৃহকার বা গৃহনির্মাতা ব'লে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ এ আসক্তি জীবকে জন্ম-জন্মান্তরের পথে নিয়ে যায় এবং জীবের দেহরূপ গৃহ-রচনার হেতু হয়।

২ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা এখানে গৃহকূট বা গৃহের মূলস্তম্ভ ব'লে বর্ণিত হয়েছে।

বলা হয় বোধিতরু। সেজন্য সেই সম্মানদান বুদ্ধের 'বোধিতরু-পূজা' নামে অভিহিত হয়।

বোধিতরু ত্যাগ ক'রে বুদ্ধ আর একটি বটগাছের ছায়ায় এসে বসলেন। এ গাছকে বলা হ'ত অজপান বটগাছ। এখানেও তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে সাতদিন কাটিয়ে দিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর জনৈক জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। ব্রাহ্মণ সেখানে দাঁড়িয়ে গর্বোদ্ধতভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ক'রে ব্রাহ্মণ হ'তে হয় এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম কি কি তা জানেন কি?' প্রশ্ন শুনে বুদ্ধ ভাবাবেগে আপন মনে বললেন—'যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্যবান্ সংযত নিষ্পাপ নির্মল অহঙ্কারহীন অধ্যাত্মোপলব্ধিসম্পন্ন, তিনিই ধর্মতঃ ব্রাহ্মণত্বের দাবি করতে পারেন।' তাঁর উক্তি শুনে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করলেন।

এর পর বুদ্ধ অজপান বটগাছ ত্যাগ ক'রে মুচলিন্দে এসে গাছের ছায়ায় বসলেন। সেখানেও তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ক'রে সাত দিন ধরে প্রবল ধারায় বৃষ্টিপাত হ'তে লাগল। একটি প্রকাণ্ড সর্প তাঁর দেহ বেষ্টনপূর্বক মাথার ওপর বিশাল ফণা বিস্তার ক'রে তাঁকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে লাগল। সাত দিন পরে আকাশ মেঘমুক্ত হ'ল। প্রভাতের স্বচ্ছ আলোয় চারিদিক ঝলমল ক'রে উঠল। ধ্যানভঙ্গের পর তিনি ভাবাবেগে নির্জন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত ক'রে গাইলেন :

মুখো বিবেকো তুট্ঠস্স সুতধম্মস্স পস্সতো
অব্যাপজ্ঝং সুখং লোকে পানভূতেসু সংযমো
সুখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিক্কমো
অস্মিমানস্স যো বিনযো এতং বে পরমং সুখং।

—মন যার ডুবিয়াছে ধর্মের গভীরে
তুষ্ট সদা মন লঙ্ঘি ক্ষোভের সীমারে,
তাহার বিবিক্তবাস কি আনন্দময়!
অহিংসা বাড়ায় তার আনন্দসঞ্চয়।
বৈরাগ্য আনন্দময় কামনা-বর্জন
পরম আনন্দ আহা অস্মিতা-নাশন[৩]।

বুদ্ধ এমনি মগ্নভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়ে যেদিন আহারের প্রয়োজন অনুভব করলেন, সেদিন বণিক তপস্সু ও বণিক ভল্লিক পণ্যসম্ভার নিয়ে তাঁর সামনের পথ ধরে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁদের পুরোগামী শকট থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শকটগুলো থামলো। তাঁরা শকট থামার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অদূরে গাছতলায় বুদ্ধকে দেখতে পেলেন। তাঁর মুখে চোখে অপূর্ব ধ্যানের দীপ্তি, চারিদিকে যেন আলোর ঢেউ বইছে। মানুষের এত সৌন্দর্য কোন দিন তাঁদের চোখে পড়েনি; প্রথম দর্শনেই তাঁরা অভিভূত হলেন এবং তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে বললেন—ভগবন্, তোমার শরণ নিলাম, তোমার ধর্মের শরণ নিলাম। তখনই তাঁরা তাদের আহার্যভাণ্ড খুলে ছাতু ও মধুপিণ্ড তাঁর ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করলেন। বুদ্ধত্ব-লাভের পর বুদ্ধের এই প্রথম আহার গ্রহণ।

এ বণিকদ্বয় বৌদ্ধ সাহিত্যে 'দ্বিবাচিক উপাসক' নামে পরিচিত। তখনও সঙ্ঘের জন্ম হয়নি ব'লে এঁরা ত্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশরণ গ্রহণ করেছিলেন।

---

৩ অস্মিতা-নাশন—অহংভাব-পরিত্যাগ বা 'আমি' 'আমার' মূলোৎপাটন।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

পরীক্ষাপদ্ধতি

আজ দীর্ঘকাল ধরে এ-দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নিয়ামক পরীক্ষা। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষক, অভিভাবক প্রভৃতি সব কিছুই তার একান্ত ভীত ও বিশ্বস্ত অনুগামী, প্রায় স্তাবকশ্রেণীভুক্ত বলা যেতে পারে।

হতভাগ্য এ-দেশের শিক্ষার্থী-দল এই সর্বশক্তিমান্ দানবের বিশাল হস্তে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। আর পরীক্ষার সমগ্র ব্যাপারটিই যেন অধিকাংশের পক্ষে একটি লটারি খেলার মতো। সেখানকার কর্মপদ্ধতিতে প্রায় সকলের পক্ষেই সফলতা নির্ভর করে শুধু কণ্ঠস্থ করবার ক্ষমতা এবং তাকে যথাস্থানে ও যথাকালে যথাযথ উদ্গারণ করবার সামর্থ্যের উপরে। প্রাক্-স্বাধীনতার বহু-নিন্দিত কাল থেকে উত্তর-স্বাধীনতার বর্তমান সময় পর্যন্ত এ-পদ্ধতির ও ব্যবস্থার প্রতাপ ও পরিধি ক্রম-বর্ধমান। এই অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, জাতি ও দেশের স্বার্থ-বিরোধী পরীক্ষাব্যবস্থার জাঁতাকলে বৎসরের পর বৎসর হাজার হাজার তরুণ-তরুণী দলিত হচ্ছে, পিষ্ট হচ্ছে—দেহে ও মনে,—এবং বৃহত্তর সমাজ-দেহে দুষ্টক্ষতের মতো সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যার সৃষ্টি ক'রে চলেছে। তথাপি আমরা নির্বিকার, তথাপি এ পরীক্ষাদানব তার বিশাল নিষ্পেষণ-যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

প্রতি বৎসর বাংলা দেশে অন্ততঃ দেখা যাচ্ছে যে, পরীক্ষার অব্যবহিত পরে সংবাদপত্র-স্তম্ভে এ আত্মঘাতী অপচয়ের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা এবং অকৃতকার্যদের জন্য কিঞ্চিৎ কুম্ভীরাশ্রু বর্ষিত হচ্ছে। তারপর—যথাপূর্বম্। অথচ একই কালে—অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে এসব ক্ষেত্রে কী বিপুল ও দূরপ্রসারী পরিবর্তনই না সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনের সফলতা-বিফলতাকে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে বিচার ক'রে একেবারে গোড়া থেকে সকল অপচয়ের, বিশেষ ক'রে মনুষ্য-সম্পদের অপচয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়েছে।··· রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে অবশ্য অবস্থা এতটা গুরুতর ছিল না। তথাপি সেকালেই এ-পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ত্রুটির দিকে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেছিলেন, বলেছিলেন :

'শিক্ষা জিনিসটা জৈব, সে যান্ত্রিক নয়। ওর প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক।' কিন্তু আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন 'পরীক্ষা-পাসের কুস্তির আখড়া'য় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে, 'আমরা শিক্ষার মুষ্টিভিক্ষায় যে-দান সংগ্রহ করি, ফর্দ ধরে তারই পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে যে-শিক্ষা, তাও ওজন দরে হয়ে থাকে।' স্বভাবতই শিক্ষাটিও যেমন ব্যর্থ হয়, পরীক্ষাও তেমনি একটি মহাক্ষতির হেতু হয়ে দাঁড়ায়।

এ-সকল নানা গুরুতর ত্রুটির ব্যাপক ফল এই হয় যে, আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার একান্ত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য সকল দিক দিয়ে ফুটে ওঠে এবং নানাভাবে আমাদের অক্ষম ও পঙ্গু ক'রে দেয়।

ধর্মশিক্ষা

ধর্মশিক্ষার রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। যন্ত্রশাসিত বর্তমান যুগে আশ্রম-বিদ্যালয়ের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর পক্ষে সে দৃষ্টিভঙ্গী খুবই সহজ ও স্বাভাবিক।…

'আমাদের ভারত তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে—এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখিতে পারি, তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও ফলবান্ করিয়া তুলিবে'—এই ছিল তাঁর কথা।

নিজ পিতৃসন্নিধানে হিমালয়ের মৌনগাম্ভীর্যে অথবা শান্তিনিকেতনের অবাধ নির্জনতায় তাঁর শৈশবের স্বপ্নমাখানো দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। প্রতিদিন ঊষাকালে মুক্ত আকাশের নীচে পূর্বাস্য হয়ে তিনি দণ্ডায়মান হতেন শুধু এই কামনাটি ঊর্ধ্বমুখে নিবেদন করবার জন্য :

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।

সুতরাং স্বভাবতই তৎপরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রারম্ভেই ধর্মশিক্ষার অনুকূল একটি পরিবেশের কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। সে পরিবেশটি শান্ত হবে, শুচি-স্নিগ্ধ হবে। সেখানে যে 'বিদ্যা-অন্ন' পরিবেশিত হবে সেটি একটি প্রাণরসে, একটি অমৃতরসে সিঞ্চিত হয়ে বিদ্যার্থীর সমগ্র জীবন পরিপুষ্ট করবে। সেখানে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্বাভাবিক হবে। ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণ-বাহুল্য মনকে ক্ষুব্ধ করবে না। সাধনা কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যে বিলীন না হয়ে ত্যাগে ও শুভকর্মে প্রকাশিত হবে।

অথচ ধর্মবস্তু যে কোন স্থূলবস্তুর মতো হাতে হাতে দেওয়া চলে না, সে-বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। বলতেন,—সুন্দর স্বাস্থ্য যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে দান করতে পারে না, কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্য-লাভের প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে পারে, ধর্মপ্রবৃত্তিকেও তেমনি অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে সর্বাঙ্গীণ পরিণতির দিকে জাগ্রত করা যেতে পারে। অন্য কোন ভাবে ধর্মের আদান-প্রদান সম্ভব নয়।

অতএব অকপট ধর্মজীবন যাপন করাই ধর্মশিক্ষা দেবার প্রশস্ত ও কার্যকরী পন্থা। যথার্থ সাধক যদি শিক্ষক হন, প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট-সাহচর্যে বর্ধিত হবার সুযোগ যদি শিক্ষার্থী লাভ করে, যদি বিদ্যালয়টিকে ঘিরে এমন একটি সূক্ষ্ম পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয় যা সাধনার দিকে, ভূমার দিকে বিসর্পিত—তবেই ধর্ম-শিক্ষার অনুকূল ক্ষেত্র রচিত হ'তে পারে।

একদিন আমাদের এ তপোবৃদ্ধ ভারতবর্ষ তার আশ্রমজীবনের স্নিগ্ধ অনাবিলতার মধ্য দিয়ে এমন একটি সুন্দর ও সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-দর্শনের সন্ধান পেয়েছিল—যার তুলনা সমগ্র পৃথিবীতে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বের দরবারে সেজন্য অদ্যাবধি সেটি আমাদের একমাত্র গর্বের বস্তু। অথচ আমাদের আজকের জীবনে 'সে-সম্পদের কোন ব্যবহার নেই, স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত যেন সঙ্কোচ ও লজ্জাতে আবৃত।'

সেইহেতু একদা নিরতিশয় দুঃখের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা-প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেছিলেন—'জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে (আমরা) জন্মগ্রহণ করিয়াছি। …না হয় আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র

হইয়া তাহার পাথরের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি, কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান, সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামল অঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয়, তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্যদেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া কোনমতেই মানিয়া লইতে পারিব না।'

সমাজশিক্ষা

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর দরজায় দরজায় শিক্ষার সঞ্জীবনী বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে, নানা কর্মসূচী অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু এখন থেকে কত বর্ষ পূর্বে, যখন এক স্বামী বিবেকানন্দ ভিন্ন অন্য কোন মনীষী সমাজের নিম্নস্তরের একান্ত উপেক্ষিত, দরিদ্র ও অশিক্ষিত নরনারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা নিয়ে কোন আলোচনায় পর্যন্ত অগ্রসর হননি, সেই অতি-অনগ্রসরতার দিনে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে তাঁর লেখনী দ্বারাই এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তাই নয়, পরন্তু শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুল গ্রামের কেন্দ্র-স্থলে 'শ্রীনিকেতন' নামে সমাজ-শিক্ষার একটি আদর্শ কর্মশালা স্থাপন ক'রে হাতেনাতে কাজ শুরু করেছিলেন।

সেদিন সমাজ-শিক্ষার প্রকৃতরূপটি কবিগুরুর কল্পনায় যেমনটি হয়ে ফুটেছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও পত্রে।

'এ-কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি, তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলছে আনুষঙ্গিক হয়ে।—এ বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ী চলেছে, সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়ীটাই যেন সত্য আর প্রাণ-বেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব। ··

'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হ'ল এন্‌লাইটেন্‌ড্, আলোকিত'—এই হ'ল এক গুরুতর সামাজিক বিপদ।'

আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে আরও একদিক থেকে বিপর্যয় এল। এ-দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে জনশিক্ষার যে-সব সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা ছিল, নানা কারণে সেগুলি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তার ফলে দেশের সর্বনাশ ঘ'টল অতি ব্যাপকভাবে। কারণ একদিকে প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত যে-শিক্ষা, তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল, অন্যদিকে—'আধুনিক কালের নূতন বিদ্যার যে আবির্ভাব হ'ল, তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে।' সুতরাং অশিক্ষার অভিশাপ তো রইলই, আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা লাভ করলেন, তাঁরাও সর্বসাধারণের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। ফলে, 'দেশে এক অবাঞ্ছিত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার উদ্ভব হ'ল।'

বস্তুতঃ সেই ছিল বাঙালীর জাতীয় জীবনের বর্তমান কালের ঘোর দুর্দিনের সূচনা। 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে এরই এক নিখুঁত চিত্র এঁকেছিলেন কবিগুরু এবং সে-চিত্র আজকের বাংলাদেশের অবস্থাটিও প্রায় সামগ্রিক ভাবেই প্রতিফলিত করবে সন্দেহ নাই।—

'বাংলার আকাশে দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে চারদিক থেকে ঘনঘোর ক'রে।

'একদা রাজ-দরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী— কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে

হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা।

'আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সঙ্কুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এদিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।' ইত্যাদি—

আর সে অবস্থারই প্রতিকারকল্পে, অবস্থার দৈন্যে ও অশিক্ষার গ্লানিতে বাঙালী যাতে একেবারে অবলুপ্ত না হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর পল্লী-উন্নয়ন সংস্থা 'শ্রীনিকেতনের' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

সেখানে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে, কৃষি বস্ত্রশিল্প রেশমশিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে, সমবায়-প্রথা বিনিয়োগ ক'রে, সেদিন সমাজ-শিক্ষার বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য বিদেশ থেকে বারে বারে তাঁকে অর্থভিক্ষা করতে হয়েছিল, অভিজ্ঞ কর্মীদের আমন্ত্রণ ক'রে আনতে হয়েছিল এবং এদেশ থেকেও কতিপয় বিশিষ্ট কর্মী সংগ্রহ করতে হয়েছিল। অথচ তিনি কবি, তিনি শিল্পী—কল্পনার অবারিত আকাশই তাঁর বিচরণভূমি। সমবায়-প্রথায় কৃষিকার্য-পরিচালনার বা ধনাগার গড়ে তুলবার অতি প্র্যাক্‌টিক্যাল কাজ তাঁর করবার কথা নয়।

আজ সেখানে গেলে দেখা যাবে যে, পল্লী-উন্নয়নের যে-সকল আধুনিক পরিকল্পনা বাস্তবে কার্যকরী করবার চেষ্টা হচ্ছে এদেশে—সেগুলির বহুলাংশ ঐ শ্রীনিকেতনের কর্মধারার অনুকরণেই রচিত ও গ্রথিত।

সমাজশিক্ষা-সম্পর্কে আর একটি দূরপ্রসারী প্রস্তাব সে-সময় তিনি দেশের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। যাতে অল্পব্যয়ে ও অল্পসময়ে শিক্ষার আলোক অগণিত অশিক্ষিতদের গৃহে গৃহে পৌঁছাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাঁর যে প্রস্তাব ছিল:

'একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষা-পাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ আসে, সুযোগ হয়। যার যেটি প্রবণতা, মাতৃভাষার সহজ ও স্বাভাবিক মাধ্যমে সেইদিকে সে নিজের যোগ্যতার ও অধিকারের পরিচয় দিক এবং তাতেই সমাজের কাছে বিশিষ্ট সম্মান সে লাভ করুক।'

এ-জাতীয় পরীক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করুক এবং মাতৃভাষার স্বাভাবিক মাধ্যমে এটি গৃহীত হোক—এই ছিল তাঁর আবেদন।

'বাংলা যার ভাষা, সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন ক'রে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে, শস্যে; সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক। যুগশিক্ষার উদ্‌বেগ-ধারা বাঙালী চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্তপথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুইকূল জাগুক পূর্ণচেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।'

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতনের কথা প্রসঙ্গতঃ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আজ বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগের খ্যাতিও বহুবিশ্রুত।

একদা বোলপুরের তৃণহীন রুক্ষপ্রান্তরে যুগল সপ্তপর্ণীর ছায়াতলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনবেদী স্থাপন করেছিলেন। কালে তাঁরই সস্নেহ লালনে সেখানে একটি ক্ষুদ্রায়তন আশ্রম গড়ে ওঠে। তারপর দীর্ঘকাল সেখানে বিশেষ কিছু হয়নি। সমগ্র স্থানটি প্রায় জনশূন্য অবস্থাতেই পড়েছিল।

পরে যথাকালে সেই আশ্রমক্ষেত্রে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যেদিন তাঁর কাছে উত্থাপিত হয়েছিল, সেদিন প্রসন্ন অন্তরে সে প্রস্তাবকে তিনি সমর্থন করেছিলেন, আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। সেটা ১৯০১ খৃঃ কথা। শান্তিনিকেতনের সেই প্রতিষ্ঠা-বৎসর। তার ইতিহাসের আরম্ভও সেখান থেকেই। কিন্তু তার শৈশব ও কৈশোর যুগের দিনগুলি অতি বিচিত্র ও মধুময় ছিল। সে-সব দিনে কবি যে কেবল নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় তাকে বর্ধিত করতেন বা সজ্জিত করতেন, তাই নয়—পরন্তু শিক্ষকতার কাজে আত্ম-নিয়োগ ক'রে সে বাণীপীঠে মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও মহিমময় সম্বন্ধসূত্র স্থাপন করতে প্রয়াসী হতেন। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্তিতে সে শিক্ষা-নিকেতন সর্বদা উদ্ভাসিত থাকত, তাঁর আনন্দময় উপস্থিতিতে শিক্ষার একান্ত অনুকূল এক দুর্লভ ও মধুময় পরিবেশ সেখানে গড়ে উঠত। সে বস্তু আমাদের এ মাটির পৃথিবীর স্থূলতার মধ্যে খুব সুলভ নয়। এই শান্তি-নিকেতনেই বোধ করি 'স্কুলে স্বায়ত্তশাসন'-প্রথার প্রথম প্রবর্তন ও পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ১৯০৫ খৃঃ।

অতঃপর আরও বিশ-বৎসরকাল উত্তীর্ণ হ'ল এবং 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' এক বিশ্বমিলন-ক্ষেত্ররূপে বিশ্বভারতীর জন্ম হ'ল :

'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে।'

এই সুর সেখানকার আকাশে ধ্বনিত হ'ল। —'সেখানে আত্মার সঙ্গে বিশ্বের, কর্মের সঙ্গে ধ্যান ও আনন্দের, শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির নিবিড় সম্বন্ধ' স্থাপিত হবে। দেশ-বিদেশের মনীষিবৃন্দ সমবেত হবেন জ্ঞান ও বিদ্যার আদান-প্রদানের জন্য, বিশ্ব-মিলন-বিহার রচনা করবার জন্য। এই স্বপ্নের বাস্তব-রূপায়ণ হ'ল বিশ্বভারতী।

সেদিন অর্থের অপ্রাচুর্য ছিল, কর্মীর অভাব ছিল, জনসাধারণও বিশেষ উৎসুক ছিল না। তথাপি কবি অগ্রসর হয়েছিলেন গভীর আশা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

উত্তরজীবনে যখন রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সে-দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ-রত ছিলেন, তখন নানা চিঠিপত্রে যে-কথা পুনঃপুনঃ প্রকাশ করেছিলেন, সে-কথাগুলিই যেন তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক যুগে তাঁর অন্তরে প্রবল প্রেরণা জুগিয়েছিল।

'টাকা কম হ'লে চলে—যদি বুদ্ধি থাকে, যদি নিজের উপর ভরসা থাকে।'…

'এখানকার (রাশিয়ার) শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম—তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম! আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে, টাকা খুঁজতে হয় তত বেশী ক'রে।'…ইত্যাদি

আবার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রায় সমসাময়িক কালেই ব্যাবহারিক শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর পল্লী-উন্নয়ন সংস্থা—শ্রীনিকেতন, যার কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।

সেখানে উন্নত কৃষিপ্রণালী থেকে চামড়ার কাজ, তাঁতের কাজ, রঙের কাজ প্রভৃতি শেখাবার যেমন ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল, তেমনি সমবায়-পদ্ধতিতে পল্লীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, স্থানীয় শিল্পের উদ্ধার প্রভৃতির পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল। এই শ্রীনিকেতন কবির অন্যতম ধ্যানের বস্তু ছিল। দেশের স্বার্থের দিক থেকে এ-প্রতিষ্ঠানটির আত্যন্তিক প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। এক সময়ে ইওরোপের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন ক'রে এসে শ্রীনিকেতনের এক বাৎসরিক উৎসবে তিনি বলেছিলেন:

একদা আমাদের পল্লীসমূহে নানা বিভেদ সত্ত্বেও—'সকলের সুখ-দুঃখের উপর সকলের দৃষ্টি ছিল। পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত একটা জীবনযাত্রা তারা তৈরী ক'রে তুলেছিল। পূজা-পার্বণে আনন্দ-উৎসবে তারা নানা রকমে মিলিত হয়েছে।...তখন এই পল্লীই ছিল মুখ্য, শহর ছিল গৌণ।

'যাঁরা বিশিষ্ট পদে কাজ করতেন বিদেশে, তাঁরাও পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করতেন। তাঁদের উপার্জিত অর্থ তাঁরা পল্লীতে নিয়ে আসতেন। সেই অর্থে টোল চ'লত, পাঠশালা ব'সত, রাস্তাঘাট হ'ত, অতিথিশালা, যাত্রা পূজা-অর্চনা প্রভৃতিতে গ্রামের মনপ্রাণ এক হয়ে মিলত।'

এখনকার তুলনায় হয়তো অনেক অভাব-অভিযোগ তখনকার পল্লীজীবনে ছিল। হয়তো আধুনিকতার অনেক উপকরণই সেকালের পল্লী-অঞ্চলে দুর্লভ ছিল। কিন্তু তখনকার পল্লীজীবনে একটি সম্পদ ছিল, যেটি আজ আর নেই; সেটি 'আত্মীয়তা'।—সেই মহামূল্য লুপ্তপ্রায় সম্পদটির পুনরুদ্ধার-কল্পে কবির মনে একটি সদ্যোজাগ্রত সংকল্প ছিল, নিরলস প্রয়াস ছিল। সেইজন্য সমগ্র ভারত-ভূখণ্ডের পল্লী-অঞ্চলের কোটি কোটি নরনারীকে উদ্দেশ করেই তিনি এক সময়ে বলেছিলেন:

'আমাদের দৈন্য দুর্বলতা আত্মাবমাননা ভারতবর্ষের বুকের উপর প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে! আর সকল দেশ এগিয়ে চলেছে, আমরা অজ্ঞানে অশিক্ষায় স্থাবর হয়ে পড়ে আছি। এ সমস্তই দূর হয়ে যাবে যদি আমরা নিজের শক্তি-সম্বলকে সমবেত করতে পারি।'

শ্রীনিকেতনে তাঁর সেই শক্তি-সমবায়েরই সাধনা ছিল।

প্রবন্ধের কলেবর আর দীর্ঘ ক'রব না। শিক্ষার বিবিধ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গভীর চিন্তা ও মনীষা, দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধি ভাবীকালের জন্য যে সুস্পষ্ট নির্দেশ চিহ্নিত ক'রে গেছে—বর্তমান প্রবন্ধে তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় অল্পপরিসরে দিতে চেষ্টা করেছি। তাঁরই উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি—এ-কথা বলতে চেয়েছি যে, শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কেই তাঁর উদ্বেগ ছিল সর্বাধিক এবং সে-উদ্বেগের স্বাক্ষরও রয়েছে তাঁর বহু পত্রে, প্রবন্ধে, ভাষণে এমন কি একাধিক পদ্যরচনার মধ্যেও।

আজ দেশে বহু-বিস্তৃত পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষা-প্রসার ও শিক্ষা-সংস্কারের যে বিপুল আয়োজন চলেছে—তার পথে পথে ক্ষণে ক্ষণেই নানা সমস্যা, নানা সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, হয়তো আরও দেবে।

সেই সকল সঙ্কট-মুহূর্তে এই দূরদর্শী মহাকবির সুচিন্তিত এবং প্রাচীনতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে গ্রথিত অভিমতগুলির দিকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপাত করলে আমরা জাতিহিসাবে উপকৃত হবো, শিক্ষাব্রতিগণ প্রেরণা লাভ করবেন এবং পথের নির্দেশ পাবেন—এই আমাদের বিশ্বাস।

অতি অল্পদিন পূর্বে কোন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ একটি ভাষণে এই মন্তব্য করেছিলেন যে, শান্তি-নিকেতন ও বিশ্বভারতীর ভাবধারা যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অনুস্যূত হ'ত, তবে আমাদের বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এ-উক্তির কোন বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়নি, বক্তাও দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু মনে হয়, তিনি এ-কথাই সেদিন বলতে চেয়েছিলেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পুনঃপুনঃ যে সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছিলেন এবং যে-মতের বাস্তব রূপায়ণের জন্যই তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির জন্ম—সেই মতটি যদি আমরা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারি, যদি অনুধাবন করতে পারি মানুষের উপর তাঁর অনন্ত বিশ্বাস :

বিরাজে মানব-শৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে অমরজয়ী প্রভু।
অজেয় আত্মার রশ্মি তারে দিবে সীমা,
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন সে তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবন-জয়-লিখা।

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তিমূলে এ-বাণীর রসধারা যদি যথাযথ সিঞ্চন করতে পারি—তবে পরম কল্যাণের পথ অবশ্য আমরা খুঁজে পাবো। দেশের নিজস্ব সম্পদে অবশ্য আমরা শ্রদ্ধাবান্ হ'তে পারবো, অথচ জ্ঞান আহরণের কোন বাতায়ন আমাদের সম্মুখে রুদ্ধ হবে না।

তখন প্রভাত-সূর্যের প্রথম আবির্ভাবের দিকে মুখ তুলে দৃঢ়চিত্তে ও অটল বিশ্বাসে এ-প্রার্থনা আমরা নিবেদন করতে পারবো—যেমন একদা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন ঋষি-কবি :

হে বিধাতা,
দূর করো চিত্তের দাসত্ব-বন্ধ
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মান-মর্যাদা বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।

তবেই আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা সার্থকতার পথ পাবে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-স্বপ্ন সত্য হবে, সফল হবে।

বিবেকানন্দ

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ।

বছরের প্রথম। লণ্ডন শহর তখন কুয়াশা আর বরফে সমাচ্ছন্ন। এমনি দিনে এক তরুণী লণ্ডন শহরের বাইরে একটি বস্তির ছেলে-মেয়েদের পড়াতে যাচ্ছিল।

যেতে যেতে ভাবছিল, কেন এই মানুষের জীবন? কোথায় এর আরম্ভ, আর কোথায় এর শেষ? এ কি কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, না মানুষ সেই জীবন নিয়ে কিছু নতুন খেলা খেলতে পারে? এই পৃথিবীতে আসা, আবার এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া—এর ভেতর কী এমন গভীর রহস্য আছে, যা আমরা আজও আবিষ্কার করতে পারছি না!

এর জবাব খুঁজতে গিয়ে মেয়েটি একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। খুঁজছিল এমন একটি মানুষকে, যিনি তাঁকে এই তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতে পারেন।

সেই সময় এই কুমারী তরুণী শুনলে—ভারতবর্ষ থেকে এক অপরূপদর্শন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনি হয়তো বা এর জবাব জানেন।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মার্গারেট একদিন দেখা করতে গেল সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

সন্ন্যাসী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায়।

ঠিক যেন একটি বিদ্যালয়ের ক্লাস।

মার্গারেট শুনছিল তন্ময় হয়ে। সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করছিলেন দর্শনের জটিলতম সমস্যা। বিশ্বের আর মানবজাতির ইতিহাসের মূলতত্ত্ব তিনি এমন সরল প্রাঞ্জল ভাষায় ব'লে যাচ্ছিলেন—এমন উদাত্ত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর—মার্গারেটের মনে হ'ল এমনটি সে জীবনে কখনও শোনেনি। অনেক পণ্ডিতের—অনেক মহামনীষী ব্যক্তির বক্তৃতা সে শুনেছে, কিন্তু সে-সব মনে হয়েছে যেন বই মুখস্থ ক'রে বলা। আর এই সন্ন্যাসীর প্রতিটি কথা যেন তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ পরম সত্য।

মার্গারেটের সেদিন হ'ল এক বিচিত্র অনুভূতি!

পরাধীন ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসী তাদের সম্রাটের রাজধানী লণ্ডন শহরের বুকের ওপর বসে বলে কিনা, 'তোমরা তোমাদের এই লণ্ডন শহরকে বলো পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর। বলতে পারো এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?'

তরুণী নোবল্ ব'লে উঠেছিল, 'আপনি কি বলতে চান—আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব নিরর্থক?'

বজ্রকণ্ঠে সন্ন্যাসী ব'লে উঠলেন, 'তোমাদের সে গর্ব আর অহঙ্কারের জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।'

—কেন? লজ্জিত হবো কেন?

—জগতের হাজার হাজার শহরের আলো নিবিয়ে দিয়ে তোমরা জালিয়েছ এই আলো। এ জৌলুসের পেছনে আছে তোমাদের দস্যুবৃত্তি!

তরুণীর দৃপ্ত অহঙ্কারে আঘাত লাগে। কিন্তু কথাটা সত্য ব'লে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

বক্তৃতা শেষ হতেই সন্ন্যাসী সেই তরুণীর সামনে এসে হাত তুলে আশীর্বাদ করেন, 'মাই চাইল্ড, তোমরা ইংরেজ; ছোট্ট একটি দ্বীপে

বাস কর, তাই তোমাদের চোখের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। চোখ তুলে একবার বিরাট বিশ্বের দিকে তাকাও—বিশ্বের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দ্যাখো—যা সত্য, তাই দেখতে পাবে।'

সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'My child !'

তরুণীর ক্ষুব্ধ অন্তর শান্ত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। নিমেষেই মনে হয়েছিল—কে যেন তার সারা দেহে স্নেহকোমল একটি স্পর্শ বুলিয়ে দিলে!

মার্গারেটও চিনেছিল সন্ন্যাসীকে, ব'লে উঠেছিল—'My Master !'

সেই দিন সেই পরম মুহূর্তে এই দু-জনের মধ্যে এমন একটি বিচিত্র সুন্দর সম্পর্কের জন্ম হ'ল—জগতের ইতিহাসে যা সত্যই দুর্লভ!

মার্গেরেট নোবলের মধ্যে জন্মালো এক মহীয়সী নারী—'ভগিনী নিবেদিতা' নামে যিনি সুপরিচিতা। আর এই বীর সন্ন্যাসী আমাদের বিবেকানন্দ!

কলকাতার ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মনে জেগেছে জিজ্ঞাসা—জীবন-জিজ্ঞাসা। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে একদিন ব'লে উঠলেন—কোথায় ভগবান্? আমি বিশ্বাস ক'রব না—যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ না আমাকে দেখিয়ে দেবে, পরিচয় করিয়ে দেবে তাঁর সঙ্গে।

কিন্তু কে দেখিয়ে দেবে?

এত বড় দুঃসাহস কার?

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভবতারিণীর পূজারী এক অশিক্ষিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁকে বুকে টেনে নিলেন; বললেন, 'আয় আমার কাছে, আমি দেখিয়ে দেবো।'

দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই পতিত-পাবন, সেই কাঙালের ঠাকুর—সর্বজনমানবের আপনজন শ্রীরামকৃষ্ণ।

দেখিয়ে দিয়েছিলেন—অন্ধ-তমসার পরপারে চিরদীপ্যমান বহ্নিবর্ণ সেই জ্যোতির্ময় পরম-পুরুষকে।

আত্মদর্শন হ'ল নরেন্দ্রনাথের।

নরেন্দ্রনাথ হলেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ বললেন: সোঽহম্! আমিই সেই। বললেন, ভগবানকে পাওয়া যায় না, ভগবান হওয়া যায়!

তারপর সেই সোঽহম্-মন্ত্রের উদ্‌গাতা স্বামী বিবেকানন্দ গেলেন আমেরিকায়, গেলেন ইংলণ্ডে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর রাইটের বাড়িতে তখন তিনি অতিথি হয়ে রয়েছেন। ডক্টর রাইট বললেন, 'তুমি চিকাগোতে যাও। সেখানে ধর্মমহাসভার আয়োজন হয়েছে। সেইখানে গিয়ে কিছু বলো।

বিবেকানন্দ বললেন, 'ওরা আমাকে সেখানে ঢুকতে দেবে না। আমি জেনে এসেছি। ওরা বলে, কে আপনি? আপনাকে চেনে কে?'

রাইট হেসে বলেছিলেন, 'তা হ'লে তারা যেন সূর্যকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি যে আকাশে আলো দেবে, তোমাকে চেনে কে? কোথায় তোমার বাড়িঘর, এর আগে কোথায় কোথায় আলো দিয়েছ, এত বড় আকাশে তুমি আলো দিতে পারবে কি? তুমি সেই সূর্যের মতোই স্বপ্রকাশ। তোমার পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই।'

তাই হ'ল। বিবেকানন্দ গিয়ে দাঁড়ালেন শিকাগোর সেই ধর্মমহাসভায়। গিয়ে দাঁড়ালেন সেই দীপ্তবিশালনেত্র প্রশান্ত পুরুষ তাঁর সেই আশ্চর্য সুন্দর পোষাক পরে। পরনে গৈরিক আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি। দুই চোখ

প্রেমে পরিপূর্ণ, বীর্যে আর মাধুর্যে দীপ্যমান সর্বদেহ, পবিত্র সুন্দর মুখচ্ছবি, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ !

বললেন—সিস্টার্স এণ্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা !

মাত্র দুটি কথা—'Sisters and brothers of America' ! কী অভূতপূর্ব সম্মোহিনী শক্তি ছিল সেই কণ্ঠস্বরে, উদ্বেল জনতা তাঁকে অভিনন্দিত ক'রে উঠল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলো ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠের সেই প্রদীপ্ত ভাষণ !

মাত্র পাঁচ মিনিট সময় পেয়েছিলেন তিনি। সেই পাঁচ মিনিট কাল যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল মহাকালের কালচক্রে।

'আমি এসেছি নিরন্ন দরিদ্র পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে। ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের কথা বলতে। পৃথিবীর আর সব ধর্মই নতুন, ভারতের হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। আর সব ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, হিন্দুধর্ম সনাতন। হিন্দুধর্ম সমস্ত ধর্মের জননী। হিন্দুধর্ম বলেছে—সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই মহান্। সব ধর্মই পৌঁছেছে ঈশ্বরের কাছে। যে-পথ দিয়েই হোক, সোজাই হোক, বাঁকাই হোক সব নদীই যেমন পড়েছে গিয়ে সমুদ্রে, তেমনি সব ধর্মই মিলেছে গিয়ে সেই এক বিরামস্থানে। এই কথাই বলেছেন আমার গুরু, আমার আচার্য—দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এমন সাধন নেই যা তিনি করেননি, এমন পথ নেই যে-পথে তিনি হাঁটেননি, কিন্তু সেই এক ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছেছে সব পথ। সব সাধনের সেই এক আস্বাদ। তিনিই বলতে পেরেছেন—যত মত তত পথ। মত ঈশ্বর নয়, পথ প্রাপ্তি নয়। পথ বিচিত্র, কিন্তু গন্তব্য এক। মত বিচিত্র, কিন্তু মানুষ এক, মানুষের ঈশ্বরও এক।'

আরও অনেক কথাই বলেছিলেন তিনি ধর্মমহাসভায়। সে-সব আজ ইতিহাসের বস্তু।

ডক্টর গ্রস্ম্যান বলেছেন: বিবেকানন্দ আমাদের কি শিখিয়েছেন ? শিখিয়েছেন ধর্ম শুধু চিন্তা নয়, ধর্ম কর্ম; ধর্ম জীবন্ত কর্ম। আমাদের শুধু ভাব আছে, কিন্তু সেই ভাবের শরীর নেই, কর্ম নেই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথা মুখে বলি, কিন্তু কাজের বেলা ভাইকে অপমান করতে কুণ্ঠিত হই না। আমাদের ঈশ্বর আকাশে, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটিতে। আমাদের ঈশ্বর সিংহাসনে বসে আছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের ঈশ্বর মাটি কাটছেন, চাষ করছেন, ধুলো পায়ে হেঁটে চলেছেন মাটির উপর দিয়ে। বিবেকানন্দের ঈশ্বর পৃথিবীর অণুতে পরমাণুতে, তৃণখণ্ডে, মানুষের হৃদয়স্পন্দনে—সর্বত্র।

তিনি বলেছেন: পাশ্চাত্যবাসী তোমাদের ধর্ম কোথায় ? কতক্ষণ ? তোমাদের ধর্ম রবিবারে—গির্জেয়, ঘণ্টাখানেকের জন্য। আর আমাদের হিন্দুদের ধর্ম প্রত্যহ, সর্বত্র, সর্বক্ষণ। নিখিল বিশ্বের অণুতে পরমাণুতে, প্রতিটি নিশ্বাসে, প্রতিটি মুহূর্তে। আর তোমরা এমনি নির্লজ্জ যে, আমাদের দেশে মিশনরী পাঠাও ধর্ম শেখাতে। ভারতবর্ষকে আর সবকিছু শেখাতে পারো, কিন্তু দর্শন শেখাতে যেও না, ধর্ম শেখাতে যেও না ! ভারতবর্ষের নিরক্ষর মজুরও জানে ধর্ম কাকে বলে। ধর্মজ্ঞান আছে বলেই সে অধর্মাচরণ করতে ভয় পায়। ভারতবর্ষের ভিখিরী দেহতত্ত্বের গান গেয়ে ভিক্ষে করে।

'দোহাই তোমাদের' বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমাদের দেশে তোমরা মিশনরী পাঠিও না। পাঠাও ইঞ্জিনিয়র। কলকারখানা তৈরি কর। কর্মহীনকে কর্ম দাও। নিরন্নকে অন্ন দাও।'

আমেরিকায় বিবেকানন্দকে বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল।

—দেশে তুমি থাকো কোথায় ?

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কখন পথে ঘাটে, কখন বাজারে বন্দরে, কখন বা শহরের ফুটপাথে।

—এতে তোমার কষ্ট হয় না ?

বিবেকানন্দ হেসেছিলেন। কষ্ট!

শ্রীরামকৃষ্ণ যার নিত্যসহচর, তার আবার কষ্ট কিসের ? এই ছ্যাখো না, তোমাদের ধর্মসভায় বক্তৃতা করবার আগের রাত্রে কনকনে শীতের মধ্যে রেলগাড়ির একটা ট্রাকের মধ্যে শীতে কুঁকড়ে রাত কাটিয়েছি। তার কোনও চিহ্ন দেখেছ আমার শরীরে কি মনে ?

লোকে জিজ্ঞাসা করেছে—তুমি খাও কি ?

—যখন যা জোটে, না জোটে তো খাই না।

—করো কি ?

—মাধুকরী।

—পয়সা নেই ?

—একটা কপর্দকও না।

আলখাল্লাটা ছুঁয়ে একজন বললে, এই বুঝি তোমাদের দেশের সাধুদের পোষাক ?

বিবেকানন্দ বললেন, এ তো তোমাদের দেশের। এ তো ভদ্র পোষাক। দেশে আমাদের গায়ে থাকে ছেঁড়া জামা আর নয়তো গায়ের চামড়া।

—জাত মানো ?

—মানি না। জাতটা ধর্ম নয়।

মেয়েদের একজন জিজ্ঞাসা ক'রে ব'লল, তুমি বিয়ে করোনি কেন ?

বিবেকানন্দ জবাব দিলেন, কাকে বিয়ে ক'রব ? সকল মেয়ের ভেতরেই যে আমার মা জগন্মাতাকে দেখি।

এমনি ছিলেন বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দ বলেছেন: তাঁরই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, যিনি ভগবানকে দর্শন করেন। কেবল তাঁরই সকল সংশয় ঘুচে যায়, যিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি আমাদের অতি নিকটতম—আবার দূর হতেও দূরবর্তী।

আমরা অনেক সময় নিরর্থক বাগাড়ম্বরকে আধ্যাত্মিক সত্য ব'লে ভ্রম করি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার ছটাকে গভীর ধর্মানুভূতি মনে করি। এত যে বিরোধ—এর কারণও শুধু তাই। যদি আমরা একবার বুঝতে পারি—প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রকৃত ধর্ম—তা হ'লে আমরা নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়েই জানতে পারবো—সে পথে আমরা কতখানি এগিয়েছি। তা হলেই আমরা বুঝতে পারবো—আমরা নিজেরাও অন্ধকারে ঘুরে মরছি আর শুধু ভাল ভাল কথা দিয়ে ভুলিয়ে অন্যকেও অন্ধকারে ঘুরিয়ে মারছি।

কেউ যদি ধর্মকথা শোনাতে আসে, তখুনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন—তুমি কি ঈশ্বর দর্শন করেছ ? আত্মদর্শন ?—প্রত্যক্ষ অনুভূতি ?

বিবেকানন্দ বলেছেন—আমার ইচ্ছে করে, জগতের প্রতিটি মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলি। ভারতে ধর্মের অর্থই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। তা না হ'লে তা ধর্মনামের যোগ্য নয়। 'এই মতে বিশ্বাস করলেই তোমার নিশ্চিত মুক্তি'—এ-কথা আমাদের কেউ কখনও শেখাতে পারবে না। তুমি নিজেকে যেমনটি তৈরি করবে, তুমি তাই হবে। তুমি যা, তা তুমি ঈশ্বরের কৃপায় এবং নিজের চেষ্টায় হয়েছ। সুতরাং কতকগুলি মতামতে বিশ্বাস করলেই তোমার কোন উপকার হবে না। ভারতের আধ্যাত্মিক জগৎ থেকেই এই মহা শক্তিশালী কথাটির সৃষ্টি হয়েছে—অনুভূতি। আর আমাদের

শাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র, যা বলেছে ঈশ্বরকে দর্শন করতেই হবে। ধর্মকথা শুধু শুনলে হবে না, তোতাপাখির মতো মুখস্থ করলে তো নয়ই, ধর্ম আমাদের ভেতরে প্রবেশ করা চাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণই হচ্ছে—ঈশ্বর-দর্শন।

অবশ্য কোন চালাকি দিয়ে ভেলকি বাজি দিয়ে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব নয়। তার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। নিজে ঈশ্বর-সদৃশ হ'তে হবে। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র আধার, ঈশ্বরাভিমুখী মন, নিরাসক্ত আনন্দময় সত্তা। এই কয়টি বস্তুর একান্ত প্রয়োজন। এই তো মানুষের স্বরূপ। মানুষ নিজের দোষে অন্ধকারকে ডেকে আনে তার চারিদিকে, তারপর সেই নিজেরই তৈরি অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজে না পেয়ে কেঁদে মরে।

অন্যায় অধর্ম লোভ এবং আসক্তির দিক থেকে নিজেকে যতই সরিয়ে আনতে পারবে, ততই তুমি নিকটবর্তী হবে ঈশ্বরের।

ঈশ্বর সব সময়েই তোমার সঙ্গে-সঙ্গেই রয়েছেন, হৃষীকেশ তোমার হৃদয়ের মধ্যে, পরম করুণাময় তিনি, সব সময় তোমার সব অপরাধ সব ভ্রান্তি ক্ষমা ক'রে চলেছেন, তবু তুমি তাঁর হাসি-হাসি প্রসন্ন মুখ দেখতে পাচ্ছ না? দেখবার চেষ্টা ক'রছ না। নিজের আমিটাকে মস্ত বড় ক'রে তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছ!

আমি

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

ধরি, মনে করি, ধরিতে না পারি,
আমার লুকানো আমিরে ;
মোর দেহ-মনে, যত দোষে গুণে,
নাহি পাই খুঁজে তাহারে।
সুললিত দেহ, সুন্দর গেহ,
যত পরিজন আমারি,
'সকলি আমার' বলি বার বার,
আমার 'আমি'রে না হেরি।
জননীর স্নেহে, পাতকীর দেহে
আমারে পাই যে দেখিতে।
দেখেছি আমার খেলা ফুলশরে,
তবু নাহি পারি ধরিতে।
মরণের শেষে ফেলে দেবে ত্রাসে
এ দেহ ঘরের বাহিরে,
বলিবে, 'এ কায়া, কেন মিছে মায়া?'
'আমি' নাহি তার ভিতরে।
ক্লান্ত আবেশে আসি অবশেষে
তোমারে হে প্রভু শুধাতে,
বলো, কেবা আমি হে হৃদয়স্বামি,
আমি পারি না আমায় বুঝিতে।
করুণা তোমার ঘুচায় আঁধার
জ্বালি দীপ হৃদি-আঁধারে,
দেখি, আমি আছি মিশায়ে সবেতে,
তবু নাহি পাই আমারে।
মুছে দাও মোর নয়ন-কাজল,
দাও গো বুঝায়ে আমারে,
কিবা পরিচয় তোমায় আমায়,
জীবন-নদীর এপারে।
আমি জলকণা, তুমি হে সাগর,
আমি আছি তব মাঝারে।
ভাঙিলে সে রূপ, নাহি কোন রূপ,
আমি, তোমাতে হারাই আমারে।
আমি কিছু নয়, হয় যে প্রত্যয়,
সব তুমি দিও বুঝায়ে,
দিও গো শান্তি, যতেক ভ্রান্তি
অন্তিমে মোর ঘুচায়ে।

এবারের পূর্ণকুম্ভ

[চলার পথে]*

'যাত্রী'

'হর হর মহাদেব শম্ভো, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে' এই গান গাইতে গাইতে ৪ঠা এপ্রিল অমাবস্যার দিন আমরা ক-জন চলেছি 'নিরঞ্জনী' দলের সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে। মিশনের বেশীর ভাগ সাধু অবশ্য গিয়েছিলেন 'নির্বাণী'দের দলে। দু-ধারে অগণিত জনতা শালবল্লার বেড়ার ও-ধারে আটকানো। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে আট-দশ হাত অন্তর। তাই ভক্তদের এবার কোন রকম সুবিধা নেই সাধুদের পায়ে পড়বার বা রাস্তায় কাপড় বিছিয়ে তাঁদের চরণধূলি সংগ্রহ করবার অথবা সাধুদের ক্ষণিক স্পর্শ করবার ব্যাকুলতাকে প্রশ্রয় দেবার। তবে ভক্তেরা ফুল ও পয়সা ছুঁড়েছেন সাধুদের লক্ষ্য ক'রে, কখনও হিন্দী বা সংস্কৃতে তাঁদের সশ্রদ্ধ আহ্বানও জানিয়েছেন। চলেছে এইভাবে প্রায় দীর্ঘ দু-মাইল পথ। নগ্নশির, নগ্নপদ, গায়ে ও পরনে একই কাপড় আর মুখে ঐ 'হর হর মহাদেব শম্ভো, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে'।

খানিক পাকা রাস্তায় চলে বালির পথে পা বাড়ালাম। মাথার উপরে তখনও সূর্য ছায়াহীন হননি। তাপমাত্রা মন্দ নয়—খালি পায়ে চলা যাদের অভ্যাস নেই, তাদের পক্ষে পায়ের নীচের তপ্ত বালি সুখপ্রদ নয়। তবে কেমন একটা ভাবে চলা যাচ্ছে তখন; তাই লিখবার সময় এ-কথা ভেবে যত দুঃখ পাচ্ছি, সত্যিকার চলার সময় এ-কথা মনে হয়েছে খুব কমই। পথের দু-ধারে সমবেত জনতার অভিনয় দেখার স্পৃহাও তখন ছিল না, তাই ও-বিষয়ে বর্ণনা দিতে গেলে কল্পনার পাখায় না উড়ে কোন উপায় ছিল না।

বহুলোকের একমুখী ভাবধারা যখন একই খাতে একই দিকে প্রবাহিত হ'তে থাকে, তখন এ একটা আপনভোলা তন্ময়তামাত্র। যেখানে 'আমি'টা প্রধান হয়ে ওঠে না, সবাইকে জড়িয়ে এক সামগ্রিক চেতনা তখন সকলকে চালিয়ে নিয়ে চলে। এমনি ক'রে ব্রহ্মকুণ্ডে পৌঁছে নগ্ন স্নান করতেও সেদিন কারও কোন দ্বিধা জাগেনি বরং সে-সময় লক্ষ লোকের চোখের মাঝে নিজেকে নির্জন ও একা বলেই মনে হয়েছে।

এর পরে ১৩ই এপ্রিল রামনবমী—চৈত্রসংক্রান্তির দিন পূর্ণকুম্ভের স্নানেও ঐ একই অবস্থা। তবে ঐদিন নির্বাণীদের দলেই গিয়েছি। লোকের ভিড় হয়েছিল ঐদিন অনেক বেশী আর পায়ের নীচের বালি ও মাথার উপরের সূর্যও বোধকরি একটু বেশী নির্মম হয়েছিল। আর স্নানের সময় কৌপীনমাত্র সম্বল করেই জলে নামায় লজ্জার প্রশ্ন মনেই ওঠেনি।

কত লোক-সমাগম হয়েছিল এবারকার হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে—১৩ই এপ্রিলের স্নানের দিন? মনে হয় কুড়ি থেকে পঁচিশ লক্ষ। আর সমবেত সাধুদের সংখ্যা হবে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার। সব জড়িয়ে কনখল থেকে সপ্তধারা পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ-ছয় মাইল স্থান জুড়ে তাঁবু, টিন ও খড়ের ঘরের এক বিরাট শহর গড়ে উঠেছিল হরিদ্বারে। আর ৩০শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত এই সাধুসমাজের কন্দরে কন্দরে প্রায় প্রতিদিন বিকেলে কি-জানি

এক নেশার ঘোরে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে যে পুণ্য-সঞ্চয় বা তথ্য-সংগ্রহের নেশা ছিল, তা নয়; কিন্তু কেমন এক আন্তর টানে সন্ধ্যায় পাখির গাছের ডালে ফিরে আসার অভ্যাসের মতো এদের মাঝে নীড় খুঁজেছি। সে নীড় খোঁজার কারণ কিছু ছিল কি—জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারবো না ঠিকই, তবে যে খুঁজেছি একথাও ঠিক।

বারে বারে মনে হয়েছে—ভারতের জাতীয় জীবনের অখণ্ড প্রাণসত্তাটি এই দেবতাত্মা হিমালয়ের বুকেই আজ স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণসত্তা স্বাভাবিক। এর মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। সকলেই এসেছে এখানে নিজের টানে—instinctively. না এসে পারেনি, তাই এসেছে। তা না হ'লে এখানে কাউকে কোন নোটিশ দিতে হয়নি—এ সম্মেলনের কোন স্বনামধন্য 'আহ্বান-কর্তা'ও ছিল না। তবু কি এক টানে ভিক্ষুক থেকে মহারাজা পর্যন্ত ছুটে এসেছে। ট্রেনে আসার কোন সুবিধা ছিল না। বাসে আসার দুর্ভোগের অভাব ছিল না—থাকার আরাম ছিল না, খাদ্যেরও প্রাচুর্য ছিল না। তবু বিভিন্ন ভেদ ও বৈচিত্র্যে ঘেরা লক্ষ লক্ষ লোক তাদের বৈষম্য হারিয়ে মাসাধিক কাল আনন্দ প্রীতি ও ধর্মপ্রাণতা নিয়ে এক মহাসমন্বয়ের মধ্যে কেমন কাটিয়ে দিয়ে গেল! কাটিয়ে দিয়ে গেল প্রাদেশিকতা ভুলে, ভাষা-বিদ্বেষ ভুলে, শূদ্র-ব্রাহ্মণত্ব ভুলে। তাই বার বার মনে হয়েছে স্বামীজীর কথা: ভারতবর্ষের প্রাণ ধর্মের কৌটায় নিহিত রয়েছে। আর এই ধর্ম যে কি, তাও এরা বিচার করেনি। তা হ'লে কি আর শৈব বৈষ্ণব শাক্ত সৌর গাণপত্য প্রভৃতি একই স্থানে, একই স্নানে ছুটে আসতে পারত? শুধু কি তাই, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে একদলের সঙ্গে অন্যদলের মুখ-দেখাদেখি নেই, তারাও আজ একই পথে একই উদ্দেশ্যে চলেছে। তাইতো দেখলাম শত শত সাধুদের আখড়া ও ছাউনির মধ্যে শতশত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদের। দেখলাম গিরি পুরী ভারতী সরস্বতী—দশনামী দণ্ডী পরমহংস, নাগা, আলেখিয়া, দণ্ডলী, অঘোরী, ঠিকরনাথ, লিঙ্গায়ৎ, রামাইৎ, দাদুপন্থী, সেনপন্থী, মধ্বাচারী, বল্লভাচারী, কর্তাভজা, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সাখিনী, সহজী, করারী, ভৈরবী, নিরঞ্জনী, টহলিয়া, নানকপন্থী উদাসীদের ও নির্মলী শিখদেরও। আর এঁরা যে চুপ ক'রে ছিলেন, তাও নয়; কত সভাসমিতি, ধর্মোপদেশ, কত পূজা-পাঠ যাগযজ্ঞ জড়িয়ে একটা ধর্মপ্রাণতার বন্যা সমস্ত তীর্থক্ষেত্রটিকে উদ্বেল ক'রে রেখেছিল। সাংসারিক জীবনের দেনা-পাওনা ভুলে সকলেই এক অব্যক্ত ধর্মভাবে পুলকিত হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই মনে হয় কুম্ভে যাওয়া উচিত কেবল পুণ্যার্জনের জন্যই নয়, ভারতাত্মাকে সঠিক বুঝে নেবার জন্য। এখানে তাই অনায়াসে আস্তিক ও নাস্তিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক, সমাজপন্থী ও ঔপন্যাসিক আসতে পারেন—নিজের মনের খোরাকের প্রাচুর্য স্ব-স্ব ভাবে আস্বাদন করতে।

হরিদ্বারে কুম্ভস্নানের সময় হ'ল:

পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশি গতে গুরো
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ।

অর্থাৎ বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে এবং সূর্যদেব মেষরাশিতে এলে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভযোগ

হয়ে থাকে। তেমনি বৃহস্পতি মেষরাশিতে এবং চন্দ্র-সূর্য মকররাশিতে এলে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) কুম্ভমেলা হবে। নাসিকে হবে বৃহস্পতি ও সূর্য উভয়ে কুম্ভ (?) রাশিতে এলে আর উজ্জয়িনীতে হবে সূর্য মেষরাশিতে ও বৃহস্পতি সিংহরাশিতে থাকার সময়ে।

কুম্ভমেলা বহু প্রাচীন মেলা। তবে মনে হয় আদি-শঙ্করাচার্যের পর, প্রায় এক হাজার পূর্বে এই যোগে সাধু-সন্ন্যাসীদের সমাবেশ করানো আরম্ভ হয়। ফলে তীর্থের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হ'তে থাকে। কথায় আছে—'তীর্থীকুর্বন্তি সাধব:'—সাধু-মহাপুরুষরা এসেই তীর্থে পবিত্রতা দান করেন। তা না হ'লে ভূ: ভুব: স্ব:—এই তিন লোকে প্রয়াণ-বাসনা যাঁরা ত্যাগ করেছেন, তাঁদের আবার কিছু পাবার আশা কোথায়? আর এই কনখলে ('খল: কো ন'—যেখানে কেউ খল নেই, সেই কনখলে) এই স্বাভাবিক উন্মাদনার পেছনে দেনা-পাওনার ভাব আসে কি ক'বে?

হরিদ্বারে স্নান ব্রহ্মকুণ্ডেই হয়ে থাকে। গঙ্গার একটি ধারা এই কুণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। শোনা যায়, এই কুণ্ডে প্রজাপতি ব্রহ্মার যজ্ঞকালে স্বয়ং বিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর পুরাণে আছে: হিমালয়ের উত্তরে দেবাসুর মিলে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন, তাঁদের মন্থন-দণ্ড হলেন মন্দর-পর্বত আর দড়ি হ'ল বাসুকি-সর্প। আর স্বয়ং বিষ্ণু কূর্মরূপ ধরে মন্দরকে পিঠে ধারণ ক'রে রাখলেন। এই মন্থনের ফলে একে একে নানা সম্পদ লাভ হ'তে লাগল। প্রথমে পাওয়া গেল পুষ্পকরথ, তারপরে ঐরাবত হাতী, তারপর পারিজাত ফুল, তারপর কৌস্তুভ মণি, লক্ষ্মী ও সুরভি ধেনু এবং সর্বশেষে অমৃত-কুম্ভ নিয়ে উঠলেন ধন্বন্তরি। তিনি এই কুম্ভ দেবরাজ ইন্দ্রের হাতে দিলেন। ইন্দ্র তাঁর পুত্র জয়ন্তকে দিলেন। জয়ন্ত সেই কুম্ভ নিয়ে যখন স্বর্গের দিকে পালাতে থাকেন, তখন দৈত্যাচার্য শুক্র দৈত্যগণকে তা কেড়ে নিতে বলায় বার-দিন ধরে দেবাসুরে ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধের সময় দেবতারা পৃথিবীর যে চারটি স্থানে (নাসিক, উজ্জয়িনী, প্রয়াগ ও হরিদ্বার) ঐ কুম্ভ লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেখানেই এই কুম্ভযোগ হয়েছে। দেবতাদের বার-দিন মানুষের বার-বছরের সমান, তাই প্রতি বার-বছরের শেষে এক এক জায়গায় পূর্ণকুম্ভ মেলা হয়।

কুম্ভের পৌরাণিক গল্পাংশ একদিন এক সাধুদের আশ্রমে ভাণ্ডারায় গিয়ে নানান পুতুলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিকৃত দেখলাম। মন্দর-পর্বতের সঙ্গে আধুনিক বৈদ্যুতিক শক্তির যোগাযোগে মন্দর-পর্বতকে বিঘূর্ণিত হ'তে দেখলাম এবং একদিকে অসুররা বাসুকির মুখের দিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়াতে মুহ্যমান হয়ে এবং বাসুকির লেজের দিকে দেবতাদের হাসিমুখে সমুদ্র মন্থন করতে দেখলাম। তার নিকটে মন্থন থেকে উত্থিত সম্পদ একে একে প্রদর্শিত। একদিকে ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত অমৃত-কুম্ভ নিয়ে পালাচ্ছেন দেখানো হয়েছে। সব মিলিয়ে এই প্রদর্শনী বেশ বাস্তব হয়েছে।

এবারে পূর্ণকুম্ভে এসে বহু সাধুদের আখড়ায় গিয়েছি। দেখেছি তাদের নানা সাধনা ও নিষ্ঠা। দেখেছি তাদের বিভিন্ন পূজা ও পদ্ধতি। এক একটি সাধু-ভাণ্ডারায় প্রায় চার-

পাঁচ হাজার সাধুদের সঙ্গে একত্র আহার করেছি এগারদিন। লাড্ডু, পুরী, কচৌরী, বালুসাই, জিলাবি—এই সব খাদ্য পরিবেশনের রীতিও চমৎকার। লাড্ডু-পরিবেশনকারী ব'লে চলেছেন—'লাড্ডুরাম', জলদানকারী বলছেন 'জল-ভগবান্', লবণ-পরিবেশন চলছে 'রামরস' ব'লে। সব তাতেই ঈশ্বরের নাম জড়িয়ে আছে।

সাধুদের রীতি-নীতির বিভিন্নতাও কত রকমের। কেউ নগ্ন রয়েছেন, কেউ কোমরে একগাছি দড়ার সঙ্গে একখণ্ড কাপড় বেঁধে কৌপীন করেছেন, কেউ কাঠের বন্ধনী লাগিয়ে তাতে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে কৌপীন এঁটেছেন। কেউ লোহার শেকলে কোমর জড়িয়ে তাতে ইস্পাতের বা রূপোর পাত বস্ত্রখণ্ডের মতো ক'রে লেংটি করেছেন। কেউ ঊর্ধ্ববাহু, কেউ কণ্টকশয্যায় শায়িত, কেউ গলা পর্যন্ত জলে নেমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জপ ক'রে চলেছেন। কেউ বা চারদিকে অগ্নি জ্বালিয়ে তার মধ্যে বসে ধ্যান করছেন। কেউ মৌনী, কেউ বা গায়ক, আবার কেউ বা উপদেশ দিচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে মেশবার সময় কাউকে তাঁদের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছি—কারও সাথে বা আলোচনা করেছি, কারও সাথে তর্কও। মিশনের পরিচয় দেওয়ায় কেউই আমার প্রতি বিমুখ হননি। শ্রীরামকৃষ্ণের উদারতার বাণী এঁদের মধ্যেও পৌঁছেছে, মিশনের নিঃস্বার্থ সেবাময় কর্মযোগ এঁরা স্বীকার করেছেন। তাই সর্বত্রই আমাদের অবারিতদ্বার। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে আমরা, তাই স্বচ্ছন্দে নির্মলী, নিরঞ্জনী, উদাসী, জুনা, নির্বাণী বা বৈরাগীদলে ঘুরে বেড়াতে পেরেছি। এঁদের অনেকের অন্তরের ছোঁয়াচও আমাকে আনন্দ দিয়েছে।

সাধারণে অনেক সময় না বুঝে প্রশ্ন করেছে—'নাগারা যখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ, তখন তারা নিশ্চয়ই সব কামজয়ী? উত্তরে বলেছি—'জলুস্' বেরোবার আগের দিনও যে প্রায় চারশত গৃহীকে এক সাধুসম্প্রদায় নাগা ক'রে প্রসেশনের সঙ্গে পাঠালেন, তাদেরও কি তাই বলবেন? কিংবা ঐ যে বৃদ্ধ গত বছর সংসার ত্যাগ ক'রে তাঁর দীর্ঘ সাদা দাড়িতে প্রবীণত্বের ছাপ নিয়ে চলেছেন, তাঁকে বলবেন প্রবীণ সন্ন্যাসী? তাই এই ঝুটা ও সাঁচ্চার মধ্যে কোন্‌টা ঠিক, তা বুঝতে হ'লে জহুরী হ'তে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—যে কোন-দিন শুঁড়িপাড়া দিয়েই গেল না, সে কি বুঝে নিতে পারবে এক বোতল মদে কতখানি নেশা হয়। তাই বিচার দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে কুম্ভের সমাগমকে বিচার করলে হবে না। হৃদয় দিয়ে বিচার করতে হবে। ভারতাত্মার প্রাণস্পন্দন তা হলেই ধরা পড়বে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

তাই বলি কুম্ভমেলা—স্ব-স্ব অন্তরের কুম্ভে প্রবেশ ক'রে নিজেকে দেখবার মেলা। কুম্ভের বাহিরে তাকিয়ে শিল্পমেলা (Industries fair) দেখবার মতো জিনিস নয় এ। তাই ভারতের বেদবাণীর সেই পুরাতন কথা 'আবৃত্তচক্ষুঃ' অর্থাৎ বাইরের দেখা বন্ধ ক'রে যে দেখে, সেই দেখার মাধ্যমেই পাবে এই মেলার রহস্য। তা না হ'লে নাগা সাধুর প্রশেসন দেখে মুখ সিঁটকে আধুনিক সভ্যতার রংকরা মন নিয়ে বলতেই হবে—ন্যাস্টি। বলতেই হবে, এটা এক আদিম বর্বরতার চিহ্নমাত্র।

তাই বলি, শিশুর সহজাত উলঙ্গ স্বাভাবিকতায় মনটাকে রাঙিয়ে এই মেলায় এস তুমি পথিক। এস বুদ্ধিমত্তার বিজয়-কেতন ফেলে, অসীম উদারতায় ভরপুর হয়ে স্বার্থহীন নির্মল মনটিকে নিয়ে। তা হলেই সার্থক হবে তোমার কুম্ভমেলায় আসা। অমৃত-কুম্ভের আস্বাদনে তখনই পাবে যথার্থ অমৃতত্বের স্বাদ—তখনই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে তুমি হবে মৃত্যুঞ্জয়ী—এই শুদ্ধ মন নিয়েই পরের কুম্ভে পা বাড়াও পথিক। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

সাধনার শেষে

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

সাধনা-কুঞ্জে চারিদিকে আজ মোর আনন্দ-বেড়া ;
ইঁটের প্রাচীর-কোলে আনারস, তরু সারি দিয়ে ঘেরা।
তারি ফাঁকে ফাঁকে করবী, রঙন, জবা ও গন্ধরাজ ;
লাবণ্যমাখা নব পল্লবে বাড়িছে সকাল-সাঁঝ।
মাধবী রচেছে সুচারু তোরণ শুভ্র কুসুমে তার ;
ফুলে ফুলে বসে অযুত ভ্রমর ঘুরে ঘুরে বার বার।
গুন্-গুন্-স্বরে শুনি যেন কার নূপুরের ধ্বনি কানে ;
পবন হেথায় মুক্ত হস্ত দিব্য গন্ধ দানে।
অদূরে আম্র-শাখায় বসিয়া মধুর কণ্ঠে পিক ;
প্রভাত না হ'তে মুখরিত ক'রে তোলে যে চতুর্দিক।
উৎসুক প্রাণে সেই ভোরে জাগি' দ্বার খুলে হেথা আসি ;
মধু-মালতীর প্রতিটি স্তবকে হেরি ফুল রাশি রাশি।
পুলকের সীমা নাই ;
হেথায় দাঁড়াই, প্রণতি জানাই, সূর্যের পানে চাই।
বন-বিহগের কণ্ঠে কণ্ঠে নামের যজ্ঞ চলে ;
প্রাণ কেঁদে ওঠে দিব্য ভাবেতে জপি নাম কুতূহলে।
হরি কৃপা করি অমৃতময় দৃষ্টি করেন দান ;
সৃষ্টি এবং স্রষ্টা অভেদ হয় যে প্রতীয়মান।
আমার বুকের কণ্টক-বন পারিজাতফুলে ভরে,
ধ্যানস্থ রয় চিত্ত তাঁহার চরণ-সরোজ ধরে।
দিব্য নামামৃত
পান করি বসে রসোল্লাসেতে, পরিতৃপ্ত এ চিত
—আর কিছু নাহি চায় ;
হেথা বসে থাকি, গোবিন্দে ডাকি—গোনা দিন কেটে যায়।

সমালোচনা

Christ the Saviour by Swami Prajnanananda, Published by Swami Adyananda, Ramakrishna Vedanta Math, 19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta 6. Pp. 47 ; Price Rupees Two.

পৃথিবীর সর্বত্র সম্মানিত ঈশপুত্র যীশুখৃষ্ট ; তাঁর অমূল্য জীবন ও বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে সহজ সরল ইংরেজী ভাষায় আলোচ্য পুস্তকে। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে ১৯৫৯ খৃঃ খৃষ্টজন্মদিনে খৃষ্টবিষয়ক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং '৬০ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকায় 'Christ the Saviour' শিরোনামে লেখাটি প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ কিছু পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান পুস্তকের আকার প্রাপ্ত হয়েছে।

সমালোচনামূলক বইটি ছোট হলেও এতে এমন সব তথ্য পরিবেশিত, যা অনেক পাঠকেরই অজ্ঞাত, যথা : যীশুর জন্মদিনের মতদ্বৈধ, যীশুর আকৃতি, যে ভাষায় তিনি উপদেশ দিতেন, তাঁর ভারতে আগমন, তিব্বতে বৌদ্ধমঠে অবস্থান, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের যীশুখৃষ্ট দর্শন। এইগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে 'ত্রাণকর্তা' যীশুখৃষ্টকে আরও ভালভাবে জানতে।

ভক্তিপ্রসঙ্গ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ অবলম্বনে দেবর্ষি নারদ-বিরচিত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা) : স্বামী বেদান্তানন্দ। জেনারেল প্রিন্টিং য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃঃ ।৵০ + ১৮২ ; মূল্য তিন টাকা।

স্বামী বেদান্তানন্দ-প্রণীত 'ভক্তিপ্রসঙ্গ' ভক্তিসাধনার মর্মবাণী ব্যাখ্যার দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই পাঠক-হৃদয়ে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রণসৌষ্ঠবের মধ্যে দেবর্ষি নারদের চরিত্রকাহিনী সংযুক্ত হয়ে গ্রন্থটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

একদিকে ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদের ভক্তিসূত্র, আর একদিকে ভক্তিভাবের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তিপ্রসঙ্গ—এ-দুয়ের মণিকাঞ্চনযোগে এই বইটি ভক্তিযোগের অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসুমাত্রেরই পক্ষে অপরিহার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম। কলিতে নারদীয় ভক্তি।' সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতেন যে, '…নারদেরও শুকদেবের মতো ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে থাকতেন লোকশিক্ষার জন্য।' শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও আমরা অনুক্ষণ ভাববিহ্বলতার অন্তরালে ব্রহ্মজ্ঞানের অনির্বাণ শিখাটি প্রজ্বলিত দেখি। তাই তাঁর দৃষ্টিতে শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান এক ছিল।

শুদ্ধা ভক্তির পরম নিদর্শনরূপে দেবর্ষি নারদ ব্রজগোপীদের উদাহরণ দিয়েছেন—যথা ব্রজগোপিকানাম্॥ ভক্তিসূত্র (২১) : গোপীপ্রেমের যে নির্মল মহিমাকে অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শন গড়ে উঠেছে, তারই পাশাপাশি ভারতবর্ষে অগণিত ভক্তি-সাধনার ধারা বর্তমান। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় এই নানা ধারার সার্থক সম্মিলন হয়েছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর আলোকে নারদীয় ভক্তিসূত্রের এই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা সাধক, ভক্ত ও রসিকজনের কাছে চিরদিন সমাদৃত হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস।

—**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

মানবতাবাদ—বসুধা চক্রবর্তী। প্রকাশক : দীপায়ন, ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২২৭; মূল্য ৭৲।

বর্তমান গ্রন্থ পাঠক-সমাজকে হতাশাক্লিষ্ট, নিঃসঙ্গ নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদের নয়া ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়াস। গ্রন্থকার প্রস্তাবনায় বলেছেন যে, মানবতা ও মানবিকতা এক বস্তু নয়। মানবিকতাবাদ করুণা ও অধ্যাত্ম-চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সাধারণ সিদ্ধান্তকে গ্রন্থকার নিজেই খণ্ডন করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি নিজেই বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে মানবতার বিরোধ নেই। বলাবাহুল্য যে, জড়বাদও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবতা-বিরোধী। এই গ্রন্থে মানবতাবাদকে নিছক নাস্তিকতাবাদে পর্যবসিত করার প্রয়াসে গ্রন্থকার বিকৃত তথ্য পরিবেশন এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। চিন্তার পরিবেশনে সব সময়ে গুরুচণ্ডালী ধারা বর্জন করতে পারেননি। এই গ্রন্থপাঠে প্রতিভাত হয় যে, গ্রন্থকার তাঁর চিন্তাকে একটি বিশেষ দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখায় সর্বজনীন সত্যের নৈকট্য লাভ করতে পারেননি বা তা উপেক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার তাঁর চিন্তাকে কেবল পাশ্চাত্যের বিশেষ কয়েকটি দেশের ও কয়েকটি যুগের চিন্তায় সীমাবদ্ধ না ক'রে যদি যথার্থ মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করতেন, তা হ'লে উপলব্ধি করতেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মানবতাবাদ ও মানবিকতাবাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

মার্ক্‌স্ সাহেব সমাজতন্ত্রবাদকে জড়বাদ আর ইতিহাসের বুলি দিয়ে বৈজ্ঞানিক করবার চেষ্টা করেছেন, আর তার অনুসরণ ক'রে গ্রন্থকার জড়বাদের সাহায্যে মানবতাবাদকে বৈজ্ঞানিক আখ্যায় ভূষিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু যুক্তি এত শিথিল যে, গ্রন্থের শেষের দিকে গ্রন্থকার নিজেও বুঝতে পেরেছেন যে, এই মানবতাবাদ জনসাধারণের নিকট কাল্পনিক বোধ হবে।

সহজ ও সরল ভাষায় লিখবার চেষ্টা ক'রে কোথাও কোথাও উপযুক্ত শব্দ-গঠনে ও বাক্য-ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছেন। চিন্তানুযায়ী ভাষার গাম্ভীর্য রক্ষিত হয়নি। পরিভাষার ইংরেজী শব্দ ও পুস্তকগুলির নাম ইংরেজী অক্ষরে দিলে পাঠক-সাধারণের বিশেষ উপকার হ'ত। রচনার ধারা লক্ষ্য করলে মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবানুবাদ। তবে এই গ্রন্থ স্বল্পবুদ্ধি ব্যর্থপ্রাণ নিরীশ্বরবাদী যুবচিত্তকে বিভ্রান্ত করলেও ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

—ধনঞ্জয়কুমার নাথ

শ্রীশ্রীভূপতিনাথ-সন্নিধানে : (দ্বিতীয় ভাগ) সম্পাদক—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী। প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৬০, মূল্য ২৲।

ভাই ভূপতিনাথ উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে তাঁহার কথা আছে। বিভিন্ন ভক্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সহিত যে প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহারই স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল এই গ্রন্থখানি।

ঈশ্বর-সান্নিধ্যবোধের সাধনা—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ৮৩; মূল্য ১'৮০ ন. প.।

খৃষ্টধর্ম-জগতে সাধু লরেন্সের নাম সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকে সাধু লরেন্সের

সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ও ১৫টি উদ্দীপনামূলক পত্রের সরল অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শীলধর্মপ্রতিষ্ঠা—লেখক ও প্রকাশক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন, ৯১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ২০। পৃষ্ঠা ২৶০+১২৮; মূল্য টাকা ১'৫০।

'শীল' শব্দের অর্থ সদাচার। শরীর বাক্য ও মন সংযত এবং বুদ্ধি নির্মল করিবার জন্যই 'শীল'। আলোচ্য গ্রন্থে বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে শীল-সাধন, শীল-গ্রহণ, শীলের আবশ্যকতা প্রভৃতি আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে 'ধর্মবিশ্বাসে মোহ', 'পুরুষকার ও দৈব' প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত।

ধর্ম ও অনুভূতি (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)—কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক। প্রকাশক: শ্রীসুরেশ-চন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। প্রত্যেক ভাগে পৃষ্ঠা ১০৪। মূল্য ৩৲+৩৲।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত থেকে এক একটি বাণী নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। 'নিবেদন'-শিরোনামে ভূমিকায় বলা হয়েছে 'উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছে—এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা'। কিন্তু ব্যাখ্যায় মৌলিকতা থাকলেও বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য।

আশ্রম—(চতুর্দশ বর্ষ—১৩৬৮): ছাত্র-সম্পাদক শ্রীসাধন রক্ষিত। প্রকাশক—স্বামী পুণ্যানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১০৮।

এ-বারের 'আশ্রম' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে দুটি সুখপাঠ্য রচনা আছে: রবীন্দ্রনাথ ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ, শিশু-মনস্তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ। অন্যান্য লেখার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য: গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক, পারমাণবিক শক্তির গোড়ার কথা, চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলীর নব মূল্যায়ন, কাঠ ও কাঠের কাজ, A case for School Debate, The Ultimatum of Basic Training, মিলন (হিন্দী)। কবিতাগুলিও সুনির্বাচিত। 'আশ্রমিকী'তে আশ্রমের সকল বিভাগের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রজীবনকথা (পরিবর্ধিত সংস্করণ)—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠা ৩২২; মূল্য ৬৲।

রবীন্দ্রজীবনকথা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি গ্রন্থমালায় একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সুন্দর সরস চলিত ভাষায় রচনা-শৈলীতে লিখিত এই গ্রন্থ; একই লেখকের লেখা হলেও চার খণ্ডে মুদ্রিত বিরাট রবীন্দ্র-জীবনীর সংক্ষেপকৃত সংস্করণ নয় এটি। তথ্য ও বিষয়সঙ্গতির দিক থেকেও যথেষ্ট শুদ্ধতা আছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের পরিচিতি, শৈশবকাহিনী, নবনব প্রতিভার উন্মেষ, কাব্য-পরিচয়, দেশভ্রমণ, দেশপ্রেম, শেষ জীবন—কিছুই বাদ পড়েনি, কোথাও সংক্ষেপে কোথাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত, মাঝে মাঝে কবির নিজের কথা উদ্ধৃতিতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের তিনটি পাণ্ডুলিপি-চিত্র, বংশ-তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী, নির্দেশিকা দেওয়াতে গ্রন্থের শোভা ও মর্যাদা—দুই-ই বেড়েছে।

দুঃখের বিষয় পুস্তকটির ৮২ পৃঃ স্বামীজীর মতবাদের সমালোচনা ব'লে লেখক যা ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর অজ্ঞতা ও মনের দৈন্যই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

ঢাকা: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই হইতে ১৩ই মার্চ ছয়দিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠান হয়। ৮ই মার্চ ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, ভজন, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী 'কথামৃত' ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, রামায়ণ-গান এবং যাত্রাভিনয় হয়।

১১ই মার্চ কাজী মোতাহের হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ডাঃ মোজাহের-উদ্দীন আহম্মদ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দেব, শ্রীসুবোধ-চন্দ্র রায়, শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী এবং একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন। এই দিন মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর): গত ২৪শে ফাল্গুন শ্রীসারদা মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে অহোরাত্র বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যূষে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা উৎসবের শুভ সূচনা হয়। সকাল ৭টা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীদশাবতার-পূজা আরম্ভ হয়। চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদির পর প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা করেন। প্রায় ৭০০ জন ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। রাত্রিতে শ্রীশ্রীদশমহাবিদ্যার পূজা, হোম এবং কালীকীর্তন হয়।

আসানসোল: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২৩শে এপ্রিল পর্যন্ত বিশেষ উদ্দীপনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, শোভাযাত্রা, হোম, চণ্ডীপাঠ, নারায়ণ-সেবা, জনসভা, সারদা-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, কীর্তন ও ভজনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবীণ সাহিত্যিক ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের পৌরোহিত্যে ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, অধ্যাপক হরিপদ ভারতী ও স্বামী পূজ্যানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের অমিয় জীবনকাহিনী ও অনুপম উপদেশাবলীর ব্যাখ্যামূলক ভাষণ প্রদত্ত হয়।

২১শে এপ্রিল শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর দিব্য জীবন ও বাণীর আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পরশিবানন্দ এবং বক্তৃতা দেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, অধ্যক্ষা চারুবালা বসু ও অধ্যাপক অমূল্য সেন।

অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ ২২শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণে বলেন, বর্তমান জগৎ যেভাবে জড়বাদ ও ধ্বংসাত্মক যান্ত্রিক বিদ্যার প্রতি একান্ত উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সত্যদ্রষ্টা মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী প্রতিপালনের তাৎপর্য ও প্রয়োজন আছে। অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ভাষণ দেন।

২৩শে এপ্রিল বর্ধমান জেলাশাসক শ্রীমেননের সভাপতিত্বে শ্রীমতী মেনন আশ্রম-

বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। উক্ত সভায় জনসাধারণের মধ্যে ১৯৬১-৬২ খৃঃ আশ্রমের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী উপস্থাপিত করা হয়।

টাকী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-প্রাঙ্গণে গত ১৮ই মার্চ হইতে পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

এতদুপলক্ষে প্রথম দিবসে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রসাদবিতরণ, কীর্তনগান, জনসভা এবং 'পাণ্ডবগৌরব' নামক যাত্রাভিনয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রায় ৫,০০০ নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্বামী সাধনানন্দ এবং শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ইহা ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বেলুড় মঠের জনশিক্ষামন্দির কর্তৃক সবাক্ চলচ্চিত্রে 'সাবিত্রী-সত্যবান্', 'পথের পাঁচালি' 'অপরাজিত' প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। আশ্রমের উচ্চ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ এবং ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক অভিনীত নাট্যাভিনয়ের সহিত উৎসব সমাপ্ত হয়।

কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া) **ঃ** রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই মার্চ হইতে সপ্তাহব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আনন্দ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, ষোড়শোপচারে পূজা, গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ, হোম, জীবনী-আলোচনা ভজন-কীর্তন, 'কথামৃত'-ব্যাখ্যা, শোভাযাত্রা, রামনাম, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

১৩ই মার্চ মধ্যাহ্নে বিরাট ভোগের পর ২,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর স্বামী পরমেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী গদাধরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা দেন।

মনসাদ্বীপ (২৪ পরগনা) **ঃ** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন আশ্রমের উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড়জলের জন্য পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান অসমাপ্ত থাকে। দ্বিতীয় দিন প্রাতে পূজাপাঠ, ভোগরাগ এবং মধ্যাহ্নে কীর্তন হয়। অপরাহ্ণে পূর্বদিনের অবশিষ্ট পারিতোষিক বিতরণের পর ধর্মসভা আরম্ভ হয়। স্বামী অজজানন্দ (সভাপতি), শ্রীহরিপদ বাগুলি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। সভান্তে সুরে 'কথামৃত' পরিবেশিত হয়। রাত্রে প্রায় ৩,০০০ দূরাগত গ্রামবাসী প্রসাদ ধারণ করেন। ইহার পর প্রাক্তন ছাত্রদের 'রাজলক্ষ্মী' অভিনয় শুরু হয় কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য উহা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে হয়। এই উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল এবং গ্রামবাসী জনসাধারণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

সমাবর্তন-উৎসব

মেদিনীপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা-ভবনে গত ২৪শে মার্চ পূর্বাহ্ণে মাঙ্গলিক পূজানুষ্ঠানের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের শততম জন্মতিথি স্মরণে 'পাঠভবন' (Library)-এর উৎসর্গীকরণ সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণে স্বামী ওঁকারানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ-ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। অতঃপর তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের শততম জন্মতিথি স্মরণে বিদ্যার্থি-ভবনের 'ব্রহ্মানন্দধাম' ছাত্রাবাসটির শুভারম্ভ

ঘোষণা করিয়া ছাত্রগণকে আশীর্বাদ করেন। ছাত্রাবাসটিতে ৪ জন শিক্ষক-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৮০ জন ছাত্র বাস করিতেছে।

অতঃপর শিশু-কাননে (Children's Park) নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপের নীচে সমাবর্তন-সভায় সমবেত অভিভাবক ছাত্র ও ভক্তগণের নিকট তিনি শিক্ষাসমস্যা-সমাধানের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের মহান্ আদর্শে শরীর মন দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। সমাবর্তন-সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের পদক, উপহার ও অভিজ্ঞানপত্র অর্পণ করা হয়।

পরদিবস ২৫শে মার্চ সকালে বিদ্যাভবনের শিক্ষকগণের একটি বৈঠকে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বিত প্রযাসে 'মানুষ-গড়ার' কাজ কিরূপে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আলোচিত হয়। অপরাহ্ণে জনসভায় স্বামী ওঁকারানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ-সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

কার্যবিবরণী

***নিউ দিল্লী*:** রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য-বিবরণী (জানুআরি '৬০—মার্চ '৬১) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার করা হয়। সাপ্তাহিক সভাগুলিতে বহুসংখ্যক ছাত্রও যোগদান করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-সমিতির উদ্যোগে বিবেকানন্দ-হলে প্রতি রবিবার সকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'ভারতে বিবেকানন্দ' ও 'কর্মজীবনে বেদান্ত' বিষয়ে আলোচনা করেন।

তুলসী-রামায়ণের হিন্দী আলোচনা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে; এ পর্যন্ত ৫৩টি রামায়ণ-আলোচনা-সভার মোট শ্রোতৃসংখ্যা ৩৯,০০০।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে মোট ক্লাসের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫ ও ৪২; শ্রোতৃসংখ্যা ৪৫,৬০০ ও ৪,১৩৫। আলোচনা ও বক্তৃতার সংখ্যা ২৯১; শ্রোতৃসংখ্যা ৮৮,৩৪০।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও জন্মোৎসবগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্বামীজীর উৎসবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে নরনারায়ণ-সেবা হয়।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১১,৬৫০ (নূতন সংযোজিত ১,০৭০); পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১৬,২১৮। পাঠাগারে ১৪টি দৈনিক ও ১২৩টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আশ্রমের চিকিৎসালয়ে ৫৪,০২৪ (নূতন ১৪,৭৬৬) রোগী প্রধানতঃ হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা লাভ করে। আশ্রম-পরিচালিত কারোলবাগ যক্ষ্মা-ক্লিনিকে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৪৮,৯১১ (নূতন ২,৩৯০); অন্তর্বিভাগে ৫৩৯ জন রোগী পর্যবেক্ষণ করা হয়।

মহিলা-সমিতির উদ্যোগে সারদা-মন্দিরে ৬-১২ বৎসরের বালক-বালিকাকে ভজন, ধ্যান, গল্প, নাটক প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

কাঁথি: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের (১৯৫৯—'৬১ মার্চ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র ইহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৩ খৃঃ হইতে জনকল্যাণে রত। বর্তমানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সর্বসাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় এই সেবাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

১৯৬০-৬১ খৃঃ ছাত্রাবাসে ১০টি ছাত্র ছিল, ৭টির আহারাদির ব্যয় আশ্রম হইতে বহন করা হয়; চিকিৎসালয়ে ৪৩,৮৬১ (নূতন ১২,৩৭১) চিকিৎসিত হয়। গ্রন্থাগারের গ্রামকেন্দ্রের কাজ যথারীতি চলে; ইহা ছাড়া দুগ্ধবিতরণ এবং ছাত্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে সাহায্য করা হয়। উৎসবাদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত সেপ্টেম্বর হইতে ফেব্রুআরি পর্যন্ত জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, ধুবড়ী রামকৃষ্ণ আশ্রম, শিলং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, গৌহাটী রামকৃষ্ণ আশ্রম, ডিগবয় রামকৃষ্ণ আশ্রম, আমলানি, সোদপুর, টাকি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, হাসনাবাদ, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, মেদিনীপুর মহিলা কলেজ, আঁটপুর, বার্নপুর, রানীগঞ্জ, সাকতুরিয়া, আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কুমারডুবি, সিউড়ি, গুসকরা, ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর উচ্চ বালিকা-বিদ্যালয়, পুরী, কটক, হোজাই, লামডিং এবং শিলচরে 'বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান', 'জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও আচার্য বিবেকানন্দ', 'সেবাধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দ', শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাত্রজীবনের কর্তব্য' সম্বন্ধে মোট ৩৬টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে ৩১টি আলোকচিত্র যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ আমেরিকা গমন করায় তাঁহার স্থলে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন কৃষ্টি প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture, Gol Park, Calcutta) কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২রা মে বুধবার তিনি 'Spiritual heritage of India' বক্তৃতা দ্বারা উপনিষদ্ ও গীতা ক্লাস শুরু করিয়াছেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী নিখিলানন্দ; সহকারী: স্বামী বুধানন্দ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং গীতা ও উপনিষদের ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

জানুআরি '৬২: ঈশ্বর-ভক্তের বিনাশ নাই; আমাদের ইচ্ছা কি স্বাধীন? সাংসারিক কর্তব্য ও ভাগবত-জীবন; আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা, যুক্তিবিচারকে আধ্যাত্মিকতামুখী করিবার উপায়; কর্ম—মুক্তিপ্রদ শক্তি।

ফেব্রুআরি: জীবনে দুঃখকষ্ট কিরূপে জয় করা যায়? ধর্মের উপায় এবং উদ্দেশ্য; মানুষের পক্ষে ঈশ্বর প্রয়োজন কেন? ঈশ্বর—বর্তমানের ঈশ্বর।

গীতা অবলম্বনে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়: চিন্তার শক্তি, সৎসঙ্গের শক্তি, পবিত্রতার শক্তি এবং ঈশ্বর-নামের শক্তি।

ইওরোপে প্রচারকার্য

লণ্ডন রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দ জার্মানিতে গত ২০শে জুন হইতে ৪ঠা জুলাই একপক্ষকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি বার্লিনে ২টি ও ব্রেমেনে ২টি বক্তৃতা দেন। নিউ দিল্লীর অবসরপ্রাপ্ত জার্মান কনসাল জেনারেল Herr von S. Pochamer কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত-জার্মান সোসাইটির উদ্যোগে এই সভাগুলি আয়োজিত হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর স্বামী ঘনানন্দ লিভারপুল পরিদর্শন করেন এবং দুইটি সভায় ভাষণ দেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

নিউ দিল্লী: বিনয়নগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৫শে ফেব্রুআরি ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, বাংলা, পাঞ্জাবী ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় প্রায় পাঁচ শত ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৫৯ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। ৩রা মার্চ সন্ধ্যায় ভারত-সেবকসমাজ-প্রাঙ্গণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সভাপতিত্বে এক সভায় প্রায় ৮০০ লোকের সমাগম হয়। ভজনগানের পর আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীগণ বিভিন্ন ভাষায় স্বামীজীর বাণী আবৃত্তি করেন। শ্রীতারাপদ চৌধুরী এবং শ্রীরামচন্দ্র তেওয়ারী বাংলা ও হিন্দীতে ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী রঙ্গনাথানন্দ তাঁহার ভাষণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বাণী বিশদভাবে আলোচনা করেন। অতঃপর সভাপতি পুরস্কার বিতরণ করেন।

আমেদাবাদ: শ্রীবিবেকানন্দ-পাঠচক্রের একাদশ বার্ষিক উৎসব গত ৪ঠা মার্চ সকালে অখণ্ডানন্দ-হলে গুজরাতের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রী কে. টি. দেশাই মহোদয়ের অধ্যক্ষতায় মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবদ্রীনারায়ণ অলোক প্রভৃতি স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন।

৮ই মার্চ মণিনগর (আমেদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, 'প্রবচন'-পাঠ ভজন, কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়।

রাউরকেলা (ওড়িশা): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ কর্তৃক গত ৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গল আরতি, প্রাতে বিশেষ পূজা, দ্বিপ্রহরে প্রসাদ-বিতরণ, বৈকালে ভজন-কীর্তন ও 'কথামৃত'-পাঠ হইয়াছিল। ১৭ই মার্চ আয়োজিত সভায় স্বামী অসঙ্গানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও দিব্য জীবনের আদর্শ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন।

হাওড়া: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৭ই ও ৮ই এপ্রিল এই দুইদিন-ব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী ওঁকারানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সম্বন্ধ-প্রসঙ্গে তিনি এক সুদীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। সভার আরম্ভে ও শেষে শ্রীকালীপদ পাঠক দুইটি ভজন গান করেন।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ; অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী ও ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপ ঘোষ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং আশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীপ্রফুল্ল রায় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক উৎসবের প্রস্তুতি-সম্পর্কে আলোচনা করেন।

খড়িবেড়িয়া (২৪ পরগনা): গত ৭ই হইতে ৯ই এপ্রিল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজা পাঠ কীর্তন ভজন প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী সুশান্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

আগড়তলা: গত **৮ই** ও **১১ই মার্চ** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব ডাঃ দুর্গাকুমার ভট্টাচার্যের বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গীতা পাঠ করেন স্থানীয় ভোলাগিরি-আশ্রমের হরানন্দ গিরি। ১১ই মার্চ উদয়াস্ত কীর্তন ও আনন্দোৎসব হয়। প্রায় ৭০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে হরিনাম-কীর্তন হয়।

আরারিয়া (পূর্ণিয়া): রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৮ই হইতে ১১ই মার্চ উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, ‘কথামৃত’-পাঠ, নরনারায়ণ-সেবা, অষ্ট-প্রহরব্যাপী নাম-সঙ্কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী অনুপমানন্দ ও স্বামী পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

গুজরাত: এই রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়ন্তী এক বৎসর ধরিয়া সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে গত ৩রা মার্চ শেঠ শ্রীনন্দদাস হরিদাসের সভাপতিত্বে এক শক্তিশালী সমিতি গঠিত হয়। শ্রীমতী সরলাদেবী সারাভাই উৎসব-সমিতির অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। রাজ্যপাল শ্রীমেহেন্দী নওয়াজ জং, প্রধান বিচারপতি শ্রী কে. টি. দেশাই ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ পৃষ্ঠপোষক এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জীবরাজ মেহেতা, অন্যান্য মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

বাংলায় শিক্ষিতের হার

গত ১০ বৎসরে বাংলায় শিক্ষিতের হার ৪% এর বেশী বাড়িয়াছে। ১৯৫১ খৃঃ বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল ২৪·৫৪%; ’৬১ খৃঃ গণনা অনুসারে ইহা রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার ২৯·১% হইয়াছে।

গত ১০ বৎসরে রাজ্যের জনসংখ্যা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে; সেই অনুপাতে শিক্ষিতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা গিয়াছিল।

কলিকাতায় শিক্ষিতের হার সর্বাধিক—৫৮·৫%। কলিকাতায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শিক্ষিতের অনুপাত প্রায় সমভাবে বাড়িয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের শিক্ষিতের হার যথাক্রমে ৬২·৮% ও ৫১·৫%।

নিম্নে জেলা অনুযায়ী শতকরা শিক্ষিতের হার দেওয়া হইল :

জেলা	শিক্ষিত	পুরুষ	স্ত্রী
কলিকাতা	৫৮ ৫	৬২·৮	৫১·৫
হাওড়া	৩৬ ২	৪৭·৭	২২
হুগলি	৩৪ ৫	৪৫ ৮	২১ ৮
২৪পরগনা	৩২·৬	৪৪·১	১৯ ৩
বর্ধমান	১৯·৪	৩৯·২	১৮
দার্জিলিং	২৮·৪	৩৯·৬	১৫·৫
মেদিনীপুর	২৭·১	৪১·৫	১২
নদীয়া	২৬ ৯	৩৫·৩	১৭·৯
বাঁকুড়া	২২·৯	৩৫ ৮	৯ ৬
বীরভূম	২২·২	৩২·৬	১১·৫
কোচবিহার	২১·১	৩১·৯	৯
জলপাইগুড়ি	১৯·৩	২৭·৮	৯·৫
পুরুলিয়া	১৮·৩	৩১·২	৫
পঃ দিনাজপুর	১৬·৮	২৫ ৫	৭·২
মুর্শিদাবাদ	১৫·৯	২৩·৪	৮ ২
মালদহ	১৩·৬	২১·২	৫·৭

—‘Hindusthan Standard’ হইতে সংকলিত।

আর্য ও তামিল *

স্বামী বিবেকানন্দ

সত্যই, এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা! হয়তো সম্প্রতি আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধবানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্রও যে-কোন স্থানে মাটি খুঁড়িলেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। হ্রদ-অধিবাসিগণ, অন্ততঃ নদীতীরবাসিগণ—নিশ্চয়ই কোন কালে প্রচুর সংখ্যায় ছিলেন। গুহাবাসী পত্রসজ্জা-পরিহিতগণ এখনও বর্তমান। বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনও এদেশের নানা অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয়, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মঙ্গোলবংশসম্ভূত ও ভাষাতাত্ত্বিকগণের তথাকথিত আর্যশাখার নানা প্রশাখা-উপশাখা আসিয়া মিলিত হয়। পারসীক, গ্রীক, ইয়ুংচি, হুন, চীন, সিথীয়ান—এমন অসংখ্য জাতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; ইহুদী, পারসীক, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি—যাহারা এখন অবধি একাত্ম হইয়া যায় নাই; এই সব বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানবসমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতরদের আত্মসাৎ করিয়া আবার আত্মস্থ হইতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রকৃতির এই উন্মাদনাস্রোতের মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আপন আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি নিজেদের 'আর্য' বলিত এবং তাহাদের পন্থা ছিল বর্ণাশ্রমাচার—তথাকথিত জাতিভেদপ্রথা।

আর্যজাতির জনসাধারণ অবশ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকগুলি সুবিধা নিজেদের হাতে রাখিয়া দিয়াছিল। তবু জাতিভেদপ্রথা চিরদিনই খুব প্রসারণশীল ছিল; মাঝে মাঝে নিম্নস্তরের সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য ইহা একটু অতিরিক্ত প্রসারণশীল হইয়া পড়িত।

* 'Aryans and Tamilians'-প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ।

এই আর্যজাতি অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সমগ্র ভারতবর্ষকে—ধনসম্পদ বা তরবারি নয়,—আধ্যাত্মিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও বিশোধিত চিন্তার অধীন করিয়াছিল। আর্যদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রাহ্মণ।

অন্যান্য জাতির সামাজিক পদ্ধতি হইতে আপাততঃ পৃথক্ মনে হইলেও, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে আর্যদের জাতিবিভাগপ্রথা দুইটি ক্ষেত্র ছাড়া খুব পৃথক্ বলিয়া মনে হইবে না।

প্রথমতঃ অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা। রাইন-নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় দস্যুকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলে রোমের পোপ খুবই খুশী হইবেন। ভারতবর্ষে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন প্রশান্তচিত্ত পুরুষগণ—শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, অবতার ও মহাপুরুষেরা।

একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নৃপতি অতীতের কোন অরণ্যচারী, সংসারবিরাগী, সর্বস্বত্যাগী, ভিক্ষান্নজীবী এবং ইহকাল ও পরকালের তত্ত্বালোচনায় জীবন-অতিবাহনকারী ঋষিকে আপন পূর্বপুরুষ বলিতে পারিলে আনন্দিত হইবেন।

দ্বিতীয়তঃ মাত্রাগত পার্থক্য। অন্য সব দেশে জাতিনির্ধারণের একক মাত্রা হিসাবে একজন নর বা নারীই যথেষ্ট। ধন, ক্ষমতা, বুদ্ধি বা সৌন্দর্যের দ্বারা যে-কেহ আপন জন্মগত জাতির ঊর্ধ্বে যে-কোন স্তরে আরোহণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে সমগ্র গোষ্ঠীটিই জাতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে এককরূপে বিবেচিত। এখানেও নিম্নজাতি হইতে উচ্চতর বা উচ্চতম জাতিতে উন্নীত হইতে পারা যায়; শুধু এই পরার্থবাদের দেশে নিজ জাতির সকলকে লইয়া একত্রে উন্নত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষে আপনার ঐশ্বর্য, ক্ষমতা বা অন্য কোন গুণের দ্বারা আপনি আপনার গোষ্ঠীর লোকদের পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতজাতির লোকদের সঙ্গে স্বাজাত্যের দাবি করিতে পারেন না। যাঁহারা আপনার উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে, আপনি তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া অসম্মান করিতে পারেন না। যদি কেহ উচ্চতর জাতিতে উন্নীত হইতে চায়, তবে তাহার স্বজাতিকেও উন্নত করিতে হইবে—তাহা হইলে আর কোন কিছুতে বাধা দিতে পারিবে না।

ইহাই ভারতীয় স্বাঙ্গীকরণপদ্ধতি—সুদূর অতীত হইতে এই প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে এ-কথা আরও বেশী করিয়া খাটে যে, আর্য ও দ্রাবিড় এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র—করোটিতত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় নামগুলির ক্ষেত্রেও সেইরূপ। উহারা কেবল একটি গোষ্ঠীর মর্যাদাসূচক যে গোষ্ঠীটি সর্বদা পরিবর্তনশীল, এমন কি পরিবর্তনের শেষ ধাপে উপনীত হইয়া যখন বিবাহনিষেধ (non-marriage) প্রভৃতির মধ্যেই অন্য সব প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখনও নিম্নতর জাতি বা বিদেশ হইতে আগত লোকদিগকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিয়া এই গোষ্ঠীগুলি প্রসারিত হইতেছে।

যে বর্ণের হস্তে তরবারি রহিয়াছে, সে বর্ণই ক্ষত্রিয় হইয়া দাঁড়ায়; যাহারা বিদ্যাচর্চা লইয়া থাকে তাহারা ব্রাহ্মণ; ধনসম্পদ যাহাদের হাতে তাহারা বৈশ্য।

যে গোষ্ঠী আপন অভীষ্ট পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই সে নবাগতদিগের নিকট হইতে নানা উপবিভাগের দ্বারা নিজেদের পৃথক্‌ করিয়া রাখে। কিন্তু শেষ অবধি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়। আমাদের চোখের উপর ভারতের সর্বত্র এইরূপ ঘটিতেছে।

স্বাভাবিকভাবেই যে গোষ্ঠীটি নিজেদের উন্নীত করিয়াছে, তাহারা নিজেদের জন্ম সব সুবিধা সংরক্ষিত করিয়া রাখিতে চায়। সুতরাং উচ্চবর্ণেরা—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা—যখনই সম্ভব হইয়াছে, রাজার সাহায্যে এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্রের দ্বারাও নিম্নবর্ণের লোকেদের উচ্চাশা দমনের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাহারা কি সফল হইয়াছিল? আপনাদের পুরাণ ও উপপুরাণগুলি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করুন—বিশেষতঃ বৃহৎ পুরাণগুলির স্থানীয় সংস্করণগুলির প্রতি লক্ষ্য করুন; আপনাদের দৃষ্টির সম্মুখে ও চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে ভাল করিয়া লক্ষ্য করুন - উত্তর পাইবেন।

আমাদের বিভিন্ন বর্ণবিভাগ এবং নানা উপবিভাগের মধ্যে বর্তমান বিবাহপ্রথাকে সীমাবদ্ধ রাখা (যদিচ এ রীতি সর্বত্র পালিত হয় না) সত্ত্বেও আমরা পুরাপুরি মিশ্রিত জাতি।

ভাষাতাত্ত্বিকদের 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমন কি যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুই বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত—রক্তগত নহে। বেদে দস্যুদের কুৎসিত আকৃতিসম্বন্ধে যে-সকল বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কোনটিই মহান্‌ তামিলভাষীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। বস্তুতঃ আর্য ও তামিলদের মধ্যে কাহাদের দৈহিক সৌন্দর্য বেশী—এ সম্বন্ধে যদি কোন প্রতিযোগিতা হয়, তবে উহার ফলাফল সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে সাহসী হইবে না।

বর্ণ বিশেষের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দাম্ভিকতাপূর্ণ মতবাদ অসার কল্পনামাত্র। দুঃখের সহিত বলিতে হয়, এই মতবাদ দাক্ষিণাত্যের মতো অন্য কোথাও এতটা সাফল্যলাভ করে নাই।

ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আমরা যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি নাই, সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াই আমরা দাক্ষিণাত্যের এই সামাজিক অত্যাচারের কথা বেশী আলোচনা করিব না। মাদ্রাজ-প্রদেশে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে যে উত্তেজনা বিদ্যমান, তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমধর্ম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের অন্যতম। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অনিবার্য ত্রুটিবিচ্যুতি, বৈদেশিক অত্যাচার, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-নামের অযোগ্য কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও দম্ভের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের স্বাভাবিক সুফললাভ ব্যাহত হইলেও এই বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতে আশ্চর্যকীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে পরমলক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে।

ভারতের আদর্শ পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের একটি জগৎসৃষ্টি—মহাভারতের মতে পূর্বে এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমরা

সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন ভারতবর্ষের এই আদর্শকে ভুলিয়া না যান, মনে রাখেন।

যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবি করেন, তিনি নিজের সেই পবিত্রতার দ্বারা এবং অপরকেও অনুরূপ পবিত্র করিয়া নিজের দাবি প্রমাণ করুন। ইহার বদলে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত জন্মগর্ব লালন করিতেই ব্যস্ত; স্বদেশী অথবা বিদেশী যে-কোন পণ্ডিতই এই মিথ্যাগর্ব ও জন্মগত আলস্যকে বিরক্তিকর অপযুক্তির দ্বারা লালন করেন, তিনিই ইহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া দাঁড়ান।

ব্রাহ্মণগণ, সাবধান, ইহাই মৃত্যুর চিহ্ন। তোমাদের চারিপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ কর—তবে প্রভুর ভাবে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দূষিত গলিত অহঙ্কারের দ্বারা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উদ্ভট সংমিশ্রণের দ্বারাও নয—শুধুমাত্র সেবাভাবের দ্বারা। যে ভালভাবে সেবা করিতে জানে, সেই ভালভাবে শাসন করিতে পারে।

অব্রাহ্মণেরাও বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ঘৃণাসৃষ্টিতে সাহায্য করিতেছেন—মূল সমস্যা সমাধানের পক্ষে এ ধরনের কাজ নিতান্ত বিঘ্নস্বরূপ। অহিন্দুরাও এই পারস্পরিক ঘৃণার বিস্তারে সহায়তা করিতেছেন মাত্র।

বিভিন্ন বর্ণের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হইবে না; যদি এই বিরোধের আগুন একবার প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক প্রগতিই কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইবে। ইহা বৌদ্ধদের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির পুনরাবর্তন হইয়া দাঁড়াইবে।

এই ঘৃণা-ও অজ্ঞতাপ্রসূত কোলাহলের মধ্যে পণ্ডিত শবরীরয়ান* একটিমাত্র যুক্তি ও বুদ্ধির পন্থা অনুসরণ করিতেছেন। মূর্খোচিত নিরর্থক কোলাহলে মহামূল্য প্রাণশক্তি নষ্ট না করিয়া তিনি 'সিদ্ধান্তদীপিকা'য় 'আর্য-তামিলগণের সংমিশ্রণ'-নামক প্রবন্ধে অতিসাহসিক পাশ্চাত্য ভাষাবিদ্‌গণের সৃষ্ট মতবাদের কুয়াশাই শুধু ভেদ করেন নাই, অধিকন্তু দাক্ষিণাত্যের জাতিসমস্যা-সমাধানে সহায়তা করিয়াছেন।

ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনও কিছু পায় নাই। আমরা যাহা পাইবার উপযুক্ত তাহাই লাভ করিয়া থাকি। *যোগ্যতার প্রথম ধাপ পাওয়ার ইচ্ছা; আমরা নিজেদের যাহা পাওয়ার যোগ্য* বলিয়া মনে করি, তাহাই লাভ করিয়া থাকি।

বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যবাসীদের জন্য তথাকথিত 'আর্য' মতবাদ এবং ইহার সহগামী চিন্তাধারাগুলি শান্ত অথচ দৃঢ় সমালোচনার দ্বারা সংস্কৃত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আর্যজাতির পূর্ববর্তী মহান তামিল-সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও যথার্থ গৌরববোধ।

নানা পাশ্চাত্য মতবাদ সত্ত্বেও আমাদের শাস্ত্রসমূহে 'আর্য' শব্দটি যে অর্থে দেখিতে চাই—যাহার দ্বারা এই বিপুল জনসঙ্ঘকে *'হিন্দু'* নামে অভিহিত করা হয়—সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ-কথা সব হিন্দুর প্রতিই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই

* Pandit D. Savariroyan.

ভাষাভাষীর সংমিশ্রণে গঠিত। কয়েকটি স্মৃতিতে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই বুঝায় যে ঐ শূদ্রেরা এখনও নবাগত শিক্ষানবিসমাত্র, ভবিষ্যতে উহারাও আর্যজাতিতে পরিণত হইবে।

যদিও আমরা জানি যে, পণ্ডিত শবরীরয়ান কিছুটা অনিশ্চয়তার পথে বিচরণ করিতেছেন, যদিও বৈদিক নাম ও জাতিসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার দ্রুত মন্তব্যসমূহের সঙ্গে আমরা একমত নহি, তবুও আমরা এ-কথা জানিয়া আনন্দিত যে, তিনি ভারতীয় সভ্যতার উৎস সংস্কৃতির (সংস্কৃতভাষী জাতিকে যদি সভ্যতার জনক বলা যায়) পূর্ণ পরিচয়লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

তিনি যে প্রাচীন তামিলগণের সঙ্গে আক্কাদো-সুমেরীয়গণের জাতিগত ঐক্য-সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর জোর দিয়াছেন, ইহাতেও আমরা আনন্দিত। ইহার ফলে অন্য সমুদয় সভ্যতার পূর্বে যে সভ্যতাটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল - যাহার সহিত তুলনায় আর্য ও সেমিটিক সভ্যতাদ্বয় শিশুমাত্র—সেই সভ্যতার সহিত আমাদের রক্তসম্বন্ধের কথা ভাবিয়া আমরা গৌরববোধ করিতেছি।

আমরা মনে করি, মিশরবাসীদের পন্টই মালাবার দেশ নয়, বরং সমগ্র মিশরীয়গণ মালাবার তীর হইতে সমুদ্র পার হইয়া নীলনদের তীর ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণের দিকে বদ্বীপ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। এই পন্টকে পবিত্রভূমিরূপে তাহারা সাগ্রহে স্মরণ করিত।

এই প্রচেষ্টাটি ঠিক পথে চলিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে তামিল ভাষা ও উপাদান যতই আবিষ্কৃত হইবে, ততই আরও বিশদ ও নিখুঁত আলোচনা দেখা দিবে। তামিল-ভাষাবৈশিষ্ট্য যাঁহারা মাতৃভাষার ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এ-কাজে যোগ্যতর আর কাহাকে পাওয়া যাইবে?

আমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী—আমরা বেদের সংস্কৃতভাষী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করি, এ পর্যন্ত পরিচিত সর্বপ্রাচীন সভ্যজাতি তামিলভাষীদের জন্য আমরা গর্বিত; এই দুই সভ্যতার পূর্ববর্তী অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল-পূর্বপুরুষগণের জন্য গর্বিত; মানবজাতির যে আদিপুরুষেরা প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ফিরিতেন, তাঁহাদের জন্য গর্বিত; আর যদি বিবর্তনবাদ সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদের সেই জন্তুরূপী পূর্বপুরুষদের জন্য গর্বিত—কারণ তাহারা মানবজাতিরও পূর্ববর্তী। জড় অথবা চেতন এই সমগ্র বিশ্বজগতের উত্তরপুরুষ বলিয়া আমরা গর্বিত। আমরা যে জন্মগ্রহণ করি, কাজ করি, যন্ত্রণা পাই, এজন্য আমরা গর্ব বোধ করি—আবার কর্মাবসানে আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়া মায়াতীত জগতে প্রবেশ করি, এজন্য আরও বেশী গর্ব অনুভব করি।

কথাপ্রসঙ্গে

উদারতা ও দুর্বলতা

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে উদারতা একটি মহৎ গুণ; উদার ব্যক্তি সর্বজন-প্রশংসিত; শাস্ত্রেও উচ্চকণ্ঠে উদারতার মহিমা ধ্বনিত হইয়াছে—আমরা বাল্যকালেই শিখিয়াছি:

অয়ং নিজো পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

এজন্য অনেকে মনে করেন, সর্বদা সর্বাবস্থায় উদারতা অবশ্য পালনীয়, তাই বর্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিতে চাই, উদারতা অনেক সময় কেন দুর্বলতা বলিয়া মনে হয়, দেখিতে চাই— কোন্ অবস্থায় উদারতা গুণ না হইয়া দোষে পরিণত হয়।

প্রথমেই দেখা যাক—উদার বলিতে আমরা কি বুঝি, কারণ উদারতার সংজ্ঞা-নির্ণয় অতি কঠিন, শব্দটি বড়ই ব্যাপক, কোন সীমারেখা টানিয়া উহাকে বুঝানো অসম্ভব। ধর্মে, সমাজে রাষ্ট্রে, পরিবারে—জীবনের সর্বক্ষেত্রে উদারতার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির চরিত্র-মাধ্যমেই উদারতাকে সহজে ধরিতে বা বুঝিতে পারা যায়, এবং ধর্ম-জীবনে সিদ্ধ মহাপুরুষগণই উদারতার জলন্ত জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই, বাসনা নাই, দেহ-বুদ্ধি নাই, দ্বেষ-হিংসা নাই, দেশ-বিদেশ নাই, আত্মীয়-পর নাই, তাঁহাদেরই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।'

প্রকৃত উদারতা শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উদার অনুভূতি আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্ভূত। আধ্যাত্মিক বলিতে দেহ-মনের সীমা ছাড়াইয়া মানুষের যে অবিনাশী সত্তা রহিয়াছে—তাহাকেই লক্ষ্য করা হইতেছে। সাধনসিদ্ধ মানুষের জীবনেই 'সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতীকারপূর্বকম্' এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত হয়, শীত-গ্রীষ্ম, শত্রু-মিত্র, মান-অপমান সর্বাবস্থায় তিনি সমভাবে থাকেন, দুঃখ বা অন্যায়ের কোন প্রতিকার করেন না, সকলের কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণমূলক কার্য করিয়া প্রমাণ করেন 'প্রীতিঃ পরমসাধনম্'। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু চরিত্রে, বুদ্ধ-জীবনে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। বিবেকানন্দ-কণ্ঠেও আমরা শুনিয়াছি:

'সকলেতে আমি আমাতে সকল
আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল!'

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে উদারতার একটি পরিপূর্ণ আদর্শ এবং একটি স্পষ্ট বাস্তব মূর্তি আমরা পাইয়াছি। সকল ধর্মের সকল মতের সাধনা করিয়া তিনি উদার অনুভূতির উপর দাঁড়াইয়া বর্তমান জগৎকে আহ্বান করিয়াছেন সর্বপ্রকার বিরোধ ভুলিয়া অন্তর্নিহিত ঐক্যের ভিত্তিতে মানব-সভ্যতার নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতে। বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর ইহাই মূল কথা।

এই উদারতা তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই দেখা যায়, তথাপি আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে ইহা বর্তমান যুগের প্রধানতম বার্তা সমন্বয়ের বাণীরূপে বিঘোষিত হইয়াছে, সেইজন্য সর্বাপেক্ষা ভয় এইখানেই। চালু মুদ্রাই নকল হইয়া থাকে। উদারতার এই ভাবও নানাভাবে নকল হইতেছে।

নকল ধরিতে হইলে আসলের রূপটি আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। ইতিভাবেও বুঝিতে হইবে, নেতিমুখেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ উদারতা কি এবং কি নয়—দুই-ই বুঝিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-দর্শনে

আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ভাবে দৃঢ় থাকিয়া তবেই অপর সকল ভাবের আদর করা যায়। এটিকে তিনি নিষ্ঠা বলিতেন, নিষ্ঠা ব্যতিরেকে নিজের ভাবই দৃঢ় হয় না। নিজের ভাবের উপরই যাহার নিষ্ঠা নাই, যত্ন নাই, আস্থা নাই, সে আবার অপরের ভাবকে সম্মান করিবে কি! একটি অপূর্ব পারিবারিক দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ এটি বুঝাইয়াছেন, গৃহলক্ষ্মী সংসারের সকলকেই ভালবাসে, কিন্তু নিজের স্বামিপুত্রকে সমধিক ভালবাসে।

সেইরূপ মানুষ নিজের ধর্ম, নিজের সমাজ, নিজের দেশকে আগে ভালবাসিবে, তবে উদারতার প্রয়োগ করিবে। যে নিজের ধর্ম কি জানে না, বুঝে না, তাহার মুখে সর্বধর্মের উপর সমদৃষ্টির কথা ফাঁকা আওয়াজ, যে নিজের জন্মগত ধর্ম কখনও আচরণ করে নাই, অন্য ধর্মের সুখ্যাতি তাহার মুখে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চাটুবাক্য! যে নিজের দেশকে ভালবাসে না, দেশের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর নয়, জনগণের প্রকৃত উন্নতি-সাধনে তৎপর নয়, শুধু বিশ্বসমস্যার সমাধান-স্বপ্নে মশগুল, যে নিজের দেশের ও জাতির স্বার্থে উদাসীন, সে শূন্য আন্তর্জাতিকতার মোহে আচ্ছন্ন, তাহার উদারতা—হয় আত্মপ্রবঞ্চনা, নয় স্নায়বিক দুর্বলতা। যাহার ঘরেই শান্তি নাই, তাহার মুখে বিশ্বশান্তি শোভা পায় না। প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া তবে বিশ্বমৈত্রীর পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

নকল উদারতার একটা মোহ আছে; কারণ উদারতা সর্ববাদিসম্মত একটি মহৎ গুণ, অতএব যদি আমার বহিরাচরণে ও কথায় উদারতা দেখাইতে পারি, লোকে আমায় ঐ সদ্‌গুণের অধিকারী মনে করিবে, আমাকে মহাপ্রাণ মনে করিয়া সম্মান করিবে, এরূপ চিন্তাধারার দুর্বার আকর্ষণ মানুষকে বুঝিতে দেয় না—চিন্তার কোথায় ভুল হইতেছে। দুর্বারতাই দুর্বলতা ধরাইয়া দেয়; সবল ব্যক্তি শক্তি- ও যুক্তি-সহায়ে সংগ্রাম করে, ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যায় না; দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিই বড় বড় ভাবের দোহাই দিয়া বড় বড় কথা বলে, কিন্তু এমন কাজ করে যে, তাহার 'ভাবের ঘরে চুরি' ধরা পড়িয়া যায়।

উদারতার একটি তাত্ত্বিক দিক আছে, একটি ব্যাবহারিক দিক আছে। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অবশ্যই আধ্যাত্মিকতা ইহার ভিত্তি। মানবাত্মার একত্বে বিশ্বাসী না হইলে বা উহা অনুভব না করিলে কেহই ঠিক ঠিক উদার হইতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে কয়জন আর ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছে! তবে কি উদারতা একটি অচল আদর্শ? না, কখনই তাহা হইতে পারে না, কারণ কি রাজনীতিক; কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক ইতিহাস—সর্বত্র দেখা যাইতেছে মানুষে মানুষে মিলিবার চেষ্টাও রহিয়াছে, আবার মানুষে মানুষে বিরোধও হইতেছে। এক কথায় বলা যায়, কতকগুলি মানুষ মিলিত হইয়া আর একদল মানুষের সহিত বিরোধ করিতেছে। ইহারই মধ্যে এক একজন মহামানব উঠিয়া কোন স্থানীয় বিরোধ, সাময়িক বিরোধ দূর করিয়া মানুষকে মহত্তর ভাবের আহ্বানে বৃহত্তর পরিধির অন্তর্ভুক্ত করিতেছেন। এইভাবে জাতি সম্প্রদায় ধর্ম প্রভৃতির সৃষ্টি, সবগুলিরই উদ্দেশ্য মানুষকে সংকীর্ণতা হইতে উদারতার দিকে লইয়া যাওয়া। কিন্তু সাধারণ মানুষ অতি উচ্চ ভাব ধরিতে পারে না, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া একটি ব্যক্তিকে আদর্শ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে হয়।—ইহাই উদারতার ব্যাবহারিক দিক। ইহার পিছনে

যদি তাত্ত্বিক অনুভূতি না থাকে, তবে ঐ অনুসরণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ অনুকরণেই পর্যবসিত হয়।

তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে কোন সীমা না থাকিলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই উদারতার একটা সীমা আছে। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রিক—সর্বত্র নিজের অধিকার এবং মর্যাদা বজায় রাখিয়া আমাদের উদারতা প্রদর্শন করিতে হইবে। কি প্রতিবেশীর সহিত, কি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত অত্যধিক উদারতা কখনই সুফল প্রসব করে না। লোকে উহা দুর্বলতাই মনে করে, এবং তাহার সুযোগ লইয়া সবল দুর্বলকে পীড়ন করে, একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উদারতার মতো অহিংসাও একটি মহৎ আদর্শ বা উচ্চভাব, এবং মনে হয় উহা উদারতারই অঙ্গীভূত, প্রকৃত উদার ব্যক্তিই যথার্থ অহিংসা পালন করিতে পারেন। এমন কি আত্মরক্ষারূপ স্বাভাবিক কর্মেও তিনি পরাঙ্মুখ থাকিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ঐ মহৎ ধর্মের পালন তো অসম্ভব, তাই সর্বত্র না হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা কাপুরুষের অহিংসাতেই পরিণত হয়। ব্যক্তিগতভাবে পালিত হইলে একটি ব্যক্তিই কাপুরুষ হইয়া দুঃখ ও অপমান ভোগ করে, জাতিগতভাবে পালিত হইলে ঐ জাতির অবনতি ঘটে।

অহিংসা বা ক্ষমা করা তাহারই সাজে, যাহার আঘাতের প্রতিঘাত করিবার ক্ষমতা আছে। প্রতিঘাত না করিয়া সহ্য করিবে, ইহা মোক্ষকামীর সাধ্য ব্যক্তিগত ধর্ম। জাতিগতভাবে ইহা পালিত হইলে সেই জাতি অপর জাতি কর্তৃক ক্রমাগত অবমানিত হইতে থাকে, কারণ এত উচ্চ আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেহ ধরিতে পারিবে বা বুঝিয়া পারিয়া আমাদের সম্মান করিবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না—এরূপ আশা করা অন্যায়। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ আমাদের স্মরণীয়: 'ফোঁস করিবে'। ক্ষতি করিতে না চাও না করিও, কিন্তু তোমার যে কিছু করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইতে হইবে।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনে সহ্য করা বা অপ্রতিকার সাধনার বিশেষ অঙ্গ, কিন্তু সংসারীর পক্ষে প্রতিকার করাই ধর্ম। যে সমাজ বা যে রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিকার করিতেছে, বুঝিতে হইবে তাহা প্রাণবন্ত। মিথ্যা উদারতার আবরণে অন্যায় সহ্য করা উচ্চ আদর্শের অপব্যবহার, অথবা বলা যাইতে পারে উচ্চ ভাব যথাযথভাবে জীর্ণ না হইলেই এরূপ অসঙ্গতি দেখা দেয়। নিজের স্বার্থ-সুখের ক্ষেত্রে বা নিজের নামযশের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সচেতন, সে যদি অপরের ক্ষেত্রে—বহুর সুখ-দুঃখ যেখানে জড়িত, সেখানে যদি উদারতা দেখাইয়া বহুর জীবন দুঃখময় করে, তবে এই উদারতাকে—উদাসীনতাকে দুর্বলতাই বলিতে হইবে। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমষ্টিগত জীবনে এই দুর্বলতা দূর করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রকৃত উদারতা বীরের ধর্ম, জ্ঞানীর লক্ষণ। বিকৃত উদারতা দুর্বলতা, আত্মপ্রতারণা, এমন কি আত্মঘাতী। এই উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়া আমাদের জীবন-পথে চলিতে হইবে। আলোকের অতি মৃদু ও অতি তীব্র কম্পন—দুই-ই দৃষ্টির অন্তরালে, বাহ্যত: দুই-ই এক-প্রকার মনে হয় অন্ধকার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ত্র যথেষ্ট তারতম্য আছে। সত্ত্বগুণ ও তমোগুণ বাহ্যত: একই প্রকার দেখায়—ধ্যানকে নিদ্রা, নিদ্রাকে ধ্যান মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ধ্যানে মন সক্রিয় সচেতন, নিদ্রায় নিষ্ক্রিয় অচেতন। উদারতা অহিংসা প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ। সক্ষমের উদারতাই উদারতা, অক্ষমের উদারতা দুর্বলতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অদ্বৈতবাদ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

[ফাল্গুন, ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

অদ্বৈত-বেদান্তের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'বিজ্ঞানে'র কথা অনেক সময়ে বলিতেন এবং ইহাকে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এই জ্ঞানের উপরে স্থান দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'বিজ্ঞান'-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন উক্তিগুলি পড়িলে মনে হয় যে, 'বিজ্ঞান' বলিতে তিনি বুঝাইতেন নির্বিকল্প সমাধির পর জগতের সব কিছুকে ব্রহ্মময় জানিয়া ও দেখিয়া জগতের সঙ্গে সক্রিয় ব্যবহার, জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ। ব্রহ্মের সহিত জগতের পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মানুভব শুধু সমাধিতে নয়, সর্বাবস্থায়, সর্বকালে। প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মকে যেন প্রপঞ্চের মধ্যে নিবিড়ভাবে পাওয়া গিয়াছে!

"'নেতি নেতি' ক'রে আত্মাকে ধরার নাম জ্ঞান। 'নেতি নেতি' বিচার ক'রে সমাধিস্থ হ'লে আত্মাকে ধরা যায়।"

"বিজ্ঞান কি?—না বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান; যে দেখেছে সে জ্ঞানী; যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জানা হয়েছে। ঈশ্বর দর্শন ক'রে তাঁর সহিত আলাপ, যেন তিনি পরমাত্মীয়—এরই নাম বিজ্ঞান।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ২।১৩।১)

"কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।** জীবজগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।" (ঐ—৩।৬।৪)

"শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। তাঁকে চিন্তা ক'রে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।" (ঐ—৩।৯।৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, জগন্মাতা তাঁহাকে বিজ্ঞানীর অবস্থায় রাখিয়াছেন—ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকিবার জন্য। কখনও কখনও তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে শোনা যাইত—'মা, আমাকে বেঁহুশ ক'রো না।' ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে 'বিজ্ঞান' আসিতে পারে না, কিন্তু বিজ্ঞানে টিকিয়া থাকিতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যাখ্যান করিতে হয়! হেঁয়ালির মতো মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবিক ইহা হেঁয়ালি নয়।

অদ্বৈত-বেদান্তের অন্যতম প্রচারক আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন:

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

—কোটি কোটি শাস্ত্র-বাক্যে বেদান্তের যে গূঢ় সত্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আধখানা শ্লোকে বলিতেছি শুন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সকল সমস্যা নিশ্চিতই পূরণ হইয়া যায়। সংসারকে মায়াকল্পিত এবং নিজের আত্মাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত যিনি অভিন্ন জানিতে পারেন, জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে তাঁহার চিরমুক্তি লাভ হয়। বহুতর উপনিষদ্-বাক্য ইহা সমর্থন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা বার বার স্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন জাগে—তাহা হইলে তিনি আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পরে 'বিজ্ঞানের' কথা বলিতেছেন কেন?

'বিজ্ঞানে'র কথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানকে খাটো করেন নাই। 'বিজ্ঞান' যেন সংসারে ব্রহ্মজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। এই বাস্তব প্রয়োগ যে সকলকেই করিতে হইবে বা সকলেই যে উহা করিতে পারিবেন, তাহা নয়। কিন্তু যিনি করিতে পারেন, তাঁহার দিকে আমরা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে না তাকাইয়া পারি না, তিনি সত্যই বাহাদুর। বিশেষ অধিকারীর জন্য বিজ্ঞানীর অবস্থা। নারদ, শঙ্করাচার্য প্রভৃতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিজ্ঞানী' বলিয়াছেন। লোকশিক্ষার জন্য ইঁহারা 'বিদ্যার আমি' অবলম্বন করিয়া লোকহিতকর নানা কর্মে জীবন নিয়োগ করিয়াছিলেন। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' জানিয়া সমাধিতে বুঁদ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। জগতের জন্য ইঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাই সমাধি হইতে নামিয়া আসিয়া ইঁহারা ব্রহ্ম-বুদ্ধিতে মানুষের সহিত ঘর করিয়াছেন—মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হইয়াছেন। 'বিজ্ঞানীর' ভূমিকায় তাঁহাদিগের ভাষা 'জগৎ মিথ্যা' নয়, জগৎ ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে 'বিজ্ঞানী'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"সমাধিস্থ হবার পর, প্রায় শরীর থাকে না। কারু কারু লোকশিক্ষার জন্য শরীর থাকে—যেমন নারদাদির। আর চৈতন্যদেবের মতো অবতারদের। কূপ খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ কেউ ঝুড়ি-কোদাল বিদায় ক'রে দেয়। কেউ কেউ রেখে দেয়—ভাবে, যদি পাড়ার কারুর দরকার হয়। এরূপ মহাপুরুষ জীবের দুঃখে কাতর। এরা স্বার্থপর নয় যে, আপনাদের জ্ঞান হলেই হ'ল।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১।৩।৬)

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঝুড়ি-কোদাল বিদায় করেন নাই, পদব্রজে সারা ভারত ঘুরিয়া সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিজ্ঞানীর অবস্থায় ছিলেন বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে কুঠির ছাদের উপর উঠিয়া 'ওরে ভক্তেরা, কে কোথায় আছিস আয়' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন। তাহারা যখন আসিতে লাগিল, তখন আহার-নিদ্রা ভুলিয়া তাহাদের কল্যাণের জন্য দিবারাত্র সকল শক্তি ব্যয় করিতে লাগিলেন। দেহের হুঁশ থাকে না, তবুও সেই বেহুঁশ দেহটাকে কলিকাতায় টানিয়া লইয়া গিয়া টলিতে টলিতে পথে পথে ভক্তের সেবা করিয়া বেড়াইলেন! নিদারুণ ব্যাধিতে ভুগিতে ভুগিতেও 'বিজ্ঞানী'র স্বধর্ম পালন করিয়াছিলেন—ব্রহ্মের সবিশেষ বিরাট মূর্তির সেবা। পঞ্চবটীর কুটিরে গুরু তোতাপুরীর নিকট বেদান্তমন্ত্র লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মনকে যে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সমাধি যদি আর না ভাঙিত—তাহা হইলে কেমন হইত? পরবর্তী জীবনের বহু পরিশ্রম ও বহু কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতেন। মানবজীবনের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য পরমাত্মার উপলব্ধি এবং তাঁহাতে তাদাত্ম্য-লাভ তো ঘটিয়াছিলই। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি কেহ কাড়িয়া লইতে পারিত না। সত্য কথা। কিন্তু আমরা তাঁহার জীবন-স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইতাম। তাই তিনদিন পরে তাঁহার সমাধি ভাঙিল—আমাদেরই জন্য ভাঙিল। ব্রহ্মজ্ঞানীকে 'বিজ্ঞানী' হইতে হইবে বলিয়া ভাঙিল। 'বিজ্ঞান' স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে বহু হাঙ্গামা পরিশ্রম কষ্টও স্বীকার করিতে হয়। সমাধির সকল উপদ্রব-রহিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের তুলনায় বিজ্ঞানের অবস্থাতে দুঃখ অনেক। কিন্তু 'বিজ্ঞানী' তাহাতে পিছপা হন না। তিনি যে হৃদয়বান্! ভক্তি-ভক্ত লইয়া থাকা, তাহার আনুষঙ্গিক সকল কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করাই তাঁহার কাম্য।

প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুই কি চাস ?' নরেন্দ্র যখন বলিলেন, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব', তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা!' সমাধির পারে যাইতে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে নিশ্চিতই এই 'বিজ্ঞানে'র অবস্থারই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রও উত্তরকালে তাঁহার জীবন, কর্ম ও বাণীর মাধ্যমে জ্ঞানের পারে এই 'বিজ্ঞান'কে আশ্চর্যভাবে বিকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ইহার একটি নূতন নাম দিয়াছিলেন 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত'—কর্মপরিণত বেদান্ত—দৈনন্দিন সংসারে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ। যাঁহারা সমাধি লাভ করিয়া নির্বিকল্প জ্ঞানে তন্ময় হইয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রয়োগের প্রশ্ন উঠে না। তাঁহারা কূপ খুঁড়িয়া ঝুড়ি-কোদাল ফেলিয়া দেন। কিন্তু যাঁহারা প্রতিবেশীর কথা ভাবিয়া ঝুড়ি-কোদাল রাখিয়া দেন, তাঁহাদের পক্ষেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পরও জগতের সেবা করিবার প্রশ্ন উঠে। স্বামী বিবেকানন্দের কাছে এই জগতের সেবা একটি সুমহান্ আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধির বস্তু ছিল। শ্রীগুরুর নিকট তিনি এই ধারণা লাভ করিয়াছিলেন।

যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিজ্ঞানী'র উদাহরণ-স্বরূপ নারদ, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি বিশেষ অধিকারিগণের নাম করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কতকগুলি উপদেশ পড়িলে মনে হয়, তিনি 'বিজ্ঞানে'র অবস্থাটিকে একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যরূপেও উপস্থিত করিতেছেন। সনাতন অদ্বৈতপন্থীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—'তোমার লক্ষ্য কি ?' তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন, 'মায়াকে নিরাস করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করা।' শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার অনুগামী অদ্বৈতসাধকের কাছে এই উত্তর আশা করেন না। তিনি যেন শুনিতে চান—'মায়াকে নিরাস করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান লাভ করিব এবং পরে মায়াকে ব্রহ্মে রূপান্তরিত করিয়া মায়ারূপ ব্রহ্মের সেবা করিব।' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ইহা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দকে করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের নিকট হইতে তাঁহার গুরুভ্রাতা ও শিষ্যবর্গের ভিতর এই আদর্শ সংক্রামিত হইয়াছিল। 'নেতি নেতি' করিয়া জগতের মায়িক রূপকে প্রত্যাখ্যান আবার 'ইতি ইতি' করিয়া জগতের তাত্ত্বিক রূপের অনুধ্যান ও গ্রহণ। নির্বিকল্প সমাধি লাভ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। 'ইতি ইতি'কে 'নেতি নেতি'র মতোই দৈনন্দিন আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে—ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বলিতে চান। 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত'কে আমরা 'সমন্বয়াদ্বৈত' বলিতে পারি—অদ্বৈতের সহিত কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়।

"তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে ? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য।...যতক্ষণ 'আমি'-বোধ থাকে, ততক্ষণ জীবজগৎ মিথ্যা বলবার জো নাই।...ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা নিরাকার সাকার দুই-ই লয়, —অরূপ রূপ দুই-ই গ্রহণ করে।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ৪।২৩।৩)

"বিজ্ঞান হ'লে সংসারেও থাকা যায়। তখন বেশ অনুভব হয় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন, তিনি সংসার ছাড়া নন।" (ঐ—২।১৩।১)

"হনুমান রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'রাম, কখনও ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন ভাবি তুমি সেব্য, আমি সেবক; আর রাম যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।" (ঐ—৩।৯।৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও কখনও 'বিজ্ঞানী'কে 'উত্তম ভক্ত' বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও সপ্তম অধ্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ ভক্ত' বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাঁহাকেই—যিনি ভগবানের সহিত শুধু তাদাত্ম্য বোধ করেন না, সমস্ত জগৎ-সংসারকে ভগবন্ময় দেখেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি নেতি' বিচার ক'রে ছাদে পৌঁছুতে হয়। তারপর সে দেখে ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারি—ইট, চুন, সুরকি, সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব-জগৎ সমস্ত হয়েছেন।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১।৬।৩)

উপনিষদে 'নেতি নেতি' বাক্যের ন্যায় 'ইতি ইতি' বাক্যেরও অভাব নাই। 'বহুত্ব-প্রতীতি মিথ্যা, এক অদ্বয় আত্মবস্তুই সত্য'—ইহা যেমন উপনিষদের শিক্ষা তেমনি 'যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই ব্রহ্ম', ইহাও উপনিষদের ঘোষণা। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের পর সংসারকে যে ব্রহ্মময় দেখা যায়, তাহা মুণ্ডক উপনিষদ্ একটি শ্লোকে চমৎকার বর্ণনা করিতেছেন:

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম
পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং
বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥ ২।২।১১

—সামনে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ব্রহ্ম, পিছনে যাহা আছে তাহাও ব্রহ্ম, দক্ষিণে যাহা কিছু দেখিতেছ তাহা ব্রহ্ম, তথা উত্তর দিকে, নীচে এবং উপরে। সর্বত্রই ব্রহ্ম পরিব্যাপ্ত। এই জগৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু সর্বত্র এই ব্রহ্মানুভব সাধন-জীবনের প্রথমেই আসিতে পারে না। প্রথমে জগতের উপর অজ্ঞান-দৃষ্টি অর্থাৎ নানাত্ববুদ্ধি দূর করিতে হইবে। ইহাই 'নেতি নেতি'র পথ। নানাত্ব-বুদ্ধি দূর হইলে নানাত্বের অধিষ্ঠান ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর যাহা 'নানা' বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম তাহাও যে ব্রহ্ম—এই উপলব্ধি আসে।

উপনিষৎ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন-রূপ শেষোক্ত এই উপলব্ধির কথা বলিলেও ঐ উপলব্ধি পুরঃসর সক্রিয়ভাবে জগতের সহিত ব্যবহারের বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ করেন নাই (অন্ততঃ প্রধান উপনিষদ্গুলিতে)। অথচ এইরূপ ব্যবহার যে সম্ভবপর তাহা ভারতবর্ষের ধর্মেতিহাসে বিভিন্ন আধিকারিক পুরুষের জীবনে সুপরিস্ফুট। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানের পর 'বিজ্ঞান'-এর কথা বলিয়া এই ঘটনাটিরই প্রামাণিকতা খ্যাপন করিয়াছেন। নিজেও 'বিজ্ঞানী'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রুতি যদি আত্মজ্ঞানলাভকেই আধ্যাত্মিক জীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে জ্ঞানের পর 'বিজ্ঞান' শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তিদ্বারা ঐ সার্থকতা ব্যাহত হয় নাই। 'বিজ্ঞান' সংসারের আত্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রয়োগমাত্র, ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। উহা কিছু নূতন সার্থকতা নয়। বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান লাভ করিলেই পরম পুরুষার্থ—মুক্তি সিদ্ধ হয়। মানুষের ব্যক্তিগত সার্থকতার দিক দিয়া ইহাই পর্যাপ্ত। তবে যে মুক্তপুরুষ হৃদয়ের করুণাবৃত্তির জন্য মুক্তিলাভের পর অপরের মুক্তির জন্য নিজের দেহমনকে ব্যাপৃত করেন, মায়িক সংসারে ব্রহ্মদৃষ্টি আনিয়া মানুষের সেবায় তৎপর হন, সেই মুক্তপুরুষ আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগের পাত্র। ইঁহারাই

'বিজ্ঞানী'। ইঁহারা জ্ঞানী হইয়াও 'ভক্তি ও ভক্ত' লইয়া থাকেন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এইরূপ যথার্থ বিজ্ঞানী হওয়া উচ্চ আধিকারিক পুরুষদের পক্ষেই সম্ভবপর, তবু তিনি সাধারণ বেদান্ত-সাধকদের জন্যও এই আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'নেতি' এবং 'ইতি' দুই পথেরই সমান্তরাল অভ্যাস। সাধন-জীবনে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান যখন লাভ হয় নাই, উহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে মাত্র, তখন এই 'বিজ্ঞান'-এর অভ্যাসকে বিশিষ্টাদ্বৈত সাধনা বলা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশিষ্টাদ্বৈতকে চরম সিদ্ধান্ত না বলিলেও উহার অনুশীলনকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'বিজ্ঞান'-এর যেন অপরিণত আভাস। পুরাপুরি 'বিজ্ঞান' ব্রহ্মজ্ঞানের পর আসে এবং কতিপয়ের জীবনেই আসে। বিশিষ্টাদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী যে-কোন অদ্বৈত-সাধক অভ্যাস করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সরল উদাহরণ সঙ্গীতে স্বরের আরোহণের সময় 'সা রে গা মা' করিয়া গলা যখন উঁচু সা-তে পৌঁছায়, তখন সেখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, আবার 'নি ধা পা মা' করিয়া নীচে নামিয়া আসিতে হয়। বেদান্ত-সাধককেও সেইরূপ 'নেতি নেতি' বিচার করিয়া নির্বিকল্পে পৌঁছিয়া পুনরায় সবিকল্পে নামিয়া আসিতে হয়। তখন যদি তিনি ব্রহ্ম-'জীবজগৎ-বিশিষ্ট', 'সংসার তাঁহারই লীলা' এইরূপ ধারণা অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহার বেদান্ত-সাধনায় একটি সহজতা ও বৈচিত্র্য আসে। অদ্বৈতের সহিত এইরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতের অনুশীলন শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী অদ্বৈতবাদের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যে-যুগের ধর্মাচার্য হইয়া আসিয়াছেন অর্থাৎ আমাদের এই বর্তমান যুগ—এই যুগ জগৎ-সংসারকে মিথ্যা বলিতে একান্তই নারাজ। জগৎ-রূপ খেলনা হাতের কাছে না থাকিলে এই যুগের সুসভ্য বিজ্ঞ-শিশুগণের ক্রন্দন এবং হাত-পা ছোঁড়ার অন্ত নাই। অতীন্দ্রিয় সত্যের অনুশীলনে তৎপর হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনকে পাশ্চাত্যের ধুরন্ধর পণ্ডিতগণের নিকট কতই না গালভরা সমালোচনা ও কটুকথা শুনিতে হইতেছে! শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সমন্বয়ী অদ্বৈতবাদ এই শিশুগণকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারিবে। হাঁ, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। তবে ভয় নাই, ধৈর্য হারাইও না। ব্রহ্মে পৌঁছিয়া আবার জগৎকে ফিরিয়া পাইবে—ব্রহ্মরূপে ফিরিয়া পাইবে। সেই ব্রহ্মময় জগতে যত খুশি লম্ফ ঝম্ফ কর, হাত-পা ভাঙিবে না।

স্বামীজীর স্বাদেশিকতা ও স্বজাতিপ্রেম

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

জাতির ব্যক্তিত্ব জাতীয় জীবনের মূলধন

স্বামীজীর অমূল্য ভাবসম্পদের অনেকাংশ তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তারিখে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে (মঠের সমস্ত গুরুভাইদের উদ্দেশে) একখানি পত্রে লিখেছেন :

'We as a nation have lost our individuality, and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and raise the masses. The Hindu, the Mahomedan, the Christian—all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside i.e. from the orthodox Hindus'.

—জাতি-হিসাবে আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি এবং ভারতবর্ষে এটাই হচ্ছে সকল অনর্থের মূল। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জাতির ব্যক্তিত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং জনসাধারণকে টেনে উপরে তোলা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান [পুরোহিত শাসকশ্রেণী]—সবাই তাদের পদদলিত করেছে। তাদের আবার টেনে তোলবার শক্তি ভিতর থেকেই অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুসমাজ থেকেই আসতে হবে।

ইটালিদেশীয় ম্যাটসিনি আধুনিক যুগে জাতীয়তাবাদের (ন্যাশন্যালিজমের) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ব'লে পরিগণিত। ন্যাশন্যালিজমের যে আদর্শ তিনি স্থাপন ক'রে গিয়েছেন, তাতে কোন ক্ষুদ্রতা · সংকীর্ণতা উগ্রতা কিংবা পরজাতি-বিদ্বেষের স্থান নেই। সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, জাতীয়তা (nationalism) হচ্ছে কোন বিশেষ জনসমষ্টির আত্মচেতনাবোধ কিংবা স্বাতন্ত্র্যবোধ (Nationalism is the individuality of peoples.)। সমগ্র মানবসমাজকে ম্যাটসিনি একটি 'Being'-রূপে (চেতনসত্তারূপে) কল্পনা করেছেন; বিভিন্ন জাতি সেই বৃহৎ সত্তার অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তা। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে; নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ক্রমপ্রস্ফুটনের দ্বারা প্রত্যেকেই সমগ্র মানবসমাজকে সমৃদ্ধ ক'রে চলেছে। সকলেই স্বতন্ত্র অথচ পরস্পরের সহিত যুক্ত। যখন কোন জাতি তার প্রকৃতি এবং স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সে তার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তখন আর তার মানবসমাজকে দেবার মতো কিছু থাকে না, তাঁর বেঁচে থাকাই হয় নিরর্থক এবং বিড়ম্বনাময়।

ভারতের ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিকতায়

স্বামীজী আমাদের জাতির ও সমাজের 'ব্যক্তিত্বে'র কথা ব'লে গেছেন, জাতীয় প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়ে তোলবার কথা ব'লে গেছেন। এই বৈশিষ্ট্যটা কি,—তা সব সময় স্মরণ রাখা দরকার। স্বামীজী বারংবার খুব জোরের সহিত ব'লে গিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং পরম সম্পদ্। যে বৈশিষ্ট্য আমাদের জাতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে ছিল, তা আমাদের নিজের চোখে সহজে ধরা না পড়লেও তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন এবং হৃদয়বান্ বিদেশীদের পক্ষে

সহজেই ধরা পড়বার কথা। বস্তুতঃ হয়েছেও তাই, বিদেশী মনীষীরা অনেকেই এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন। আমরা শুধু আচার্য ম্যাক্সমূলারের উক্তি এখানে উদ্ধৃত ক'রব। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাক্সমূলার একটি খুব চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা মুষ্টিমেয় প্রতিভাশালী ব্যক্তির অবদান নয়, এ যেন সমগ্র হিন্দুজাতির একযোগে একটা বিশেষ প্রণালীতে জীবনযাপন ও সাধনার ফল।

'Indian Philosophy [is] throughout the work of the people, rather than that of a few gifted individuals. As far back as we can trace the history of thought in India, from the time of King Harsha and the Buddhist pilgrims back to the description found in the Mahabharata, the testimonies of Greek invaders, the minute accounts of the Buddhists in their Tripitaka, and in the end the Vedas, we are met every where by the same picture,—a society in which spiritual interests predominate and throw all material interests into the shade, —a world of thinkers, a nation of Philosophers ?'

—ভারতীয় দর্শন পূর্বাপর ভারতীয় জনসাধারণের সৃষ্টি ; স্বল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তির রচনামাত্র নয়। অতীতে ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসের দিকে যতদূর আমরা তাকাই,—সম্রাট্ হর্ষবর্ধন ও চীনা পরিব্রাজকদের আমল থেকে শুরু ক'রে মহাভারতের্র বর্ণনা, গ্রীক আক্রমণকারীদের সাক্ষ্য, ত্রিপিটকে বৌদ্ধদের দ্বারা লিপিবদ্ধ খুঁটিনাটি বিবরণ, পরিশেষে উপনিষদ্ এবং বেদের সংহিতা পর্যন্ত অনুধাবন করলে একই চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। আমরা দেখতে পাই এমন একটি সমাজ যাতে আধ্যাত্মিক কল্যাণের চিন্তাই মুখ্য এবং তার তুলনায় পার্থিব সবরকম অভ্যুদয়ের ব্যাপারই গৌণ ; আমরা দেখতে পাই একটা মননশীলতার জগৎ, একটা দার্শনিকের জাতি।

পাছে এই জাতিকে কেউ স্বপ্নবিলাসী ব'লে অবজ্ঞা করেন, তার নিবারণকল্পে আচার্য ম্যাক্সমূলার লিখেছেন : 'Let them be called dreamers, but dreamers of dreams without which life would hardly be worth living'. —তাদের স্বপ্নবিলাসী বলতে চাও বলো, কিন্তু এমন স্বপ্ন তারা দেখেছে, যা বাদ দিলে জীবনের মূল্য কিছুই থাকে না।

সমস্ত দেশ জুড়ে সর্বসাধারণের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক ভাব পরিব্যাপ্ত ছিল, সহস্রবর্ষব্যাপী পরাধীনতায় এবং অত্যাচার-উৎপীড়নেও তা একেবারে বিনষ্ট হয়নি। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী এই সনাতন ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়েছিলেন এবং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, দাসত্ব ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আধ্যাত্মিকতার শেষ সম্বলটুকুও নিঃশেষিতপ্রায়। তদুপরি পাশ্চাত্যের ইহৈকসর্বস্ব সভ্যতার প্রলোভন হচ্ছে আর এক মহা বিপদ্।

হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার উপায় : দেশমাতৃকার ধ্যান।

হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন যে, একদিকে রজোগুণের অনুশীলনের দ্বারা দারিদ্র্যকে দূরীভূত করতে হবে, অন্য দিকে ভোগলালসা ও শক্তিলোলুপতা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। এই কঠিন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশই স্বামীজী দিয়েছেন। কিন্তু এই পথ ধরে চলবার মতো বলবীর্য ও সাহস আসবে কোথা থেকে? স্বামীজীর মতে শক্তি ও

সাহসের উৎস একটি হচ্ছে আত্মজ্ঞান, আর একটি হচ্ছে দেশমাতৃকার মহিমময় মূর্তির ধ্যান। 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধের শেষাংশে ভারতের এই ধ্যানমূর্তির ছবিই স্বামীজী এঁকেছেন এবং ভারতমাতার জন্য সর্বস্বত্যাগের ব্যাকুল আহ্বান জানিয়েছেন।

'আনন্দমঠে' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে চৈতন্যময় সত্তারূপেই বর্ণনা করেছেন। 'স্বদেশ' বলতে শুধু একখণ্ড জমি কিংবা জনসমষ্টি বুঝায় না। দেশ শুধু রূপকচ্ছলেই মা নন,—দেশ এবং সমাজ সত্য সত্যই 'মা'—জগজ্জননীরই অন্যতম প্রকাশ। স্বামীজী উদাত্তস্বরে ভারতবাসীকে ডেকে বলেছেন: ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র।

এই সূত্র ধরেই বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'Soul of India' পুস্তকে 'আনন্দমঠে'র দেশমাতৃকামূর্তির এবং 'India—the Mother' কথার ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতবর্ষের একটি চিন্ময় রূপ আছে, যা প্রত্যেক খাঁটি ভারতবাসীর নিকটই ধ্যানের বস্তু এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সর্ববন্ধনমুক্ত হয়েও এই চিন্ময় ভারতের রূপে মুগ্ধ, স্নেহপাশে বদ্ধ। হিন্দু কিংবা হিন্দুভাবাপন্ন জাতি ব্যতীত অপর জাতির পক্ষে মহামায়ার ছায়ারূপিণী এই চিন্ময়ী ভারতমাতার ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। আমরা নিজেরাই মোহগ্রস্ত এবং এই ধারণা থেকে বিচ্যুত। আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙবার প্রয়াসেই স্বামীজী নিজের জীবন আহুতি দিয়ে গিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই আমরা স্বামীজীর বেদান্তপ্রচার, হিন্দুধর্মকে জয়িষ্ণু করবার জন্যে বিপুল কর্মোদ্যম এবং তাঁর স্বদেশপ্রেম, জনসেবা প্রভৃতির মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র, সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য দেখতে পাই।

স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম

ভারতবর্ষের আদর্শ কি, বৈশিষ্ট্য কোথায়, ভারতবাসীর পক্ষে স্বদেশপ্রেমের মূল উৎস কোথায়—ইত্যাদি সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণার যৎসামান্য পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিকের লক্ষণ এবং স্বদেশপ্রেমের সোপান-সম্পর্কে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বাণী বিগত চৈত্রমাসের 'উদ্বোধনে'র প্রারম্ভেই উদ্ধৃত হয়েছে; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দেশের অগ্রগতির জন্য কি কি প্রয়োজন, তৎসম্পর্কে একখানি পত্রে কাথিয়াওয়াড়ের হরিদাস বিহারীদাসজীকে তিনি লিখেছিলেন:

'বড় হ'তে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে তিনটি জিনিস প্রয়োজন: (১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস (২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব (৩) যাঁরা সৎ হ'তে কিংবা সৎকাজ করতে সচেষ্ট, তাঁদের সহায়তা।'

সর্বোপরি প্রয়োজন দেশে সৎশিক্ষা বিস্তারের। সৎশিক্ষার উপর, চরিত্র গঠন ও মানুষ তৈরির উপর স্বামীজী কত অধিক জোর দিতেন তা বলা অনাবশ্যক; স্বামীজীর বাণী ও রচনার সহিত যাঁদের স্বল্পমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরাও তা জানেন।

স্বদেশ, স্বজাতি ও হিন্দুসমাজকে স্বামীজী কত গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং কোন্ ভিত্তিভূমির উপর দেশ ও সমাজকে তিনি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন, তা আজকের দিনে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। হিন্দুসমাজকে তিনি অর্ণবপোতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাদ্রাজের যুবকবৃন্দকে উদ্দেশ ক'রে তিনি বলছেন: 'হে আমার স্বদেশবাসিগণ, হে আমার বন্ধুগণ,

হে আমার সন্তানগণ, ভেবে দেখ আমাদের এই জাতীয় অর্ণবপোত কত কোটি কোটি মানবকে জীবনসমুদ্রে পারাপার ক'রে আসছে। কত কীর্তিসমুজ্জ্বল শত শত বৎসর ধরে জীবনসমুদ্রে এর চলাচল, এবং বুকের উপরে ক'রে কত অগণিত যাত্রীকে এ অপর তীরে অমৃতধামে বয়ে নিয়ে গিয়েছে। আজ হয়তো তোমাদেরই দোষে তরী একটু জখম হয়েছে, তলদেশে কোথাও একটু ছিদ্র হয়েছে। তার জন্যে তোমরা কি তরীকে নিন্দা করবে? আমরা তো এই সমাজেরই সন্তান। আমাদের জাতীয় অর্ণবপোত, আমাদের এই সমাজ-তরণীতে যদি ফুটো হয়ে থাকে, তবে চল আমরা এগিয়ে যাই এই ফুটোগুলো বন্ধ করতে। আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত যেন এ-কাজে লাগাই, আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে যেন ছিপি তৈরি করি। সফলকাম না হই, না হলাম; চল, প্রাণ আহুতি দিই। কিন্তু সাবধান! এই মহৎ তরণীর বিরুদ্ধে একটি নিন্দা, একটি তিরস্কারবাক্য আমাদের মুখ থেকে যেন না বেরোয়।···হে সন্তানগণ! তোমরা যদি আমার কথা গ্রাহ্য না কর, এমন কি, আমাকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দাও, তবু আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব এবং সত্য যা, তা ঘোষণা ক'রব; —ব'লব, আমরা সবাই তো ডুবতে বসেছি! আজ আমি তোমাদের মাঝখানে বসবার জন্যেই এসেছি। যদি ডুবতে হয়, সকলেই যেন এক সঙ্গে ডুবি; কিন্তু কোন কটূক্তি যেন আমাদের ওষ্ঠ থেকে নির্গত না হয়।'—'আমার সমরনীতি'-বিষয়ক বক্তৃতা

স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনই হচ্ছে দেশকে একতাবদ্ধ, উন্নত এবং শক্তিমান্ করবার একমাত্র উপায়। বহু স্থলে তিনি এ-কথা বলেছেন যে, ধর্মের মধ্যেই আমাদের জাতির প্রাণপাখি এবং ধর্মকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকার দরুনই জাতি-হিসাবে আমরা টিকে রয়েছি।

'ভারতের ভবিষ্যৎ'-শীর্ষক বক্তৃতায় এক জায়গায় তিনি বলছেন:

বিদেশী আক্রমণকারী মন্দিরের পর মন্দির ধূলিসাৎ করেছে, কিন্তু যেমনি এক একটা উৎপাতের ঝড় থেমেছে, অমনি নূতন মন্দিরের চূড়া আবার আকাশে মাথা তুলেছে। দক্ষিণ ভারতের কত মন্দির এবং গুজরাটের সোমনাথ-মন্দিরের ন্যায় অন্যান্য মন্দির থেকে তোমরা প্রচুর শিক্ষা পেতে পারো। জাতির ইতিহাস-সম্পর্কে বই পড়ে যা কখনও পাবে না, তার চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্দৃষ্টি তোমরা পাবে এই সমস্ত মন্দির প্রত্যক্ষ ক'রে। তাকালেই দেখবে কত ধ্বংস, কত পুনরুত্থানের পরিচয় তারা তাদের ক্ষত-বিক্ষত দেহে ধারণ ক'রে রয়েছে। যতবার বিধ্বস্ত হয়েছে, ততবারই যৌবনের তেজ ও বলবীর্য নিয়ে আবার মাথা খাড়া করেছে। এটাই হ'ল জাতীয় চিত্তের, জাতীয় জীবনস্রোতের প্রকৃত পরিচয়। এই জীবনস্রোতে ভেসে চল, সম্মুখে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই স্রোত পরিত্যাগ কর, পরিণাম মৃত্যু; যে মুহূর্তে এই জীবনস্রোত থেকে সরে দাঁড়াবে, তার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে মৃত্যু এবং ধ্বংস। আমি বলছি না যে, আর কোন কিছুরই দরকার নেই। আমি এমন বলি না যে, রাজনীতিক বা সামাজিক উন্নতি অপ্রয়োজনীয়; কিন্তু আমি বলতে চাই এবং তোমরা এটা মনে গেঁথে নাও যে, এদেশে এগুলো গৌণ, ধর্মসাধনাই মুখ্য।

ভারতবর্ষের সেবা এবং ধর্মের সাধনা স্বামীজীর দৃষ্টিতে একই বস্তু। এই বক্তৃতায়ই শেষাংশে তাই বলছেন:

দাসের স্থায় আচরণ ক'রো না। আগামী পঞ্চাশ বৎসর এটাই হবে আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র—অর্থাৎ আমাদের গরীয়সী ভারত-মাতার সেবা। আপাততঃ অন্য সকল দেবতার মূর্তি আমাদের মন থেকে মুছে যাক। ইনিই একমাত্র জাগ্রৎ দেবতা,—আমাদের জাতি ও সমাজের মধ্যে ইনিই বিরাজিত, সর্বত্র এঁর পাণিপাদ, সর্বত্র এঁর চক্ষু, সর্বসমাজ-শরীর ইনিই আবৃত ক'রে রয়েছেন। আর যত দেবতা তারা এখন নিদ্রিত। যে বিরাট দেবতা আমাদিগকে চারিদিকে ঘিরে আছেন, তাঁকে ছেড়ে অপর বৃথা দেবতার অন্বেষণে কেন আমরা ঘুরে বেড়াব? যখন আমরা ঠিকভাবে এঁর উপাসনা করতে পারব, তখন অন্যান্য দেবতার উপাসনা সহজ হয়ে যাবে।

সত্যিকার দেশপ্রেমিকের যে যোগ্যতা ও গুণাবলী নিতান্তই থাকা উচিত ব'লে স্বামীজী ব্যাখ্যা করেছেন, সেই সমস্ত যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী হয়ে যদি নিষ্ঠার সহিত একাদিক্রমে ৫০ বছর ধরে আমরা দেশের সেবা করি, তবেই দেশ তার হারানো সত্তা ফিরে পাবে, আমাদের অবরুদ্ধ জীবনস্রোত আবার তার স্বকীয় ছন্দে প্রকৃতিনির্দিষ্ট খাতে তরতর বেগে প্রবাহিত হবে। এই ছিল স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা। এ সকল বক্তৃতা যখন তিনি দিয়েছিলেন, তখন থেকে প্রায় ৬৫ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। জাতির হারানো সত্তাকে কি আমরা ফিরে পেয়েছি, অথবা স্বামীজীর কথা হৃদয়ে গ্রহণ ক'রে সেই চেষ্টায় কি নিজেদের নিয়োজিত করেছি?

অবস্থার পরিবর্তন

বিগত অর্ধশতাব্দীতে আমাদের চিন্তা-ধারা ও আকাঙ্ক্ষার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বদলেছে, রুচি বদলেছে। সর্বোপরি একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বামীজী বলেছিলেন যে, এদেশে ধর্মের ভিতর দিয়ে না এলে কোন বিষয় লোকের মন জয় করতে পারে না। এমন কি, রাজনীতি, সমাজনীতিও ধর্মের মোড়কে পুরে পরিবেশন করতে হয়। বিগত ৫০ বৎসরে চাকা সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে। এখন অধ্যাত্মবিদ্যাও পলিটিক্সের ভিতর দিয়ে না দিলে মুখরোচক হয় না। পলিটিক্স জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে—এমনি রাষ্ট্রের আওতায় আমরা বাস করছি!

ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন একদল ত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী, যাঁরা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উভয় প্রকার শিক্ষাদানকে, পরা ও অপরা উভয় প্রকার বিদ্যাদানকেই জীবনের ব্রত ব'লে গ্রহণ করবে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে, বাধামুক্ত-ভাবে তারা এই কাজ করবে। এই শিক্ষাদ্বারা দেশে এমন এক নবজাগরণ আসবে, যার ফলে লোকের আধ্যাত্মিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত হবে। একখানি পত্রে স্বামীজী বলেছেন:

'আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটি যন্ত্র চালাইয়া যাইব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর পুরুষই হউক, আর নারীই হউক—নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করিবে।'—এই হচ্ছে স্বামীজীর লোকশিক্ষার পরিকল্পনা। রাষ্ট্রের আদর্শের সহিত এবং বর্তমানে দেশে যেভাবে ও যে-ধরনের শিক্ষাবিস্তার হচ্ছে, সেই ব্যবস্থার সহিত স্বামীজীর আদর্শের কতটুকু মিল আছে, তা ভাববার সময় এসেছে। আমরা যে স্বাদেশি-কতার কথা বলি, স্বদেশের উন্নতির যে-সমস্ত

ধারণা মনে পোষণ এবং মুখে প্রচার করি, সেই স্বাদেশিকতা ও স্বামীজীর স্বাদেশিকতা কি একই বস্তু? তাও আজ গভীরভাবে চিন্তনীয়।

পরিবর্তনশীল জগতের স্বাভাবিক নিয়মে প্রত্যেক আদর্শই কালক্রমে ম্লান হয়ে যায়, কিংবা দেশকালপাত্রের অনুপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণে তাকে মাঝে মাঝে ঘষে চকচকে করতে হয়, কিংবা নূতন রূপ দিতে হয়। যেগুলি অশাশ্বত, সেগুলির পরিবর্তন পরিবর্জন কিংবা সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। জাতির ব্যক্তিত্ব, জাতির বৈশিষ্ট্য, জাতির আদর্শ, জাতীয় উন্নতির উপায় প্রভৃতি বিষয়ে স্বামীজী যে-সমস্ত অভিমত প্রকাশ ক'রে গেছেন, সেগুলি কি বর্তমান অবস্থায় উপযোগী? যদি না হয়, তবে তা অকপটে স্বীকার করাই উচিত। বৃথা স্তোকবাক্য এবং মৌখিক সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা আমাদের নিজেদের হীনতা প্রতিপাদন ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। আর যদি আমরা মনে করি যে, স্বামীজীর আদর্শ এবং পন্থা বস্তুতঃ অনুপযোগী হয়ে পড়েনি,—এখনও সমানভাবে উপযোগী, তবে বর্তমান অবস্থায় আমাদের কি করণীয়, তাও বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়।

'আকাশে যদি আনন্দ না থাকিত'

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

যুগান্তের পার হ'তে ভেসে আসে শুনি—
বিমুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে অজানা কে মুনি
তপোভঙ্গে কহিলেন, এ বিশ্বভুবন
ঊর্ধ্বে নীলাকাশ নিচে নদী গিরিবন
দিনের আলোক লোক, রাত্রির তিমিরে
আনন্দ-পরশে তব যদি নাহি ঘিরে
রাখিতে হে বিশ্বদেব, হে ভুবননাথ,
আলোক-আঁধারময় তব দুই হাত

যদি না করিত পূর্ণ—দিবা বিভাবরী
এই পৃথিবীর পথ—আনন্দেতে ভরি,—
এ আকাশে সে প্রসাদ থাকিত যদি না—
হে সুন্দর, কে বাঁচিত সে অমৃত বিনা!

আজিও ভুবনে ভাসে তোমারি প্রণাম,—
'এ আনন্দ বিনা প্রভু কিসে বাঁচিতাম।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের রূপায়ণ

[পূর্বানুবৃত্তি—চৈত্রসংখ্যার পর]

শ্রীমতী সুধা সেন

জগন্নাথ ও মাধব ছিলেন অজ্ঞান, অবিদ্যায় আবৃত ছিল তাঁহাদের চিত্ত, কিন্তু পরমপুরুষের কৃপাবারি-সিঞ্চনে সে অবিদ্যা দূর হইয়া গেল। মুহূর্তে নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইলেন। কিন্তু বিদ্যা দূর হইবে কিসে? নাম কি সাধককে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে লইয়া যাইতে পারেন, পারেন কি আনন্দ-সমুদ্রের সন্ধান দিতে? কেবল বিদ্যা তথা শুষ্ক জ্ঞানের সাধ্য নাই সেই প্রেম, সেই আনন্দ দান করিতে; প্রভু বলেন, এক নামেরই আছে সেই সাধ্য। অথচ কি দুর্দৈব, সেই নামেই জীবের রুচি হইল না।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

(মহাপ্রভু-কৃত দ্বিতীয় শ্লোক)

—ভগবান্ বহুভাবে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত নামে নিজের সর্বশক্তি ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই নামের স্মরণ-বিষয়ে (দেশ-) কাল-সম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধই নাই। হে ভগবান! এমনই তোমার কৃপা; কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।

যিনি এক, তিনিই আপনাকে নানা বিচিত্র রূপে প্রকাশিত করিতেছেন—'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'। (শ্রুতি—গোপালতাপনী ৩।২)। বিচিত্র তাঁহার প্রকাশ, বিভিন্ন তাঁহার নাম, কিন্তু সকল নামের আশ্রয় সেই একমাত্র নামী। নাম নামীকেও নামাইয়া আনেন, ভক্তের হৃদয়কেও নমনীয় করিয়া তোলেন। জীবের পরম কাম্য প্রেমধন লাভ হয় শুধু নামেরই আশ্রয়ে, এবং তাহাই জীবের পরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ।

প্রভু বারাণসীতে আসিলেন, বৃন্দাবনের যাতায়াতের পথে দুইবারই কিছুকাল তথায় রহিলেন। নাম চিন্তামণি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহাতেই মগ্ন হইয়া আছেন প্রভু; কানে আসে তীব্র নিন্দা, কিন্তু নীরবে তাহা উপেক্ষা করেন।

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী অদ্বৈত-বৈদান্তিক। নির্গুণ ব্রহ্মই তাঁহার প্রতিপাদ্য; শ্রীভগবানের চিন্ময় আনন্দ-বিগ্রহও তাঁহার কাছে 'মায়িক'। কাজেই নামসংকীর্তন তাঁহার কাছে মাত্র 'ভাবকালি' অর্থাৎ নেহাৎ ভাবালুতা-মাত্র।

বারাণসীর সন্ন্যাসী-সমাজে আপন মহিমায় সমাসীন প্রকাশানন্দ; সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে বিঁধিতেছেন অলক্ষ্যে 'ভাবুক' সন্ন্যাসীকে, 'মূর্খ! একদল লোক লইয়া কীর্তন করিয়া বেড়ায়, সন্ন্যাসীর যাহা ধর্ম—বেদান্ত-পাঠ তাহাই সে করে না, কে এই কৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী অর্বাচীন সন্ন্যাসী?' শুনিয়াছেন পরম পণ্ডিত পরম বেদান্তী বাসুদেব সার্বভৌমও এই ভাবুক সন্ন্যাসীর পথগামী হইয়া এখন ভক্তি-পথকেই শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সেই রসেই মত্ত হইয়াছেন—তাই বোধ করি প্রকাশানন্দের অধিক বিরক্তি, অধিক তিক্ততা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া প্রকাশানন্দ স্বামী বলিলেন—কাশীতে এই সমস্ত 'ভাব-কালি' বিকাইবে না, ইহা অদ্বৈত-জ্ঞানের রাজ্য।

প্রভুর নিন্দা শুনিতে হয়—তপন মিশ্র ও শূদ্র চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তের হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠে, প্রভুকে দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রতিকার তো কিছু হয়ই না—প্রভু নীরব হইয়া থাকেন।

অল্প কিছুদিন বাস করিয়া প্রভু বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় আসিলেন বারাণসী। সমস্ত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, বাকী আছে কাশী—অদ্বৈত-জ্ঞানের কঠিন স্থান; যদি এখানেও রসের সঞ্চার না করিতে পারিলেন, তবে বৃথাই তাঁহার অবতরণ, বৃথাই তাঁহার রস-মাধুর্য।

'অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ'—এ সত্য মহাপ্রভু একাধিক বার উচ্চারণ করিয়াছেন। নবদ্বীপে 'অষ্টপ্রহর'-কালীন ঐশ্বর্য-প্রকাশে এবং আরও কয়েকদিন বহুবার নিজেকেই তিনি 'মুঞি সেই, মুঞি সেই' বলিয়া ব্রহ্মবস্তুর সহিত অভেদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়াছেন দশনামী সম্প্রদায় হইতেই। ব্রহ্মের একত্ব বা অদ্বৈতবাদে প্রভুর সংশয় নাই, তিনি তাহা নিজেই জানেন, কিন্তু তিনি জানেন—'বাঁশির একটি রন্ধ্রেই সমস্ত সুর বাজে না, সাতটি রন্ধ্রে সাতটি সুর লইয়াই বাঁশি বাজানোর সার্থকতা—বাঁশির সৌন্দর্য মাধুর্য।' বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীসনাতন আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রায় দুইমাস-কাল যাবৎ প্রভু তাঁহাকে আপনার কাছে রাখিয়া অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব—কিন্তু রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর বর্ধিত সন্ন্যাসী-সমাজের সমালোচনা তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিল না। কিন্তু স্পর্শ করিল প্রভুভক্ত মহারাষ্ট্রী বিপ্রকে। তিনি প্রভুনিন্দা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একদিন কাশীবাসী প্রায় দশ সহস্র সন্ন্যাসীকে তিনি আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তারপর আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলিতে দুলিতে উপস্থিত হইলেন প্রভুর কাছে—ভয়, পাছে প্রভু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু প্রভু ঈষৎ হাসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু!

বিপ্রের পত্রপুষ্প-সুসজ্জিত, অগুরু-ধূপ-চন্দন-সুরভিত অঙ্গনে উচ্চাসনে বসিয়াছেন জ্ঞানোজ্জ্বল—স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী; পাদপীঠতলে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দীপ্তি পাইতেছে।

এমন সময়ে তপঃকৃশ সুকুমার উজ্জ্বল তনুখানি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন—দীনাতিদীনের মতো।

ক্ষীণ শীর্ণ তনু কিন্তু যেন 'কোটি সূর্য প্রভাময়'—মুগ্ধ সন্ন্যাসী-সমাজ 'হা-হা' করিয়া উঠিলেন। প্রকাশানন্দও বিচলিত হইলেন, বলিলেন, 'এ কি! তুমি ওই স্থানে বসিলে কেন? এইখানে আমার নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ করো।'

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র হাস্যে প্রভু বলিলেন, তিনি ভারতী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, কাজেই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ী (সরস্বতী) সন্ন্যাসী-সমাজে বসিবার যোগ্যতা বা অধিকার তাঁহার নাই। 'নমো নারায়ণ' সন্ন্যাসীদের এই চিরন্তন সম্ভাষণ করিয়া প্রকাশানন্দ স্বহস্তে প্রভুকে তুলিয়া

আনিয়া নিজের অতি সন্নিকটে বসাইলেন। প্রভুর রূপলাবণ্য ও বিনয়নম্র ব্যবহারে প্রকাশানন্দের অন্তর দ্রবীভূত হইল, বলিলেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য! নারায়ণ-সম তোমার অঙ্গকান্তি, তুমি কেন হীন হইবে?' হয়তো বা পরম সুকুমার এই তরুণের প্রতি প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর একটু বাৎসল্যের সঞ্চার হইল!

—বলিলেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য; তোমার আকৃতি সুন্দর, বাক্য সুন্দর; তুমি সন্ন্যাসী, তবে কেন তুমি বেদান্ত না পড়িয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছ?'

সকরুণ মধুর হাস্যে প্রভু বলিলেন: বেদান্ত আলোচনা বা পাঠ করার অধিকার ও যোগ্যতা আমার হয় নাই, তাই আমার গুরু আমাকে কৃষ্ণ-মন্ত্র দান করিলেন। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'—এই শ্লোকটিও কণ্ঠস্থ করাইয়া আমার গুরু বলিলেন—'এই হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে করিতেই আমার সিদ্ধি লাভ হইবে। গুরুবাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা করিয়া আমি এই মহামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু দেখিলাম এই নাম বড় অবিবেচক, আমি নামকে আশ্রয় করিলাম, অথচ নাম আমাকে বশে থাকিতে দিলেন না, হাসাইয়া কাঁদাইয়া নৃত্য করাইয়া আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিলেন! কি করিব, আমি বুঝিতে পারি না—বিহ্বল ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গেলাম গুরুর কাছে—'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল—' এই মন্ত্র যে আমাকে পাগল করিয়া দিতেছেন!

পরম স্নেহভরে আমার দয়াল গুরু হাসিয়া উঠিলেন, 'ওরে অবোধ, ওরে পাগল—কৃষ্ণনামের যে পরম কাম্য ফল অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই তো লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ তুমি! দেবদুর্লভ ধনে ধনী হইয়া পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিয়া আজ আমার কাছে আসিয়াছ, তাহা ফিরাইয়া দিতে? যাও, যাহা করিতেছ তাহাই কর গিয়া—বেদ-বেদান্ত যাঁহার সন্ধান করিয়া সারা হইতেছেন, সেই সারাৎসারকেই যে অন্তরতম করিয়া লাভ করিয়াছ তুমি, আর তোমার কিসের প্রয়োজন? আমাকেও তুমি ধন্য করিয়াছ বৎস, আর কি তোমার প্রার্থনা?' আশ্বস্ত চিত্তে পরম নির্ভয়ে আমি ফিরিয়া আসিলাম, তবে ইহা নামেরই ফল, আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য নয়! এখনও যে আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই—আমার এ 'ভাবকালি' আমার ইচ্ছাধীন নয়—আমি স্বতন্ত্র নই—নামই আমাকে অধীন করিয়া এই সমস্ত করাইতেছেন!

অননুভূত অনাস্বাদিত অশ্রুতপূর্ব এই কৃষ্ণপ্রেম; তথাপি জগদ্‌গুরু প্রকাশানন্দের চিত্ত যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত—নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতির কথা প্রকাশানন্দ জানেন, কিন্তু খোসা-বিচি বাদ দিয়া তিনি বেলের ওজন করেন, সমগ্র বেলের ওজন করিবার কথা কোন দিনই তাঁহার—তথা তৎকালীন বারাণসীবাসী জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসী-সমাজের মনে হয় নাই। 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'—লীলা তথা সৃষ্টিকে মায়া বলিয়াই জানেন—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দলীলারসানুভূতির কথা জানা নাই—জানিবার বিন্দুমাত্র অভিরুচিও নাই।

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন: ভালো কথা। নাম করিয়া ভগবৎপ্রেম তোমার লাভ হইয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসী তুমি! 'বেদান্ত না পড় কেনে, কি ইহার দোষ?' আকুল আগ্রহে সমবেত সন্ন্যাসীরাও চাহিয়া আছেন

নবাগত ভাবুক সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দিকে—কি উত্তর দিবেন তিনি ?

বিনীত কণ্ঠে প্রভু বলিলেন : আপনারা যদি মনের মধ্যে দুঃখ গ্রহণ না করেন, তবে ইহার কারণ আমি বলতে পারি।

সন্ন্যাসী-মণ্ডলী প্রভুর উত্তর শুনিবার জন্য সাগ্রহে ও সানন্দে সম্মত হইলেন, প্রকাশানন্দ বলিলেন, 'তোমার কথা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার কথা বলো।'

ভাবুক সন্ন্যাসী অপূর্ব ভাবে মগ্ন হইলেন, জ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল তাঁহার বদনমণ্ডল—সুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বেদ-বেদান্ত-সংকলয়িতা ভগবান বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণসহ যে 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করিরাছেন, তাহা অভ্রান্ত—কারণ তাঁহার বাক্যে ভ্রম থাকার কথা নয়, তিনি ভগবানের অংশ। পূর্বে নীলাচলে মহাপণ্ডিত বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমকেও এই কথা বলিয়াছিলেন প্রভু—'ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ, কল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন।'

'কিন্তু আপনারা ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ব্রহ্মের শক্তি ও পরিণাম অস্বীকার করিয়া বিবর্তবাদ স্থাপন করিতে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই আমাকে আঘাত করে, তাই আমি বেদান্ত আলোচনা করি না।'

বিস্মিত হইলেন সমস্ত সন্ন্যাসী—জগদ্গুরুর সম্মুখে কি বলিতেছেন ইনি ? সভা অধীর প্রতীক্ষায় নীরব! প্রভু বলিলেন, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ—সকলে যে শক্তিমান্ ব্রহ্ম স্থাপন করিতেছেন, আপনারা তাঁহাকেই অস্বীকার করিতেছেন, ব্রহ্মের' শক্তি অস্বীকার করিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি হয়।

শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥'—তেমনই বহুবার বলিয়াছেন, ব্রহ্ম 'সত্যং শিবং সুন্দরম্', 'রসো বৈ সঃ,' 'আনন্দম্ ব্রহ্ম'—এবং তাঁহার 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ' স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াও আছে। শ্রুতি ইহাও বলেন—'স ঐক্ষত', 'সোঽকাময়ত'—তিনি ঈক্ষণ করিলেন, কামনা করিলেন বহু হইব—কাজেই ব্রহ্ম শক্তিমান্। অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তি অথবা মৃগমদ কস্তুরী আর তাহার গন্ধ যেমন ওতপ্রোত অবিচ্ছিন্ন অভেদ, তেমনি শক্তি আর শক্তি-মানেও অভেদ।

'অর্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি'। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তিনটিই প্রধান শক্তি—সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। যিনি স্বরূপ শক্তি, তিনিই অন্তরঙ্গা; যিনি জীবশক্তি, গীতার মতে তিনি 'ক্ষেত্রজ্ঞা', বৈষ্ণবগণ তাঁহাকেই বলেন, 'তটস্থা'; আর যাঁহাকে বলা হয়, 'ন সৎ ন অসৎ'—সেই মায়া বহিরঙ্গা শক্তি।

জীব ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অংশ, অজ—চিদংশে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া জীবকে কবলিত করিবার শক্তি রাখেন, তাই জীব মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হন। তটস্থা অর্থাৎ জীবশক্তি—তিনি মধ্যবর্তিনী; সরূপ শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি তাঁহার যেন দুই প্রান্ত।

জীব মায়াবশ এবং ঈশ্বর মায়াধীশ। বৈষ্ণব-মতে এই মায়া আগন্তুক নহে, দ্বিতীয় কোন বস্তুও নহে, ব্রহ্মেরই শক্তি।

কাজেই বিবর্তবাদে যে নির্গুণ ব্রহ্ম স্থাপন করা হয়, বৈষ্ণবগণ সে সিদ্ধান্ত মানিতে পারেন না। জগৎ মিথ্যা নয়—নশ্বর। দেহে যে জীবের আত্মবুদ্ধি, বৈষ্ণব-মতে একমাত্র তাহাই বিবর্ত! একই ব্যক্তি যেমন পিতা-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ,

প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি নানাভাবের সম্বন্ধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন; কিন্তু সমগ্র ভাব ও বৈচিত্র্যের মিলিত সত্তার এক অখণ্ড প্রকাশ এবং সমস্ত বিচিত্র ভাবকে অতিক্রম করিয়াও তাঁহার যেমন একটি একক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব—ব্রহ্ম বস্তুও তেমনই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—কিন্তু লীলারসে, আনন্দরসে বহু বিচিত্র ভাবে ব্যক্ত।

জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি—শক্তির পরিণাম। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এবং 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টই পরিণামবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইতে পারেন না। প্রাকৃত জগতে চিন্তামণি যেমন হেমভার প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে, তেমনই জগদ্রূপে নিজেকে ব্যক্ত করিয়াও ব্রহ্ম অপরিণামী ও অবিকারী থাকেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিতে তিনি অন্তরে বাহিরে অনুস্যূত হইয়াও তদতিরিক্ত। বিবর্তবাদ স্থাপন করিলে উপাস্য-উপাসনা কিছুই থাকে না। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও স্বরূপভূত তথা ব্রহ্মভূত হওয়ার জন্যও উপাসনার প্রয়োজন, নতুবা 'অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বে' পৌঁছানো অসম্ভব। যিনি ভক্ত, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ চাহেন না—'চিনি না হইয়া তিনি চিনির আস্বাদন করিতে চাহেন।'

যিনি 'ব্রহ্মভূত'—তিনি প্রসন্নাত্মা, সর্বত্র তাঁহার ব্রহ্ম-দর্শন ও লীলারস-আস্বাদনের বাসনা এবং সুকৃতি যদি তাঁহার থাকে, তবে তিনি সেই আস্বাদনে যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে তেমন কোন বস্তু ব্রহ্মলোকেও নাই। ব্রহ্ম-নির্বাণের আনন্দ হইতেও তাঁহার কাছে সেই আনন্দ অনেক অধিক।

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥'

—হরির এমনই গুণ, এমনই তাঁহার লীলা-মাধুর্য যে, আত্মারাম সিদ্ধ সাধকগণও হরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মারাম সনক-সনন্দাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ শুকদেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেই আমরা লীলারস-মাধুর্যের বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারি।

সেই শুকদেব বসিয়া আছেন গভীর নিস্তব্ধ বনভূমির শান্ত নীরবতায়—ব্রহ্মসমাধিতে মগ্ন—দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্যুত্থানের কোন লক্ষণই নাই, নাই কোন চেতনার সাড়া, কিন্তু প্রশান্ত জ্যোতি-র্লেখা ঘিরিয়া আছে বদনমণ্ডল। ব্যাসদেব অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন ব্যুত্থিত হইবেন পুত্র, কখন তপস্যালব্ধ জীবন-শেষের ধন—আনন্দ-রসঘন ভাগবতী কথা শুনাইবেন পুত্রকে, জগতে কে আর আছেন অধিকারী? তবে কি জগৎ এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিবে?

অধীর আগ্রহে ব্যাসদেব রাখাল-বালকদের কণ্ঠস্থ করাইলেন ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক—শুকদেবের কানের কাছে বালকগণ মধুর সুরে গাইতে লাগিল সেই 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যে'র কথা।

ব্রহ্মভূত শুকদেবের শ্রবণে পৌঁছিল সে ভাগবতী কথা—কৃষ্ণের মোহন-বাঁশরির সুরে হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল, সুধারসে সিক্ত হইয়া উঠিল প্রাণ। চোখ মেলিয়া চাহিলেন শুকদেব—সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই শ্যামময়, সমস্তই রসময় 'রসো বৈ সঃ,' যিনি জ্ঞান, তিনিই প্রেম, তিনিই আনন্দ।

ভাগবতী কথার বক্তা হইলেন ব্রহ্মর্ষি—আত্মারাম আজন্ম-ব্রহ্মচারী শুকদেব আর শ্রোতা হইলেন মরণব্রতী অনশন-অবলম্বনকারী

মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং সহস্র সহস্র সিদ্ধ সাধক মুনি ঋষি। জগতের বিস্মিত নয়ন আর মুগ্ধ শ্রবণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল বেদান্তের রূপায়ণ ও রসায়ন!

ইহাই ভাগবতী কথা, ইহাই প্রেম ও প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাব। মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা—কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা; মিলনেও চরম আনন্দ, বিরহেও তাই। 'বাহে বিষজ্বালা' কিন্তু ভিতরে অমৃত-প্লাবন। কৃষ্ণ-বিরহের ক্রন্দনেও কত আনন্দ, সেই অতলস্পর্শী বিরহের এতটুকু ছোঁয়া—জীবের তাহাই কাম্য, তাহাই সাধনা, তাহাই সাধ্য। মিলনে বিরহে বেদনায় সেই পূর্ণতমেরই অভিব্যক্তি—বিরহেও তাহার বিয়োগ নাই—

'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥'

মুগ্ধ হইলেন প্রকাশানন্দ—আনন্দ-প্লাবনে মগ্ন হইলেন সন্ন্যাসী-সমাজ।

প্রভু বলিলেন—'এই পূর্ণ শক্তিমান্ ব্রহ্ম-স্বরূপ; লীলা বাদ দিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়, জীবের তাহাতে অপরাধ হয়।'

মীমাংসা, সাংখ্য-পাতঞ্জল, ন্যায়-বৈশেষিক ব্রহ্ম-সম্পর্কে প্রত্যেক দর্শনের বিভিন্ন মত। ভগবান ব্যাস সমস্ত মত আবর্তন করিয়া তার পরে ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য 'ব্রহ্মসূত্র' প্রণয়ন করিলেন।

বেদান্ত-মতে 'ওম্ ইতি ব্রহ্ম'—ওঙ্কার তথা প্রণবই ব্রহ্মের স্বরূপ, প্রতীক এবং বাচক। ব্রহ্ম তথা ওঙ্কার হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়।—ওঙ্কারই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম এবং 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্য-ভিসংবিশন্তি'—আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দ দ্বারাই জাত ভূতসমূহ জীবনধারণ করে, এবং পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।

কাজেই ওঙ্কার শক্তিরই বাচক এবং ইহাই মহাবাক্য। 'এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ' (প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২)—ওঙ্কারই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই দৃশ্যমান জগৎ, এবং ত্রিকালের অধীন ও অতীত সমস্তই এই ওঙ্কার তথা ব্রহ্ম। এই ওঙ্কারকে উপাসনা করাই বিধি। 'তত্ত্বমসি' বাক্য এই ওঙ্কারেরই অন্তর্গত—'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু শক্তিমান্ সমগ্র ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায়—মহাবাক্য প্রণবের উপাসনায়। এই প্রণবই জীবকে আনন্দ-লীলার ভিতর দিয়া চরম তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ।

সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান ব্রহ্মাকে যে 'চতুঃশ্লোকী' উপদেশ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাহা নারদকে বলেন; নারদ আবার তাহা ব্যাসদেবকে বলেন, বেদ বিভাগ করিয়া 'বেদান্তসূত্র' রচনা এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও ব্যাসদেব যখন পূর্ণ আনন্দের সন্ধান না পাইয়া তাহা লাভের আশায় ধ্যানস্থ হইলেন, তখনই তিনি এই চতুঃশ্লোকী পাইলেন। গায়ত্রীর যে অর্থ, চতুঃশ্লোকারও অর্থ তাহাই। ভগবান ব্যাসদেব গায়ত্রীর অর্থানুরূপ শ্লোকেই 'ভাগবত' আরম্ভ করেন:

'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥

—অর্থাৎ যাঁহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি আদি, যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন,

স্বীয় তেজ দ্বারা যিনি কুহককে নিরস্ত করেন, সেই সত্য-স্বরূপ পরমপুরুষের ধ্যান করি।

ইহা ছাড়া 'বেদান্তসূত্রে' বেদ ও উপনিষদের যে যে ঋক্ সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সেই সেই ঋক্‌ই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। একটি শ্লোক এই—

'আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥'
(ভাঃ ৮।১।১০)

কাজেই ব্যাসদেব সর্বশেষে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন তাহা বেদান্তেরই ভাষ্য—এবং লীলা-পুরুষোত্তম রসস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দ-বিলাসেরই প্রকাশ।

সেই আনন্দ-ব্রহ্মকে লাভ করাই জীবের কাম্য, 'ভাগবত' জীবকে সেই পথের সন্ধানই দিতেছেন। জীবের সম্বন্ধ—সেই পরম সচ্চিদানন্দ পুরুষ!

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥
(ভাঃ ১।২।১১)

পরজ্ঞান আর পরাভক্তি একই বস্তু, পার্থক্য কেবল আস্বাদন-বৈচিত্র্যে। সাধ্য বস্তু যেমন আনন্দস্বরূপ, সাধনাও তেমনই আনন্দময়। শুষ্ক জ্ঞানে অথবা শক্তিহীন ভাষ্যে সে আনন্দের স্পর্শমাত্র লাভ করাও সুদূরপরাহত। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবত জীবকে সম্বন্ধ-অভিধেয়-ও প্রয়োজন-তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন চরম আনন্দলাভের জন্যই। 'সম্বন্ধ' তত্ত্ব শ্রীভগবান, 'অভিধেয়' সাধন—ভক্তি এবং 'প্রয়োজন' পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেম। এই প্রেমধন লাভ করিলেই জীব কৃতকৃতার্থ হন—আর তাঁহার কিছুই চাওয়া-পাওয়ার থাকে না, ভক্তের কাছে ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ হইতে অনেক ন্যূন।

প্রকাশানন্দ মুগ্ধ হইলেন—লোভাতুর হইয়া উঠিল মন প্রাণ। একদিন দেখিলেন পরম প্রেমের প্রকাশ—অশ্রু স্তম্ভ পুলক নৃত্যের দিব্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দেহে। সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া গেল জ্ঞানের কঠোরতা—ঐ অপার্থিব আনন্দ-লাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বুঝিলেন—জ্ঞানই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আনন্দ, তিনিই রস এবং তিনিই রসিক, তিনি শক্তিমান্। তপঃকৃশা পার্বতীর মতোই ব্রহ্মবিদ্যা যাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সত্য শিব সুন্দরের আবির্ভাব হইল সম্মুখে—সেই পরম পতির দর্শনে আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন বিদ্যারূপিণী বধূ—জীবননাথের পদতলে উৎসর্গ করিলেন আপনাকে। প্রিয়-মিলনের আনন্দ নিবিড়—নিবিড়তর হইতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে, আর তাহাতে বিচ্ছেদ রহিল না!

·········বিদ্যাবধূজীবনং আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্নপনং······ জ্ঞানের নিমজ্জন হইল প্রেমে—আনন্দের আর অবধি রহিল না। সে সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া দেহ মন প্রাণ সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া গেল—প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন। প্রকাশানন্দ প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের কাছে। (ক্রমশঃ)

জোড়াসাঁকো থেকে দক্ষিণেশ্বর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর আর জোড়াসাঁকো—এ-যুগের দুই তীর্থ। ভারতবর্ষ মানব-সভ্যতার ভাণ্ডারে অনেক কিছু দান করেছে। তার মধ্যে 'কথামৃত' আর 'গীতাঞ্জলি' যেন দুটি উজ্জ্বল রত্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর রবীন্দ্রনাথ এঁদের বাণীতে শাশ্বত ভারতের মর্মবাণীর অমৃতময় প্রকাশ। এঁরা দু-জনেই এই টেক্‌নলজির যুগে বহন ক'রে এনেছেন তপোবনের বার্তা, আর এই বার্তার অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। না থাকলে নানা ভাষায় 'গীতাঞ্জলি'র এত অনুবাদ হ'ত না; সমুদ্রের এপারে ওপারে দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসংখ্যাও এমন বৃদ্ধি পেত না। সুদূর ইওরোপে বসে ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁ (Romain Rolland) কি খেয়ালের বশে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী নিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেন? নিশ্চয়ই ঐ জীবন ও বাণীর মধ্যে বিশ্বজনীন এমন এক অমর বার্তা আছে, যা সমুদ্র-পর্বত লঙ্ঘন ক'রে রলাঁর রক্তে দিয়েছিল দোলা, মনকে করেছিল পূর্ণ।

টেক্‌নলজি মানুষের অনেক দুঃখ দূর করেছে—এতে কোন সংশয় নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ জড়জগতের বহু বাধাকে জয় করেছে নিশ্চয়ই। তবু ব'লব সে সুখী হ'তে পারেনি। টেক্‌নলজির দ্রুত উন্নতি তার মাথায় জয়মুকুট পরিয়েছে—এ-কথা সত্যি; কিন্তু মানুষের অন্তরে অমৃতের জন্যে যে কান্না রয়েছে, তার হৃদয়ের গভীরে যে পরম পিপাসা রয়েছে অনন্তের জন্যে, টেক্‌নলজি কি সেই কান্না থামাতে পেরেছে? নিবারিত করতে পেরেছে সেই অসীমের তৃষ্ণাকে? পারেনি, আর সেই জন্যেই এই বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ধর্মের দাবিকে পাগলামি ব'লে ঠেলে দিতে পারছে না।

সেই উপনিষদের যুগেও মানুষ মৃত্যুর ছায়ায় বসে অমৃতের জন্যে একই কান্না কেঁদেছে, অসীমের দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছে তার ব্যগ্র বাহু-দুটি, কাতরকণ্ঠে বলেছে: 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও। যম নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন রাজমুকুট, পুত্রপৌত্র, ধনরত্ন, সুন্দরী নারী এবং সুদীর্ঘ পরমায়ু দিয়ে। নচিকেতা দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। বলেছে: যম, এই সমস্ত তোমারই থাক। এরা আজ আছে, কিন্তু কাল তো নাও থাকতে পারে! মৃত্যুর রহস্য আমার কাছে অবারিত করো। জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হ'লে আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো কিনা, সেই কথা বলো।

এ-যুগের মহাকবির কণ্ঠেও সেই প্রার্থনা। কবি চেয়েছেন তাঁকেই, যিনি অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুব, অবস্তুর মধ্যে বস্তু, অনিত্যের মধ্যে নিত্য, অসত্যের মধ্যে সত্য।

> আর যা কিছু বাসনাতে
> ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে—
> মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ও গো,
> তোমায় আমি চাই।

ধনে জনে মানে তো চিত্তের শূন্যতা ভরবার নয়। মানুষ তাই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অন্বেষণ ক'রে আসছে এমন কাউকে, যাঁকে

পেলে চাইবার আর কিছুই থাকে না, সব পিপাসার এককালে অবসান হয়।

এমন ক'রে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে চাঁই।

সমস্ত 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে একটি সুর পাতায় পাতায় বেজে উঠেছে। এই সুরটি হ'ল, পার্থিব সমস্ত কিছু পিছনে ফেলে রেখে ঈশ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার সুর। 'তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে, আমার হৃদয় হ'তে এই কথাটি বলতে দাও হে, বলতে দাও।' অনির্বচনীয় পরা শান্তি তো ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছে, আর আমরা জেনে অথবা না জেনে শান্তিকেই তো কামনা করছি মর্মের গভীরে। আমি যে সংসারে এসেছি, সে তো আলেয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াবার জন্যে নয়।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

আমি এসেছি, আমার দেহমনকে পানপাত্র ক'রে ঈশ্বর অমৃত পান করবেন ব'লে। আমার চোখ দিয়ে তিনি যে তাঁর বিশ্ব-ছবি দেখতে চান! আমার মুগ্ধ কর্ণ দিয়ে শুনতে চান তাঁর নিজের গান!

কিন্তু আমি যে তাঁর হাতে বাঁশি হ'য়ে বাজবো—তার পথ রেখেছি কই? নিরেট হয়ে আছি অহঙ্কারে। নিজেকে একেবারে শূন্য ক'রে ফেলতে হবে। তবেই না জীবন-বাঁশরি বাজবে তাঁর হাতে। সমস্ত 'গীতাঞ্জলি'তে অহঙ্কার থেকে মুক্ত হবার জন্যে একটা কান্নার সুর বাজছে।

অহঙ্কারের মিথ্যা হ'তে বাঁচাও দয়া ক'রে
রাখো আমায় যেথা আমার স্থান।
আর সকলের দৃষ্টি হ'তে সরিয়ে দিয়ে মোরে
করো তোমার নত নয়ন দান।

'গীতাঞ্জলি'র শুরুতেই নিরহঙ্কার হবার জন্যে কী আকুতি!

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

কবি চেয়েছেন ঈশ্বরকে সর্বদার জন্যে অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে, 'তুমি আমার অনুভাবে কোথাও নাহি বাধা পাবে।' অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো অনুক্ষণ ঈশ্বরের চিন্তা দিয়ে তিনি মনকে রাখতে চেয়েছেন পূর্ণ। 'দুঃখ-সুখের বিচিত্র জীবনে তুমি ছাড়া আর কেহ না রবে।' কিন্তু ঈশ্বরকে নিরন্তর অন্তরের মধ্যে অনুভব করার পথে প্রচণ্ডতম বাধা হ'য়ে আছে অহঙ্কার।

ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়—
তুমি জানো মন তোমারে চায়।

'গীতাঞ্জলি'তে শুনি 'কথামৃতে'রই প্রতিধ্বনি —'কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ পূর্ণ ক'রে রাখা'র সুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্ত প্রতাপকে বলছেন: 'এখন সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে দাও। ঈশ্বরেতে ঝাঁপ দাও।' সংসার করতে বলেছেন, কিন্তু মন ঈশ্বরে রেখে 'তাঁকে জেনে একহাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর একহাতে সংসারের কার্য কর।' উপমা দিয়েছেন বড় মানুষের বাড়ির দাসীর সঙ্গে। সব কাজ

করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। কচ্ছপের উপমাটিও সুন্দর! 'কথামৃতে' আছে: 'কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? আড়ায় পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কাজ করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।'

কিন্তু অহঙ্কার তো মানুষকে ঈশ্বরচিন্তা করতে দেবে না। টাকার অহঙ্কার, খ্যাতির অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার! অহঙ্কার জীবনের স্বভাব বদলে দেয়। ঠাকুর বলতেন, 'টাকা হলেই মানুষ আর রকম হয়ে যায়, সে-মানুষ থাকে না।' ঠাকুর বলছেন: 'এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্যে সূর্যকে দেখা যায় না। মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তা হ'লে ঈশ্বরদর্শন হয়।' 'অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে তাঁর শরণাগত হও, সব পাবে।' এই কথাটা নানা ভঙ্গিতে ঠাকুরের সমস্ত বাণীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের নিজের শক্তির একটা সীমা আছে। সেই শক্তি দিয়ে আমরা অন্তরের সমস্ত দুর্বলতাকে জয় করতে পারিনে। নিজেকে যখন মনে হচ্ছে খুবই শক্তিমান্, খুবই দুর্জয় এবং নিরাপদ তখন ঈশানকোণে হঠাৎ দেখা দিল ঝড়ের মেঘ। অন্তরের সমুদ্র উঠল খেপে। সেই সমুদ্রকে শাসনে রাখবার জন্যে যত অনুশাসনের বাঁধ বাঁধা হয়েছিল, এক নিমেষে গেল সব চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে! কর্দমের মধ্যে জীবন খেতে লাগলো লুটোপুটি! নৈতিক যাতনার দুঃসহ বৃশ্চিকদংশনে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম! কামনায় পঙ্কিল জীবন কাঁদে মুক্তির প্রভাতের জন্যে! কে এনে দেবে সেই মুক্তির আশীর্বাদ? হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্রকে কোন্ বরুণ-দেবতা আবার শান্ত ক'রে দেবে? সেই দুর্দিনের অন্ধকারে সকল অহঙ্কার যখন অশ্রুজলে নিশ্চিহ্ন, দিগন্তে আলোর যখন চিহ্নমাত্র নেই, তখন মানুষের নম্রহৃদয় ঈশ্বরের চরণপদ্মে প্রার্থনা জানিয়েছে:

> দয়া দিয়ে হবে গো মোর
> জীবন ধুতে।
> নইলে কি আর পারবো তোমার
> চরণ ছুঁতে? (গীতাঞ্জলি)

তখন আর সে 'হাম্বা, হাম্বা' বলে না; তার জ্ঞানচক্ষু তখন উন্মীলিত হয়েছে বেদনার আঘাতে আঘাতে! সেই জন্মান্তরের মুহূর্তে 'তুহুঁ তুহুঁ' ব'লে তবে সে নিস্তার পায়।

মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছে খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে নয়। নিজের শক্তিকে অপরিমেয় জেনে আত্মশক্তিকেই সে প্রথমে আশ্রয় করেছে। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সেই আশ্রয় যখন ভেঙে গিয়েছে, অহঙ্কার যখন তার উপলব্ধিতে মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছে, তখনই তার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে, 'আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়-পদ্ম দলে।' নিজের শক্তিতে মানুষ যদি দৈবী মায়াকে অতিক্রম করতে পারত, তবে সে কখনই ঈশ্বরের কাছে মাথা নত ক'রত না।

স্বামীজী চিকাগোর ধর্মমহাসভায় ঠিকই বলেছিলেন:

Whatever may be the position of philosophy, whatever may be the position of metaphysics, so long as there is such a thing as death in the world, so long as there is such a thing as weakness in the human heart, so long as there is a cry going out of the heart of man in his very weakness, there shall be a faith in God.

—দর্শনের কথা যাই হোক না কেন, যতদিন

পৃথিবীতে মৃত্যু থাকবে, যতদিন মানুষের হৃদয়ে থাকবে দুর্বলতা, যতদিন দুর্বলতায় অসহায় মানুষের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবে কান্না, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবেই থাকবে।

মানুষ পুঁথির সত্য নিয়ে চলে না, চলে সাধারণ বুদ্ধির আলোয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে সে যদি নিজের মধ্যে বিরাট শক্তিকে উপলব্ধি ক'রে সমস্ত দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়, তবে প্রার্থনা সে করবেই। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়েছে যে বিপুল সত্যটি, তা হ'ল প্রার্থনার অমোঘ শক্তি। দার্শনিকদের তত্ত্বের কচকচিকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষ কি নিজের গভীরতম উপলব্ধিকে অস্বীকার করবে? যা সত্য, তাকে কোন দার্শনিক মতবাদই চ্যুত-আসন করতে পারবে না। আর একথা একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, মানুষ মৃত্যুর সামনে চিরদিন আতঙ্কে শিউরে উঠেছে; মৃত্যুভয়ে সে ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করেছে অমৃতের পানে, আর এইখানেই বীর্যের উৎস। জার্মান দার্শনিক Spengler-এর ভাষায়: Far before death is the source not merely of all religion, but of all philosophy and natural science as well.

একদা বুদ্ধের অনুবর্তীরা ভারতবর্ষের হৃদয়-আসন থেকে ভগবানকে নির্বাসিত করেছিলেন; ফল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে বিশেষ সন্তোষজনক হয়নি। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মকে বিদায় নিতে হয়েছিল! স্বামীজী চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় বৌদ্ধধর্ম-সম্পর্কে যে ভাষণ দেন, তার মধ্যে আছে:

On the philosophic side the disciples of the Great Master dashed themselves against the eternal rocks of the Vedas and could not crush them, and on the other side they took away from the nation the eternal God to which every man or woman, clings so fondly. And the result was that Buddhism had to die a natural death in India. At the present day there is not one who calls oneself a Buddhist in India, the land of its birth.

—দর্শনের দিক থেকে মহান্ আচার্যের শিষ্যেরা বেদের শাশ্বত পাহাড়গুলিকে দিলেন ধাক্কা, কিন্তু তাদের ধূলিসাৎ করতে পারলেন না। অন্যদিক থেকে জাতির কাছ থেকে তাঁরা ছিনিয়ে নিলেন চিরন্তন ঈশ্বরকে, যাঁকে অনুরাগ-ভরে আঁকড়ে আছে প্রত্যেকটি নরনারী। ফলে—ভারতে বৌদ্ধধর্ম আপনা থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আজ বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতে বৌদ্ধ বলতে কেউ নেই!

বৌদ্ধধর্ম-সম্পর্কে জার্মান দার্শনিক Oswald Spengler যে-মন্তব্য করেছেন, বিদ্বজ্জনের তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে 'Buddhism rejects all speculation about God and the cosmic problems, only self and the conduct of actual life are important to it.' ভগবান নিয়ে মাথা ঘামানো প্রাণোদ্যমের অপচয়-মাত্র। জীবন দুঃখময়। দুঃখ থেকে যাতে মুক্তি পাওয়া যায়, তারই জন্যে যত্নবান্ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সাংখ্যের যুক্তিবাদ এবং নিরীশ্বরবাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূল রয়েছে নিহিত। Spengler বুদ্ধের জীবন-বেদকে বলেছেন 'unmetaphysical.' জার্মান দার্শনিকের মতে 'Religion is metaphysic and nothing else—and this metaphysic, is not the metaphysic of knowledge, argument, proof (which is mere philosophy or learnedness), but *lived and experienced* metaphysic·· His life in and with the supersensible.'—অর্থাৎ ধর্মের

প্রাণ হচ্ছে অনুভূতি, স্বামীজীর ভাষায় 'the whole religion of the Hindu is centred in realisation.'– ঈশ্বরের মধ্যে যে অনির্বচনীয় মাধুর্যরস রয়েছে, সেই রসের জীবন্ত এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতিই ধর্ম। এই অনুভূতি যেখানে নেই, সেখানে পরোপকার থাকতে পারে, পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, নানা রকমের অনুষ্ঠান থাকতে পারে, কিন্তু ধর্ম নেই।

স্বামীজীর শিষ্যা নিবেদিতাও গুরুর প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন, 'Religion is a matter of experience and not a matter of faith.' ঈশ্বর সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ—এই বিশ্বাস তো ধর্মের বিষয়বস্তু নয়।

'ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুবে যাও'—এই কথাই ঠাকুর বারংবার বলেছেন। পাণ্ডিত্য, পুঁথি, জ্ঞানবিচার, মেধা, বৌদ্ধিক কসরত—এ সবের উপরে ঠাকুর জোর দেননি। 'অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জানবারই বা কি দরকার? এক-সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে!' পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর বলছেন: 'শাস্ত্রের কি ব্যবহার জানো? একজন চিঠি লিখেছিল, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখানা কাপড় পাঠাইবে। যে চিঠি পেলে, সে চিঠি পড়ে, পাঁচ সের সন্দেশ ও একখান কাপড়, এই কথা মনে রেখে চিঠিখানা ফেলে দিলে! আর চিঠির কি দরকার?'

কোন্ পথে গেলে ঈশ্বরের মাধুর্যরসকে আস্বাদন করা সম্ভব, শাস্ত্র শুধু তারই নির্দেশ দিতে পারে। এই পর্যন্ত। আস্বাদন হচ্ছে বড়ো কথা, শাস্ত্র নয়, পুঁথি নয়, পাণ্ডিত্য নয়, তর্ক নয়। 'যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধবোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল—এ-সব হিসাবে তোমার কাজ কি? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। চিনির পাহাড়কে জানবার কি কোন প্রয়োজন আছে পিঁপড়ের? ঠাকুরের এই যে উপমার পর অনুপম উপমা—এই সমস্তের ইঙ্গিত একটি পরম সত্যের পানে এবং এই পরম সত্যটি হ'ল - ঈশ্বর অমৃতের সাগর। ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। সাগরের তীরে তীরে ঝিনুক কুড়োলে হবে না, ঝাঁপ দিতে হবে, ভেসে যেতে হবে ঈশ্বরের মাধুর্যস্রোতে। আস্বাদন করতে হবে তাঁর অবর্ণনীয় আনন্দকে। ধর্ম metaphysic নিয়ে তর্ক নয়, metaphysic-সম্পর্কে পাণ্ডিত্যও নয়। ধর্ম হচ্ছে 'lived and experienced metaphysic'—সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার আস্বাদন, সেই সত্তার আকাশে বিহার, সেই সত্তার সঙ্গে অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন যোগ, কেবলমাত্র তাঁকে দিয়ে প্রাণকে পরিপূর্ণ ক'রে রাখা।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে মার্ক্সবাদ-সম্পর্কে দু-একটা কথার অবতারণা করলে হয়তো তা অবান্তর হবে না। সবাই জানেন, গৌতমবুদ্ধ এবং জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর—এঁদের দু-জনের কেউ ঈশ্বরের 'আইডিয়া'কে স্বীকৃতি দেননি। এঁদের বাণীর মধ্যে যুক্তিবাদের খরদীপ্তি। মার্ক্সবাদের মধ্যেও কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার স্বীকৃতি নেই। বৌদ্ধধর্মের মতোই মার্ক্সবাদ ঈশ্বরের 'আইডিয়া'কে বাতিল ক'রে দিয়েছে। মার্ক্সবাদীরা যুক্তিবাদী মেটিরিয়ালিস্ট্। 'Materialists do not expect aid from supernatural forces. Their faith is in man, in his ability to transform the world by his own efforts and make

it worthy of himself.' (Fundamental of Marxism-Leninism—P. 26)—জড়বাদীরা অতীন্দ্রিয় শক্তির কাছ থেকে কোন সাহায্য প্রত্যাশা করে না। মানুষের উপরে তাদের ষোল আনা বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে, নিজের শক্তিতে মানুষ জগৎকে রূপান্তরিত করতে পারে, তাকে নিজের বাসযোগ্য করতে পারে।

জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিকদের মতে ঈশ্বরে মানুষের কোন প্রয়োজন নেই। মূল্যবান্ কোন জীবন যদি থাকে, তবে সে হচ্ছে এই পৃথিবীর জীবন,—আর মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই পার্থিব জীবনকে অজ্ঞতা, ব্যাধি, দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা।

হিন্দুঋষিদের কথা—জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ। ঠাকুরের ভাষায়: জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-লাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটি উপায়—উদ্দেশ্য নয়। শম্ভু মল্লিককে ঠাকুর বললেন, 'আর যাই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়।...হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি এ-সব অনিত্যবস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর অবস্তু।' ধর্ম মানুষকে নিত্যবস্তুর অন্বেষণে প্রেরণা দিয়েছে। পরোপকার, সামাজিক উন্নতি—এ-সব আদর্শ ধর্মগুরুদের নয়। Spengler ঠিকই বলেছেন, 'To ascribe social purposes to Jesus is blasphemy.' খ্রীষ্ট কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেননি। ঠাকুরও কি কামারপুকুরে কোন নৈশবিদ্যালয় খুলে ছিলেন? তাঁরা ঈশ্বরকে খুঁজেছিলেন, ঈশ্বরকে পেয়ে অনন্তজীবনের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা মানুষকে সংসারে থাকতে বলেছেন ঈশ্বরকে নিয়ত স্মরণে রেখে;—তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বুদ্ধের এবং মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গির মিল কোথায়? আর যে-কারণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবাসীর চিত্তভূমিতে শিকড় গাড়তে পারেনি, সেই একই কারণে নিরীশ্বরবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সবাদও ভারতবর্ষে কখনও শিকড় গাড়তে পারবে ব'লে মনে হয় না। যতদিন মৃত্যু আছে, যতদিন মানুষের হৃদয়ে দুর্বলতা আছে, ততদিন স্বামীজীর ভাষায় 'there shall be a faith in God.'—ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবেই।

হিন্দুঋষিদের চিন্তাধারার সারমর্ম করতে গিয়ে চিকাগো ধর্মমহাসভায় তিনি যা বলে-ছিলেন ১৮৯৩ খৃঃ ১৯শে সেপ্টেম্বর, তা এখানে উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও পরিস্ফুট হবে।—

'Thus the whole object of their system is by constant struggle to become perfect, to become divine, to reach God and see God, and this reaching God, seeing God, becoming perfect even as the Father in Heaven is perfect, constitutes the religion of the Hindus.'

ভারতবর্ষের নচিকেতা পার্থিব কোন কিছুর আকর্ষণেই প্রেয়কে কামনা করলেন না, চাইলেন অন্ধকারের পারে অবস্থিত সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানতে—কারণ তাঁকে জানলে তবেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গে'র নায়ক শচীশ নচিকেতার মতোই বলেছে: 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার, আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।' 'সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবনদ্বারে'—এই প্রার্থনাই 'গীতাঞ্জলি'তে কবির বাঁশরি থেকে উৎসারিত হয়েছে বারংবার।

আমরা পরোপকার, ভালবাসা ইত্যাদি গালভরা কথা কত সহজেই না ব্যবহার ক'রে থাকি! যেন স্বার্থচিন্তাকে বিসর্জন দেওয়া শুধু ইচ্ছাসাপেক্ষ। কিন্তু তাই কি? মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের 'Humam Society in Ethics and Politics'-এ আছে:

When Christ told men that they should love each other, He produced such fury that the mob shouted, 'Crucify Him, crucify Him'. Christians ever since have followed the mob rather than the founder of their religion.

—যীশুখ্রীষ্ট যখন লোকদের বললেন, তোমাদের উচিত পরস্পরকে ভালবাসা, তখন জনতা সেই কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে তারস্বরে বলতে লাগলো, ওকে ক্রুশবিদ্ধ ক'রে মারো। সেই থেকে খ্রীষ্টানেরা জনতাকেই অনুসরণ করেছে—তাদের ধর্মের প্রবর্তককে নয়!

এমনই অদ্ভুত উপাদানে এই মানুষের চরিত্র গড়া! তার মধ্যে বিপরীতের কী আশ্চর্য মিশ্রণ! তার স্বভাবে স্বর্গের জ্যোতি আবার নরকের অন্ধকার; খানিকটা মৃত্তিকা, খানিকটা নক্ষত্রখচিত আকাশ। রাসেল বলছেন: No beast or Yahoo could commit the crimes committed by Hitler or Stalin. তবু তো এই মানুষকে আত্মবৎ ভালবাসার বাণী সকল ধর্মের একটি মূল কথা! কি বললেন ঠাকুর?—'যখন বাহিরে লোকের সঙ্গে মিশবে, তখন সকলকে ভালবাসবে। মিশে যেন এক হয়ে যাবে, বিদ্বেষভাব আর রাখবে না।'

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসা সম্ভব হয় কিসের যাদুতে? সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন—এই চেতনা এনে দেয় সর্বজনীন প্রেম। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বললেন, 'সাধু ঈশ্বরচিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন জেনে তাদের সেবা করেন।' জোড়াসাঁকোর রবিঠাকুর যেন প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন:

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

প্রথিতযশা ঐতিহাসিক টয়েনবী-র (Arnold J. Toynbee) 'A study of History' একখানি নামকরা বই। দশখণ্ডে সমাপ্ত এই পুস্তকের সপ্তমখণ্ডের ৫১০ পৃষ্ঠায় আছে:

Without a harmony of wills, society cannot maintain itself even on the most narrowly restricted tribal range, not to speak of its becoming world-wide and the only society in which there can be a harmony of wills is one in which two or three or two or three thousand million are gathered together in God's name with God Himself in the midst of them. In a society including the One True God as well as His human creatures. God plays a unique part. He is a party to the relation between each human member and Himself; but in virtue of this He is also a party to the relation between each human member and every other human member, and through this participation of God, breathing His own divine love into human souls, human wills can be reconciled.

—ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সমন্বয় ব্যতীত একটা অতি ক্ষুদ্র উপজাতীয় গণ্ডির মধ্যেও সমাজ-

জীবন সম্ভব নয়—বিস্তীর্ণ বিশ্বের ক্ষেত্রে কা কথা! যেখানে ভগবানের নামে এবং ভগবানকে কেন্দ্র ক'রে দু-তিন জন অথবা দু-তিন লক্ষ মানুষ মিলিত হয়, মাত্র সেই সমাজেই বিভিন্নমুখী ইচ্ছার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হ'তে পারে। যে-সমাজ এক এবং শাশ্বত ঈশ্বর ও সৃষ্ট মানুষগুলিকে নিয়ে—সেই সমাজে ভগবানের ভূমিকা অনুপম। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তাঁর একটা নিজস্ব সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কের দরুন সমাজের মানুষগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক যোগ রয়েছে, সেই যোগের মধ্যেও তিনি যোগসূত্র। এই যোগসূত্রকে আশ্রয় ক'রে ভগবান তাঁর নিজের ঐশী প্রেম সঞ্চারিত ক'রে দেন মানুষের আত্মায়, আর তখন মানুষগুলির ইচ্ছায় ইচ্ছায় আর কোন সংঘর্ষ বাধে না।

ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে স্থায়ী প্রেমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা, সেটি খুবই ভাববার কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের মধ্যে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখতে পাই। দু-জনেই আপন-আপন অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: ঈশ্বরলাভের পথ দুর্গম। সেই পথে চলতে গেলে নিজের শক্তিকে আশ্রয় করতে হয়। কেউ কাউকে ভগবান পাইয়ে দিতে পারে না। সাধন চাই। 'নির্জনে থেকে মাঝে মাঝে ভগবানের জন্য সাধন করতে হয়। শাস্ত্র পড়ে হদ্দ অস্তিমাত্র বোধ হয়। কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দেখা দেন না।' 'ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ ক'রে বসে থাকবেন! মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো!' এই ধরনের উক্তি 'কথামৃতে'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মণিমুক্তার মতো। কৃপার উপরেও ঠাকুর কিছু কম জোর দেননি! কিন্তু নির্জনে সাধন, তপস্যা, কর্ম—এ সবের উপরেও কি তিনি সমান জোর দেননি?

'চতুরঙ্গে'র শ্রীবিলাস বন্ধু শচীশকে বলছে: 'দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোন গুরুর দরকার, যার উপর ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।' এর উত্তরে শচীশ যে-কথা বলেছে, তার মধ্যে সহজের কোন স্থান নেই—কারণ সত্য 'কঠিন'। শচীশের উত্তরের মধ্যে আছে: "আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'—কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।" এখানে রবীন্দ্রনাথ সাধনের উপরেই জোর দিয়াছেন।

উভয়েরই বাণীর মধ্যে শুনি স্বাধীনতার শঙ্খধ্বনি। ঠাকুর বলতেন, 'কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।' রবীন্দ্রনাথও ধর্মবিশ্বাসে ব্রাহ্ম হলেও কারও ভাবের নিন্দা করেননি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধর্মান্ধতার কোন স্থান নেই। ঐক্যকে যেমন পরম সত্য ব'লে স্বীকার করেছেন তিনি, তেমনি স্বীকার করেছেন বৈচিত্র্যের মধ্যে যে পরম সত্য রয়েছে—তাকেও।

খ্রীষ্টান পাদ্রী Stanley Jones গান্ধী ও খ্রীষ্ট সম্পর্কে নিজের মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে যা লিখেছেন, তারই প্রতিধ্বনি ক'রে আমিও বলি: I bow to Rabindranath, but I kneel at the feet of Ramakrishna and give Him my full and final allegiance.

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[হনুমানের সাগর-লঙ্ঘন]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সীতার অন্বেষণে অঙ্গদ গিয়াছিল দক্ষিণ দিকে। তাহার সঙ্গে ছিল জাম্ববান্, হনুমান্, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, চন্দন প্রভৃতি পরাক্রমশালী ও ক্ষিপ্রগামী বানরগণ। দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে অবস্থিত জনস্থান-প্রদেশের অধিপতি ছিল রাবণ। তাহার অনুচরগণ সর্বদা ঐ অঞ্চলে বিচরণ করিত। সীতাকে রাবণ জনস্থানের কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই অনুমানে বানরগণ উৎসাহের সহিত বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সর্বত্র সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। দক্ষিণ অঞ্চল পর্বতময়। মধ্যে মধ্যে গুহা ও বিশাল বন। পথ দুর্গম। বানরগণ ক্রমে লতা ও বনে সমাচ্ছন্ন এক পর্বতদুর্গে আসিয়া পড়িল। চারিদিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজি। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। অরণ্য হইতে বাহির হইবার পথও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও পথশ্রমে ক্লান্ত বানরগণ সেই অরণ্যময় পর্বতে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে বেশ কিছুদিন কাটিয়া গেল।

একদিন সামনে এক বিস্তীর্ণ গুহা দেখিতে পাইয়া তাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে অন্ধকার আরও গাঢ়। কেহ কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত বানরগণ চীৎকার করিতে লাগিল। মনে হইল তাহাদের সকলের মৃত্যু আসন্ন। এমন সময়ে সহসা একদিকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা গেল। উহা লক্ষ্য করিয়া দ্রুত চলিয়া অবশেষে তাহারা একটি চমৎকার জায়গায় আসিয়া পড়িল। সামনেই বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও সরোবর-সংযুক্ত এক বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত সুসজ্জিত প্রাসাদ। চারিদিকে বিলাসের উপকরণ, উৎকৃষ্ট ফলমূল ও পানীয়; আর তাহারই মাঝখানে উপবিষ্টা চীর- ও কৃষ্ণাজিন-ধারিণী অগ্নিশিখার ন্যায় ব্রতধারিণী এক তাপসী। তাপসীর নাম স্বয়ম্প্রভা। তিনি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত বানরগণকে ফলমূল ও পানীয় দ্বারা যথোচিত সৎকার করিলেন। হনুমান্ অগ্রণী হইয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন, তাঁহারা পথ হারাইয়াছেন, তাপসী আহার্য ও পানীয় দানে তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন। বানরগণ তাঁহার জন্য কি করিতে পারেন? স্বয়ম্প্রভা বলিলেন, তিনি তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহারা সকলেই মহাতেজস্বী। কিন্তু তিনি তপস্বিনী; তাঁহার জন্য কাহারও কিছু করিবার নাই। বানরগণ তখন প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং তপস্বিনীর সাহায্যে অবশেষে তাহারা সেই বিশাল বনের বাহিরে আসিতে সমর্থ হইল।

ইতিমধ্যে একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। সুগ্রীবের নির্দেশ সকলেরই স্মরণ ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তন না করিলে প্রাণদণ্ড! অঙ্গদ জানিত, কেবল শ্রীরামচন্দ্রের আদেশেই সুগ্রীব তাহাকে যুবরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি সুগ্রীবের চিত্ত অনুকূল নহে। অঙ্গদ অকৃতকার্য হইয়া নির্দিষ্ট সময়ের অন্তে প্রত্যাবর্তন করিলে সুগ্রীব তাহাকে ক্ষমা করিবেন, এমন সম্ভাবনা কম। অতএব ফিরিয়া গিয়া দণ্ডিত

হওয়া অপেক্ষা প্রায়োপবেশনে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আর সীতার সংবাদ না লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে রামচন্দ্রও কি শোকে দেহত্যাগ করিবেন না? বানরগণের অনেকেই অঙ্গদকে সমর্থন করিল। তাহারা সকলেই অঙ্গদের প্রতি স্নেহশীল। বিশেষতঃ সুগ্রীবের মতে তাহারা রাজ্যের প্রধান অমাত্য, এবং প্রধান অমাত্যদিগের অপরাধ কখনই মার্জনীয় নয়। আর কিরূপেই বা তাহারা রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া জানাইবে যে, সীতার অন্বেষণে তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে! সুতরাং অঙ্গদের পরামর্শ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

তার-নামক এক বুদ্ধিমান্ বানর যুক্তি দিল, প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করার প্রয়োজন নাই। যদি প্রত্যাবর্তন না করাই স্থির হয়, তাহা হইলে পুনরায় সেই গুহায় ফিরিয়া যাওয়া ভাল; কারণ সেখানে বাসস্থান ও প্রচুর আহারের ব্যবস্থা আছে। দিনগুলি নিরুদ্বেগে ভালভাবেই কাটিবে।

হনুমান্ তারের পরামর্শ সমর্থন করিলেন না। তাঁহার মতে অঙ্গদের প্রত্যাবর্তন করাই উচিত। বিনীতভাবে সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিলে সুগ্রীব ক্রুদ্ধ না হইতেও পারেন। কিন্তু অঙ্গদ জানাইল, সুগ্রীবের প্রতি তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। পিতৃহন্তা সুগ্রীবের হস্তে নির্যাতিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ।

হতাশ ও বিষণ্ণচিত্ত বানরগণ অঙ্গদের চারিদিকে উপবেশন করিয়া গভীর আলোচনায় মগ্ন, এমন সময় সহসা জটায়ুর ভ্রাতা সম্পাতির সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ। সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদে সম্পাতি দুঃখিত হইল। রাবণের বহু অত্যাচারের কাহিনী তাহার কানে আসিয়া পৌঁছায়, কিন্তু বার্ধক্য ও জরাবশতঃ কোন-প্রকার প্রতিবিধানে সে অক্ষম। সম্পাতিও দূর হইতে সীতার 'রাম, রাম' করুণ বিলাপ শুনিয়াছিল। অতঃপর সে জানাইল, জনস্থানের অধিপতি রাবণের রাজধানী সমুদ্র-মধ্যবর্তী লঙ্কাদ্বীপে। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় গেলে সীতার সংবাদ পাওয়া যাইবে। সম্পাতি পথের নির্দেশ দিয়া বলিল, দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরদিকে মলয়-পর্বত। মলয়-পর্বত হইতে বিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে। যে বলবান্ বানর শতযোজন-বিস্তৃত সমুদ্র-লঙ্ঘনে সাহসী হইবে, তাহাকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করা হউক। পথের একটা নিশানা পাইয়া বানর-গণের মনে নূতন করিয়া আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। মলয়-পর্বতে গিয়া সমুদ্র-লঙ্ঘন-বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে ভাবিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ কলরব করিতে করিতে দ্রুত চলিয়া পূর্বঘাট বা মলয়-পর্বতে উপস্থিত হইল।

বানরগণ ইতিপূর্বে সমুদ্র দেখে নাই। আকাশের ন্যায় অন্তহীন বিশাল তরঙ্গময় সমুদ্র-দর্শনে তাহাদের মনে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে হতাশা জাগিল, এবং সেই সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সীতার সংবাদ-আনয়ন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইল। পরিশ্রান্ত হতাশ বানরগণকে আশ্বাস দিয়া অঙ্গদ বলিল, ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া রাত্রিযাপন করুন, পরদিন সকালে সমুদ্র-লঙ্ঘন-বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে।

পরদিন সকালে বানরগণ একত্র হইয়া পর্বততটে উপবেশন করিল। অঙ্গদ প্রত্যেক বানরকে জিজ্ঞাসা করিল—সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার শক্তি ও সাহস কাহার আছে? প্রত্যেকে নিজ নিজ বল-বিক্রমের পরিচয়

দিল। তাহারা সমুদ্র-লঙ্ঘনের চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু কৃতকার্য হইয়া সীতার সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে, এরূপ সামর্থ্য তাহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। হতাশ হইয়া অঙ্গদ বলিল, সে নিজেই এই দুরূহ কার্যের ভার লইবে। কিন্তু তাহাতে সকলের আপত্তি। অধীনস্থ সৈন্যগণ থাকিতে যুবরাজ স্বয়ং কেন এই কঠিন কার্যে ব্রতী হইবেন? সৈন্যগণকে পরিচালনা করাই অঙ্গদের কাজ। হনুমান্ একধারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। অবশেষে জাম্ববান্ বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, নতুবা সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতার সংবাদ আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত না। যাহা হউক, হতাশ হইবার কারণ নাই। হনুমানের শক্তি অসাধারণ। সাগর লঙ্ঘন করিয়া সীতার সংবাদ তিনিই আনিতে পারিবেন। জাম্ববান্ হনুমানের অশেষ প্রশংসা করিলেন, তাঁহার পরাক্রমের বহু কাহিনী বর্ণনা করিলেন। হনুমান্ জাম্ববানের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া জানাইলেন, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি প্রভুভক্ত, শ্রীরামচন্দ্রের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। যে-কোন প্রকার বিপদ আলিঙ্গন করিয়া প্রভুর কার্য সম্পাদন করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যথাসময়ে তিনি সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবেন। বানরগণের মধ্যে এবার উল্লাস দেখা গেল। সকলে সমবেতভাবে পুষ্পমাল্যদ্বারা হনুমান্‌কে অভিনন্দন জানাইল। পূর্বঘাট বা মলয়াদ্রির মধ্যে মহেন্দ্রগিরি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। মহেন্দ্র-পর্বতে উঠিয়া ভাল করিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ ও সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করিয়া হনুমান্ সাগর-লঙ্ঘনে উদ্যোগী হইলেন।

রামায়ণে দেখা যায়, রাবণ সীতাকে লইয়া বিমান-পথে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কা-নগরীতে উপনীত হয়। সীতার সংবাদ আনয়নের জন্য হনুমান্ লম্ফ দিয়া সাগর উত্তীর্ণ হন এবং শ্রীরামচন্দ্র সেতু নির্মাণ করিয়া বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় গমন করেন

লঙ্কার বর্তমান নাম সিংহল। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সিংহল একটি ক্ষুদ্র মহাদেশীয় দ্বীপ (continental island) অর্থাৎ মহাদেশের এক অগভীর ও অপ্রশস্ত জলরাশি দ্বারা প্রধান ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত ও সিংহলের মধ্যে পক-প্রণালী ও মান্নার-উপসাগর। উভয়ই সংকীর্ণ ও অগভীর। বর্তমানে ভারত হইতে সিংহলের সর্বাপেক্ষা নিকটতম পথের দূরত্ব বাইশ মাইল। সর্বদক্ষিণ রেলপথ স্টেশন ধনুষ্কোডি হইয়া স্টীমারযোগে সিংহলের স্টেশন তালাইমান্নার পৌঁছানো যায়।

এই দ্বীপটির ভৌগোলিক পরিবর্তন কতখানি ঘটিয়াছে জানা যায় না। রামায়ণের যুগে উহার অবস্থান ভারতের আরও নিকটে হওয়া বিচিত্র নহে। রামচন্দ্র যে-স্থানে সেতু নির্মাণ করেন, সেই স্থানটি অধুনা রামেশ্বর-নামে প্রসিদ্ধ। রামেশ্বরও একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, রেল-পথের দ্বারা প্রধান ভূখণ্ডের সহিত সংযুক্ত। রেলপথের নিম্নে অগভীর সমুদ্রে বরাবর প্রস্তরখণ্ডসমূহ দৃষ্ট হয়। রামায়ণে কিন্তু এই দ্বীপের উল্লেখ নাই। এমন হইতে পারে, এই অংশটি তখনও প্রধান ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপে পরিণত হয় নাই।

লঙ্কা হইতে রাক্ষসগণ সর্বদা ভারতে গমনাগমন করিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রামায়ণে আছে। লঙ্কার বহু রাক্ষস রাবণের আদেশে দণ্ডকারণ্যের দক্ষিণে জনস্থানে বসবাস করিত, এবং দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অরণ্যে বিচরণ করিয়া

মুনি-ঋষিগণের যজ্ঞ পণ্ড ও নানাপ্রকার উপদ্রব করিয়া তাহাদের অশান্তি সৃষ্টি করাই ছিল তাহাদের কাজ। তাহাদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বনবাসী তপস্বিগণ রামের শরণ লইয়াছিলেন। লক্ষ্মণের হস্তে লাঞ্ছিত শূর্পণখা লঙ্কায় গিয়া রাবণকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার বিষয় গোচর করে। সীতাকে লঙ্কায় লইয়া আসিয়া রাবণ রামচন্দ্রের বিনাশ-অভিপ্রায়ে জনস্থানে বহু রাক্ষস প্রেরণ করে। বিভীষণ রাবণের নিকট দুর্ব্যবহার লাভ করিয়া সমুদ্র অতিক্রম-পূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হয়; ঐ সকল ক্ষেত্রে বিমানের কোন উল্লেখ নাই। সমুদ্রোপকূলের অধিবাসীদের নৌচালনে দক্ষতা প্রাচীন যুগেও ছিল। অতএব রাক্ষসগণের পক্ষে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতে আগমন কিছুমাত্র কঠিন ছিল না।

কিষ্কিন্ধ্যা-নগরী সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত। সমুদ্র-সম্বন্ধে বানরগণের কোন ধারণা বা অভিজ্ঞতা ছিল না, বলাই বাহুল্য। সুতরাং বিস্তীর্ণ সমুদ্র দেখিয়া তাহাদের ভয় ও হতাশা স্বাভাবিক। রাবণ যদি সীতাকে সমুদ্রের পারে লঙ্কাদ্বীপে লইয়া গিয়া থাকে, তবে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সেই দ্বীপে যাইবার উপায়ও আছে, ইহা অনুমান করিতে বানর-গণের কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু সেই উপায় তাহাদের অজ্ঞাত। অতএব সেই বিস্তীর্ণ সমুদ্র অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা প্রকৃতই দুঃসাহসের পরিচায়ক। বীর ও প্রভুভক্ত হনুমান্ কেবল দুঃসাহসের পরিচয় দেন নাই, অজানা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

সমুদ্রের বর্ণনা দিতে গিয়া মহাকবি বলিয়াছেন, 'প্রসুপ্তমিব চান্যত্র, ক্রীড়ন্তমিব কুত্রচিৎ'—অর্থাৎ সমুদ্র কোথাও প্রসুপ্তের ন্যায় নিশ্চল, আবার কোথাও ক্রীড়াপরায়ণের ন্যায় চঞ্চল। হনুমান্ যখন সাগর লঙ্ঘন করেন তখন শীতকাল, সমুদ্র শান্ত। যেখানে জল কিঞ্চিৎ গভীর, সেখানে তরঙ্গমালা চঞ্চল হইলেও উত্তাল নহে। ভারত ও সিংহলের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ মান্নার ও রামেশ্বর ব্যতীত ছিন্ন শৃঙ্খলের ন্যায় প্রস্তর ও বালুকাবহুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রবাল-দ্বীপ আছে। সাগর-লঙ্ঘন-কালে হনুমান্ ঐ সকল দ্বীপে আশ্রয় লইয়া-ছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ রামায়ণে বর্ণিত একটি ঘটনা উহা সমর্থন করে।

হনুমান্‌কে সাগর-লঙ্ঘনে উদ্যোগী দেখিয়া সমুদ্র ভাবিলেন, উহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত। অতএব তিনি সমুদ্র-জল-মধ্যস্থিত হিরণ্যনাভ—মৈনাক-পর্বতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'তুমি জল হইতে উত্থিত হও, এই বানর তোমার উপর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আমার অবশিষ্ট অংশ অতিক্রম করিবেন। সমুদ্রের আহ্বানে হিরণ্যনাভ (মৈনাক) জল হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন।

'হিরণ্যনাভস্তদ্বচো নিশম্য লবণাম্ভসঃ।
উৎপপাত জলাত্তূর্ণং মহাদ্রুমলতাবৃতঃ॥
ততো নীলাৎ সমুদ্রস্য সলিলাৎ প্রজ্বলন্নিব।
উৎপপাত মহাতেজাঃ পর্বতঃ সূর্যসন্নিভঃ॥'

—কাঞ্চনবর্ণ সূর্য যেমন প্রভাতে জ্বলিতে জ্বলিতে নীল জলরাশি হইতে সমুত্থিত হন, বৃক্ষ ও লতাজালে আচ্ছাদিত সেই দীপ্তশৃঙ্গ মৈনাক যেন তেজস্বী সূর্যের মতোই সমুদ্রের জলরাশি ভেদ করিয়া সগর্বে উত্থিত হইল।

অতঃপর সমুদ্র উত্তরণকালে হনুমান্ তাহার নিকটে আসিলে সে বিনীতভাবে হনুমানকে তাহার উপর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করে। হনুমানের বীরত্ব ও অসাধারণত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলা হইয়াছে, হনুমান পর্বতের অনুরোধ অঙ্গীকার করিয়া হস্তদ্বারা পর্বতকে স্পর্শ করত তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং বিশ্রাম না লইয়াই পুনরায় গমন করিয়াছিলেন।

ক্রমে বিস্তীর্ণ সাগর অতিক্রম করিয়া হনুমান্ অপরপারে লঙ্কা-নগরীতে উপনীত হইলেন।

আন্তর্জাতিক মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী সমুদ্ধানন্দ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞানী-গুণী মহাজনদের মধ্যে এ-বিষয়ে কোন মতানৈক্যই নেই যে, স্বামী বিবেকানন্দ মানব-জাতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর পুরুষ। তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছিল বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, গুরু নানকের আধ্যাত্মিক তেজ, এ ছাড়াও ছিল খৃষ্টের করুণা এবং সাধু পলের বাণী-প্রচারের বাগ্মিতা।

তাঁর বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন ধারায় সকলের কাছেই তিনি যে ভারতের জাতীয়তা-বাদের অগ্রপথিক ও উদ্বোধক হিসাবেই গণ্য হবেন, শুধু তা নয়, অনন্য এক মহান্ আন্তর্জাতিকতাবাদী রূপেও তিনি প্রতিভাত। বস্তুতঃ তিনিই ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিক মহামানব। সমগ্র বিশ্বে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে কল্যাণ ও শুভেচ্ছার বাণী প্রচার করবেন বলেই যেন তাঁর আবির্ভাব। কোন কোন মহলে এমনভাবে তাঁর আন্তর্জাতিক কর্মধারার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেন তিনি সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক দেশপ্রেমের প্রচারক। বাস্তবিক বিশেষ কোন শ্রেণী সমাজ বা সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের প্রতিভূ। আমেরিকার এক খ্যাতনামা বক্তা তাঁর উদ্যম এবং সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কোন্ দেশের মানুষ, কি তাঁর ধর্ম? এর উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ যে উত্তর দেন, তা অবিস্মরণীয়। তিনি প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠেছিলেন, 'আমার ধর্ম হ'ল সত্য, আর সমগ্র বিশ্বই আমার স্বদেশ।'

মানব-ইতিহাসে এমন আর একটি মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে কি, যিনি আত্মবোধে সবকিছুই বিশ্বের কল্যাণার্থে উৎসর্গ ক'রে প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে এই রকম ঘোষণা করতে পেরেছেন? পৃথিবীতে কি এমন আর এক জনকে খুঁজে বার করতে পারা যাবে, যিনি সব রকম বিভেদ সত্ত্বেও সকল মানুষকে নিজের রক্ত-সম্পর্কিত ভাই ব'লে স্বীকার করবেন? এই বিশ্ব কি আধুনিককালে স্বামীজীর মতো এমন বিশ্বমানবের দেখা পেয়েছে?

১৮৯৩ খৃঃ শিকাগোর ধর্মমহাসভায় দ্বিতীয় কোন প্রতিনিধি কি এমন কথা বলতে পেরেছেন যে, প্রত্যেক ধর্মই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার এক একটি পথ এবং নির্দিষ্ট কোন ধর্ম যদি টিকে থাকার একমাত্র অধিকারের দাবি জানায়, তা হ'লে প্রত্যেক ধর্মেরই সেই অধিকার রয়েছে? দুঃসময়ে শত বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি আর্ত নিপীড়িত মানবের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও নিন্দাস্তুতি সহ্য ও উপেক্ষা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাসীকে শান্তির পথ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তীব্র কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'ঘৃণা নয়, প্রেমই পারে শান্তি এবং পবিত্রতার পথ নির্দেশ করতে।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ কিংবা আগামী কাল অথবা কোন না কোন দিন সত্যের জয় হবেই; প্রেম বিজয়ী হবেই। তুমি কি তোমার মানুষ-ভাইকে ভালবাসো?'

'প্রেম, একমাত্র প্রেমই আমি প্রচার করি। সর্বত্র বিরাজিত অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার বৈদান্তিক সত্যকে ভিত্তি করেই আমার এই বাণী-প্রচার, প্রতিটি প্রাণীতে সুপ্ত রয়েছে দিব্যভাব।'

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্ববাসীর প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এই যে প্রেম, তা অতুলনীয়। তিনি নিগ্রোর সঙ্গে করমর্দন করতে পারেন, আলিঙ্গন করতে পারেন অস্পৃশ্যকে, নীচ জাতির সঙ্গে বসে একই হুঁকো থেকে ধূমপানও করতে পারেন। তিনি হিন্দুর মন্দিরে বা হিমালয়ে বসে ধ্যানস্থ হ'তে পারেন, মুসলমানের সঙ্গে কাবামুখী হয়ে প্রার্থনা করতে পারেন, আবার খৃষ্টানের সঙ্গে ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে আত্মনিবেদন করতে পারেন। দুর্বিপাকে পড়েও তিনি কখনও অন্যের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেননি। এ-রকম ঘটনা আমেরিকায় বহুবার ঘটেছে, যখন তাঁকে নিগ্রো ভেবে ভুল করা হয়েছিল এবং হোটেলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে যাননি। বিদেশে এমন অবস্থাও তাঁর হয়েছিল, যখন তিনি একদম নিঃস্ব হয়ে পড়েন এবং সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সংস্থার দ্বারস্থ হন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন, কারণ তাদের মত-প্রচারে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। একজন মানুষ আর একজন মানুষকে যেটুকু সাহায্য করে, তিনি তাই চেয়েছিলেন, তবু তিনি কোন রকমের সাহায্যই পাননি।

স্বামী বিবেকানন্দ পুরোপুরিই বেদান্তবাদী ছিলেন। তাঁর কাছে বেদান্তের অর্থ বিশ্বজনীন ধর্ম। সঙ্কীর্ণ ধর্মগত গোঁড়ামিকে তিনি ঘৃণা করতেন, বেদান্তবাদে এই গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। এ এমনই এক ধর্ম, যার মধ্যে অফুরন্ত ভাবাদর্শ সুশৃঙ্খলভাবে পাওয়া যাবে, অজস্র দ্বার খোলা রয়েছে, প্রত্যেকেই আপন অভিপ্রায় অনুসারে যে-কোন একটি দ্বার দিয়েই প্রবেশ করতে পারে।

বিশ্বমানব বিবেকানন্দ ছিলেন আধ্যাত্মিক ধরনের আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাঁর জীবন ও প্রচারের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ নতুন ভাবে, নতুন রূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার পূর্বে মানব-জাতির ইতিহাসে কোন দেশে, কোন মানুষের মধ্যেই এমন কারও কথা জানা যায়নি, যিনি সমগ্র মানব-সমাজকে একটি মাত্র জাতি ও গোত্র ব'লে ভেবেছেন। সুতরাং তিনি যে শুধু ভারতেরই প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন তা নয়, বস্তুতঃ সারা বিশ্বেরও একজন শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী।

মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশত-বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে সারা বিশ্বে পালিত হবে আগামী ১৯৬৩, জানুআরি থেকে ১৯৬৪, জানুআরি পর্যন্ত।*

* স্বামীজীর শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি-উপলক্ষে।

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

[বৈশাখ-সংখ্যার পর]

[উত্তরকাশীতে স্বামী দেবী গিরিজী মহারাজের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন-কালে বর্তমান সঙ্কলয়িতা স্বামী আদিত্য পুরী-রচিত সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকা-সহ 'বেদান্তসংজ্ঞা-প্রকরণম্' নামক একটি পুস্তকের সন্ধান পান। সম্প্রতি স্বামী স্বরূপানন্দ-প্রণীত 'আর্ষসংজ্ঞাবলিঃ' নামক একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয়, ইহাতে বেদান্তের বিভিন্ন সংজ্ঞাসমূহ বহু পুস্তক হইতে সঙ্কলিত এবং একটি সংস্কৃত ব্যাখ্যা সংযোজিত। ইহা একটি ক্ষুদ্র 'কোষ'-বিশেষ।

বর্তমান সঙ্কলনে উল্লিখিত দুইখানি পুস্তক হইতেই বেদান্তের সংজ্ঞাবোধক শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুস্তকের প্রায় সবগুলি বিষয়ই লওয়া হইয়াছে। সংখ্যানুযায়ী সাজাইবার জন্য কতকগুলি শ্লোক ইচ্ছামত গ্রথিত করা হইয়াছে। বেদান্ত-শিক্ষার্থীর পক্ষে শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাগুলি অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দসমূহ ও তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থের সহিত পরিচিত হইতে এইরূপ গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া এই সঙ্কলন-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করা হইল।

বলা বাহুল্য প্রবন্ধে নিবদ্ধ পাদ-টীকা-সহায়ে বস্তুগুলির সহিত সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্রই হইবে; বিস্তৃত পরিচয় গুরুমুখে প্রাপ্তব্য। বেদান্ত-সংজ্ঞা-'পুষ্প'-সমূহকে 'মালিকা'-রূপে গ্রথিত করা হইয়াছে বলিয়া প্রবন্ধের নামকরণ তদনুরূপ করা হইয়াছে।—লেখকের ভূমিকা হইতে সঙ্কলিত।]

ত্রিবিধ সংজ্ঞা

ব্রহ্ম-জীবশরীরাণ্যপ্যবস্থাকরণে তথা।
কর্ম চৈতানি সর্বাণি ত্রিবিধানি স্মৃতানি বৈ ॥১৫॥

ব্রহ্ম,[১] জীব,[২] শরীর,[৩] অবস্থা,[৪] করণ[৫] ও কর্ম[৬]—এই সকলের প্রত্যেকটিই বেদান্তশাস্ত্রে তিনপ্রকার কথিত হইয়া থাকে।

১. একই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সমষ্টিস্থূল, সমষ্টিসূক্ষ্ম ও সমষ্টিকারণোপাধিবশে **বিরাট্**, **হিরণ্যগর্ভ** ও **ঈশ্বররূপে** কথিত হন। ইহাই **ব্রহ্মত্রয়**। সমষ্টিস্থূলশরীরোপাধিক চৈতন্য বিবিধ কার্যাকারে বিরাজমান বলিয়া **বিরাট্** এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অথবা 'বিশ্বেষু সমস্তেষু নরেষু অভিমানিত্বাৎ বৈশ্বানরঃ' অর্থাৎ সর্বপ্রাণীতে 'অহং'-'আমি' এইরূপে অভিমানী বলিয়া তাঁহাকে **বৈশ্বানর** বলা হয়। অথবা বিশেষরূপে প্রকাশমান বলিয়াও তাঁহাকে **বিরাট্** বলা হইয়া থাকে। সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপাধিক চৈতন্যই জ্ঞানশক্তিমত্তাবশতঃ **হিরণ্যগর্ভ**, মালার পুষ্পাভ্যন্তরস্থ সূত্রের ন্যায় সর্বপ্রপঞ্চে অনুস্যূত বলিয়া **সূত্রাত্মা** এবং ক্রিয়াশক্তিমান্ বলিয়া **প্রাণ** নামেও কথিত হন।

সমষ্টি-অজ্ঞানোপাধিক চৈতন্যই সর্বপ্রাণীর নিয়ামক বলিয়া **ঈশ্বর**, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদের সর্বকর্মের প্রেরয়িতৃরূপে **অন্তর্যামী**, এবং রূপরাহিত্যবশতঃ **অব্যাকৃত** নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সমষ্টি-অজ্ঞানোপাধি বলিতে বিশুদ্ধসত্ত্বগুণপ্রধান মায়া বুঝায়। ইহাই ঈশ্বরের উপাধি। বস্তুতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ বলিতে উহা সম্পূর্ণ রজঃ ও তমোগুণ রহিত এরূপ বুঝায় না। উহা তমঃ ও রজোগুণ দ্বারা অভিভূত সত্ত্বগুণ নহে, কিন্তু উহাই তমঃ ও রজোগুণকে অভিভূত করে। এইজন্য ঐ সত্ত্বগুণকে বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ বলা হয়। [বৈষ্ণব-শাস্ত্র

কিন্তু ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণকে মায়া বা প্রকৃতির গুণ বলেন না, উহাকে ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত শক্তিবিশেষ বলেন। সুতরাং তাহা রজঃ ও তমোগুণের লেশশূন্য হইতে বাধা নাই।] ঈদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন মায়াতে পতিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব যে ঈশ্বর, তাঁহাতে নিজ স্বরূপ বিষয়ে বা অন্য পদার্থ বিষয়ে কোন আবরণ থাকিতে পারে না বলিয়া ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও সর্বজ্ঞ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের প্রকাশস্বরূপতা লাভ হয়। জ্ঞানই ব্রহ্ম বস্তু। স্বচ্ছ সত্ত্বগুণ তাঁহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তদ্বৎ হয় মাত্র। এই বিশুদ্ধসত্ত্বমায়োপাধিক ঈশ্বরই জগৎকারণ। তাঁহার জড় মায়ারূপ শরীরই জগতের উপাদান-কারণ ও চৈতন্যভাগই নিমিত্ত-কারণ। সুতরাং একই ঈশ্বর জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ হইয়া থাকেন।

২. একই প্রত্যগাত্মা ব্যষ্টিস্থূল, ব্যষ্টিসূক্ষ্ম ও ব্যষ্টিকারণোপাধিবশে **বিশ্ব, তৈজস** ও **প্রাজ্ঞ** সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই জীবত্রয়।

ব্যষ্টি-শরীরত্রয়ের অধিষ্ঠান চৈতন্যই প্রত্যগাত্মা, জীবসাক্ষী, কূটস্থ, অন্তরাত্মা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। অনৃত জড় দুঃখাত্মক অহঙ্কারাদি হইতে বিপরীতভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপে সদা প্রকাশমান বলিয়া ইনি **প্রত্যক্-আত্মা**। নিজেতে অধ্যস্ত প্রত্যেক পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রমাণবৃত্তি ব্যবধান বিনাই অপরোক্ষভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া ইনি **সাক্ষী** এবং একরূপ চিরস্থায়ী নির্বিকার বলিয়া তাঁহার **কূটস্থ**-সংজ্ঞা। 'কূট' শব্দে লৌহকারের যন্ত্রবিশেষ (নেয়াই) বুঝায়। সেই কূটের ন্যায় চৈতন্য সর্বদা নির্বিকার থাকেন বলিয়া তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়। অথবা 'কূট' শব্দে মিথ্যা যে বুদ্ধি এবং চিদাভাস, তাহাদের মধ্যে অসঙ্গরূপে যে বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাকেই **কূটস্থ** বলে।

সূক্ষ্মশরীরকে পরিত্যাগ না করিয়াও স্থূলশরীরে প্রবেশকর্তৃত্ববশতঃ প্রত্যগাত্মাকে **বিশ্ব** বলা হয়। তেজোময় অন্তঃকরণবিশিষ্ট বা তেজঃ অর্থাৎ বাসনাতে 'অহং' 'মম' অভিমান করত তৃপ্ত হন বলিয়া তিনি **তৈজস** এবং প্রজ্ঞারূপ চৈতন্যবান্ এই কারণে তিনি **প্রাজ্ঞ**। ব্যষ্টি-কারণোপাধি বলিতে মলিন-সত্ত্বোপাধিরূপা মায়া বা অবিদ্যাই বুঝায়। ইহাতে রজঃ ও তমোদ্বারা সত্ত্বগুণ অভিভূত হইয়া থাকে। এই মলিন সত্ত্বোপাধিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব জীব অবিদ্যা-আবরণদ্বারা সদা আবৃত বলিয়াই বদ্ধ ও অল্পজ্ঞ। ব্যষ্টিকারণোপাধিক এই প্রাজ্ঞ 'প্রজ্ঞানঘন,' কারণ জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার যাবৎ জ্ঞান সুষুপ্তিতে 'ঘন'—এক অবিদ্যারূপ হইয়া যায়। শ্রুতি এই প্রাজ্ঞকে 'আনন্দভুক্'ও বলেন। কারণ অবিদ্যাকৃত আনন্দই তিনি তৎকালে ভোগ করেন।

[কোন কোন আচার্যের মতে সুষুপ্তিতে জীব ঈশ্বররূপ হইয়া যায়। এবং ব্যষ্টি-অজ্ঞান উপাধিও সমষ্টি-অজ্ঞান বা মায়ারূপ হইয়া যায়। মায়ার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। সুতরাং কারণশরীর অজ্ঞানের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম, কূটস্থ নহেন। অতএব এই মতে কূটস্থ শরীরত্রয়ের অধিষ্ঠান নহেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের অধিষ্ঠানমাত্র। পঞ্চদশী ৬।২২ এবং ঈশ উপঃ আনন্দগিরিকৃত টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ-শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই মতে কিন্তু প্রাজ্ঞের অভাব হইয়া পড়ে।]

৩. স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর—এই শরীরত্রয়।

৪. জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে অবস্থা তিনপ্রকার। দিক্-আদি অধিষ্ঠাতৃদেবতানুগৃহীত ইন্দ্রিয়সকল-সহায়ে যে-কালে শব্দাদি বিষয় অনুভূত হয়, উহাই জাগ্রদবস্থা।

জাগ্রদ্‌ভোগপ্রদ কর্মের উপরম হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ উপরত হইলে যে অবস্থায় জাগ্রদনুভবজনিত সংস্কার হইতে উদ্ভূত বিষয় ও তাহার জ্ঞান হয়, তাহাই স্বপ্ন।

জাগরণ ও স্বপ্ন এই উভয় ভোগপ্রদ কর্মের উপরম হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাভিমানের নিবৃত্তি হইয়া বিশেষ বিজ্ঞানের উপরমাত্মক বুদ্ধির কারণাত্মারূপে অবস্থিতিকেই সুষুপ্তি বলে। সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি অজ্ঞানে লীন হয়। জাগ্রৎ-স্বপ্নকালীন সুখদুঃখপ্রদ কর্মের উপরম হইলেই সুষুপ্তি হইয়া থাকে বলিয়া সুষুপ্তিকালীন সুখ কর্মফলরূপ নহে। জাগ্রৎ-স্বপ্নকালীন সুখ আত্মস্বরূপ আনন্দের আভাসরূপ হইলেও উহা বিষয়রূপ উপাধি-অবচ্ছিন্ন মলিন ও ত্যাজ্য। সুষুপ্তি-সুখ প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ-সুখ হইলেও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হওয়াতে উহাও উপাদেয়. নহে। কিন্তু উহা জাগ্রৎ-স্বপ্নকালীন সুখ হইতে বিলক্ষণ। অবিদ্যারূপ তমোমিশ্রিত হওয়াতে সুষুপ্তির আত্মসুখও বৃদ্ধির যোগ্য নহে; এবং উহা বৃদ্ধি করাও যাইতে পারে না। নিদ্রাবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে স্বপ্নই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, সুষুপ্তির বৃদ্ধি হইবে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে সুখদুঃখ ভোগবশতঃ ইন্দ্রিয় ও মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সব পরিশ্রমই সুষুপ্তির ক্ষণিক সুখেও দূর হইয়া যায় বলিয়া সুষুপ্তিসুখ সর্বজীবের জীবনহেতু হয়। অবিদ্যাবৃত বলিয়া এই সুখও কাম্য নহে। কেবল আত্মাকার বৃত্তিতে ও নির্বিকল্প সমাধিতে যে স্বরূপানন্দের আবির্ভাব হয়, উহাই উপাদেয়।

৫. মন, বাক্ ও কায়-ভেদে করণ ত্রিবিধ। মন-শব্দে এখানে অন্তঃকরণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বোদ্ধব্য এবং বাক্-শব্দে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় গ্রহণীয়।

৬. ত্রিবিধ কর্ম: পুণ্যকর্ম, পাপকর্ম ও পুণ্যপাপমিশ্রিত কর্ম।

পুণ্যং পাপং বিমিশ্রং যত্তৎ প্রত্যেকং ত্রিধা মতম্।
প্রারব্ধং ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রতিবন্ধত্রয়ং তথা ॥ ১৬ ॥

পূর্বশ্লোকোক্ত যে পুণ্য,[১] পাপ[২] ও বিমিশ্র[৩] কর্ম তাহা প্রত্যেকটিই ত্রিবিধ। প্রারব্ধ[৪] কর্ম ত্রিবিধ বলা হয় এবং তদ্রূপ প্রতিবন্ধ[৫] ও ত্রিবিধরূপে প্রসিদ্ধ।

১. পুণ্যত্রয়: পুণ্যোৎকর্ষ, পুণ্যমধ্যম ও পুণ্যসামান্য।

পুণ্যোৎকর্ষ কর্মের ফল হিরণ্যগর্ভ-শরীর-প্রাপ্তি। **পুণ্যমধ্যম** কর্মের ফল ইন্দ্রাদি-দেবশরীর-প্রাপ্তি। **পুণ্যসামান্য** কর্মের ফল যক্ষ-রক্ষ-আদি শরীর-প্রাপ্তি।

২. পাপত্রয়: পাপোৎকর্ষ, পাপমধ্যম ও পাপসামান্য।

পাপোৎকর্ষ কর্মের ফল পরদুঃখদায়ী গুচ্ছ, গুল্ম, বৃশ্চিক, বনমক্ষিকাদি শরীর-প্রাপ্তি। **পাপমধ্যম** কর্মের ফল আম্র, পনস, নারিকেলাদি এবং মহিষ, অশ্ব ও গর্দভাদি শরীর-প্রাপ্তি। **পাপসামান্য** কর্মের ফল গো, গজ ও অশ্বত্থ, তুলসী আদি দেহ-প্রাপ্তি।

৩. মিশ্রকর্মত্রয়: মিশ্রোৎকর্ষ, মিশ্রমধ্যম ও মিশ্রসামান্য।

মিশ্রোৎকর্ষ কর্মের ফল নিষ্কাম কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নির্বিকল্প সমাধি অনুষ্ঠানের উপযোগী মনুষ্য-শরীর-প্রাপ্তি। **মিশ্রমধ্যম** কর্মের ফল স্বাশ্রমোচিত কাম্যকর্মানুষ্ঠানোপযোগী মনুষ্যদেহ-প্রাপ্তি। **মিশ্রসামান্য** কর্মের ফল ব্যাধ-চণ্ডালাদি দেহ-ধারণ।

[কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারা পঞ্চবিধ ফলের যে-কোন একটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চবিধ ফল যথা : উৎপাদ্য, বিনাশ্য, সংস্কার্য, বিকার্য ও আপ্য। **উৎপাদ্য**—যথা : কুলালের কর্ম দ্বারা ঘটের উৎপত্তি ; **বিনাশ্য**—যথা : দণ্ডপ্রহার-রূপ কর্মের দ্বারা ঘটের নাশ ; **সংস্কার্য**—যথা : মলের নিবৃত্তি অথবা গুণের উৎপত্তি ; **বিকার্য**—যথা : দুগ্ধের বিকার দধি অর্থাৎ অন্যরূপ প্রাপ্তি এবং **আপ্য**—যথা : গমনরূপ কর্মের দ্বারা গ্রামের প্রাপ্তি। মোক্ষ ইহাদের কোনটিই নহে। মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ বস্তু। অতএব মোক্ষ কোন কর্মফল নহে।]

৪. প্রারব্ধ ত্রিবিধ : স্বেচ্ছাকৃত, পরেচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। **স্বেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ**—ভিক্ষাটনাদি। **পরেচ্ছাকৃত প্রারব্ধ**—সমাধি আদি অবস্থায় শিষ্যাদি কর্তৃক দীয়মান অন্নাদি। **অনিচ্ছাকৃত প্রারব্ধ**—আকাশফল পতনবৎ অকস্মাৎ পাষাণ-পতনাদি। (পঞ্চদশী ৭।১৫১—১৬২ দ্রষ্টব্য)

৫. ভূতপ্রতিবন্ধ, বর্তমান প্রতিবন্ধ ও আগামী প্রতিবন্ধ-ভেদে প্রতিবন্ধ ত্রিবিধ। **ভূতপ্রতিবন্ধ**—শ্রবণাদিকালে পূর্বানুভূত বিরোধী বিষয়ের স্মরণ। **বর্তমান প্রতিবন্ধ**—প্রজ্ঞামান্দ্য, বিষয়াসক্তি, কুতর্ক ও বিপর্যয়-দুরাগ্রহ। **আগামী প্রতিবন্ধ**—প্রারব্ধ শেষ। যথা জড়ভরতাদির দয়াদি। আগামী প্রতিবন্ধ বামদেবের এক জন্মে ও জড়ভরতের তিন জন্মে ক্ষয় হওয়ার কথা প্রসিদ্ধ আছে। (পঞ্চদশী ৯.৩৯-৪৫ দ্রষ্টব্য)।

সম্বন্ধস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়স্ত্রিবিধস্তাপ এব হি।
অধিভূতাদিকং ত্রেধা কারণং ত্রিবিধং মতম্ ॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ,[১] তাপ,[২] অধিভূতাদি[৩] এবং কারণ[৪]—এই সকলেরই তিনপ্রকার ভেদ স্বীকার করা হইয়া থাকে।

১. সম্বন্ধ—**সংযোগ, সমবায় ও আধ্যাসিক-তাদাত্ম্যভেদে** ত্রিবিধ। অথবা **কার্যকারণভাব, বিষয়বিষয়িভাব ও আধারাধেয়ভাব** এইভাবে সম্বন্ধ ত্রিবিধ। অথবা ('তৎ' ও 'ত্বম্') **পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য, পদার্থদ্বয়ের বিশেষণবিশেষ্যভাব** ও **প্রত্যগাত্মপদার্থদ্বয়ের লক্ষ্যলক্ষণভাব**-ভেদেও সম্বন্ধ ত্রিবিধ জ্ঞাতব্য। (নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ৩।৩ দ্রষ্টব্য)

২. আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে তাপ ত্রিবিধ। আধিব্যাধি-আদি **আধ্যাত্মিক তাপ**। চরাচর প্রাণী হইতে জায়মান দুঃখ **আধিভৌতিক তাপ**। যক্ষ, রক্ষ, শীত, বাতাদিজনিত দুঃখ **আধিদৈবিক** তাপ।

৩. অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব—ইহাই অধিভূতাদিত্রয়।

৪. ন্যায়মতে সমবায়ী (উপাদান), অসমবায়ী ও নিমিত্ত-ভেদে কারণ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সমবায়ী বা উপাদান-কারণ বিষয়ে তিনপ্রকার মত প্রসিদ্ধ। পরিণাম, আরম্ভ ও বিবর্ত-ভেদে উপাদান-কারণ ত্রিবিধ। 'উপাদানসমসত্তাকত্বে সতি অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ'—একই বস্তুর পূর্বাবস্থা ত্যাগ-পুরঃসর সমসত্তাবিশিষ্ট অবস্থান্তর-প্রাপ্তির নাম **পরিণাম**। ইহাই সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত **পরিণামবাদ**।

বহুমৃৎকণিকা-সংযোগে ঘটোৎপত্তির (যে ঘট ছিল না তাহার উৎপত্তির), বহু তন্তু

সম্মিলনে পটোৎপত্তির (যে পট ছিল না তাহার উৎপত্তির) ন্যায় বহু অণু সংহত হইয়া যে জগৎ পূর্বে ছিল না, তাহার উৎপত্তি হয়—ইহাই নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক-সম্মত আরম্ভবাদ। সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ হইতে ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি—ইহাই আরম্ভবাদী বলিয়া থাকেন। আরম্ভ ও পরিণামবাদ নিরবয়ব পরমাত্মাতে সম্ভব হয় না।

'উপাদানবিষমসত্তাকত্বে সতি অন্যথাভাবো বিবর্তঃ'—উপাদানের বিষমসত্তাবিশিষ্ট কার্যাপত্তির নাম বিবর্ত, যেমন—রজ্জুরূপে স্থিত বস্তুরই সর্পরূপে প্রতীতির নাম বিবর্ত। এস্থলে রজ্জুর সত্তা ব্যাবহারিক ও সর্পের সত্তা প্রাতিভাসিক বলিয়া উহারা বিষমসত্তাবিশিষ্ট। অতএব অধিষ্ঠানের স্ব-স্বরূপ পরিত্যাগ বিনাই দোষবশে রূপান্তরে প্রতীতি—ইহাকেই **বিবর্তবাদ** বলে। যেমন মায়াবশে নির্বিকার ব্রহ্মে জগৎপ্রতীতি। চিদ্‌বিবর্ত জগৎ চিদ্‌ভিন্ন নহে। ইহা অদ্বৈত-বেদান্তের মত। (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৬ অধিঃ দ্রষ্টব্য)

'কৃপণধীঃ পরিণামমুদীক্ষতে ক্ষপিতকল্মষধীস্তু বিবর্ততাম্'—মন্দ-বুদ্ধি পুরুষের নিকট পরিণামবাদই উপাদেয় হইয়া থাকে, বিশুদ্ধান্তঃকরণ ভাগ্যবান্ পুরুষই সাদরে বিবর্তবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ত্রয়ো গুণাস্ত্রয়ঃ কালাস্ত্রিস্র এব হি মূর্তয়ঃ।
ত্রয়ো জ্ঞাত্রাদয়ো লোকে প্রপঞ্চস্ত্রিবিধো মতঃ॥ ১৮ ॥

সংসারে গুণ,[১] কাল,[২] মূর্তি,[৩] জ্ঞাত্রাদি[৪] এবং প্রপঞ্চ[৫]—এই সকলই ত্রিবিধ।

১. সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ। ২. ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তিন কাল। ৩. ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিন মূর্তি। ৪. জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই জ্ঞাত্রাদি-ত্রয়। ইহা ত্রিপুটী-নামেও কথিত হইয়া থাকে। ৫. স্থূলপ্রপঞ্চ, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ ও কারণপ্রপঞ্চ-ভেদে প্রপঞ্চ ত্রিবিধ।

লোকত্রয়ং তথা জ্ঞানপ্রতিবন্ধত্রয়ং স্মৃতম্।
বাসনাত্রিতয়ং লোকে শ্রবণাদিত্রয়ং মতম্॥ ১৯ ॥

সংসারে (শাস্ত্রে) লোক,[১] জ্ঞান-প্রতিবন্ধ,[২] বাসনা[৩] এবং শ্রবণাদির[৪] ত্রিবিধ ভেদ প্রসিদ্ধ।

১. স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—লোকত্রয়।

২. সংশয় ও অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা—ইহাই জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-ত্রয়। 'আমি ব্রহ্ম অথবা শরীর ?'—এইরূপ বিকল্পকে **সংশয়** বলে। 'পরিচ্ছিন্ন জীব আমি কিরূপে অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্যঘন-স্বভাব হইতে পারি ? অতএব আমি ব্রহ্ম নই'—এইরূপ নিশ্চয়কে **অসম্ভাবনা** বলে। 'আমি দেহ' এইরূপ দৃঢ়-জ্ঞান **বিপরীত ভাবনা** নামে প্রসিদ্ধ।

৩. লোকবাসনা, দেহবাসনা ও শাস্ত্রবাসনা-ভেদে বাসনা ত্রিবিধ। 'কেহ যেন আমার নিন্দা না করে এবং সকলেই যেন আমার স্তুতি করে'—এইরূপ ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া লোক-রঞ্জনার্থ পুনঃ পুনঃ লোকানুবর্তিত্বকে **লোকবাসনা** বলে। 'কো লোকমারাধয়িতুং সমর্থঃ'—সর্ব-লোকের মনোরঞ্জন করা অসম্ভব এবং পুরুষার্থের অনুপযোগী বলিয়া ইহা বন্ধনকর মলিন বাসনা।

বিণ্মূত্রাদি-পরিপূর্ণ, অস্থিমাংসময়, অনাত্মদেহে আত্মত্বভ্রান্তিপূর্বক মধুরান্নপানাদি সেবন ও অলঙ্করণাদি সহায়ে দেহের পুষ্টি বলবীর্য সৌষ্ঠবাদি সম্পাদনে অভিনিবেশ-হেতু দৈহিক

সংস্কার-বিশেষকে **দেহবাসনা** বলে। আত্মত্বভ্রান্তি, গুণাধানভ্রান্তি ও দোষাপনয়নভ্রান্তিরূপে দেহবাসনাও পুনঃ ত্রিবিধ। দেহাত্মভ্রান্তি বিরোচনাদিতে প্রসিদ্ধ ও উহা সার্বলৌকিক। সমীচীন লৌকিক শব্দাদি বিষয় সম্পাদন ও গঙ্গাস্নান শালগ্রাম তীর্থাদি সেবনরূপ শাস্ত্রীয় বিষয়-সম্পাদন-ভেদে গুণাধানভ্রান্তি দ্বিবিধ। চিকিৎসকোক্ত ঔষধ-সহায়ে ব্যাধি-আদি অপনয়নরূপ লৌকিক ও বৈদিক স্নান-আচমনাদিদ্বারা অশুচিত্ব অপনয়নরূপ শাস্ত্রীয় ভেদে দোষাপনয়নরূপ-ভ্রান্তিও দ্বিবিধ হইয়া থাকে। পুরুষার্থের অনুপযোগী বলিযা এইগুলি মলিন বাসনা। এই সকল সম্যক্‌রূপে সম্পাদন করাও অসম্ভব এবং ইহারা পুনর্জন্মের হেতু।

শাস্ত্রতাৎপর্যগ্রহণে তৎপর না হইয়া বহুগ্রন্থাভ্যাসপটুতার জন্য ও বিচারে বাদীকে পরাজিত করিবার ইচ্ছায় বহুশাস্ত্রাধ্যয়নে যে আসক্তি, তাহাকে **শাস্ত্রবাসনা** বলে। পাঠব্যসন, বহুশাস্ত্রব্যসন ও অনুষ্ঠানব্যসন-ভেদে ত্রিবিধ শাস্ত্রবাসনা ক্রমপূর্বক ভরদ্বাজ, দুর্বাসা ও নিদাঘে প্রসিদ্ধ আছে। দুঃখপ্রদ, পুরুষার্থের অনুপযোগী, দর্পহেতু ও পুনর্জন্মের নিমিত্ত বলিয়া এই শাস্ত্রবাসনাও মলিন। (গীতা ৬।৩২ মধু: টীকা দ্রষ্টব্য।)

এই সমস্ত বাসনাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ভাষ্যকার ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন :

'লোকানুবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭১ ॥
লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥ ২৭২ ॥

অর্থাৎ, লোকানুবর্তন (লোকরঞ্জন) দেহানুবর্তন ও শাস্ত্রানুবর্তন পরিত্যাগ করত আত্মাতে দেহাদি অধ্যাস দূর করিতে যত্নপর হও। লোকবাসনা দেহবাসনা ও শাস্ত্রবাসনা-প্রভাবেই মনুষ্যের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

এই মলিন বাসনাত্রয় হইতে ভিন্ন শুদ্ধ বাসনাকেই দৈবী সম্পদ বলে। শাস্ত্রসংস্কার-প্রাবল্য-বশতঃ উহা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন ও একরূপ। উহাই মুমুক্ষুগণের একান্তভাবে সেবনীয়।

৪. শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—শ্রবণাদিত্রয়। সর্বসংশয়-নিবর্তক—শ্রবণ, অসম্ভাবনা-নিবর্তক—মনন এবং বিপরীতভাবনা-নিবর্তক—নিদিধ্যাসন ; ইহাদের এরূপ ভেদ বোদ্ধব্য।

আচার্যপরিচর্যাপূর্বক সর্ববেদান্তের যথার্থ তাৎপর্য আচার্যমুখে শুনিয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবধারণই **শ্রবণ**। জীব ও ব্রহ্মের অভেদের সাধক ও ভেদের বাধক শ্রুত্যনুকূল যুক্তিদ্বারা অনাত্মদৃষ্টি তিরস্করণকেই **মনন** বলা হয় এবং 'আমিই ব্রহ্ম, আমা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই'—এইরূপ নিরন্তর চিন্তন **নিদিধ্যাসন** নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অনাত্মাকারবৃত্তিব্যবধানশূন্য ও ব্রহ্মাকারবৃত্তিতে স্থিতিরূপ। সমাধি ইহারই পরিপক্ব অবস্থা।

জ্ঞানাদিত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং তথা হেত্বাদয়স্ত্রিধা।
প্রাণায়ামত্রয়ং লোকে চান্ধ্যাদিত্রয়মেব হি॥ ২০ ॥

সংসারে জ্ঞানাদি,[১] হেতু-আদি,[২] প্রাণায়াম[৩] এবং আন্ধ্য-আদি[৪] ত্রিবিধ জ্ঞাতব্য।

১. জ্ঞানাদিত্রয়—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও উপরতি। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়ক।

প্রায়ই ইহাদের সহাবস্থান ঘটিয়া থাকে। কোথাও কোথাও অর্থাৎ কোন কোন অধিকারী পুরুষে ইহারা বিযুক্তভাবেও দৃষ্টিগোচর হয়। (পঞ্চদশী চিত্রদীপ—২৭৬ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের হেতু, স্বরূপ ও কার্য পরে বর্ণিত হইতেছে।

২. হেতু-আদিত্রয়—হেতু, স্বরূপ ও কার্য। **জ্ঞানের হেতু** শ্রবণাদি। সত্য ও মিথ্যা-বস্তুর ভেদ নিশ্চয় **জ্ঞানের স্বরূপ** এবং অজ্ঞান নাশপূর্বক অনাত্মবস্তুতে পুনঃ আত্মবুদ্ধির অভাব **জ্ঞানের কার্য** কথিত হইয়া থাকে। অজ্ঞান অবস্থায় দেহাদিতে যে দৃঢ় আত্মত্বুদ্ধি বিদ্যমান, উহার একান্ত অপ্রতীতিপূর্বক 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ই জ্ঞানের চরম অবধি বা সীমা।

বৈরাগ্যের হেতু বিষয়ে দোষদৃষ্টি। বান্তাশন অর্থাৎ উদ্‌গীর্ণ পদার্থ ভক্ষণের ন্যায় বিষয়ে ত্যাজ্যতা-বুদ্ধিই **বৈরাগ্যের স্বরূপ**। পুনরায় বিষয়-ভোগেচ্ছার একান্ত অভাবই **বৈরাগ্যের কার্য**। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ভোগের প্রতি তৃণবৎ তুচ্ছত্ববোধ—ইহাই বৈরাগ্যের চরম অবধি বা সীমা।

উপরতির হেতু যম-নিয়মাদি। চিত্তনিরোধ **উপরতির স্বরূপ**। লৌকিক সর্ব ব্যবহারের অভাবই **উপরতির কার্য**। সুষুপ্তির ন্যায় সর্ববস্তুর বিস্মৃতি উপরতির চরম অবধি বা সীমা। এইরূপে জ্ঞান বৈরাগ্য ও উপরতির হেতু স্বরূপ ও কার্য ত্রিবিধ জ্ঞাতব্য। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও উপরতি—এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানই প্রধান। কারণ উহা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ। বৈরাগ্য ও উপরতি ঐ তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক। তীব্র তপস্যার ফলে উক্ত তিনটিই কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষে অতি পরিপক্ব অবস্থায় দৃষ্ট হয়। প্রতিকূল প্রারব্ধ-বশে উহার অন্যথাও বহুস্থলে ঘটিয়া থাকে। বৈরাগ্য ও উপরতি পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মোক্ষ হয় না। তবে ঐ তপস্যাবলে পুণ্যলোকাদি-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

বিদ্যারণ্যাদির মতে তত্ত্বজ্ঞান উদয় হওয়া সত্ত্বেও যাঁহার বৈরাগ্য ও উপরতি পরিপূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় নাই, তাঁহার মোক্ষলাভ নিশ্চিত হইলেও দৃষ্ট দুঃখ (চিত্তের বিক্ষেপাদি) কিন্তু নিবৃত্ত হয় না। দৃষ্ট দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তাঁহার মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়াভ্যাস সহায়ে জীবন্মুক্তি-সুখলাভার্থ চেষ্টা করিতে হইবে। (পঞ্চদশী— চিত্রদীপ ২৭৬-২৮৬ এবং গীতা ৬।৩২ মধুঃ টীকা দ্রষ্টব্য)

৩. প্রাণ-নিগ্রহোপায় রেচক, পূরক ও কুম্ভকই প্রাণায়ামত্রয়। প্রাণায়াম অর্থ—প্রাণের সংযম অর্থাৎ প্রাণের চাঞ্চল্য দূর করা। একাগ্রতা-সহকারে ধ্যান বা জ্ঞান দ্বারাও প্রাণায়ামের ফললাভ হয়। পূরক, রেচক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়াম যোগ্যগুরুর নিকটে থাকিয়াই অভ্যাস করা উচিত, নতুবা রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। 'যোগবাশিষ্ঠ' মতে ধ্যান বা জ্ঞান দ্বারা প্রাণসংযম অর্থাৎ ভক্তিমার্গে বা জ্ঞানমার্গে প্রাণসংযমই সহজ বলিয়া বিবেচিত।

৪. নেত্রধর্ম আন্ধ্য (অন্ধতা), মান্দ্য (দৃষ্টিশক্তির মন্দতা) ও পটুত্ব (দর্শনশক্তির উৎকর্ষ) —ইহাই আন্ধ্যাদিত্রয়।

তাদাত্ম্যং চৈষণা ত্রেধা সুষুপ্ত্যাদিত্রয়ং ভবেৎ।
আনন্দাস্ত্রয় এবাত্র ত্রিবিধং কর্ম চোচ্যতে ॥ ২১ ॥

তাদাত্ম্য,[১] এষণা[২] ও সুষুপ্তি[৩] আদির ভেদ ত্রিবিধ। বেদান্তশাস্ত্রে আনন্দ[৪] ত্রিবিধ রূপে প্রসিদ্ধ এবং কর্মও[৫] ত্রিবিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. তাদাত্ম্যত্রয় : **সহজতাদাত্ম্য, কর্মজতাদাত্ম্য** ও ভ্রান্তিজন্যতাদাত্ম্য। **অহঙ্কারের সহিত** চিদাভাসের যে তাদাত্ম্য, তাহা **সহজতাদাত্ম্য** নামে উক্ত ; অহঙ্কারসহ দেহ ও সাক্ষীর তাদাত্ম্য পর্যায়ক্রমে **কর্মজতাদাত্ম্য** এবং **ভ্রান্তিজন্যতাদাত্ম্য** নামে প্রসিদ্ধ। (বাক্যসুধা—৮, ৯)

২. এষণাত্রয় : পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা। ৩. সুষুপ্তিত্রয় : সুষুপ্তি, মূর্ছা ও সমাধি। ৪. আনন্দত্রয় : ব্রহ্মানন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ।

নিদ্রাদির অভাবকালে ব্রহ্মাকারা অখণ্ডবৃত্তি-সহায়ে দ্বৈত-প্রতীতি রহিত হইলে যে স্ব-স্বরূপভূত নির্বিকল্পক আনন্দ অপরোক্ষ অনুভূতি-স্বরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই **ব্রহ্মানন্দ**। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণবৃত্তি অজ্ঞানে লয় হয় ; কিন্তু নির্বিকল্পক সমাধিতে ব্রহ্মাকারা-অন্তঃকরণ-বৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হয়। সুষুপ্তির আনন্দ অজ্ঞানাবৃত থাকে, কিন্তু নির্বিকল্পক সমাধিতে নিরাবরণ ব্রহ্মানন্দের ভান বা প্রকাশ হইয়া থাকে। এই আনন্দের অনুভব হয় না, ইহাই অনুভবস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলে অন্তঃকরণ ঐ আনন্দে আপ্লুত হইয়া যায়। ঐ আনন্দে তখন সর্ববস্তুই আনন্দময় হইয়া যায়। অভীষ্ট-বস্তুপ্রাপ্তিবশতঃ তত্তদিচ্ছার উপরম হইলে শান্ত অন্তর্মুখ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিতে স্বরূপানন্দের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, উহাই **বিষয়ানন্দ**। বস্তুতঃ বিষয়ে আনন্দ নাই। বিষয়েতে আনন্দ মূর্খদের কল্পনামাত্র। (পঞ্চদশী ১১।৮৬ দ্রষ্টব্য)। বিষয়ানুভব বিনা শান্ত তুষ্ণী অবস্থায় যে সুখ অনুভূত হয়, তাহাকে **বাসনানন্দ** বলে। এই আনন্দ বিষয়জন্য নহে এবং সামান্য অহঙ্কারের দ্বারা আবৃত। (পঞ্চদশী ১১।৮৫ দ্রঃ)। বিষয়-সম্বন্ধবশতঃ যে আনন্দের ভান হয়, তাহাকে জ্ঞানী এইরূপে জানেন যে, 'এই আনন্দ আমার স্বরূপাতিরিক্ত নহে। ইহা আমার স্বরূপানন্দের আভাসমাত্র। সুতরাং বিষয়ভোগকালে জ্ঞানী সমাধিস্থই থাকেন। অজ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু ঐরূপ জানে না। অতএব তাহার ভ্রান্তি হইয়া থাকে যে, আনন্দ বিষয়জন্য। বিষয়ভোগকালেও জ্ঞানীর যে সমাধি তাহা নিশ্চয়জ্ঞানরূপা ও তাহাকে **বাধমুখ-সমাধি** বলা হয়। 'জগৎ মিথ্যা' এই জ্ঞানে ব্যবহার-কালেও এই সমাধি হইয়া থাকে। পুনঃ ইন্দ্রিয়ব্যাপাররহিত হইয়া সর্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মে বিলয় করত বুদ্ধি ব্রহ্মাকারে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে **লয়মুখ-সমাধি** বলে। এই সমাধিতে বেদান্ত-মহাবাক্যার্থ-জ্ঞান থাকে না বলিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য ক্ষীণ হয় না। সুতরাং লয়চিন্তন দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তি হইলেও এই অবস্থায় মূল অবিদ্যা থাকিয়া যায় বলিয়া ইহা অমুখ্য। 'তত্ত্বমস্যা'দি মহাবাক্যার্থ-জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা-নিবৃত্তি-সহায়ে সর্বপ্রপঞ্চ বাধিত হইলে পূর্বোক্ত বাধমুখ-সমাধি হইয়া থাকে। উহাই মুখ্য। (গীতা, ৪।২৭ মধুঃ টীকা দ্রষ্টব্য।) জ্ঞানিগণ প্রায়ই বাধমুখ-সমাধির পক্ষপাতী। যোগ ভিন্ন লয়মুখ সমাধি হয় না।

৫. কর্মত্রয় : আগামী, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্ম। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কৃত পাপপুণ্য কর্মসমূহ **আগামী কর্ম** নামে কথিত হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের ফলভোগ আগামী (ভাবী) জন্মে হয়। ভাবী জন্মসকলের হেতুরূপে অবস্থিত পূর্ব পূর্ব জন্মজন্মান্তরকৃত কর্মসমূহ **সঞ্চিত কর্ম** নামে খ্যাত। বর্তমান শরীরারম্ভক কর্মকে **প্রারব্ধ কর্ম** বলে। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

A Ramakrishna-Vedanta Word-book compiled by Brahmacharini Usha, Vedanta Press, 1946 Vedanta Place, *Hollywood 28, California.* Pp. 87; Price One dollar.

বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্য অধ্যয়ন-কালে ইওরোপ-আমেরিকার পাঠক-পাঠিকারা এমন সব শব্দের সংস্পর্শে আসেন, যাহা তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ও নূতন; সেইজন্য তাঁহাদের খুব অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ৬০০টি শব্দসহ আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ব্যক্তি ও স্থানের পরিচয়, দুরূহ দার্শনিক সংজ্ঞা, পৌরাণিক শব্দ—জ্ঞাতব্য সব কিছুই স্থান পাইয়াছে। বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া দেওয়াতে প্রয়োজনীয় শব্দটি সহজেই বাহির করা যাইবে।

গ্রন্থটি যাঁহাদের জন্য রচিত, তাঁহাদের নিকট ইহা বিশেষ আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা—স্বামী তত্ত্বানন্দ। প্রাপ্তিস্থান : রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ২৫; মূল্য ২৫ ন. প.।

পকেট-সাইজ পুস্তিকাটিতে হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই আছে। ইহাতে হরিদ্বারের প্রাচীন ও বর্তমান পরিস্থিতি, কুম্ভমেলার পৌরাণিক কাহিনী, কুম্ভযোগ, বিভিন্ন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা ও মেলার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৩৯২; মূল্য ১০৲।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার-পরিচালনা ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, গ্রন্থাগারিক-বিদ্যাশিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়িতেছে। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার-সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তকের একান্ত অভাব। 'গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান' এই অভাব দূর করিতে সমর্থ হইবে।

সুধী লেখক ১০ বৎসর কাল গ্রন্থাগার-বিষয়ক কার্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই ফলস্বরূপ বর্তমান গ্রন্থ। ইহাতে ১৯টি অধ্যায়ে ও পরিশিষ্টে যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য : পুস্তক-নির্বাচন, বর্গীকরণ (Classification), ক্যাটালগ-নির্মাণ, গ্রন্থাগার-কমিটি, রেফারেন্স-লাইব্রেরি, লেণ্ডিং লাইব্রেরি-রুটিন, ছোটদের গ্রন্থাগার, পাঠকের সাহায্য, গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র-বিস্তরণ, গ্রন্থাগার-আইন, গ্রন্থ-সংরক্ষণ, গ্রন্থাগার-গৃহ ও আসবাব-পত্র, গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী, দশমিক বর্গীকরণ-সংখ্যা, পরিভাষা।

পরিশিষ্টে বর্ণিত 'ডিউই দশমিক বর্গীকরণে বাংলা পুস্তকের স্থাননির্ণয়'—একটি মৌলিক সংযোজন। বিশেষতঃ এই কারণেই—অর্থাৎ 'expansion of Indian subjects according to Dewey Decimal classification'—জন্যই ১৯৬১ খৃঃ লেখক 'Watumull'-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৯৬০ খৃঃ এই পুস্তক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহদাস'-পুরস্কারও লাভ করে।

উদ্বোধনের নবপ্রকাশিত পুস্তক

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। **প্রকাশক:** স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ২৬৮; মূল্য ৩৲।

হিন্দুধর্মকে বিশেষভাবে জানিতে হইলে শিবাবতার আচার্য শঙ্করের জীবনী-পাঠ অত্যাবশ্যক। দুঃখের বিষয় তাঁহার প্রামাণিক জীবনচরিত দুর্লভ; যে জীবনী পাওয়া যায়, তাহা কিংবদন্তীতে পূর্ণ। স্বামী অপূর্বানন্দ বহু পরিশ্রম করিয়া আচার্য শঙ্করের ঐতিহাসিক জীবন-তথ্য সংগ্রহ করিয়া চৌদ্দটি অধ্যায়ে বর্তমান গ্রন্থের রূপ দিয়াছেন।

আলোচ্য জীবনীতে কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে; ঘটনাগুলি আচার্য শঙ্করের জীবনের সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে জড়িত যে, সেগুলি বাদ দেওয়া কঠিন। এই গ্রন্থে আচার্য শঙ্করের অপূর্ব প্রতিভা ও অলৌকিক সাধনার দিকটি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি তাঁহার জীবনের কর্মধারা সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। অদ্বৈত-বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও ভক্তিমূলক স্তবের রচয়িতা—জ্ঞান ও ভক্তির দুইটি চিত্র পাশাপাশি থাকায় এই অমূল্য জীবন অনুশীলনে যথার্থ দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-প্রস্তুতি

ভুবনেশ্বর: গত ৬ই মে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ও রাজভবনে বিশিষ্ট জনসমাবেশে অনুষ্ঠিত সভায় ওড়িশ্যার রাজ্যপাল শ্রীসুখতঙ্কার বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের জাতীয় জীবনস্রোত ঘুরাইয়া দিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন জড়বাদ ত্যাগ করিতে। মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, শুধু আধ্যাত্মিকতায় নয়, ঐহিকতার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষ উন্নতি করুক।

মাননীয় রাজ্যপাল ইচ্ছা করেন, স্বামীজীর শতবার্ষিকীর বৎসরটি যেন জাতির আধ্যাত্মিক বৎসর-রূপে প্রতিপালিত হয়—এই সময়ে দেশবাসী গভীরভাবে স্বামীজীর বাণী অনুধ্যান করিবে, তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিবে এবং তাঁহার উপদেশ অনুসারে জীবন-গঠনে সচেষ্ট হইবে।

ওড়িশ্যার বিধান-সভার সভাপতি শ্রীলিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী বলেন: স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয় মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। তাঁহার বাণী আজও দেশকে যথার্থ লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিতে সমর্থ। জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের জন্য বর্তমানে যাহা করণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, স্বামীজী তাহার ইঙ্গিত বহুপূর্বেই দিয়াছিলেন।

স্বামী সৌম্যানন্দ বলেন, ভারতে স্বামীজীর আবির্ভাব বিশেষ উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল। জনসাধারণ দেশ সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা-জগতে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাঁহার বহু বক্তৃতায় দেশপ্রেম

ও নিপীড়িত ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দেশে 'সমাজসেবা'-কথাটি নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে; ইহা স্বামীজীর শিবজ্ঞানে জীবসেবা, নরনারায়ণ-জ্ঞানে সেবা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উক্তির ফলস্বরূপ। ওড়িষ্যার সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত যাহাতে স্বামীজীর শতবার্ষিকী সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য তিনি সর্বসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা আশা করেন।

ওড়িষ্যায় স্বামীজীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ১৪ দফা কার্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: স্বামীজীর নামে একটি আদর্শ গ্রাম-প্রতিষ্ঠা, দশখণ্ডে স্বামীজীর বাণী ও রচনার প্রকাশন, ওড়িষ্যার ১৩টি জেলায় শতবার্ষিকীর আয়োজন, ভুবনেশ্বরে রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা, একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের নামে স্থায়ী বক্তৃতার ব্যবস্থা, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের রচনা আবৃত্তি বক্তৃতা সঙ্গীত ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা। এই কার্যসূচীকে রূপ দিতে প্রাথমিক ব্যয় তিন লক্ষ টাকার মতো পড়িবে।

এতদুদ্দেশ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি লইয়া শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। শতবার্ষিকী কমিটির কার্যালয়ের ঠিকানা: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (ভুবনেশ্বর)।

বক্তৃতা-সফর

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এপ্রিল ও মে মাসে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে বক্তৃতা দেন এবং বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য অনেক স্থলে শক্তিশালী কমিটি গঠন করেন:

গড়বেতা (মেদিনীপুর): সাধারণ পাঠাগার; কলেজ; রামকৃষ্ণ আশ্রম। কলিকাতা: শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদ; বেহালা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম; বলরাম-মন্দির; দমদম। জলপাইগুড়ি: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম; I.T.P.A. হল। দার্জিলিং: বি. টি. কলেজ। কালিম্পং: টাউন হল। শিলিগুড়ি: মিউনিসিপ্যাল হল। হাবড়া (২৪ পরগনা): সারদা-সঙ্ঘ; অশোকনগর হাইস্কুল। ইটাচুনা (হুগলি)। কোচবিহার: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম; মদনমোহন মন্দির; মাথাভাঙ্গা। ধুবড়ি: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম; শিশুপাঠশালা; হরিসভা। আলিপুর দুয়ার: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম।

কুলটি ঃ গত ২৪শে এপ্রিল কুলটি সম্মিলনীর উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ডক্টর এস. কে. চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী পরশিবানন্দ, চণ্ডিকানন্দ, নিস্পৃহানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বরানগর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৬ই হইতে ১৩ই মে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব বিশেষ উৎসাহ- ও আনন্দ-সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মাঙ্গলিক শান্তিপাঠ, ঊষাকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা ও হোম, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের মিলন-সভা, প্রাক্তন ছাত্রদের সাধারণ সভা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, কথকতা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, ধর্মসভা, প্রদর্শনী, বাউল-গান, ব্রতচারী, লাঠি ও তরবারি-খেলা, রামায়ণ-গান, পুতুলনাচ, আবৃত্তি রচনা ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, কালীকীর্তন, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

উদ্বোধন-দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ উৎসবানুষ্ঠানের ও প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রতিদিন প্রদর্শনীতে সহস্র সহস্র দর্শক আগমন করেন। প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশু-চিড়িয়াখানা, ইলেকট্রিক ট্রেন, স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন অবস্থার ছবি।

বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা-সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন।

উৎসবের শেষ দিন শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দ শাস্ত্রযুক্তি-অবলম্বনে 'বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সরিষা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২২শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী ওঁকারানন্দ ভাষণ দেন। প্রায় ৭,০০০ নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

কাঁথি: শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিনদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রথম দিন পূজা, হোম, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বামী যুক্তানন্দ বক্তৃতা দেন। মহকুমা-শাসক শ্রীনির্মলচন্দ্র রায় নবনির্মিত গ্রন্থাগার-ভবনের উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় দিন ডক্টর কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। তৃতীয় দিন হরিনাম-সংকীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছিল।

বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ভজন এবং ৫ই জ্যৈষ্ঠ 'কথামৃত' পাঠ ও নগরকীর্তন হয়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ঊষা-কীর্তনের পর পূজা, ভজন, গীতা ও চণ্ডীপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে ৩,০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ পান। অপরাহ্নে সেবাশ্রমের নবপঞ্চাশৎ বার্ষিক সভার অধিবেশন ও বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রে যাত্রাভিনয় হয়।

কার্যবিবরণী

সারদাপীঠ (বেলুড়)**:** মিশন-পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যে ও বিস্তারে সারদাপীঠ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। সারদাপীঠের প্রধান ৫টি বিভাগ: বিদ্যামন্দির, শিল্পমন্দির, তত্ত্বমন্দির, জনশিক্ষামন্দির, এবং শিক্ষণমন্দির। সারদাপীঠের ১৯৫৯-'৬১ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) বিদ্যামন্দির

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে স্থাপিত আবাসিক কলেজ বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা-বর্ষ (১৯৪১) হইতেই উৎকৃষ্ট পরীক্ষাফলের জন্য জনসাধারণের ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যামন্দিরে ১৫৮ জন ছাত্র ছিল, ৩৩ জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক (৫ জন সাধু) তাহাদের শিক্ষাদান ও তত্ত্বাবধান করেন। ১৯৬০ খৃঃ হইতে বিদ্যামন্দির তিন বৎসরের ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হইয়াছে। সাধারণ শিক্ষানুষ্ঠানের সহিত ছাত্রপরিষদের উদ্যোগে প্রার্থনা, পূজা, জাতীয় উৎসব, বিতর্ক ও সাহিত্যসভা, পত্রিকা-প্রকাশ, ছুটিতে বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ অভিযান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

(২) শিল্পমন্দির

শিল্পমন্দিরের তিনটি বিভাগ: ইঞ্জিনিয়রিং, টেকনিক্যাল ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল। ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগে ১৯৫২-৫৫ খৃঃ পর্যন্ত জুনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তিন বৎসরের সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স বা লাইসেন্‌সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং চালু করা হইয়াছে। সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ সিভিল (L. C. E.), মেকানিক্যাল (L. M. E.) ও ইলেকট্রিক্যাল (L. E. E.) ইঞ্জিনিয়রিং শিক্ষা দেন। ১৯৫৯ ও '৬০ খৃঃ শিল্পমন্দিরের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৫১৪ ও ৫২৯। শিল্পমন্দির-ছাত্রাবাসে ৯৮ ও ১১০ জন ছাত্র ছিল।

শ্রমশিল্পবিভাগে বয়ন ও রঞ্জনশিল্প, খেলনা তৈয়ার এবং কাঠের ও দর্জির কাজ শেখানো হয়। শিল্পবিভাগের বিক্রয়-কেন্দ্রে শ্রমশিল্প-ও যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যাদি সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

শিল্পবিভাগে একটি গবেষণাগার আছে, এখান হইতে উদ্ভাবিত গোময়-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, পেট্রল-গ্যাস প্ল্যাণ্ট, ইলেক্‌ট্রিক ক্লক ও অটোমেটিক তাঁত উল্লেখযোগ্য; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রশংসিত।

(৩) তত্ত্বমন্দির

ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার উদ্দেশ্যে তত্ত্বমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার চতুষ্পাঠীতে সারদাপীঠের কর্মিগণ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ভারতের জাতীয় আদর্শ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহক সংস্কৃত ভাষাকে মর্যাদা দিবার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মহতী ইচ্ছা রূপায়িত করিবার জন্য বেলুড় মঠের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যান-বাটীতে একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হইতেছে। তত্ত্বমন্দিরে সর্ব-সাধারণের জন্য ধর্মসভার ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) জনশিক্ষামন্দির

জনশিক্ষামন্দিরের প্রধান কাজ দেশের বিভিন্ন অংশে নিরক্ষর বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার। ৯টি কেন্দ্রে আদিবাসীদের মধ্যে এবং শিল্পাঞ্চলে ও অনুন্নত গ্রামে এই কাজ করা হইয়াছে; শ্রুতিচাক্ষুষী (audio-visual) শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রধান গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৪,৭১৩। কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ১৯৬০ খৃঃ ১,৪৮১ জন পাঠককে ২৫,২৯৩ বই পড়িতে দেওয়া হয়।

সমাজশিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্রে (S. E. O. T. C.) ১৯৫৯ ও '৬০ খৃঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ১০১ ও ৯০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়াছে।

(৫) শিক্ষণমন্দির

গবর্নমেণ্টের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীনে আবাসিক শিক্ষণমন্দির

(B. T. College) পরিচালিত হইতেছে; প্রতিবর্ষেই পরীক্ষাফল ভাল হয়।

এতদ্ব্যতীত সারদাপীঠের আরও কতকগুলি বিভাগ আছে, যথা: ফটোগ্রাফি ও ফিল্ম, কৃষি ও গোপালন, পুস্তক-প্রকাশন।

বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়

সারদাপীঠের উদ্যোগে বিবেকানন্দ শতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বিবেকানন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলিতেছে। এই জন্য দুই কোটী টাকা প্রয়োজন; এ-বিষয়ে আমরা ভারত সরকার, রাজ্যসরকার ও সহৃদয় বদান্য জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যাহাতে সকলের অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সহযোগিতায় এবং সমবেত প্রচেষ্টায় স্বামীজীর পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হয়।

রামহরিপুর: বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একটি শাখা—বাঁকুড়া শহর হইতে ১৯ মাইল দূরে স্বাস্থ্যকর গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত। ১৯৪৩ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে, কলা ও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, বিজ্ঞান-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৩০১। নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ১০৯ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। ছাত্রাবাসে ২৫ জন থাকিতে পারে, নূতন ছাত্রাবাস নির্মিত হইতেছে। বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য স্কুল-কাম্-কমিউনিটি সেণ্টার পরিচালিত হইতেছে। গ্রামের এই কেন্দ্রটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল!

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

জানুআরি: এস আমরা অতীতকে জয় করি; দ্বিতীয় জন্ম; দ্বৈত ও অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মা; ভারতকে জানা; স্বামী বিবেকানন্দ: তাঁহার কার্যক্রম ও তাহার রূপায়ণ; সত্তা, অনুভূতি ও ঈশ্বর; আধ্যাত্মিক উন্নতি কি উপায়ে দ্রুততর করা যায়? প্রেম—মানবীয় ও ঐশ্বরিক।

ফেব্রুআরি: স্বামী বিবেকানন্দের শাণিত তরবারি; স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ: হিন্দুমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা; ধ্যান, সমাধি ও জ্ঞানালোক; বৈদান্তিক দৃষ্টিতে জগৎ; ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করিবার উপায়; অতীন্দ্রিয় অনুভূতিই ধর্মের প্রাণ; কাল, মন ও সত্য; ঈশ্বর-সচেতনতার অভ্যাস।

পুরাতন মন্দিরে প্রতি রবিবার রাত্রি ৮টায় ধ্যান ও কঠোপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে বেদীতে প্রতিদিন পূজা হয়; বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

সিঁথি: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১৯শে হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনই প্রায় ১০,০০০ হাজার ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। স্বামী সংশুদ্ধানন্দ উদ্বোধন ও মঙ্গলাচরণ করেন। বিভিন্ন দিনে স্বামী পুণ্যানন্দ, নিরাময়ানন্দ, পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী, অধ্যাপক বিনয়কুমার সেন ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। কাশুন্দিয়া মায়ের মন্দির, শ্রীঅভয়জী ও সম্প্রদায়, শ্রীক্ষান্তিলতা দেবী, শ্রীগনেশ মুখার্জি, দক্ষিণাকালী সন্তানসঙ্ঘ ও অন্ধগায়ক সত্যেন চক্রবর্তী ধর্মকথা ও কীর্তনাদি করিয়া সকলকে আনন্দদান করেন। একদিন ৫,০০০ ভক্ত নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। পাঁচদিন সিঁথিতে একটি ধর্মীয় উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়।

অশোকনগর (২৪ পরগনা): গত ৭ই ও ৮ই এপ্রিল স্থানীয় শ্রীসারদা সঙ্ঘ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বিকালে মহিলাসভা পরিচালনা করেন কল্যাণগড় বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা নির্ভয়াপ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ছবিতে দেখানো হয়।

দ্বিতীয় দিন সকাল বেলা হইতে মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভোগরাগ ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়। ১,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালে এক জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও উপদেশাদি আলোচিত হয়, পরে ধর্মমূলক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

গোরক্ষপুর: প্রতিবর্ষের মতো এবারেও গত ১২ই হইতে ১৪ই মে স্থানীয় রামকৃষ্ণ সমিতি কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-প্রদত্ত সমিতির নিজস্ব ভূমিতে তিনদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, আলোচনা-সভা ও কীর্তনাদির মাধ্যমে সমিতির নিজস্ব গৃহের ভিত্তি-স্থাপনার দ্বারা বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দির, পুস্তকালয় ও হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, বীতশোকানন্দ, অপূর্বানন্দ, ভাস্বরানন্দ ঈশানানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রেরণা অনুভূত হয়।

প্রথম দিন সন্ধ্যায় রামতাল হ্রদের তীরে আম্রকুঞ্জের মনোরম ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে গোরক্ষনাথ মন্দিরের মোহন্ত শ্রীদিগ্বিজয়নাথের সভাপতিত্বে ধর্মসভার অধিবেশন হয়। গীতা প্রেসের শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধে, অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গোরক্ষনাথ ও সিদ্ধযোগী সম্প্রদায় সম্বন্ধে, স্বামী বীতশোকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অধ্যক্ষ V. M. Chako খৃষ্টধর্ম-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

দ্বিতীয় দিন প্রাতে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, ভজনাদি ও প্রভাতফেরী সহযোগে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পরে বিশেষ পূজা হোম ও পুষ্পাঞ্জলি সম্পন্ন হয়। স্বামী অপূর্বানন্দের

'কথামৃত'-পাঠ ও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বাস্তুযাগ ও রুদ্রযাগের অনুষ্ঠান জনসাধারণের বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে সহস্রাধিক নরনারীকে প্রসাদ-দানে তৃপ্ত করা হয়। পরে জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

তৃতীয় দিন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বৃহৎ সপ্তশতী যজ্ঞ ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী অপূর্বানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী বীতশোকানন্দ ও অধ্যাপক ভাণ্ডারকর স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

পূর্ণিয়াঃ রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই হইতে ১৩ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী অনুপমানন্দ ও পরশিবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিব্য জীবন ও কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তী পূজা হইয়াছিল। রামনবমীর দিন ৬,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বেহালা (কলিকাতা ৩৪): পর্ণশ্রী পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্রের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ১৬ই মার্চ রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দির কর্তৃক ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ১৮ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি-সহ প্রভাতফেরী, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে পল্লীর প্রায় ৮০০ শত লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় স্বামী ঋদ্ধানন্দ (সভাপতি) এবং অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

নূতনপুকুর (২৪ পরগনা): গত ১লা এপ্রিল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, ভজন ও পল্লীপরিক্রমা এবং পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ১,৫০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ধর্ম-সভায় অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ (সভাপতি) ভাষণ দেন।

ভাঙ্গামোড়া (হুগলি): গত ১১ই চৈত্র স্থানীয় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পূর্বাহ্নে চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২,০০০ নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে স্বামী চিদ্রসানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জন-সভায় অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ

জন্ম ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০

মহাসমাধি : ১লা আষাঢ়, ১৩৬৯

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মহাসমাধি

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ৮০ বৎসর বয়সে গত ১লা আষাঢ় (১৬ই জুন) শনিবার সকাল ৯টা ৭ মিঃ সময়ে মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে গত ১১ই জুন কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়। গত দুই বৎসর যাবৎ তিনি মূত্রগ্রন্থির (prostate gland) রোগে ভুগিতেছিলেন। ষোল মাস পূর্বে তাঁহার দেহে একবার প্রাথমিক অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। উহাতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ না করায় তাঁহার সম্মতিক্রমে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁহাকে পার্ক নার্সিং হোমে গত ১১ই জুন ভরতি করা হয়। ১৩ই জুন অস্ত্রোপচারের পর তিনি ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছিলেন, কিন্তু শুক্রবার অপরাহ্ণ হইতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হইতে থাকে। চিকিৎসকগণের সর্ববিধ চেষ্টা সত্ত্বেও ৯টা ৭ মিঃ তিনি মহাসমাধি লাভ করিলেন।

তাঁহার পূতদেহ নার্সিং হোম হইতে বেলা ১২ টা ৩০ মিনিটে বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতার সাধু ও ভক্তগণ টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া বেলুড় মঠে আসিতে থাকেন। 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' যোগে তাঁহার মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচারিত হইলে বহু ভক্ত নরনারী কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে তাঁহাদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিবার জন্য মঠ-প্রাঙ্গণে সমবেত হন। যে ঘরে তিনি থাকিতেন, সেখানে তাঁহার পুণ্যদেহ ঘিরিয়া সাধু-ব্রহ্মচারীরা সমবেত কণ্ঠে বেদ ও উপনিষৎ পাঠের পর ভজন করেন।

বেলা ২-৩০ মিঃ তাঁহার পুষ্পশোভিত পূতদেহ নীচে মঠের বাঁধানো প্রাঙ্গণে নামানো হয়। সেখানে সুসজ্জিত খাটের উপর তাঁহার দেহ রক্ষিত হইলে অগণিত নরনারী, যাঁহারা দারুণ বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া নীচে অপেক্ষা করিতেছিলেন, একে একে পুষ্পাঞ্জলি দেন।

মঠের ঘাটে আনুষ্ঠানিক স্নানাদি কৃত্য সমাপনান্তে পুষ্পশোভিত খাটে স্থাপিত দেহ শোভাযাত্রা-সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর মন্দিরের সামনে অল্পক্ষণের জন্য নামানো হয়। বেলা প্রায় ৪॥টায় বেলুড় মঠের দক্ষিণপ্রান্তে গঙ্গাতীরে তাঁহার পুণ্যদেহ অগ্নিতে সমর্পিত হয়। চিতাগ্নিতে ঘৃত তিল যবাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়। শেষকৃত্য সমাপনের পর চিতাভূমি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়।

* * *

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল জিতেন্দ্রনাথ। ১৮৮২ খৃঃ জুলাই মাসে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুরুপ গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার অবুঝহাটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত সিংহ-রায় পরিবার তাঁহার পৈতৃক বংশ। বাল্যকালেই তিনি মাতাপিতাকে হারান এবং ধর্মপ্রাণা মাতামহীর স্নেহযত্নে বর্ধিত হন। শৈশব হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্মভাব লক্ষিত হইত। প্রথমে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের ইংরেজী স্কুলে ও পরে হাওড়া জেলার ব্যাঁটরা গ্রামে তিনি পড়াশুনা করেন। ১৯০১ খৃঃ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে একদিন ম্যাক্সমূলর-লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী পাঠ করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন; সেখানেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়, 'কথামৃত'-কার 'শ্রীম' ও 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হন।

১৯০৬ খৃঃ তিনি তাঁহাদেরই নিকট শ্রীশ্রীমায়ের সন্ধান পাইয়া জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহামন্ত্র লাভ করেন। কয়েকমাস পরে সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি পদব্রজে জয়রামবাটীতে মাতৃসকাশে উপস্থিত হন। তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-সঙ্কল্পে প্রসন্ন হইয়া শ্রীশ্রীমা স্বহস্তে তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয়কে গৈরিক বসন প্রদান করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করেন, 'ঠাকুর, এদের সন্ন্যাস রক্ষা ক'রো, পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক না কেন, এদের তুমি দেখো।' শ্রীশ্রীমায়েরই নির্দেশে জিতেন্দ্রনাথ ১৯০৭ খৃঃ কাশীধামে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর নিকট সন্ন্যাস-নাম গ্রহণ করিয়া সাধন-জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম হইল স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। অতঃপর তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট আনুষ্ঠানিক বিরজা-হোম সমাপনান্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

ইহার পর হইতে তাঁহার জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কর্মধারার সহিত মিলিত হইয়া যায়; শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে তাঁহার চিত্ত শতদলের মতো বিকশিত হইতে থাকে। বারাণসী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, মায়াবতী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তিনি মঠ ও মিশনের কাজ করেন। তিনি মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর এবং বলরাম-মন্দিরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ লাভ করেন।

স্বামী সারদানন্দজীর নির্দেশে তিনি রাঁচি মোরাবাদী পাহাড়ের নির্জন পাদদেশে একটি নূতন আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন এবং ১৯২৭ হইতে ১৯৫২ খৃঃ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বৎসর সেখানে নিরবচ্ছিন্ন সাধন-ভজন ও লোককল্যাণকর সেবাকার্যে রত থাকেন। তাঁহার জীবনে একদিকে কঠোর তপস্যা ও অন্যদিকে বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা লক্ষিত হইত।

১৯২২ খৃঃ তিনি মঠ ও মিশনের অন্যতম পরিচালক (Trustee and Member of the Governing Body) মনোনীত হন। ১৯৪৭ খৃঃ তিনি মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ (Vice-President) নির্বাচিত হন। ১৯৫১ খৃঃ হইতে কয়েকবার তিনি বাংলা, বিহার, আসাম, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, নাগপুর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাব-প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ করেন। নিষ্কাম

কর্ম ও নিরবচ্ছিন্ন উপাসনার সমন্বয়ে গঠিত তাঁহার জীবন নানা দেশে অগণিত ধর্মপিপাসুর প্রাণে অনাবিল আনন্দ ও শান্তি দিয়াছে। বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও অক্লান্তভাবে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ-সাধনে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এইরূপ পরিভ্রমণকালে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণাবলী উদ্বোধন-পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় গত সাত বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে; পরে ঐগুলি 'সৎপ্রসঙ্গ'-নামে পুস্তকাকারে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজীর তিরোধানের পর স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী গত ৬ই মার্চ, ১৯৬২ সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে বৃত হইয়াছিলেন। কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মিলিত হইলেন। তাঁহার অন্তর্ধানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। ভক্তগণ হারাইলেন একজন স্নেহশীল পথনির্দেশক।

* * *

মহাপ্রয়াণের ত্রয়োদশ দিবসে গত ১৩ই আষাঢ় (২৮শে জুন) বৃহস্পতিবার বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন ও ভোগরাগ হইয়াছিল। বিশুদ্ধানন্দজীর একখানি প্রতিকৃতি পুষ্প ও মাল্য দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। সমবেত ভক্তগণ পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। দ্বিপ্রহরে ১১,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ এবং বৈকালে নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন হয়। আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর তপস্যাপূত জীবন ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং গুরুতত্ত্ব বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী তেজসানন্দ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া বলেন, শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান স্বামী বিশুদ্ধানন্দের মধ্যে মাতৃভাবের বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল, তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাই তাঁহার স্নেহস্পর্শ লাভ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারা ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণই শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ, তাঁহার শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়াশীল। অতএব গুরুর অদর্শনে শোক করা অনুচিত, লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিয়াও তিনি সাধক-শিরে অজস্র আশিস্‌-ধারা বর্ষণ করিতেছেন, কালে গুরু ইষ্টে লয় হন। আমাদের কর্তব্য গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় জীবন গঠন করা—ইহাই শ্রেষ্ঠ গুরুসেবা এবং শান্তিলাভের উপায়।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কথাপ্রসঙ্গে

একটি গঠনমূলক কর্মসূচী

আজকাল আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি, একটি গঠনমূলক কর্মসূচী চাই, যেন সেই কর্মসূচী পাইলেই আমরা কাজে নামিয়া পড়িব, এবং তদনুযায়ী কাজ করিয়া শুধু দেশের কেন, সারা পৃথিবীর রূপ একেবারে পালটাইয়া দিব। একটি কর্মসূচীর অভাবেই যেন আমরা কাজে নামিতে পারিতেছি না।

যদি বলি—একের পর এক অনেক কর্মসূচী তো আসিয়াছে, যাহারা কাজ করিবার তাহারা কাজে নামিয়া গিয়াছে, অনেকে কাজ করিয়া পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আবার নূতন অঙ্কে নূতন দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে।

বুদ্ধের ছিল 'সদ্ধর্ম' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী, খৃষ্টের ছিল 'স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার; হজরত মহম্মদ আসিয়াছিলেন 'শান্তি' স্থাপন করিতে। শ্রীচৈতন্য আপামর জনসাধারণে 'প্রেম' বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ভাব লইয়া যাঁহারা কাজ করিবার তাঁহারা কাজ করিয়া চলিয়াছেন। পৃথিবী ও মানুষ 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'য় যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে, কর্মসূচীর কোন অভাব নাই, অভাব আছে কর্ম করিবার মানুষের, অভাব আছে 'আমার' মনের মতো কর্মের।

সম্প্রতি আর একটি নূতন কর্মসূচী রাখিয়া গিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁহার শত-বার্ষিকীর প্রাক্কালে আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, দেখা যাক—এই কর্মসূচী এ-যুগের মানুষের কতটা উপযোগী, এবং কি ইহার প্রকৃত লক্ষ্য এবং কিভাবে ইহা চরম সার্থকতা লাভ করিবে।

স্বামীজীর কর্মসূচী সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নাই। অনেকে একটি দিক মাত্র দেখিয়াই তাহাকে আংশিক ভাবে বর্ণনা করেন। কেহ বলেন, তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারক, কাহারও মতে তিনি দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী—পরাধীন ভারতকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন; আবার এক শ্রেণীর সমালোচকের চক্ষে তিনি মধ্যযুগীয়, কারণ ধর্মকেই তিনি তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র করিয়াছেন; আবার আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতের সমালোচনা: 'বিবেকানন্দের কর্মসূচীতে ধর্ম কিছুই নাই, ও একটা আধুনিক পাশ্চাত্যের সমাজসেবার অনুকরণ মাত্র'। এইরূপ বিচিত্র ও বিভিন্ন সমালোচনা দেখিয়া এবং শুনিয়া আমাদের অন্ধের হাতী দেখার গল্পটিই মনে পড়ে, আসল কথা স্বামীজীর কর্মসূচী সমগ্রভাবে অনেকেই ধরিতে বা বুঝিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী-নির্দিষ্ট বহুমুখী সেবাধর্ম সর্ব শুভকর্মের সার্থক সমন্বয়। তবে ইহার প্রধান সুর ধর্ম, কারণ স্বামীজী নিজেই বলিয়াছেন, পৃথিবীতে মানব-কল্যাণে যত শক্তি কাজ করিয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্মই প্রধান। ধর্মের নামে যে সকল অশুভ কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার জন্য ধর্ম দায়ী নহে, তাহার জন্য মানুষের অপরিণত মনই দায়ী। সেইজন্য আজ বিশেষ প্রয়োজন মানুষের এই মনের উন্নয়ন বা মানসিক প্রস্তুতি।

কর্মসূচী গ্রহণ করিবার পূর্বে স্বামীজীর জীবনে যে প্রস্তুতিপর্ব আমাদের চোখে পড়ে, তাহাতে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা, জিজ্ঞাসা, কঠোর

সাধনা, গভীর ধ্যান ধারণা ও ব্যাপক পরিব্রজ্যাই দিগন্ত জুড়িয়া দৃশ্যের পর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। কি ছাত্রজীবনে গভীর অধ্যয়ন, কি শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে পরিপ্রশ্ন সেবা ও আত্মনিবেদন, কি হিমালয়ে ধ্যান-প্রচেষ্টা, কি ভারতব্যাপী পরিভ্রমণ—সর্বত্র দেখা যায় বিরাট বিশ্বব্যাপী একটা কর্মযোগের প্রস্তুতি চলিয়াছে, যাহার লক্ষ্য প্রথমতঃ ভারতের জাগরণ, কিন্তু প্রধানতঃ মানুষের জাগরণ বা মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সন্নিধানেই তিনি বুঝিয়াছিলেন, এক মহৎ কর্মের দায়িত্ব তাঁহার উপর রহিয়াছে। শুকদেবের মতো তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত ধ্যানে ডুবিয়া থাকিলে তাঁহার চলিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন এক-টুকরা কাগজে লিখিয়াছিলেন: 'নরেন শিক্ষে দেবে'। যিনি কখন কিছু লেখেন নাই, তাঁহার সেদিন হঠাৎ এ-কথা লিখিবার ইচ্ছা কেন হইয়াছিল? তখন কেহ না বুঝিলেও আজ আমরা জানি এ-কথার অমোঘতা।

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবমুখে বলিয়াছেন,'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা' সেদিন নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, এ-কথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া তাঁহার বন্ধু—পরে সহকর্মী গুরুভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন। যদি ভগবান দিন দেন—এ-কথা কার্যে পরিণত করিব। শ্রীভগবান দিন দিয়াছিলেন এবং স্বামীজী বেদান্তের ভিত্তিতে নিষ্কাম কর্মের—সেবাধর্মের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিলাম—স্বামীজীর কর্মের মূল প্রেরণা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষা। ধর্মই উহার বিশাল ভিত্তি; সারা পৃথিবী উহার প্রয়োগ-ক্ষেত্র। তাই তো আমরা দেখি, স্বামীজীর কর্মজীবনের যবনিকা উঠিতেছে—পৃথিবীর অপর প্রান্তে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায়! মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে বিধাতার নির্দেশে তিনি এ-যুগের ধর্মগুরু-রূপেই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মানুষের স্থায়ী উন্নতি করিতে গেলে ধর্মের সহজ সরল ব্যাখ্যাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ধর্মের দৃঢ় ভিত্তির উপরই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, মনুষ্যসমাজের পুনর্গঠন।

এতদিন ধর্ম একটি স্থানীয় শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে, মানুষকে সমাজবদ্ধ করিয়াছে, কিছু পরিমাণে উন্নতও করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্মের অপব্যবহারও যথেষ্ট হইয়াছে। কোথাও রাষ্ট্রশক্তি, কোথাও পুরোহিত-শক্তি ধর্মকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাইয়া ধর্মকে ধ্বংসের অস্ত্রে—অপরধর্মীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত ধর্মশক্তিই রাষ্ট্রক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতারূপে দেখা দেয়।

তাই তো দেখি, বর্তমান যুগের ধর্ম-ব্যাখ্যার প্রথম প্রভাতেই স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুদেবের জীবন ও সাধনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং নিজ অনুভূতি দ্বারা লব্ধ—ধর্মসমন্বয়ের কথাই ঘোষণা করিলেন, যাহাতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বভাব অতীতের দুঃস্বপ্নের মতো মিলাইয়া যায়।

স্বামীজীর দ্বিতীয় কর্মসূচী বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের যে আপাত-বিরোধ রহিয়াছে, তাহা দূর করা! মানুষের চোখে আঙুল দিয়া তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন—ধর্ম একত্বের সন্ধান করিতেছে, বিজ্ঞানও একত্বের সন্ধানী। বিজ্ঞান সেই চরম এককে 'জড়' বলিতেছে, ধর্ম তাঁহাকে 'চৈতন্য' বলিতেছে। ধর্মের যে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, ধর্মও বিজ্ঞানের মতো যুক্তি ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত;

এ-কথা বলিয়া তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন, বেদান্তই ভবিষ্যৎ মানবের বিশ্বজনীন ধর্ম।

অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ধর্ম, যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া এই বিশ্বজনীন ধর্মসৌধকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিবে। কিন্তু সকল ধর্মকেই বিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে শেষ পর্যন্ত এই বেদান্তের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। বেদান্তের সাহায্যেই আমরা বুঝিতে পারি, প্রত্যেকটি ধর্মের আপেক্ষিক মূল্যমান। ভূত-প্রেত-পূজা হইতে একেশ্বরবাদ পর্যন্ত সব এক সূত্রে গ্রথিত ; কিন্তু ইহাই ধর্মবিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। বিজ্ঞানের সমালোচনার উত্তর দিতে একেশ্বরবাদও অসমর্থ! এইখানেই—এই পথেই বেদান্তচিন্তা পাশ্চাত্য ধর্ম ও দর্শনে অনুপ্রবেশ করিতেছে। মানুষের চিন্তাজগতে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—বেদান্তের গভীরতম তত্ত্ব প্রকাশ করিতে, আধুনিক মানবের উপযোগী করিয়া বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে এবং কবিত্বের ভাষায়। ভবিষ্যৎ মানবকে মনের মুক্তির জন্য এই প্রশস্ত পথেই চলিতে হইবে।

মানসিক পুনর্গঠন শুরু হইয়া গিয়াছে। কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে বহু চিন্তাশীল মনীষী নানাভাবে অনুভব করিয়াছেন : ধর্মবর্জিত বিজ্ঞানভিত্তিক এই যন্ত্রসভ্যতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে, আণবিক ভীতিতেই মানুষ আজ মৃতপ্রায়। অধ্যাপক সোরোকিন ইওরোপের সহস্র বৎসরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তই করিতেছেন—মানুষকে সুখী করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নাগরিক অধিকারের মহিমা প্রচার করিয়া গ্রীক নগররাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা রোম-সাম্রাজ্যের কবলিত হইল। বর্তমান যুগের প্রারম্ভে বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পসভ্যতা যে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প এমন কি তথাকথিত সুসম্বদ্ধ ধর্মগুলিও একক-ভাবে মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, এবং পারিবেও না। ধর্মের সমন্বয়ী শক্তিই মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে—সেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানবই সভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারে, সেজন্য প্রয়োজন একটি নূতন ধর্ম, যে ধর্ম বিজ্ঞানের বিরোধী হইবে না, বিজ্ঞানও যে ধর্মের বিরোধিতা করিতে পারিবে না। ধর্মের এই নূতনতর রূপের জন্য জগৎ প্রতীক্ষা করিতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষানুযায়ী স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান জগৎকে আধ্যাত্মিক ক্ষুধার অন্ন দিয়া গিয়াছেন চার বৎসর ইওরোপ-আমেরিকায় তাঁহার অক্লান্ত ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে।

স্বামীজীর মতে এই নূতন বৈদান্তিক ধর্ম পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সময়োপযোগী প্রত্যুত্তর। বিদেশে এই ধর্মপ্রচারকে স্বামীজী তাঁহার বৈদেশিক নীতি (Foreign policy) বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভারতেরও কল্যাণ হইবে। সুপ্ত ভারত সহস্র বৎসরের জড়তা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহার নিজস্ব ঘরোয়া নীতি (Home policy)-ও আছে, সেখানে চাই—আধ্যাত্মিকতার সহিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও শিল্প। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদান-প্রদানের দ্বারাই সামঞ্জস্য-বিধান হইবে।

ভারত যেন পতনোন্মুখ পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ না করে, পাশ্চাত্যে যে-সকল ভাব ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেগুলি লইয়া ভারত যেন আবার নূতন করিয়া বাল-সুলভ পরীক্ষা শুরু না করে।

ভারতীয় কর্মসূচীতে স্বামীজী প্রথম স্থান দিয়াছেন জাতির উপযোগী শিক্ষাকে। সর্বপ্রকার

গঠনমূলক শিক্ষাই জাতি গড়িয়া তুলিবে। নেতিমূলক সমালোচনা বা ধ্বংসমূলক সংস্কার দ্বারা কিছু হইবে না। চাই সেই শিক্ষা—যে শিক্ষা প্রত্যেক মানুষকে তাহার হারানো ব্যক্তিত্ব ফিরাইয়া দিবে, প্রত্যেকটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। ভারতবাসীকে আজ এমন শিক্ষা দিতে হইবে, যাহাতে সে আত্ম-নির্ভর হয়, আত্মবিশ্বাসী হয়, বাকী সব আপনা-আপনি আসিবে; জীবিকা অর্জন তো সামান্য কথা। আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তির উপর লৌকিক শিক্ষা—উপনিষদের ভাষায় 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চ'—ইহাই ছিল স্বামীজীর শিক্ষানীতি। অপরা লৌকিক বিদ্যা অবহেলা করার ফলেই ভারতের ঐহিক অবনতি ঘটিয়াছিল। ভারতকে আজ জগৎ-সভায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে বিজ্ঞান যন্ত্রশিল্প সব কিছুই আয়ত্ত করিতে হইবে; পাশ্চাত্যের নিছক অনুকরণ করিলে হীনমন্যতা আসিয়া যাইবে। ধর্মশূন্য লৌকিক বিদ্যাতেই শিক্ষা সমাপ্ত করিলে ভারত তাহার বিধাতানির্দিষ্ট গুরু-দায়িত্ব নিষ্পন্ন করিতে পারিবে না, সেজন্যই চাই পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এ-যুগের পশু-মানবকে দেবমানবে উন্নীত করাও যে ভারতের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

তাহার পূর্বে নিজের দেশে অবহেলিত জনগণকে উন্নত করিতে হইবে - তাহাদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। উচ্চ বর্ণের লোকদিগকে এই সেবাব্রতে আত্মাহুতি দিতে হইবে। ইহাই স্বামীজীর কঠোর নির্দেশ। যে সাপ কামড়াইয়াছে, সেই বিষ উঠাইয়া লইবে। তাহারা যদি যুগ-প্রবর্তকের এ নির্দেশ পালন না করে, তবে তাহারাই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কারণ যুগযুগান্ত পদদলিত জনসাধারণ এবার উঠিবেই উঠিবে, এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনে সহায়তা করাই সার্থকতা। জগন্নাথের রথ আপনিই চলিতে শুরু করে, যে উহার গতিতে সাহায্য করে, সেই ধন্য হইয়া যায়।

জনগণের উন্নয়নের কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে স্বামীজী আর একটি কর্মসূচীর কথা বলিয়া গিয়াছেন: ভারতের নারীগণের উন্নতি। ভারতীয় নারীর প্রশংসায় স্বামীজী পঞ্চমুখ! পৃথিবীর মতো সর্বসংহা ভারতীয় নারীর আদর্শরূপে তিনি পৃথিবী-কন্যা সীতাকেই এ-যুগে নূতন করিয়া সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বলিয়াছেন, যে নারীশিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের দেশের মেয়েদের মনেপ্রাণে সীতার মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে, তাহাই সার্থক হইবে। অন্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে, এবং জাতীয় জীবনাদর্শ নষ্ট করিয়া দিবে।

নারীদের সম্বন্ধে পুরুষের কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন: মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া পর্যন্ত পুরুষের কর্তব্য। বাকীটা তাহারা নিজেরাই করিবে।

স্বামীজী আজীবন এই কর্মসূচী তাঁহার মস্তিষ্কে বহন করিতেছিলেন, এবং দেশেবিদেশে একাকী সাধ্যমত কার্যে পরিণত করিতেছিলেন, কিন্তু সর্বদাই ভাবিতেছিলেন স্থানকাল অনুকূল হইলে—তাঁহার এই কর্মসূচীকে একটি স্থায়ী রূপ দিবেন। চিঠিতেও লিখিতেছেন, 'আমি এমন একটি যন্ত্র চালু করিয়া যাইতে চাই, যাহা ঘরে ঘরে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে উচ্চতম ভাবরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে।'

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মিশন' তাঁহার সেই পরিকল্পনার বাস্তুরূপ! বাংলায় ইহার নাম 'রামকৃষ্ণ প্রচার', কারণ এই যন্ত্রসহায়ে

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবই প্রচারিত হইবে, তাঁহার জীবনে আচরিত সমন্বয়ের ভাব, ত্যাগ ও সেবার ভাব দ্বারাই এ-যুগে দেশে বিদেশে মহা কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহাই ছিল স্বামীজীর বিশ্বাস।

স্বামীজীর এই কর্মসূচী—স্বামীজীর এই দুর্বার কর্মের আহ্বান বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভারতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল। দিকে দিকে যুবশক্তি জাগিয়া উঠিয়া দেশের সেবায়—মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে! এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধিকাংশ নেতাই স্বামীজীর ভাব যতটা সম্ভব গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ জীবন গঠন করেন এবং মরণভীরু জাতিতে মরণজয়ী হইবার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে থাকেন।

দুঃখের বিষয় স্বামীজীর এমন উদার শিক্ষা কোন কোন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদেশে 'বিবেকানন্দ' শব্দ বেদান্তেরই সমার্থক; কিন্তু ভারতে বিভিন্ন বিকৃতমস্তিষ্কে স্বামীজীর নানা বিচিত্র চিত্র প্রতি-ফলিত, তদনুরূপ সমালোচনাও কানে আসে: হিন্দু সাম্প্রদায়িক হইতে খৃষ্টান মিশনরীর অনুকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী হইতে নিরীশ্বরবাদী পর্যন্ত—কিছুই বাদ যায় না।

স্বামীজী এগুলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, বলিতেন—বিরূপ সমালোচনা করিতে করিতে একদিন তাহারাও ঠিক ভাবটি ধরিতে পারিবে, কারণ তাহারা যুগভাবের আলোচনার আবর্তে আসিয়া পড়িয়াছে। স্বামীজীর এই বিশ্বব্যাপী বিরাট পরিকল্পনা—পাঁচ বছর বা দশ বছরের জন্য নয়, এমনকি শত বর্ষেও এই পরিকল্পনার সামান্য অংশই রূপায়িত হইয়াছে। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন, 'আগামী দেড় হাজার বৎসর হেসে-খেলে চলবে এই ভাব।' অতএব ধীর পদক্ষেপে স্থির বিশ্বাসে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

তিনি কি বলেন নাই, 'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।'—আমার সমানধর্মা কেহ আছেন বা উৎপন্ন হইবেন, যিনি এই অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিবেন; কাল অনন্ত, পৃথিবীও বিশাল! তিনি কি বলেন নাই, 'আমি শতমুখে কথা বলিব, সহস্র হস্তে কাজ করিব!'

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর একখানি পত্র*

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
বারাণসী-১, ২০।২।৬২

স্নেহাস্পদেষু— প্রিয় শ্রীমান্ —

তোমার পত্রখানি যথাসময়ে পেয়ে সমাচার অবগত হয়েছি। শ্রীগুরুর তিরোধানে তোমরা মোটেই নিরাশ্রয় হও নাই। তিনি এখন সর্বদা তোমাদের অন্তরে রয়েছেন। চোখ বুজলেই দেখতে পাবে। আর হেথা-সেথা যেতে হবে না তাঁকে দেখবার জন্য।

তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রিত ও ভক্ত; তোমাদের কিসের ভয়? কিসের ভাবনা? তাঁকে ধরে চলতে অভ্যাস কর। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানবে। ইতি—

চির-শুভানুধ্যায়ী বিশুদ্ধানন্দ

---

* স্বামী শঙ্করানন্দজীর দেহত্যাগের পর জনৈক ভক্তকে লিখিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কৃত 'শিক্ষাষ্টকে'র রূপায়ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী সুধা সেন

হরিনাম সাধককে যে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়া নামীর সহিত মিলন করাইয়া দেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখা গেল; কিন্তু কিরূপে নাম করিলে সে-নাম ফলপ্রদ হয়, তাহা প্রভু বলিলেন তৃতীয় শ্লোকে :

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থে ইহার ভাবানুবাদে বলিয়াছেন :

'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম,
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়,
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়,
সেই সে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন,
ঘর্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান,
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥'

নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাণ গৌরের সঙ্গে মিলিত হইবার আকুল আগ্রহে দীর্ঘ কঠিন পথ পরিক্রমান্তে নীলাচলে সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; একদিকে অসীম অনন্ত সুনীল সাগর আপন অন্তরের পূর্ণতাকে প্রকাশ করিতেছে তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই তরঙ্গ আসিয়া যেন সীমা খুঁজিতেছে শুভ্র বালুকাময় বেলাভূমিতে—অপর দিকে আর একটি অনন্তবিস্তারী ঘনকৃষ্ণ সাগর আপন অন্তরের অহেতুক আনন্দকে প্রকাশ করিতেছেন লীলাতরঙ্গে, সেই তরঙ্গ আসিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাহিতেছে এক স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় গৌর-তটভূমিতে। আত্ম-সমর্পণের সুতীব্র গতিবেগে কত শত স্রোতস্বিনী সাগরে আসিয়া মিলিতেছে—সাগরও যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে ভক্তহৃদয়-জাহ্নবীধারার স্পর্শ-কামনায়। প্রভু অধীর আনন্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন, দূর হইতেই সুগম্ভীর মেঘগর্জনের মতো মৃদঙ্গ-মন্দিরার ধ্বনি ও সংকীর্তনের রোল শোনা যাইতেছে। রাজপথের দুইধারে আগ্রহাকুল নীলাচলবাসী, রাজহর্ম্যের বাতায়নে প্রতীক্ষমাণা রাজবধূ, রাজবালা, হর্ম্যশিখরে প্রতীক্ষারত মহারাজ প্রতাপরুদ্র—সঙ্গে রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। ভক্ত-ভগবানের মিলন-দর্শনের আশায় সকলেই আগ্রহে আকুল।

সমুদ্র-সঙ্গমে আসিয়া সমস্ত ধারা একত্র মিশিয়া গেল, রাজপথ প্লাবিত হইয়া গেল আনন্দ-তরঙ্গে।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসান, প্রভু-ভক্ত সকলের চোখে জল, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ নদী ও সাগর, ভক্ত ও ভগবান! ধীরে ধীরে, মিলনের প্রথম আনন্দবেগ প্রশমিত হইয়া আসিল, সজল প্রসন্ন নয়ন মেলিয়া কাহাকে খুঁজিতেছেন প্রভু, হরিদাস কোথায়?

দূরে পথের প্রান্তে ধূলায় লুটাইতেছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস। 'রাজপথে—জগন্নাথের ভক্ত সেবকের চলার পথে পদ রাখিবার অধিকার কোথায় আমার, আমি নীলকুলজাত অধম, অভক্ত!'

প্রভু আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন, দূর হইতে

দণ্ডবৎ লুটাইয়া পড়িলেন হরিদাস প্রভুর চরণের উদ্দেশ্যে। প্রভু স্বহস্তে হরিদাসকে উঠাইলেন, নিবিড় গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'হরিদাস, এত দৈন্য করিও না, দেখিতে কি পাও না আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?'

'প্রভু গো!' কাঁদিয়া উঠিলেন হরিদাস! 'তুমিও কি দেখিতে পাও না—তৃণের চেয়েও যে অধম তাহাকে এত মান দিলে অভিমানে সেও যে ফাটিয়া যায়?'

উড়িষ্যারাজগুরু কাশী মিশ্রের ভবনে প্রভু আছেন, নিকটেই এক নিভৃত উদ্যান। প্রভু কাশী মিশ্রের কাছে নিভৃত ভজনের জন্য সেই উদ্যানস্থিত ছোট একটি কুটির প্রার্থনা করিয়া লইলেন। তারপর হরিদাসকে লইয়া আসিলেন ঐ কুটিরে আপন একান্ত সান্নিধ্যে। দীনাতিদীন হরিদাস আপনার এই সৌভাগ্যে ধন্য হইয়া গেলেন, দিনে একবার জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াগ্র দর্শন করেন, দিনে একবার প্রভু আসিয়া দর্শন দান করেন তাঁহাকে, এই তো পরমপ্রাপ্তি—হরিদাসের চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই রহিল না বাকী! গৌড়ের ভক্তগণ-সঙ্গে সারাদিন প্রভুর কত আনন্দ—কীর্তন, ভোজন, সমুদ্র-অবগাহন—দূর হইতে সেই আনন্দ-লহরী হরিদাসের কানে ভাসিয়া আসে, নির্জন কুটিরে বসিয়াই হরিদাস সে আনন্দে আপনাকে মিলাইয়া দেন।

সারাদিন নাম করেন হরিদাস, প্রভুর সেবক গোবিন্দ আসিয়া প্রসাদ দিয়া যান, দিনান্তে হরিদাস তাহা গ্রহণ করেন।

'তৃণাদপি সুনীচ' হরিদাস, কিন্তু প্রভু জানেন 'তরোরিব সহিষ্ণু'—শুধু তরু নয়, বিরাট বনস্পতি হইতেও অধিকতর সহিষ্ণু হরিদাস এবং তাহা হইতেও অধিকতর ছায়াশীতল! তাই নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু ডাকিলেন—'হরিদাস! কোথায় তুমি, একবার আসিয়া আমায় দর্শন কর। এই কলিকালে পৃথিবীতে ভক্তি নাই, ভক্ত নাই বলিয়া যে তোমার তীব্র দুঃখ, আচার্য অদ্বৈতের যে ব্যাকুল আহ্বান, তাহার জন্যই তো আমাকে শীঘ্র প্রকাশিত হইতে হইল!'

'হরিদাস! তুমি হরিনাম কর, তোমার শুধু এই অপরাধে যেদিন মুলুকের যবন-অধিপতি তোমাকে কঠোর অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছিল, সেদিন কি বৈকুণ্ঠে আমার আসন কাঁপিয়া উঠে নাই, দুর্দম অপ্রতিহত বেগে আমার সুদর্শন-চক্র কি ভক্ত রক্ষা করিতে নামিয়া আসে নাই? সেইদিন খণ্ড ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যাইত তোমার প্রহার-কারিগণ, কিন্তু কি মহৎ তোমার করুণা, কি বিশাল তোমার হৃদয়, তুমি আমাকে স্তব্ধ করিয়া দিলে, প্রার্থনা করিলে—'প্রভু! যাহারা আমাকে আঘাত করিতেছে, তাহারা অজ্ঞান তুমি তাহাদের দোষ গ্রহণ করিও না দয়াল তাহাদের ক্ষমা করো!'

'কি করিব, আমি নিরুপায়! তোমার আঘাত যে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতে চায়? আমি পৃষ্ঠ পাতিয়া দিয়া তোমাকে আড়াল করিয়াছিলাম হরিদাস, এই দেখ সেই নিদারুণ নির্যাতনের চিহ্ন আজও রহিয়াছে আমার দেহে!'

হরিদাস কাঁদিয়া উঠিলেন, 'একি করিয়াছ প্রভু? দীনের ব্যথা নিজ অঙ্গে নিয়া এমনি করিয়াই কি তাহাকে রক্ষা করিতে হয় দীননাথ? কি প্রয়োজনে লাগিবে এই তুচ্ছ দেহ?'

যশোহরের বেনাপোলের বুঢ়ন গ্রামে যবনকুলে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব সংসার-বিরক্ত, ভগবদনুরক্ত হরিদাস যৌবনে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া-শান্তিপুরে এক

নির্জন গুহায় বসিয়া ধ্যান-ভজন ও নাম-কীর্তনে মগ্ন থাকেন, হয়তো বা আচার্য অদ্বৈতের ও মুষ্টিমেয় কতিপয় ভক্তের সঙ্গসুখ-লালসাও আছে মনে।

মুলুকের যবন-অধিপতি যখন জানিতে পারিল—স্বধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া হরিদাস হিন্দু দেবতার নাম করিতেছে, তখন শাহী দরবারে হরিদাসের ডাক পড়িল। নির্ভীক ভক্ত নাম করিতে করিতে আসিয়া অধিপতির সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সুকুমার সুদর্শন যুবকের নির্ভীক প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া অধিপতির মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল, আসনে বসিবার অনুরোধ করিয়া তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ভাই! স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি বিধর্মীর পথ গ্রহণ করিয়াছ, কেনই বা পরম করুণাময় নিখিল-বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌তালার নাম পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম জপ করিতেছ?'

মৃদু মধুর হাস্যে হরিদাস কহিলেন, 'তাহাতে দোষ কি শাহানশাহ্, যিনি আল্লাহ্, তিনিই কি হরি নহেন? আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কি দ্বিতীয় আছে?' মুলুকের অধিপতি বলিলেন, 'তাহাই যদি না থাকে, তবে তুমি কেন নিজ উপাস্য আল্লাহ্‌র নাম ত্যাগ করিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়াছ? তোমার ধর্মই কি তোমাকে পূর্ণতা দিতে পারে না?'

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে হরিদাস বলিলেন, 'যিনি এক অখণ্ড, তাঁহারই বিভিন্ন নাম, বিচিত্র প্রকাশ! একই ব্যক্তি, কেহ তাঁহাকে ডাকে পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভাই। তাহাতে কি তাঁহার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হইয়া যায় বাদশাহ্? যাঁহার যে নামে, যে ভাবে রুচি, তিনি সেই নামে, সেই ভাবেই আল্লাহ্‌কে ডাকেন, তাহাতে আল্লাহ্ নারাজ হন না।'

অধিপতি বলিলেন, 'কিন্তু ভাই, যে হিন্দুগণকে দেখিলে ঘৃণায় আমরা অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করি না, তুমি উচ্চধর্মাশ্রয়ী, উচ্চকুলজাত হইয়াও কেন তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ?'

ক্ষুব্ধ হইয়া হরিদাস বলিলেন, 'কে ছোট, কে বড় মহারাজ! এই দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে সকলেই কি সমান নহে?'

পাশেই ছিলেন কাজী—দরবারের বিচারক। হরিদাসের স্পর্ধা তাঁহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল, সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 'বিধর্মী! বিশ্বাসঘাতক! প্রাণদণ্ডই তোমার বিধান! কুকুর দিয়া হত্যা করাইলেও তোমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় না!'

'তবু শোন! শেষবারের মতো তোমাকে বলিতেছি—নিজ শাস্ত্র উচ্চারণ করিয়া, কলেমা জপ করিয়া তোমার কলুষিত রসনার প্রায়শ্চিত্ত যদি কর, তবে তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতেও পারি।'

পরম অভয় পদে আত্মসমর্পণ করিয়া 'অভীঃ' হইয়াছেন ভক্ত, বলিলেন—

'খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।'

চৈঃ ভাঃ

অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণায় কাজীর দুই নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, মুলুকপতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'না বাদশাহ্, এই নরকের কীট কাফেরের আর ক্ষমা নাই, ইহাকে কঠোর বেত্রাঘাত করা হোক—একবার নয়, একস্থানে নয়—বাইশ বাজারে বাইশ বার।'

প্রহরী-বেষ্টিত বন্দী হরিদাস চলিয়াছেন, চোখে মুখে আতঙ্কের এতটুকু ছায়ামাত্রও নাই, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছে ভুবনমঙ্গল হরিনাম। রাজপথের দুইপাশে জনতা কেহ বা হরিদাসের নিগ্রহ-আশঙ্কায় ব্যাকুল—যবন

হইয়াও হরিনাম-উচ্চারণের ঘোর অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইবে ভাবিয়া আবার কোন বা উচ্চকুলজাত ব্রাহ্মণ আনন্দে আকুল!

এক বাজার, দুই বাজার—তিন বাজারের অধিক কোন দিন কাহাকেও প্রহার করিতে হয় নাই—বেত্রাঘাত-খণ্ডিত দেহ ছাড়িয়া প্রাণ বাহির করিতে এ পর্যন্ত কোন অপরাধীকেই চতুর্থ বাজারে যাইতে হয় নাই। ভীমকান্তি যমদূতসদৃশ প্রহারকারীরা পর্যন্ত বিস্মিত, 'এ কি দেবী মায়া! নিদারুণ তীব্র বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রুধির-ধারায় ধরণী লিপ্ত! বাইশ বাজারে আঘাত করা হইল, তথাপি মৃত্যু নাই, নাই এতটুকু আর্তনাদ, কে এই ব্যক্তি?' দর্শকগণ পর্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বা কাতর আবেদন জানাইতেছেন, 'ওগো রক্ষীরা! আমাদের কাছ হইতে যত খুশি অর্থ লও, নিবৃত্ত করো তোমাদের এই পাশবিক অত্যাচার।'

হরিদাসের অঙ্গে রুধির-ধারা, নয়নে প্রেমাশ্রু, ডুবিয়া আছেন নাম-রস-সমুদ্রে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! 'রক্ষ মাং' নয়, ডাকিতেছেন হে কৃষ্ণ, হে পতিত-পাবন 'রক্ষ তান্'—এই অজ্ঞান দ্রোহকারীদের রক্ষা করো, ইহাদের অজ্ঞানতা ক্ষমা করো প্রভু। কিন্তু আকাশ হইতে নামিয়া আসিল প্রলয়-বহ্নি, রুদ্রতেজে নামিয়া আসিল সুদর্শন-চক্র। কিন্তু! কোথায় কাহার মস্তকে পতিত হইবে এই উদ্যত কঠোর বজ্র, হরিদাসের কল্যাণ-কামনা যে ঐ প্রহারকারীদের চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে! সুতরাং এইবার সুদর্শনধারীকেই নামিয়া আসিতে হইল; এমনি কতবারই নামিয়া আসিতে হয়; পাহাড়ে, সমুদ্রে, জলন্ত অনলে বক্ষ পাতিয়া ভক্তকে রক্ষা করিতে হয়, সুধা মনে করিয়া বিষ গ্রহণ করিতে হয় তাঁহাকেই, ভক্ত তো তাঁহাকে ডাকেন নাই, নির্দেশ করিয়া দেন নাই তাঁহার কর্তব্য, তাই কর্তব্যের চেয়েও বেশী করিতে হয়, ভাগ করিয়া লইতে হয় ভক্তের ব্যথার অংশ। হরিদাসের অঙ্গও আবৃত করিয়া রহিলেন কৃষ্ণ-জলধর—অমৃতধারা-বর্ষণে হরিদাসের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল।

রক্ষীরা হার মানিল, 'ইনি কি সাধারণ মানুষ? না জানিয়া কোন পীর বা মহাসাধকের অঙ্গে আঘাত করিতেছি নিষ্ঠুরের মতো?'

করজোড়ে রক্ষীরা বলিল, 'ওগো মহাতপস্বী? বাদশাহের আদেশে নিষ্ঠুর ঘাতক আমরা তোমার সিদ্ধ দেহে আঘাতের পর আঘাত করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাদের ক্ষমা কর। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, কিন্তু আজ তোমার মৃত্যু না ঘটিলে রাজশাসনে আমাদেরই মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।'

হরিদাস হাসিয়া উঠিলেন—'তাই কি? বেশ, দেখ, এই আমি মরিতেছি।' হরিদাস যোগস্থ হইলেন, নিস্তরঙ্গ সমাধি-ভূমিতে ক্রমে মন হু হু করিয়া চলিয়া গেল, দেহে জীবনের বিন্দুতম চিহ্নও আর দেখা গেল না। সেই সমাধিবান্ পুরুষের দেহটি মুলুকপতির নিকটে বহিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অধিপতি তাঁহার দেহ কবরস্থ করিবার আদেশ দিলেন, কিন্তু কাজীর ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নাই, তিনি বলিলেন, 'ইসলাম-ধর্মমতে কবর দিলে তো এই কাফেরের মুক্তিই লাভ হইবে—অনন্ত স্বর্গ এই পাপীর প্রাপ্য নয়, ইহাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হোক।'

রক্ষীরা বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই পুণ্য দেহকে একচুল নাড়িবার সামর্থ্য হইল না—ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের অজ্ঞাতেই যোগবিভূতি তাঁহার দেহ আশ্রয় করিলেন। অধিপতি, কাজী ও দর্শকগণ বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া রহিলেন

—দীর্ঘ সময় কাটিয়া গেল, ধীরে ধীরে হরিদাস ব্যুত্থিত হইলেন, ক্ষমাসুন্দর চোখে একবার সকলের দিকে চাহিলেন।

অধিপতি নতমস্তকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'হে সিদ্ধ তপস্বী! সত্যই আপনি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-ভাজন। আপনি আমাদের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। আর আমরা আপনার সাধন-পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিব না, আপনি স্বচ্ছন্দে গঙ্গাতীরে গিয়া তপস্যা করুন।'

নাম-মহামণি কণ্ঠে গাঁথিয়া ফিরিয়া আসিলেন হরিদাস তাঁহার নির্জন গুহায়! শান্তিপুরবাসী আচার্য অদ্বৈত ও ভক্তগণ হরিদাসকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দের যেন হাট বসিয়া গেল, কিন্তু হরিদাসের কুটিরে এত তীব্র জ্বালা কেন? যেখানে অহর্নিশি হরিনামামৃতের প্লাবন বহিতেছে, সেখানে কিসের এত দাহ?

কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল—তীব্র বিষধর এক মহানাগ সেই গুহা-বিবরে বাস করে, তাহারই বিষের দাহে ভক্তগণ দগ্ধ হন।

ভক্তগণ হরিদাসকে শীঘ্র ঐ কুটির ত্যাগ করিবার অনুরোধ জানাইলেন, নতুবা তাঁহারাই বা কোন্ ভরসায় এইখানে আসিবেন? হরিদাস একটু বিস্মিত হইলেন, কই, তিনি তো কোন বিঘ্নই অনুভব করেন নাই এতদিন?

তথাপি ভক্তদের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার কর্তব্য, তাই বলিলেন, 'এইখানে যেই মহাশয় বাস করিতেছেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া এই গুহা ত্যাগ করিয়া যান, তবেই ভালো, নতুবা আগামী কল্য আমিই এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব, আপনারা নিশ্চিন্ত হোন।' কালরূপী মহাসর্পের সঙ্গে বাস করিতেও হরিদাস কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না, যদি না ভক্তগণের কষ্ট হইত।

সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়, ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথার রসাস্বাদন করিতেছেন হরিদাস, এমন সময় দেখা গেল ধীরে ধীরে গৃহকোণ হইতে মাথা তুলিতেছে মহানাগ, লাল-নীল-পীত-কৃষ্ণ—বিচিত্র বর্ণে দেহ চিত্রিত সুপ্রশস্ত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল ফণার দুইপাশে দুই আরক্ত নয়ন, নিঃশ্বাসে সুতীব্র হলাহল! ধীর হিল্লোলিত গতিতে সর্প যেন কুটির ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল—ভক্তগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শান্ত অবিচল হরিদাস সর্পের দিকে চাহিয়া রহিলেন ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে। সর্প মাথা নত করিয়া যেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে অভিবাদন জানাইয়া ধীরে ধীরে বাস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, হয়তো কোন সুদূর গহন অরণ্যে। ভক্তগণ নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইলেন। তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হরিদাস! কিন্তু 'অমানী মানদ' হওয়া—নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দেওয়া, কিংবা যে মান্য করে না তাহাকেও মান দেওয়া—তাহা কি সহজসাধ্য?

মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, 'জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'—শুধু মানুষ নহে, পশুপাখি কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যেই কৃষ্ণ অধিষ্ঠান, কাজেই শুধু 'জীবে দয়া' নয়, জীবের সেবা করিবে, জীবকে সম্মান দিবে ভগবৎ-জ্ঞানে। হরিদাসের জীবনে প্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সার্থক হইয়াছে, তাই মূর্তিমান্ হিংসা এবং প্রলোভনও হরিদাসের পদমূলে আপনাদের বিসর্জন দিয়াছে অক্লেশে!

বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খান, ঐশ্বর্য-গর্বে স্ফীত—ভক্তের মর্যাদা তো জানেন-ই না, অধিকন্তু ভক্তকে অপমান করাই জীবনের

অন্যান্য নানা কদর্য ব্যসনের মতোই শ্লাঘ্য মনে করেন। একদিন শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে অপমান করিতেও তাঁহার বাধে নাই। এই ধনী জমিদারের সহিত নিষ্কিঞ্চন দরিদ্র ভক্ত হরিদাসের প্রতিযোগিতা করিবার সাধ্য নাই, অভিপ্রায়ও নাই। তাঁহার ঐশ্বর্যের মধ্যে ভক্তি, তাহারই আকর্ষণে দীনাতিদীন হইতে লক্ষপতি পর্যন্ত শত শত ভবব্যাধিগ্রস্ত রোগী হরিদাসের জীর্ণ কুটিরে সমাগত হন ব্যাধিশান্তির আশায়, নিরভিমান হরিদাস বিনামূল্যে নামামৃত বিতরণ করেন। রামচন্দ্র খানের তাহাও সহ্য হইল না—ঈর্ষার বিষে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল—'কপট সাধুত্বের' আবরণটি উন্মোচন করিয়া হরিদাসের 'আসল স্বরূপ' লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট করিয়া লোকের ভক্তি খর্ব করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

একদিন এক সুন্দরী পতিতাকে নিভৃতে কিছু অর্থ ও পরামর্শ দিয়া রামচন্দ্র খান উৎফুল্ল চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন- অস্ত্র তাঁহার হাতেই আছে, প্রয়োগ করার অপেক্ষামাত্র—হরিদাসের 'ভাণ্ডামি' ঘুচাইতে বেশী দেরি হইবে না!

গভীর নিশীথে নানা অলঙ্কারে আভরণে সজ্জিতা সেই নারী হরিদাসের ভজন-কুটিরে উপস্থিত হইল, হরিদাস ভজনরসে মগ্ন, হাতে জপমালা—চিত্ত তন্ময়, ছলনাময়ীর বহু-পরীক্ষিত বিলাস-কটাক্ষের বহু শরাঘাত হরিদাসের উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু হরিদাস নির্বিকার, নিশ্চল! রমণী মনে মনে হাসিল, তাহার তূণে এই কয়টিমাত্র অস্ত্রই নহে, আরও আছে বহু সুতীক্ষ্ণ শর!

রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও যৌবনশ্রীতে হরিদাস যখন মোহগ্রস্ত হইলেন না, তখন সহসা রমণী রূপমুগ্ধ পতঙ্গের মতোই যেন আপনাকে হরিদাসের রূপ-শিখানলে বিসর্জন করিতে কৃত-সংকল্প হইল। তাহার কাতর প্রার্থনার উত্তরে হরিদাস বলিলেন, 'আমি ব্রতধারী, আমার ব্রত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না, তুমি অপেক্ষা কর, আমি নামসংখ্যা পূর্ণ করিয়া লই, তুমি বরং ততক্ষণ বসিয়া নাম শ্রবণ কর।'

সারারাত্রি বৃথাই কাটিয়া গেল, নামও সমাপ্ত হইল না, রমণীর অভিলাষও পূর্ণ হইল না। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে রমণী নিশাশেষে উঠিয়া গেল, কিন্তু একেবারে নিরাশ হইল না।

সমস্ত শুনিয়া রামচন্দ্র খান যেন কতকটা হতাশ হইলেন, অস্ত্র শাণিততর করিবার উপদেশ দিয়া রমণীকে বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রি—রমণী আসিয়া তুলসী প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিল। মনোহারিণীর হাস্যে লাস্যে আজও হরিদাসের বিকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কিন্তু যেন লজ্জিত স্বরে রমণীকে বলিলেন, 'কাল আমার ব্রত সমাপ্ত হয় নাই, তাই তোমাকে দুঃখ দিয়াছি, তুমি কিছু মনে করিও না, আজ ব্রত সমাপ্ত হইলেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

অধিকতর আশায় বুক বাঁধিয়া রমণী প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু বিধাতার কি লিখন, আজও রজনীর শেষ প্রহর ঘোষণা করিয়া পাখি ডাকিয়া উঠিল, কিন্তু হরিদাস তাহাকে ডাকিলেন না, আজও ব্রত সমাপ্ত হইল না। চরম নিরাশায় অপমানে যখন রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত হরিদাস তাহার কাছে মার্জনা চাহিলেন। আগামী রাত্রিতে আর দেরি হইবে না—নিশ্চয়ই তাঁহার ব্রত-শেষে তিনি তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

তৃতীয় রাত্রি—আজ রমণীর মন আনন্দে পূর্ণ, সাধুর বাক্য মিথ্যা হইবে না, আজ নিশ্চয়ই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

গভীর রাত্রি, আকাশের বুকে জাগিয়া আছে শুধু কয়েকটি স্তব্ধ তারা, জনপ্রাণী আর কেহই জাগিয়া নাই, এই তো সময়! রমণী অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছে হরিদাসের দিকে, আর কত দেরি? সহসা কি এক পুলকের জোয়ার আসিয়া যেন ভাসাইয়া লইয়া গেল তাহার সমস্ত মোহ-মলিনতা, হৃদয় যেন ময়ূরের মতো নৃত্য করিয়া উঠিল! একি পুণ্য জ্যোতি, একি আনন্দধারা তপস্বীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণকে স্নিগ্ধ সিক্ত করিয়া দিতেছে! আকাশে কত আলো, বাতাসে কত না গান! দেহের অণু-পরমাণু সে আলোয়, সে সুরের ঝরনাধারায় যেন স্নান করিয়া উঠিল। তাহার দেহ আর দেহ-সঙ্গাভিলাষী নয়, এবার হৃদয় উন্মুখ—হে মহাপুরুষ, দাও দাও—আমার প্রাণ ভরিয়া, তৃষ্ণা হরণ করিয়া তোমার অমৃত-আনন্দের স্পর্শ আমাকে দাও।'

আপন দেহ-বিপণির কদর্য পসরার দিকে তাকাইয়া লজ্জায় রমণী বিবশ হইয়া গেল। কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে সে এই দীন মলিন আবেদন লইয়া? রমণী হরিদাসের চরণতলে লুণ্ঠিত হইল, কণ্ঠে ব্যাকুল মিনতি—'ওগো বৈরাগী, আমার এ স্খলিত শিথিল কামনার ভার আর আমি বহিতে পারিব না, তোমার তপস্যার বজ্রানলে আমার সকল কালো তুমি ধ্বংস করো, আমার এ কামনা-কলুষিত দেহকে তোমার দেবালয়ের প্রদীপ করিয়া তাহাকে জ্বালাও প্রভু!'

হরিদাস আপন কল্যাণ-হস্তখানি তাহার মাথায় রাখিলেন, সেই পুণ্যস্পর্শে তাঁহার দেহ-মন-চিত্ত পুণ্যময় হইয়া উঠিল—আত্মায় আত্মায় মিলনের এক সেতু রচিত হইয়া গেল নিমেষেই। হরিদাস বলিলেন, 'ওঠো নারী, তুমি সার্থক হও, তোমাকে পরমপতির সন্ধান দিবার জন্যই এই তিনদিন আমি প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, এইবার আমারও ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, পরমপতির সহিত মিলনে তুমিও পূর্ণ হও।'

হরিদাসের আদেশে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া দিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুণ্যশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া শুচিস্মিতা দীক্ষাভিলাষিণী নারী আসিয়া দাঁড়াইলেন যুক্তকরে অশ্রুসজল চোখে।

হরিদাস তাহার কর্ণে নামমহামন্ত্র দান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ মন পুলকিত ধন্য হইয়া উঠিল!

গুরু হরিদাস আপন সাধনার শক্তি-সঞ্চারিত ভজন-কুটির, আসন ও তুলসীমঞ্চ তাহাকে দান করিয়া চলিয়া গেলেন সুদূর কোন দেশে। সুদৃঢ় হইয়া সেই আসনে বসিলেন সাধিকা, একাহারে কাটিতে লাগিল দিনের পর দিন—তপঃক্লিশ তনুখানি ধীরে ধীরে হৃদয়নাথের অধিষ্ঠানযোগ্য মন্দির হইয়া উঠিল, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন অপরূপ এক বিগ্রহ! সে-মন্দিরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া আসিতে লাগিলেন কত সাধু, কত বা দর্শনার্থী বৈষ্ণব!

'প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥' চৈঃ চঃ

সাধু হরিদাস! শুধু জীবের অন্তরে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান জানিয়াই তিনি সম্মান দিয়া সরিয়া আসিলেন না, রূপোপজীবিনীর অন্তরেও কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া দিয়া আসিলেন, আপন তপস্যালব্ধ ধন সমর্পণ করিয়া আসিলেন অক্লেশে, এতটুকু ঘৃণার সঞ্চার হইল না মনে!

জীবনের প্রতিটি দিন ক্ষণ পলকেও যিনি কৃষ্ণনামে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, বৃথা যাইতে দেন নাই, আজ জীবনসায়াহ্নে সেই

হরিদাস নির্দিষ্ট সংখ্যা নামজপ সম্পূর্ণ করিতে পারেন না, তাই গোবিন্দের আনা প্রসাদের কণামাত্র স্পর্শ করিযাই আবার বসেন আসনে, কিন্তু বার্ধক্য-শিথিল দেহ যেন আর ভার বহিতে পারে না !

সেদিন হরিদাসের কুটিরে আসিয়া প্রভু বলিলেন, 'হরিদাস ! গোবিন্দ বলিল, সংখ্যা-জপ সারা হয় না বলিয়া তুমি আহার্য স্পর্শ কর না ? নামে সিদ্ধ দেহ তোমার, এত জপে আর তোমার কি প্রয়োজন ? এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নামের সংখ্যা কমাও। 'হরিদাস সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'প্রভু ! আমার একটি প্রার্থনা রাখিবে বলো ! আমার মন বলে তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে। এই ধূলার ধরণীকে নন্দন-কানন করিয়া তুলিয়া, পর মুহূর্তেই তাহাকে শ্মশান করিয়া তুলিতে তুমি পারো এবং তাহাই করিতেছ যুগে যুগে বার বার ! আমাকে তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা দেখাইও না দয়াল ! হৃদয়ে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিয়া, নয়নে তোমার রূপ-সুধা পান করিয়া, বদনে তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে তোমার দীনাতিদীন হরিদাসের প্রাণত্যাগ হোক—ইহাই প্রার্থনা।'

প্রভুর চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল—বলিলেন, 'হরিদাস ! তুমি ভক্তোত্তম, কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, কিন্তু তুমি কেন এত নিষ্ঠুর হইতে চাও ? তোমাদের লইয়াই যে আমার সকল আনন্দ, সকল পূর্ণতা ! তুমি গেলে আমি কি লইয়া থাকিব বলো !'

দীন-ক্ষীণ হরিদাসের কণ্ঠে আজ যেন দাবির শক্তি আসিল—বলিলেন, 'ওগো রাজাধিরাজ ! তোমার কোটি কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি পিপীলিকার মৃত্যুতে যদি তোমার ক্ষতি হয়, তবে তাই হোক। তুমি মায়া ছাড়, আমার প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।'

বিষণ্ণ নয়নে প্রভু হরিদাসের দিকে চাহিলেন, সেই চাহনিতে কি ছিল—আশ্বাস না অভয়, অসুস্থ হরিদাস যেন সুস্থ নিরাময় হইয়া উঠিলেন। পরদিন বিশিষ্ট ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু আসিয়া হরিদাসের অঙ্গনে দাঁড়াইলেন—বলিলেন,

'হরিদাস ! কহ সমাচার।'

হরিদাস কহে, 'প্রভু ! যে কৃপা তোমার !' হরিদাস ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'আমার আর খবর কি প্রভু ! এইবার খবর তো দিবে তুমি, এই পারের খবর আমার শেষ। তুমিই জানো, কি খবর আছে সেই পারে।'

হরিদাসকে বহিরঙ্গনে আনিয়া শোওয়ানো হইল। ভক্তসঙ্গে প্রভুও তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নাম-সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর আনন্দ-বারিধি যেন ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ হরিদাসের পদধূলি লইয়া মাথায় অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন, কম্পিত দক্ষিণ হস্তে হরিদাসও ভক্ত-পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় রাখিলেন।

অন্তিম মুহূর্ত ! হরিদাস নিজের সম্মুখে প্রভুকে বসাইলেন—তাঁহার দুই নয়ন-ভৃঙ্গ প্রভুর রূপ-কমলের সুধাপানে বিবশ হইয়া রহিল, বদনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সহিত হরিদাস প্রাণ উৎক্রমণ করিলেন।

'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—সারাজীবন নাম-সাধনার ফল—স্বয়ং নামী আসিয়া দাঁড়াইলেন সম্মুখে ! মহাভারতের মহাপুরুষ ভীষ্মের মতোই হরিদাসের মহানির্বাণ হইল আপন ইষ্টের সম্মুখে !

হরিদাসের যবন দেহ ঢাকিয়া গেল বালুকারাশির তলে, কিন্তু বিদেহী আত্মা মুক্ত বিহঙ্গের মতোই হয়তো বা দুই পাখা মেলিয়া আনন্দ-লীলায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন অসীম অনন্ত চিদাকাশে ! (ক্রমশঃ)

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

'It is man-making theories that we want. It is man-making education that we want.'

—Swami Vivekananda.

শিক্ষার প্রগতি-পথে যুগে যুগে তার আদর্শ ও লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়েছে, কেন্দ্রবিন্দুর স্থানচ্যুতি ঘটেছে—কি এদেশে, কি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে। দেখা গেছে যে, কোন যুগে শিক্ষা পুরোহিত বা যাজক-সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, কোন যুগে রাজশক্তির হস্ত-বিধৃত ছিল। আবার কোন যুগে বিশেষ সংস্থা বা প্রতিভা-সম্পন্ন মনীসীর নির্দেশে তা পরিচালিত হয়েছিল। ফলে, কালে কালে পরিচালক-শক্তির রুচি-বৈচিত্র্য ও মত-পার্থক্যের জন্য স্বভাবতই শিক্ষার সংজ্ঞাও যেমন পরিবর্তিত হয়েছিল, তার আদর্শ এবং লক্ষ্যেরও তেমনি তারতম্য ঘটেছিল।

এক যুগের সংজ্ঞায় অপর যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়নি, হ'তে পারেনি। এক যুগের উদ্দেশ্য এবং অভিলাষ অপর যুগের মাপকাঠিতে প্রকৃত পরিমাণে পৃথক্ হয়েছে, স্বতন্ত্র হয়েছে।

এমনি ভাবেই যুগে যুগে, শিক্ষা কি, শিক্ষার লক্ষণ কি, প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি কাকে বলা যাবে?—ইত্যাদি নানা জিজ্ঞাসার নানা উত্তর বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রদত্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা ও ধর্ম একটি সুন্দর সমন্বয়ে সমগ্র পারিবারিক ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই শিক্ষার আদর্শ এবং লক্ষ্য দূর অতীত যুগেই একটি অনবদ্যসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল। তখন আত্মজ্ঞান-লাভই ছিল শিক্ষার মূল লক্ষ্য। কথা ছিল 'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জানো, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি কর, বিকশিত কর।

তুমি কে? কোথা থেকে এ জীবধাত্রী বসুধার বুকে এসেছ? আবার কোন্ দূর রহস্যময় লক্ষ্য-মুখে তোমার বিশ্রামহীন দুর্গম যাত্রা?—এ-সব জানবার জন্য তুমি প্রয়াসী হও, ব্রতী হও। শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ ও নির্দেশ শ্রবণ কর। কায় মন ও বাক্যে সংযম ও সাধনার প্রতীকরূপে আচার্যের হাত থেকে মুঞ্জতৃণের মেখলা গ্রহণ ক'রে তিনবার কটিদেশে বেঁধে নাও। তারপর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সংযত চিত্তে যাত্রা শুরু কর। সে-যাত্রাই শিক্ষার ক্ষুরধার পথে তোমার পদবিক্ষেপ সূচনা করবে, তোমার বিদ্যার্থী-জীবনে ঐ হবে সত্যানুগমন।

বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধোত্তর-যুগেও শিক্ষার সংজ্ঞা ও লক্ষ্য বহুলাংশে অনুরূপ ছিল। যদিও তখন শিক্ষায়তনসমূহের আকৃতি বিপুলতর হয়েছে, বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় অধিক সংখ্যায় গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষার মান ও সীমা বিস্তৃততর পরিধি লাভ করেছে, তথাপি আদর্শগত পার্থক্য খুব বেশী হয়নি।

আবার ইওরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীনযুগে শিক্ষার যে সকল সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছিল, যে আদর্শনিচয় চিত্রিত হয়েছিল—উত্তরযুগে ধীরে ধীরে একাধিক মনীষীর চিন্তায় ও অবদানে তাদের মধ্যেও নানা পরিবর্তন এবং বিচিত্রতা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।